

পঞ্চম বর্ষ।　　　　প্রথম সংখ্যা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৩১১—১২

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত।

—— •:•):• ——

লেখকগণের নাম।

শ্রীমন্মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি. এ., শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী,
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ., শ্রীকেদারনাথ মজুমদার,
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি. এল. ও
সম্পাদক।

ময়মনসিংহ সুহৃদ্ যন্ত্রালয় হইতে
শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মাঘ, ১৩১১।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

সূচী।

সম্পাদকের নিবেদন।

প্রেসের অসুবিধায়, ৪র্থ বর্ষের ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর "আরতি"র প্রকাশ স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। এখন উহার জন্য একটী মনোরম প্রেস আনীত হওয়ায়, আমরা ভগবন্নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। আশা করি গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গ "আরতি"কে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ-চক্ষে অবলোকন করিবেন।

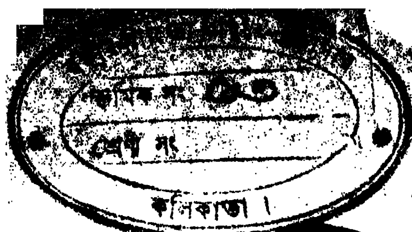
বিশেষ কোন কারণে, এবার মাঘ হইতে "আরতি"র বর্ষগণনা করিতে হইল।

নিবেদক
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যে সকল গ্রাহক ৪র্থ বর্ষের সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান বর্ষে "আরতি"র মূল্য ৸৵০ আনা মাত্র দিতে হইবে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর পণ্ডিত,
প্রোপ্রাইটার ও ম্যানেজার,



আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।



পঞ্চম বর্ষ

১৩১১ মাঘ হইতে ১৩১২ পৌষ পর্য্যন্ত।



ময়মনসিংহ সুহৃদ্ যন্ত্রালয় হইতে

শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

—— •:(•):• ——

পঞ্চম বর্ষের লেখক ও লেখিকাগণের নাম

(বর্ণানুসারে)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম, এ, বি, এল।

কুমারী আশালতা গুপ্তা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

" উমেশচন্দ্র গুপ্ত।

" কামিনীকুমার দে

" কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ।

" কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ।

" কেদারনাথ মজুমদার।

" দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

" দুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন।

" ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

" প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

" বিপিনচন্দ্র রায় বি, এ।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন।

" মোহিনীশঙ্কর রায়।

" যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ।

" রজনীকান্ত চৌধুরী।

" রমণীমোহন ঘোষ বি, এল।

" রসিকচন্দ্র বসু।

" রামপ্রাণ গুপ্ত।

" রেবতীমোহন গুহ এম, এ, বি, এল।

শেখ ফজলল করিম।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ।

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। ময়মনসিংহ, মাঘ ১৩১১। প্রথম সংখ্যা।

বাণী-আরাধনা।

১

আয় মা বরদে শক্তি শ্বেতবীণাপাণি!
বসন্ত যুবক নিত্য, তোরি মা বিশ্বাসী ভৃত্য
অবনীতে অঙ্গরাগ দিছে তুলি টানি;
কোকিল গাহিছে নিতি, তোর আবাহন-গীতি,
মলয়ে মধুরে বাজে তোর আগমনী;
শিরে বরণের ডালা, শ্যামাঙ্গী প্রকৃতি বালা
নীরবে বোধন-মন্ত্র কি জপে না জানি;
তোরি আগমন চেয়ে, কোটি ছেলে কোটি মেয়ে
উৎকণ্ঠা-উদ্বেগে আছি দিবস যামিনী;
আয় মা বরদে শক্তি শ্বেতবীণাপাণি!

২

আয় মা বরদে শক্তি শ্বেতবীণাপাণি!
আজিও আবেগ ভরে, এনেছি কুসুম-স্তরে
সচন্দন বিল্বপত্র—পূর্ণ দুই পাণি;
মুখে তোর জয়গান, হৃদয়ে ভক্তির টান
নয়নে এনেছি পাদ্য আরাধ্যা জননি!
আজি সে পঞ্চমীযোগ— নরের অমৃতভোগ,
নরের মরতে আজি এলে সুররাণি!

বড়ই পুণ্যের জোরে, বর্ষে বর্ষে পাই তোরে,
দে মা পূজি ভক্ত তোর চারু পা' দুখানি,
সারদে শুভদে শক্তি শ্বেতবীণাপাণি!

৩

মা!
গ'ণে দেখ আজি কত বর্ষ অবসান,
এমনি ত বর্ষে বর্ষে, অতুল উদ্যমে হর্ষে
আকুল হৃদয়ে করি পুষ্পাঞ্জলি দান;
কিছুতে কাটে না রিষ্টি, ঘুচে না শনির দৃষ্টি,
যেই দুঃখী সেই দুঃখী ভারত সন্তান;—
নয়নে গলিত ধার, দেহে অস্থি মাত্র সার,
বুকে বিভীষিকাময় প্রতপ্ত শ্মশান,
জীবন্তে অসংখ্য মরা— রোগে পাপে ভরা ভরা,
বদন বিষাদে ঢাকা অবসন্ন প্রাণ;
একে একে হলো কত বর্ষ অবসান।

৪

কিছুতে গলে না তোর পাষাণ অন্তর!
তোরি ত সম্মুখে ধ্বংশ, ত্রেতায় রাক্ষসবংশ,
অমর অমরী যার নামে পে'ত ডর;
দেখেছ জলন্ত নেত্রে, দ্বাপরে সে কুরুক্ষেত্রে,
পাণ্ডব-কুরুর মহা ভয়াল সমর,
ভ্রাতৃমেধ যজ্ঞ-ধুমে, সোণার ভারতভূমে
পাহাড়ে প্রান্তরে নাচে অসি খরতর;
দেখেছ সে সর্ব্বনাশ— আত্মদ্রোহ আত্মনাশ,
ভারতের বলক্ষয় রক্তের সাগর!
তখনো কাঁপেনি তোর কঠিন অন্তর!

৫

যাক্ সে পুরাণা কথা—ব্যথা ভয়ঙ্কর;
দেখিতেছ স্থির নেত্রে, সোণার ভারত ক্ষেত্রে
কি বিষম জ্বালা হায় জ্বলে নিরন্তর,—

বসন্ত দুর্ভিক্ষ ওলা, ঘৃণ্য যমদূত গুলা
অস্থীরে রুধির খায় ভাঙ্গিয়া পঞ্জর;
আনন্দে ডিঙ্গায়ে বেলা,—কি যে সে রাক্ষসী খেলা—
ভারতের শস্য লুঠে কত দামোদর;
বোম্বাই পঞ্জাব বঙ্গে, ভারতের অঙ্গে অঙ্গে
কি ব্যথা জাগায়ে দিছে পেলেগ পামর।
তবুও গলেনি তোর কঠিন অন্তর?

৬

এখনো জ্বলেনি চিত্ত দারুণ ব্যথায়?
আমরা ভারতবাসী, আত্মদ্রোহী আত্মনাশী;
এমন জঘণ্য জাতি আছে কি ধরায়?
আমাদের প্রতিশ্বাসে, হিংসার দুর্গন্ধ আসে,
প্রতিবাক্য পরিপূর্ণ গর্ব্ব-গরিমায়;
কুটিলতা প্রতিকর্ম্মে, স্বার্থচিন্তা মর্ম্মে মর্ম্মে,
প্রতিদৃষ্টি কলুষিত পাপ কালিমায়;
এ উহারে করি হেলা, পিশাচ রাক্ষসগুলা,
এ উহার বুক চিরি, শোণিত তৃষ্ণায়;
একে কাঁদে অন্যে নাচি, একে মেরে অন্যে বাঁচি,
এত অধঃপাতে গেছি হায় হায় হায়!

৭

মা!
দেখি বটে বর্ষে বর্ষে, পতিত ভারতবর্ষে;
জাতীয় মিলন-ক্ষেত্রে দৃশ্য মহীয়ান,
হৃদয়-কপাট খুলি, মিশে হিংসা-দ্বেষ ভুলি,
দেশের খ্রীষ্টান বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান;
মুখে মমতার বোল, এ উহারে দেয় কোল,
সব যেন এক দুঃস্থা মায়েরি সন্তান,
সকলেরি এক গান, অবিভিন্ন সুর-তান;
উপরে আকাশ, নীচে ধরা কম্পমান;
সবি যেন পারে দিতে, এ উহার স্বার্থ হতে
প্রয়োজন হয় যদি প্রাণ মূল্যবান!

বিস্ময় বিমুগ্ধনেত্রে, দেখি এসে কার্য্যক্ষেত্রে,
ভয়ঙ্কর গদাহস্তে দৈত্য-অধিষ্ঠান!

৮

দেবি!
তোরি যে কলঙ্কগানে ভরেছে সংসার;
আরাধ্যা দেবীর ধ্যানে, ফ্রান্স বাঁচিয়াছে প্রাণে,
হয়েছে রোমের দেহে জীবন-সঞ্চার;
অতি ক্ষুদ্র একবিন্দু,— চৌদিকে অকুল সিন্ধু—
জাপান জাতীয় রাগে জাগে অনিবার;
আমরা পিশাচ হেয়, অতি ঘৃণ্য অবজ্ঞেয়,
আমরা পড়িয়া আছি মৃতের আকার!
এ যে সুধু বীণাপাণি কলঙ্ক তোমার।

৯

এ যে বীণাপাণি! ঘোর কলঙ্ক তোমার,
সন্তান-মমতা ভুলি, হৃদয়ে পাষাণ তুলি'
এমন অকাল নিদ্রা শোভে কিগো মা'র?
সন্তানের বুকচিরা হেরে সদ্য রক্ত-শিরা,
আতঙ্কে কাঁপে না অঙ্গ ও পাষাণি কার?
কোলে নে সন্তানে তোর, মুছে দে নয়ন-লোর,
আশ্বাসে বিশ্বাস দেও ঘুচিবে আঁধার,
সতেজে নবীন রাগে, অচিরে পূরব ভাগে,
সৌভাগ্যের শান্তসূর্য্য উদিবে আবার।

১০

এমন অকাল নিদ্রা শোভে কি তোমার?
অই যে তোমার কাছে, সপ্ততন্ত্রীবীণা আছে,
মৃত সঞ্জীবনী শক্তি আছে ত উহার;
চড়া'য়ে মা গ্রামে গ্রামে, ভারত মঙ্গল কামে,
তোল্ ও বীণায় তোর গম্ভীর ঝঙ্কার;
আঙ্গুলের ঘা'য় ঘা'য়, উঠিবে মা পুনরায়,
অসংখ্য সন্তান সুপ্ত ভারত মাতার,

নবরত্ন প্রভাময়ী, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডজয়ী
উজ্জয়িনী-রাজসভা জাগিবে আবার ;
ধর্ম্মপ্রাণ শিষ্ট-শুদ্ধ, মহাধীর মহাবুদ্ধ
উঠিবে উঠিবে শত ব্রাহ্মণ কুমার ;
মুখে হাসি, হাতে হল, জাগিবে সে বৈশ্যদল,
চৈতন্য গৌতম শত ধর্ম্ম-অবতার ;
চিতা-ভস্ম ঠেলে ফেলে, উঠিবে মা দলে দলে
সহস্র ভাস্কর শত শিল্প-কর্ম্মকার ;
ফল-শস্যে হবে ভরা, মা তোমার বসুন্ধরা,
ঘুচে যাবে সন্তানের ঘোর হাহাকার।
তোল্ মা বীণায় তোর গভীর ঝঙ্কার।

কালিদাস ও রঘুবংশ।

কালিদাস রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সভা সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ইহা এত প্রসিদ্ধ যে, ইহার প্রমাণ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বিক্রমাদিত্য নামধারী ও বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী কতিপয় রাজা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য নাম নহে, উপাধিমাত্র এরূপ মনে করা যেমন ভ্রম, বিক্রমাদিত্য সর্ব্বস্থলেই উপাধি মাত্র, ইহা মনে করাও তেমনি ভ্রম। মনে হয়, কালিদাসের বিক্রমাদিত্য সূর্য্যবংশীয় ছিলেন। কালিদাসের নাটকগুলির নান্দীতে ও কাব্যগুলির মঙ্গলাচরণে শিবস্তুতি দৃষ্ট হয়। রঘুবংশে আঠারটী ছন্দের ব্যবহার হইয়াছে। কবি রামায়ণ কথায় সর্ব্বত্র বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। রামায়ণে চরুভাগের যে প্রসঙ্গ আছে, তাহা সদর্থ হয় না, ইহাতে অনুমিত হয়, দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের উপাখ্যান, বাল্মীকির লেখনীপ্রসূত নহে। ইহা পরবর্ত্তী সংযোজন মাত্র। অবশ্য সে সংযোজনও বহুদিন পূর্ব্বে হইয়াছে। রামানুজের নামে চলিত রামায়ণটীকায় চরুভাগের সুমীমাংসা হয় নাই। কালিদাস, বুদ্ধিমানের ন্যায় চরুভাগ করিয়া দিয়াছেন। টীকাকার মল্লীনাথ বলেন কালিদাসকৃত চরুভাগের মতটী নারসিংহ পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আমরা অবশ্য বিশ্বাস করি যে, যদি পুত্রেষ্টিযজ্ঞ ও চরুভাগ

বাল্মীকির লিখিত হইত, তবে মহর্ষি ভাগ মিলাইয়া রাখিতেন। নরসিংহ পুরাণ ও কালিদাস এই উভয়ের মধ্যে কে প্রাচীনতর, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। পুরাণ কালিদাসের প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। পুরাণকারেরা প্রথমতঃ রামকে বিষ্ণুঅবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কবিদের তেমন সাহস হইতে পারে না; কারণ পুরাণের কথা লোকে যেমন মানে, কাব্যের কথা তেমন মানে না। অহল্যার পাষাণী হওয়া ও রামের আত্মবিস্মৃতি প্রভৃতি কালিদাস, পুরাণের মতানুসারে গ্রহণ করিয়াছেন। বাল্মীকি, রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের সমস্ত রচনা করেন নাই। আমার অনুমান হয়, বৃহৎ গ্রন্থের যেমন পরিশিষ্ট থাকে, উত্তরকাণ্ডের কোন কোন অংশ সেইরূপ রামায়ণের পরিশিষ্ট মাত্র। সীতানির্ব্বাসন ও রামাশ্বমেধ পরিশিষ্টের অন্তর্গত, কিন্তু রাবণের দিগ্বিজয়, পরে সংযোজিত হইয়াছে।

কালিদাসের সময় বিষ্ণুর সমুদয় অবতার কল্পিত হইয়াছিল। কবি, পুরাণের নিতান্ত অসম্ভব উপখ্যানগুলির সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নাই। তিনি সগর সন্তান-গণের দ্বারা সাগর কাটান নাই, বলিয়াছেন তাহারা সাগর বাড়াইয়াছিল। লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আগমন কালে, রামের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—

গুরোর্যিযক্ষোঃ কপিলেন মেধ্যে।
রসাতলং সংক্রমিতে তুরঙ্গে॥
তদর্থমুর্ব্বীমবদারয়দ্ভিঃ।
পূর্ব্বৈঃ কিলায়ং পরিবর্দ্ধিতো নঃ॥

বলিয়াছেন,—অজ্ঞ লোক ভূমির ছায়াকে চন্দ্রের কলঙ্কত্বে আরোপিত করেঃ—

ছায়াহি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ।

কালিদাস কোনস্থানে বরুণবাণ, বায়ব্যাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই, বোধ হয় সেগুলিতে বিশ্বাস করিতেন না।

বিষ্ণুর যে একটী পুরাতন নাম ছিল কৃষ্ণ, কালিদাসের এরূপ বিশ্বাস ছিল, নতুবা তিনি—

কার্ষ্ণেন পত্রিনা শত্রুঃ স ভিন্নহৃদয়ঃ পতন্।
আনিনায় ভুবঃ কম্পং জহারাশ্রমবাসিনাং॥ এবং
রাবণাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ।
অভিবৃষ্য মরুৎশস্যং কৃষ্ণমেঘস্তিরোদধে॥

এরূপ লিখিতেন না।

কালিদাসের সময় লইয়া তর্ক বিতর্কের মীমাংসা হয় নাই। প্রচলিত অধিকাংশ কাব্যের মধ্যে কালিদাসের কাব্যসমূহকে প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কালিদাসের গ্রন্থে নামধাতুর প্রয়োগ অল্প। যে গ্রন্থ যত আধুনিক, তাহাতে নামধাতুর প্রয়োগ তত অধিক। বাঙ্গলার বৈষ্ণবদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে নামধাতুর প্রয়োগের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা রঘুবংশ পাঠ করিয়া দিলীপ রঘু ও অজ দশরথাদির সময়ের বিবরণ জানিতে পারি আর না পারি, কালিদাসের সময়ের বা তাহার কিছু পূর্ব্বের অনেক বিবরণ জানিতে পারি। রঘুর দিগ্বিজয় রঘুবংশবর্ণিত একটী প্রধান ঘটনা। রঘু যে যে দেশ দিয়া যে যে দেশে গিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তৎকালে, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজ্যের নাম জানিতে পারি। রঘু অযোধ্যা হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ সুহ্মদেশে উপস্থিত হইলেন। সুহ্মদেশ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী ছিল। রাঢ়ের প্রাচীন নাম সুহ্ম। ত্রিপুরা ও আরাকানের নাম সুহ্ম নহে। অযোধ্যা হইতে সুহ্ম পর্য্যন্ত কোন প্রবল রাজ্য ছিল না। ইন্দুমতী-স্বয়ংবরে অঙ্গাধিপতিকে উপস্থিত দেখিতে পাই, তিনি হয়ত অযোধ্যার করদ ছিলেন। সুহ্মগণ, বৈতসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রঘুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। সুহ্মজয়ের পর রঘু, নৌসাধনোদ্যত বঙ্গীয়গণকে উৎখাত করিয়া গঙ্গা-স্রোতোন্তরে জয়স্তম্ভ নিখাত করিলেন। তখন বঙ্গের সমস্ত অংশ সমুদ্রগর্ভশয্যা পরিত্যাগ করিয়া মস্তক উত্তোলন করে নাই। বঙ্গরাজগণ স্বদেশজাত কলমের ন্যায় রঘুর নিকট মস্তক অবনত করিলেন।

রঘু বঙ্গজয় করিয়া বদ্ধদ্বিরদসেতুদ্বারা কপিশানদী পার হইলেন। একালের কশাইকে কপিশা বিবেচনা করা হইয়া থাকে। কংসাবতী ও কপিশা এক নদী কি না সন্দেহ। রঘু এ পর্য্যন্ত কোন বাধা পান নাই। সুহ্মেরা ত বৈতসীবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছিল, নৌসাধনোদ্যত বঙ্গীয়েরা কিছুকাল বাধা দিয়াছিল। উৎকলগণ ,কলিঙ্গের পথ দেখাইয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। রঘু, কলিঙ্গের সন্নিহিত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বত সমীপে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মহেন্দ্রপর্ব্বত, কলিঙ্গের অধিকৃত ছিল। কালিঙ্গগণ, প্রবল গজসৈন্য লইয়া ঘোরতর নারাচ বর্ষণ করিতে করিতে রঘুর সম্মুখীন হইল। ঘোরতর যুদ্ধের পর মহেন্দ্রনাথ বন্দী হইলেন। রঘু তাঁহাকে স্বপদে স্থাপন করিলেন। বিজয়ী সৈন্যগণ মহেন্দ্র পর্ব্বত সমীপে পানভূমি রচনা করিয়া নারিকেলাসব পান করিল।

কলিঙ্গ জয় করিয়া রঘু সমুদ্রের ধার দিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কোন রাজা তাঁহার গমনে বাধা জন্মাইতে পারিল না। কাবেরী নদী উত্তরণ পূর্ব্বক মলয়াদ্রি পার হইয়া পাণ্ড্যরাজ্যের সম্মুখীন হইলেন। পাণ্ড্যগণ রঘুর প্রতাপ সহিতে না পারিয়া তাম্রপর্ণী সমুদ্রসঙ্গমজাত মুক্তাফল সমর্পণ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। রঘু, মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বতে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া সহ্যপর্ব্বত লঙ্ঘন করিলেন। রঘু, দক্ষিণদিক্ জয় করিয়া সহ্যপর্ব্বতের পশ্চিমে সমুদ্রের ধার দিয়া ত্রিকূট পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমুদয় অপরান্ত দেশ জয় করিলেন। কেরল দেশের রমণিগণ, সেনাগণের ভয়ে পলায়ন করিল। তত্রত্য মুরলানদীর তীরজাত কেতকীপুষ্পের রেণুতে সেনাগণের বসনে সুগন্ধ হইল।

অনন্তর রঘু স্থলপথে পারসীকদিগকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন। স্থলপথে বলায় বুঝা যায় যে, তৎকালে জলপথেও পারস্যে গমনাগমন হইত। কবি বলিয়াছেন, যেমন সংযমী ব্যক্তি, ইন্দ্রিয়াখ্য রিপুগণকে জয় করেন, রঘুও তদ্রূপ পারসীকগণকে জয় করিতে যাত্রা করেন। এই বর্ণনায় বুঝা যায় যে, পারসীকেরা তৎকালে নিতান্ত দুর্নীতিপরায়ণ ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল। পারসীকেরা যবন, তাহারা মদ্যপান করিত, মুখে শ্মশ্রু রাখিত, মাথায় পাগড়ি পরিত। তাহারা অশ্বসেনা সহায়ে রঘুর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করিয়া, পরাজিত হইল; বিস্তর অজিন রত্ন ও দ্রবিণরাশি দিয়া শরণাগত হইল। সেনাগণ সেই সকল অজিন বিস্তার করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক দ্রাক্ষা-মদ্য পান করিয়া রণক্লম অপনয়ন করিল। রঘু, বোধ হয় বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া পারস্যে গিয়াছিলেন। তখন আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের কিয়দংশ হয় ত পারস্যের অন্তর্গত ছিল।

পশ্চিমদিক্ জয় করা হইলে, রঘু সসৈন্যে সিন্ধুনদের ধার দিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে হূণজাতিকে পরাভূত করিলেন। হূণদিগের কোন বিশেষ বিবরণ নাই। হূণদিগকে পরাজিত করিয়া সেনাগণ কাম্বোজে প্রবেশ করিল। কাম্বোজ নানারাজ্যে বিভক্ত ছিল। "উপদা বিবিশুঃ শশ্বৎ" এই বাক্যে তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। কাবুলের উত্তরদিকে কাম্বোজদেশ ছিল। আফগানস্তান, মুসলমানদের অধিকৃত হইলে কাম্বোজ জাতি উত্তরদিকের পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া বাস করে। অল্পদিন হইল, এই প্রাচীনজাতি, আফগান আমীরের ধর্ম্মোন্মত্ত পাঠান সেনাদের হাতে প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। কাম্বোজগণ রঘুর সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করে নাই। তাহাদের দেশ, সদশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা বহু সংখ্যক অশ্ব ও ধনরত্ন দিয়া রঘুর শরণাগত হইল।

অতঃপর সেনাগণ, গঙ্গার ধার দিয়া হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিতে

লাগিল। হিমালয়ের কোন বিশেষ বর্ণনা নাই। হিমালয়ে সিংহ আছে, কস্তুরিকা মৃগ বিচরণ করে, বায়ুতে কীচক ধ্বনিত হয়, রাত্রিকালে জ্যোতির্লতা প্রজ্বলিত হয়, দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষ জন্মে, উৎসবসঙ্কেত নামক জাতি বাস করে, কবি হিমালয় সম্বন্ধে এতাবন্মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতেও এই উৎসবসঙ্কেত জাতির বর্ণনা আছে। উৎসবসঙ্কেতেরা অশ্মবর্ষণ করিয়া রঘুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংরেজদের তিব্বত অভিযানের যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিব্বতের লোকের পাথর ছোড়া ব্যতীত যে অন্য কোন সুন্দর অস্ত্র প্রয়োগের অভ্যাস আছে এমন বোধ হয় না। প্রাচীনকালেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে, বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। রঘুসেনা উপস্থিত হইলে কিরাতেরা ভয়ে পলাইয়াছিল। সেনাগণ চলিয়া গেলে দেবদারুবৃক্ষে গজস্কন্ধের ঘর্ষণ স্থান দেখিয়া হাতীগুলা কত উচ্চ, তাহা মাপিয়া দেখিয়াছিল। রঘুসৈন্য, কৈলাস পর্ব্বতকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সে দিকে না যাইয়া হিমালয় হইতে নামিতে লাগিল। রঘু, সসৈন্যে লৌহিত্য নদী পার হইয়াছেন শুনিয়া কামরূপেশ্বর ভয়ে কম্পমান হইলেন। যে প্রবল গজসৈন্যদ্বারা, তিনি রিপুগণের ত্রাসোৎপাদন করিতেন, তৎসমুদয় দ্বারা রঘুর পূজা করিলেন। আমরা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সময়ে কামরূপেশ্বরকে দেখিতে পাই, রঘুনন্দন অজ, কামরূপেশ্বরের হস্ত ধারণ করিয়া বিদর্ভেশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রঘু এইরূপে দিগ্বিজয় সমাপন করিয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন। কালিদাসের বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় কোন প্রকৃত দিগ্বিজয় ব্যাপার তাহার মানসপটে অঙ্কিত ছিল। ভারতীয় প্রাচীন রাজচক্রবর্ত্তিগণ যে সময়ে সময়ে দিগ্বিজয়ে নির্গত হইতেন, তাহা লোকে জানিত। কালিদাস, দক্ষিণাপথের সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশগুলির নাম করিয়াছেন, অভ্যন্তরস্থ কোন দেশের নাম করেন নাই। তখন পর্য্যন্ত অভ্যন্তর ভাগে কোন গণনীয় আর্য্যরাজ্য স্থাপিত হয় নাই। ভারতের যে বৈজ্ঞানিক সীমা আছে, কালিদাস, রঘুকে তাহার বহিঃসীমায় যাইতে দেন নাই। উত্তরে কৈলাস, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে পারস্য, পূর্ব্বে কিরাত দেশ ভারতের বৈজ্ঞানিক সীমা এই। ইংরেজরাজ, প্রায় এই বৈজ্ঞানিক ভারতের অধীশ্বর হইয়াছেন। ভারতের প্রাচীন রাজগণের কেহ কেহ এই বৈজ্ঞানিক ভারতের অধীশ্বর হইতেন।

কালিদাসের সময় অযোধ্যা ও কামরূপের মধ্যে অন্য কোন প্রবল রাজ্য ছিল না। পূর্ব্বকালে আসাম বা নরকের দেশ সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছিল। পশ্চাদ্ভাগে

সুহ্ম বলিত, পুণ্ড্রদেশ কখন কখন কামরূপের অন্তর্গত হইত। কালিদাস, ইন্দুমতীস্বয়ংবরে মগধরাজ, অঙ্গরাজ, অবন্তীনাথ, অনূপরাজ, শূরসেনরাজ, পাণ্ড্যনাথ ও কলিঙ্গনাথকে আনয়ন করিয়াছেন।

রঘু, দিগ্বিজয় সমাপন করিয়া সমাহৃত অর্থদ্বারা বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। পূর্ব্বকালের রাজগণ, সময়ে সময়ে সর্ব্বত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন। হুয়েনসাং, হর্ষবর্দ্ধনকে এইরূপ একটী ধর্ম্মোৎসবে সর্ব্বস্ব দান করিতে দেখিয়াছিলেন।

কালিদাস, সুন্দর সুন্দর উপমার প্রয়োগ করিয়া আপনার কাব্যগুলিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এমন কোন উপমার প্রয়োগ করেন নাই, যাহা কালভেদে ও দেশভেদে বুঝিতে পারা যায় না।

কালিদাসের বিশ্বাস ছিল, মানুষের একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ু আছে, যথা—

প্রতীকারবিধানমায়ুষঃ সতিশেষে ফলায় কল্পতে॥

ইহাকে কুসংস্কার বলা যায় না। আমাদের শারীর যন্ত্রে এমন একটা শক্তি আছে, যাহার ক্ষয় হইলে সে আর কার্য্য করিতে পারে না, তখন ঔষধাদি তাহাকে আর সাহায্য করিতে পারে না, ঐ শক্তিকে আয়ুঃ বলিতে পারা যায়। কালিদাস বিশ্বাস করিতেন, মৃত্যুর পর স্বজনদের স্বকর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি হয়, কেহ কাহারও সঙ্গে মিলিতে পারে না। অনেকের বিশ্বাস আছে, মৃত স্বজনগণ পরলোকে গিয়া আমাদের অপেক্ষা করে। আমি তাহাদিগকে ভালবাসি বলিয়া তাহারা যে আমাদিগকে ভালবাসিবে এমন মনে করা ভুল। রঘুবংশে অনেক সুন্দর সুন্দর নীতি উপদেশ আছে। উনবিংশ সর্গে যদিও অশ্লীল বর্ণনা আছে, তথাপি পাপের ভীষণ পরিণাম বর্ণনা করিয়া কবি মহতী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

খুকি।

১

আমাদের খুকির নাম এখন বলিব না।

খুকিকে "কচি মেয়ে"ও বলিতে পার, "ডাগর মেয়ে"ও বলিতে পার। যাহাই বল, খুকি কিন্তু বড় টুকটুকে মেয়ে। খুকি একখানা মোটা কাপড় পরিয়া থাকে। হাতে কেবল দু'গাছি বালা।

খুকির মা খুকির বিয়ের জন্য ভাবে। খুকি কেবল দীনু দার স্ত্রীর জন্য ভাবে। দীনু কৈবর্ত্তর স্ত্রী পোয়াতি। দীনু বলিয়া ছিল "খুকি মণি, আমার সন্তান হইলে তোকে মা বলিয়া ডাকিবে"।

সেই দিন হইতে খুকি সারা রাত্রি ভাবিয়া আকুল। "মা" কি মধুর নাম! মা হইবে মনে করিয়া খুকি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। অঙ্গের মাধুরী ফুটিয়া উঠিল। খুকির দিকে যে তাকাইত সে আর নয়ন ফিরাইতে পারিত না।

খুকির পিতা এক কালে জমিদার ছিলেন। তিনি বাঁচিয়া নাই। জমিদারীও নাই। কেবল এক ঘর পূর্ব্বের প্রজা আছে—সেই দীনু কৈবর্ত্ত। খুকির মা এখন দরিদ্র বিধবা। কতকগুলি সেকালের গহনা আছে মাত্র।

খুকির মামার ইচ্ছা, খুকির সঙ্গে হরিপুরের জমিদারের ছেলের বিবাহ হয়। ছেলেটী বড় সুন্দর। শান্ত, সুধীর এবং ডাক্তারী পাশ। জমিদারীর আয় দুইলক্ষ টাকা হইলেও হরিপুরের জমিদার তাঁহার পুত্রকে ডাক্তারী পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল ডাক্তারী শিখিলে, পুত্র হঠাৎ রোগে মারা যাইবে না। অতি অল্প বয়সেই নরেন্দ্র ডাক্তারী শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের বয়স মোটে বাইশ বৎসর।

খুকির মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছিল "এমন দিন কি আর হবে"!

২

তেমন দিন হইবার সম্ভাবনা হইল। খুকির মামা আসিয়া বলিল "লীলা (খুকির মা), নরেন্দ্র বাবু স্বয়ং খুকিকে দেখিতে বেলা চারিটার সময় আসিবেন"।

খুকির মা ব্যস্ত হইল। পুরাতন কাঠের সিন্দুক হইতে একখানা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বেণারসী শাড়ী বাহির করিল এবং নিজের ডায়মণ্ড-কাটা চিক্ বাহির করিল।

দিনটা বড় দুর্য্যোগের। ঘন অন্ধকার করিয়া পশ্চিমে মেঘ উঠিতেছিল। "তবুও কি জানি, যদি মেয়ে দেখিতে আসে"। তাহাই মনে করিয়া খুকির মা, খুকিকে ডাকিল।

খুকি ঘরে নাই। সে টুপ্ করিয়া দীনুর বাটীতে চলিয়া গিয়াছে। দীনুর স্ত্রীর তখন একটা টুকটুকে ছেলে হইয়াছে।

খুকি তাই আনন্দে অধীর। সে ভাবিতেছিল "কখন আমার ছেলেকে দেখিব"। এমন সময় দীনু বাহিরে আসিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল "খুকি! দিদিমণি! তোর ছেলে বুঝি বাঁচে না।"

"সে কি দীনু দা" ? বলিয়াই খুকির চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

দীনু। দিদিমণি! তার অবস্থা যেন কেমন কেমন। সকলে বলিতেছে ডাক্তার ডাকিলে বাঁচিবে। আমি গরীব মানুষ, ডাক্তার কোথায় পাইব ?

খুকির মনে পড়িল এক ক্রোশ দূরে যাদব ডাক্তার থাকে। সে কলাবাগান পার হইয়া এক ছুট দিল। তখন কাল মেঘ প্রথম গর্জ্জনে জলস্থল কাঁপাইতে-ছিল।

দীনু ভাবিল "খুকি কোথায় গেল ?" খুকির মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমাদের খুকি কই" ?

দীনু সভয়ে বলিল "এই মাত্র সে দৌড়িয়া গেল"।

খুকির সন্ধান করিয়া কেহই পাইল না। দুই শত বিঘার মাঠ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। তার পর আর দেখা যায় না।

৩

কিন্তু খুকির সে জ্ঞান নাই। তীক্ষ্ণ বারিধারা ভেদ করিয়া খুকি কুড়ি মিনিটে প্রায় এক ক্রোশ রাস্তা পার হইয়াছিল। খুকির পায় কাঁটা ফুটিয়া ব্যথা লাগিয়াছিল। ভ্রুক্ষেপ নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? সম্মুখেই একটা খাল। তার পর যাদব ডাক্তারের বাড়ী।

খালের মধ্যে গভীর জল। গলা জলে নামিয়া খুকি আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সে সাঁতার জানে না। তবে বুঝি সন্তান বাঁচিবে না! আকা-শের দিকে চাহিয়া খুকি কাঁদিতে লাগিল। হে ভগবন্ আমার ছেলেকে বাঁচাও!

বোধ হয় ভগবান্ শুনিলেন। সেই সময় সর্ব্বাঙ্গে ওয়াটারপ্রুফআবৃত একজন ভদ্রলোক টম্‌টম্ হাঁকাইয়া যাদব ডাক্তারের বাটীর দিকে যাইতেছিলেন। তিনিও খাল দেখিয়া স্থগিত হইলেন এবং খালে একটী টুক্‌টুকে মেয়েকে কাঁদিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

প্রথমে তিনি বাটীর দিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ডাক্তার বাটীতে আছেন ?"

খালের অপর পার হইতে যাদব ডাক্তারের বাগানের একজন মালী উত্তর দিল "না, বাবু কলিকাতায় গিয়াছেন"।

খালের মধ্যে খুকি তাহাই শুনিয়া অন্ধকার দেখিল। সে জলে ডুবিয়া যাইতেছিল। আগন্তুক ভদ্রলোকটী তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ খুকিকে জল হইতে তুলিয়া তীরে আনিলেন।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি কোথায় যাবে?

খুকি ক্ষীণ কাতর স্বরে বলিল ওগো! দীনু দার ছেলে বাঁচে না, একজন ডাক্তারকে কোথায় পাইব বলিয়া দিন্ না।

আগন্তুক। কতদুর?

খুকি। ঐ গ্রামে।

আগন্তুক। আমি একজন ডাক্তার।

খুকির কাঁচা সোণার বর্ণ আবার দীপ্ত হইয়া উঠিল। খুকি সোণার বালা দু'গাছি খুলিয়া বলিল "আপনার কষ্ট হবে, আপনি এ দু'গাছি লউন। দীনু দা বড় গরীব। তাঁহার নিকট কিছু চাহিবেন না।

কি সুন্দর মুখ! কি সুন্দর হাত দুখানি! কি সুন্দর কথা!

৪

কি মনে করিয়া আগন্তুক ডাক্তার বাবু বালা দু'গাছি সযত্নে পকেটে রাখিলেন। এই তাঁহার প্রথম ব্যবসায়।

ডাক্তার বাবু। তুমি টম্‌টমে উঠিতে পারিবে? খুকি উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না। কণ্টকের ব্যথা বড় যন্ত্রণা দিতেছিল।

ডাক্তার বাবু খুকির ক্ষীণদেহ, রূপরাশির সহিত, দুই বাহুতে ধরিয়া, টম্‌টমে তুলিয়া দিলেন। ওয়াটারপ্রুফটা খুলিয়া খুকির গাত্র আবৃত করিয়া দিলেন। তীক্ষ্ণ কশাঘাতে অশ্ব তীরবেগে ছুটিতে লাগিল। রাস্তা সোজা। চক্ষের নিমেষে দীনুর কুটীর দেখা দিল।

তখন খুকির সন্ধানে সকলে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কোনও বাক্য ব্যয় না করিয়াই ডাক্তার বাবু এবং খুকি প্রসব গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

খুকি বলিল "ঐ ঘরে, আমি যাব?"

ডাক্তার। না।

ডাক্তার বাবু সাড়া দিয়া ঘরে গেলেন। প্রসূতি অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিল। সদ্যোজাত শিশু তখনও মরে নাই। নিকটে দীনুর বৃদ্ধা মাতা বসিয়া কাঁদিতেছিল। বাহিরে বৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন "কোন ভয় নাই।" তাহার পর তিনি শিশু এবং মাতার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং টম্‌টম্ হইতে ঔষধের বাক্সটী আনিয়া দুইজনকে দুইটী ঔষধ প্রয়োগ করিলেন।

এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। খুকি তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া। ডাক্তার বাবু বাহিরে আসিলেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল।

খুকির আশায় সঞ্চার হইল "বাঁচিবে ত?

ডাক্তার। "বাঁচিয়াছে" কোন ভয় নাই।

খুকি কৃতজ্ঞতা ভরে ডাক্তারের হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিল। সেই হাতে কি যাদু মাখা ছিল তাহা এ সংসারে সকলে জানে না।

ডাক্তার বাবু বিস্মিত এবং পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে"?

খুকি বলিল আমি "সূর্য্যমুখী"।

৫

ডাক্তার বাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। যেমন সুন্দর মেয়েটী তেম্‌নি সুন্দর নাম!

ডাক্তার বাবু। তোমার বাড়ী কোথায়?

খুকি। ঐ!

কলাবাগান পারেই খুকিদের দোতালাবাড়ী। ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কাহাদের বাড়ী"?

ইত্যবসরে দীনুর মা ডাক্তারের জন্য যথাসম্বল দুইটী টাকা লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল " ও যে জমিদারের পুরাণো বাড়ী। আহা! তিনি বাঁচিয়া থাকিলে কি আর আমাদের টাকার অভাব! ন্যাও বাবা! আমার যা আছে এই দুটী টাকা ন্যাও"।

খুকি বলিল "না না, আমি ডাক্তার বাবুকে টাকা দিয়াছি। তুমি টাকা রাখ। আর আমার ছেলেকে কখন দ্যাখাবে? ঐ যে সে যে কাঁদ্‌ছে" খুকির সর্ব্বশরীর নাচিয়া উঠিল।"

দীনুর মা। কি দয়াময়ী মেয়ে! যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। যেমন বাপ, তেম্‌নি মেয়ে।

ডাক্তার বাবু বুঝিতে পারিলেন সূর্য্যমুখী কে। ধীর গম্ভীর ভাবে সূর্য্যমুখীর হাত ধরিয়া বলিলেন "চল তোমাদের বাড়ী যাই"।

ডাক্তার বাবুর হাত কাঁপিতেছিল। খুকির যেন তাহাতে একটু লজ্জা হইল। খুকি অবনত বদনে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কলাবাগান পার হইল।

তখন বৃষ্টি থামিয়াছে। সূর্য্যদেবও পাটে নামিয়াছে। ডাক্তার বাবু যুবা। সুন্দর। অতি সুন্দর। খুকির হাত ধরিয়া তিনি আরও সুন্দর হইলেন।

খুকির বস্ত্র সিক্ত। বালা দু'গাছি হাতে নাই। খুকি ডাকিল "মা, তুমি কোথায়। ডাক্তার বাবু তোমায় ডাক্‌ছেন"।

ডাক্তার বাবু বলিলেন "সূর্য্যমুখী, তুমি একটু দাঁড়াও, তোমার চুল মুছিয়া দিই"

খুকি বলিল "না, মা মুছাইয়া দিবে"।

ডাক্তার বাবু। কখনও না, আজ হইতে আমিই মুছাইয়া দিব।

৬

খুকি ফাঁপরে পড়িল। ডাক্তার বাবু তার সন্তানের প্রাণ দাতা। তাঁহার কথা এড়াইতে পারে না। অথচ ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া খুকির লজ্জা বাড়িতে লাগিল। কৈ, এতক্ষণ ত লজ্জা হয় নাই! এ আবার কি জঞ্জাল!

ডাক্তার বাবু, খুকির চুল মুছাইয়া দিতেছিলেন তখন খুকির মা ও মাতুল আদাড়, বাদাড়, বন প্রভৃতি খুজিয়া হায়রাণ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

খুকিকে দেখিয়া খুকির মা কাঁদিয়া ফেলিল "ওলো পোড়ামুখী, তোর কি একটু ভয় নাই। তের বৎসরের মেয়ে একটুও বুদ্ধি নাই! এই বৃষ্টিতে গিয়াছিলি কোথায়"?

হারাধন পাইয়া খুকির মা, আগন্তুক ডাক্তার বাবুকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। খুকির মামা বলিল, "লীলা একটু থাম, নরেন্দ্র বাবু সম্মুখে"।

কি লজ্জার কথা! কি বিস্ময়ের কথা! খুকির মা ঘোমটা দিয়া দশ হাত দূরে সরিয়া গেল। ওমা! খুকির বালা দু'গাছি কোথায় গেল!

নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া খুকির মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "মা, আমি সূর্য্যমুখীর নিকট হইতে এই দু'গাছি বালা পাইয়াছি; আজ তাহাই দিয়া সূর্য্যমুখীর মুখ দেখিলাম। আশীর্ব্বাদ কর যেন এই দুইগাছি বালা আমি সূর্য্যমুখীর হাতে চিরদিন দেখি"।

সূর্য্যমুখী লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল। মা'র কতই আনন্দ! তদপেক্ষা আনন্দ দীনুর!

সূর্য্যমুখী মামাকে চুপি চুপি ডাকিয়া বলিল "ওঁকে বলিও যেন আমার ছেলেকে দেখিয়া যান"।

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন "আমাদের ছেলে, কেবল ওঁরই নয়"।

সেই প্রথম প্রেমের সূত্রপাত! সেই প্রেম আজীবন ছিল। লক্ষ্মী সূর্য্যমুখী রাজরাণীর ন্যায় সুখে দিন কাটাইয়াছিল এবং তার ছেলেকে ডাক্তারী শিখাইয়া বড় মানুষ করিয়া দিয়াছিল।

শ্রী—

খেদা।

(৪র্থ বর্ষ, ৩য় ৪র্থ সংখ্যার পর)

হস্তীগুলি গড় দাখিল হইলে এত ঘেসাঘেসি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে যে সহজে তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। কোটে আবদ্ধ হইলে হস্তীগুলি ইতস্ততঃ ২।১ বার ভ্রমণ করিলেই জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া যায়। যদি তাহারা কোট আক্রমণ করিয়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে তবে কোটের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত লোক দণ্ডায়মান থাকিবে তাহারা পূর্ব্ব সংগৃহীত তীক্ষ্ণাগ্র বংশদণ্ডদ্বারা, আক্রমণকারী হস্তীগুলিকে আঘাত করিবে, ইহাতেও নিরস্ত না হইলে বংশখণ্ডে অগ্নি সংযোগ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিতে হয়। সময় সময় অত্যন্ত অদম্য হইয়া হস্তীগুলি কোট ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু এপ্রকার দুর্ঘটনা অতি বিরল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হস্তীগুলি কখনও কোটের খুঁটি টানিয়া উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করে না, সজোরে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে মাত্র। সর্ব্বদাই প্রথম খেদাতেই যে হাতী, গড় দাখিল হইবে তাহা বলা যায় না। অনেক সময় ক্রমাগত ২।৩ দিনের চেষ্টাতেও গড় দাখিল না হইতে দেখা যায়। প্রথম দিনের খেদাতে হাতী, গড় দাখিল না হইলে যূথস্থ হস্তীগুলিকে রাত্রিতে পাতবেড়ে আবদ্ধ রাখা দুষ্কর হইয়া পড়ে; বস্তুতঃ একবারের খেদায় কৃতকার্য্য না হইলে বিশেষ চেষ্টা ও সতর্কতা ব্যতীত যূথ আবদ্ধ রাখা কঠিন এবং গড় দাখিল করানও সহজ নহে। সময় সময় (যদি ক্রমাগত খেদাতে গড় দাখিল না হয় এবং হস্তী পাতবেড়ে থাকিয়া যায়) নূতন কেল্লা বাঁধাইয়া খেদা করিলে সহজে গড় দাখিল করান যায়, কিন্তু এই ব্যাপার গুরুতর শ্রমসাধ্য এবং কঠিন।

হস্তী গড় দাখিল হওয়ার পর অনুসন্ধান করাইতে হইবে যে পাতবেড়ের মধ্যে আরও হস্তী আছে কি না; যে পর্য্যন্ত তাহা নিশ্চিত ভাবে নির্দ্ধারিত না হইবে এবং গড় দাখিলী হস্তীগুলি বাঁধা শেষ না হইবে (বাঁধিবার প্রণালী পরে বিবৃত হইবে) সে পর্য্যন্ত পুঞ্জীর কুলিগণ স্বীয় স্বীয় স্থান, পরিত্যাগ করিবে না; যদি হস্তী গড় দাখিল হওয়ার পর উপযুক্ত সময় থাকে তবে সেই দিনই আবদ্ধ হস্তীগুলিকে বাঁধিবার উদ্যোগ করিতে হইবে, বেলা অবসান হইলে সেই দিন বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া পাতবেড় পূর্ব্ববৎ ঠিক রাখিয়া, কোটের চতুর্দ্দিকে বন্দুক ও জাঠা ইত্যাদি সহ ৩০।৪০ জন প্রহরী

নিযুক্ত রাখিতে হইবে, এবং কোটের বহির্ভাগে চারিদিকেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হইবে। কোটের বহির্ভাগে খুঁটির সঙ্গে ছোট ছোট কতকগুলি মাচাং বাঁধাইতে হয়, এগুলিতে রাত্রিকালে প্রহরিগণ বসিয়া থাকিতে পারে এবং দর্শকগণও সময় সময় এ গুলিতে বসিয়া আরণ্য হস্তীগুলির গতিবিধি দেখিতে পারে। এই মাচাংগুলি বাঁধাইবার আর একটী উদ্দেশ্য এই যে, হস্তী বাঁধিবার সময় রশি প্রভৃতি এ গুলির উপর সংগ্রহ করিয়া রাখা যাইতে পারে।

এখন কি প্রকারে গড়-দাখিলী হস্তীগুলি বাঁধিতে হয়, তদ্বিষয় সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। হস্তীর ন্যায় বৃহৎকায় পশুকে রজ্জুবদ্ধ করতঃ যথেচ্ছা পরিচালিত করিতে পারা যায়, এ কথা যেন সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু মানববুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের অসাধ্য কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ" (তৃণ একত্র করতঃ গুণ পাকাইয়া মত্ত হস্তীকেও আবদ্ধ করা যায়) এই প্রবাদ বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, এখনও তৃণ না হউক পাটের রশিদ্বারাই হস্তী বাঁধার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। হস্তীগুলি বাঁধিবার জন্য পাঁচ প্রকার রশি ব্যবহৃত হয় (আমাদের খেদার বিষয় বলা হইতেছে) তাহা এই :—(১) পরতালা, (২) দোমা, (৩) ডোল, (৪) ইছাকলসী ও (৫) চরী; এ সমস্তের প্রস্তুত প্রণালী ও ব্যবহার সম্বন্ধে যথাস্থানে বলা যাইবে।

পাতবেড় হওয়ার অব্যবহিত পরেই মেট্ মাহুত প্রভৃতি হস্তীরক্ষক ও পরিচালকগণ রশি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইবে; হস্তীর সংখ্যা ও আকৃতি বিবেচনায় রশির আয়তন ও পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয় অর্থাৎ বৃহৎকায় হস্তী থাকিলে ডোল বড় করিতে হয় এবং সংখ্যায় অধিক হইলে রশির পরিমাণ অধিক করিতে হয়। আমাদের খেদাতে দাইদারগণই (সর্ব্বোপরি সরদার) হস্তী বাঁধার কার্য্য সম্পাদন করিত, অথবা তাহার নিয়োগানুসারে সুদক্ষ মাহুত ও মেট্গণ ঐ কার্য্য করিত। প্রসঙ্গাধীন বলা কর্ত্তব্য যে, আমাদের পীলখানাতে (হস্তীশালাতে) একজন (১) দারোগা, তাহার অধীনে (২) দাইদার তন্নিম্ন পদে (৩) মাহুত এবং মাহুতের অধীনে (৪) মেট্ থাকিত, এতদ্ব্যতীত হস্তীর ঘাস কাটার জন্য ২।৩ জন কামলা নিযুক্ত থাকিত, এখনও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। সর্ব্বদা হস্তী পরিচালন ও তাহাদিগকে স্নানাহার করান মেটের কার্য্য; মাহুতগণ, খেদা ও মৃগয়াতে (শিকার কার্য্যে) মেলা শিকারে এবং কর্ত্তৃপক্ষের

গমনাগমনের সময় হস্তী পরিচালন করিয়া থাকে। মাহুতগণ মেলা শিকারে (এ সম্বন্ধে পরে বলার ইচ্ছা আছে) বৃহৎ পুং হস্তী (গুণ্ডা) বাঁধিয়া বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে পারিলে তাহারাই দাইদার পদবীতে উন্নীত হয়।

দাইদার পদ প্রাপ্ত হইলে দুইটী রৌপ্য বলয় পুরস্কার পাওয়ার নিয়ম ছিল। দাইদারগণ হস্তীশালার সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধান করিবে এবং দারোগা, সকলের উপর দৃষ্টি রাখিবে। খেদা উপলক্ষে দারোগাকে নিজে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত, এমন কি তাহাকে কুলিগণের সঙ্গে যাইয়া পাতবেড় দেওয়াইতে হইত। প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসা হইয়াছে, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

হস্তী বাঁধার কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, রশিগুলি কোটের নিকট আনিতে হইবে, অতঃপর ১০।১২ টী অতি সুশিক্ষিতা এবং বলিষ্ঠা কুম্‌কীর (সুশিক্ষিতা বয়স্থা পালিতা হস্তিনীকে কুম্‌কী বলা যায়) পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল বেষ্টন করতঃ মোটা রশি বাঁধিতে হইবে; এই প্রকার রশি বাঁধাকে ফাঁড়াকসা বলা হয়। পূর্ব্ব কথিত ১০।১২ টী কুম্‌কীর মধ্যে যে'টী বিশেষ শান্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট ও সুশিক্ষিতা তাহাতে সিঁড়ি বাঁধিতে হইবে অর্থাৎ দুইটী মোটা রশিদ্বারা হস্তিনীর পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল বেষ্টন করতঃ বাঁধিতে হইবে, এই রশি দুইটীর শিরোভাগ মণ্ডলাকার করতঃ অগ্রভাগ ক্রমে সূক্ষ্ম করিতে হইবে, (এই রশির শিরোভাগকে মণ্ডল ও অগ্রভাগকে ছুর বলা হয়) অতঃপর বক্ষঃস্থল বেষ্টিত রশি দুইটীর অবশিষ্টাংশ কুম্‌কীটীর গলদেশ দিয়া আড়াআড়িভাবে (প্রতিকৃতি ভিন্ন ইহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ) জড়াইয়া পৃষ্ঠে বাঁধা রশি দুইটীর সঙ্গে অগ্রপদদ্বয়ের উপরি সন্ধির নিকট দিয়া পার্শ্বে তিন গুণ করিয়া বাঁধিতে হইবে, এই প্রকার রশি বাঁধাকেই সিঁড়ি বাঁধা বলা হয়, ইহার উদ্দেশ্য পরে বলা হইবে। কুম্‌কীগুলিতে এখন সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত মাহুতগণ আরোহণ করিবে; আরোহণ কালে তাহাদের হাতে এক একটী জাঠা (তীক্ষ্ণ লৌহযুক্ত বংশদণ্ড) থাকিবে। অতঃপর দাইদার যে কুম্‌কীর উপর থাকিবে তাহাতেও এক জন ভাল মাহুত জাঠা নিয়া আরোহণ করিবে। ইতঃপর কুম্‌কীগুলিকে সতর্কতার সহিত একে একে কোটে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে, এতদুদ্দেশ্যে কোটের একদিকে ২।৩ টী খুঁটি উঠাইয়া হাংড়াগুলি কাটিয়া একটী ছোট প্রবেশদ্বার প্রস্তুত করিতে হইবে; দ্বার প্রস্তুত হইলে কুম্‌কীগুলি একটীর পশ্চাতে আর একটী ক্রমান্বয়ে শ্রেণীবদ্ধ করতঃ দাঁড় করাইতে হইবে এবং

পর-পর ভাবে কোটে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। সমস্তগুলি কোটে প্রবেশ করিলে পুনর্ব্বার খুঁটি পুতিয়া হাংড়া প্রভৃতি বাঁধিয়া প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ফেরের কতকাংশে (কোটের দরজার পশ্চাৎভাগে) কুম্‌কী-গুলিকে দণ্ডায়মান করাইয়া তাহাদের পশ্চাৎভাগে খুঁটি ও হাংড়া দিয়া একটী রোম্‌কোট প্রস্তুত করাইয়া কোটের দরজা টানিয়া উঠাইলেও কুম্‌কী কোটে প্রবেশ করিতে পারে; এই প্রণালীটী পূর্ব্ব-কথিত প্রণালী হইতে নিরাপদ ও সুবিধাজনক, কিন্তু পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ, তথাপি ইহা নিরাপদ তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোটের মধ্যে বৃহৎ দন্তযুক্ত গুণ্ডা পুং হস্তী থাকিলে কুম্‌কীগুলি সহসা তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করে না এবং ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া পড়ে; এবম্বিধ গুণ্ডা এক একটা যূথে এক একটীর অধিক থাকে না, কিন্তু যূথের বিচরণস্থানের কিঞ্চিৎ দূরে এদিক সেদিক আরও ২।৪ টী গুণ্ডা প্রায়শঃই থাকে, এবং সুবিধা ও অবসর পাইলেই যূথে প্রবিষ্ট হইয়া যূথপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অতঃপর যে'টী অধিক বলশালী সেটী বিজয় লাভ করে এবং যূথপতির পদে স্থাপিত হয় এবং অপরটী পলায়ন করে। ছোট ছোট পুং হস্তী পালের মধ্যে একাধিক থাকিতে পারে, সে গুলিকে গাউা, ম্যাথানা, কালা (বয়োভেদে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা) প্রভৃতি বলা হয়।

গুণ্ডা বিশেষ উগ্র প্রকৃতির ও অদম্য হইলে সে অতি নির্দ্দয়ভাবে কুম্‌কীকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তখন কুম্‌কী ও মাহুত উভয়েরই প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়। এই অবস্থা ঘটিলে তাহাকে (গুণ্ডাকে) বধকরা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই; হস্তীর কপালের নিম্নে যে একটী উচ্চ স্থান আছে ইহাকে প্রচলিত ভাষায় পিতোয়ান বলে সেই স্থানে অথবা কপালের উভয় পার্শ্বে (temple) বন্দুকের একটী গুলি চালাইতে পারিলে হস্তী নিঃশব্দে ভূপতিত হয় এবং জীবনলীলা সম্বরণ করে। আরও একটী বিষয় বলা কর্ত্তব্য যে, গুণ্ডাগুলির দন্ত নাতিস্থূল, অধর বক্র এবং সূক্ষ্মাগ্র হইলে সে গুলি প্রায়ই অতি উগ্র প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু স্থূল, খর্ব্ব ও বিশেষভাবে বক্র দন্তযুক্ত গুণ্ডা ধীর প্রকৃতির হইয়া থাকে; অথবা গড়-দাখিলী হস্তীর মধ্যে গুণ্ডা থাকিলে তাহার দন্তের গঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব্বাহ্লেই সতর্কতাবলম্বন করিতে হইবে।

দাইদার, মাহুত প্রভৃতি কুম্‌কী সহ কোটে প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ

গুণ্ডা থাকিলে সেইটাকেই বাঁধিতে চেষ্টা করে। এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক—গুণ্ডা হস্তীর কপালের দুই পার্শ্বে দুইটী রন্ধ্র থাকে, হস্তিনীর ও রন্ধ্র থাকে কিন্তু তত স্পষ্ট ও সুব্যক্ত নহে। শরৎ ও বসন্তকালে পুংহস্তী-গুলির এই রন্ধ্রপথে এক প্রকার তীব্র গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ নির্গত হইতে থাকে, এবং তাহা হস্তীর কপোল ও গণ্ডদেশ দিয়া ঝরিতে থাকে। এই ধারাপাতকেই কবিগণ মদস্রাব বলিয়া থাকেন। হস্তিনীর কদাচিৎ মদস্রাব হইতে দেখা যায়। এতদবস্থায় হস্তীগুলি একটু যেন মদবিহ্বলের ন্যায় হয় এবং ধ্যানপরায়ণ ও স্তিমিতভাব ধারণ করে, এই জন্যই বোধ হয় ইহাকে মদস্রাব বলা হইয়াছে। মদস্রাবী গুণ্ডাকে বাঁধা অপেক্ষাকৃত সহজ; কারণ এতদবস্থায় সে করিণী সংস্পর্শে সুখানুভব করতঃ একবারে নিশ্চলভাবে নিমীলিত নয়নে দাঁড়াইয়া থাকে এবং কুম্‌কীকেও আক্রমণ করিতে ততটা উৎসাহান্বিত হয় না। যে হস্তীটাকে বাঁধিতে হইবে তাহাকে কোটে আবদ্ধ অন্যান্য আরণ্য হস্তী হইতে একটু দূরে (কোটের মধ্যেই) সুবিধাজনক স্থানে সরাইয়া নিতে হইবে, অতঃপর তাহাকে দুইটী কুম্‌কীদ্বারা দুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিতে হইবে; কুম্‌কীর পশ্চাৎদেশ আরণ্য হস্তীটীর অগ্রপদদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে সংলগ্ন থাকিবে এবং তাহাদের মুখ আরণ্য হস্তীটীর পশ্চাৎভাগের দিকে একটু তীর্য্যগ্‌ভাবে থাকিবে এই প্রকারে কুম্‌কীদ্বারা চাপিয়া রাখাকে প্রচলিত ভাষায় ভিঁড়ান বলা হয়। গুণ্ডাতে কুম্‌কী ভিঁড়ান সহজ নহে; কিন্তু মদমত্ত গুণ্ডাতে একবার কুমৃকী ভিঁড়াইতে পারিলে তাহাকে বাঁধিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কুমৃকী ভিঁড়ান হইলে আরণ্য হস্তীটীর সম্মুখে ২।৪ টী এবং উভয় পার্শ্বে আরও ২।৩ টী কুমৃকী দাঁড় করাইতে হইবে এবং তাহার পশ্চাৎভাগে সিঁড়ির কুমৃকীটীকে রাখিতে হইবে। এই প্রকারে কুমৃকী সন্নিবেশিত হইলে দাইদার সিঁড়ির কুমৃকী হইতে নামিয়া অতি নিঃশব্দে ও সতর্কভাবে আরণ্য হস্তীটীর পশ্চাৎ পদদ্বয়ে দুইটী পরতালার রশি বাঁধিবে। পরতালার রশিগুলি ৬ গুণ (তিনটী ২ গুণ রশি একত্র পাকাইলে ৬ গুণ রশি হয়) ১½।২ ইঞ্চ স্থূল, শিরোভাগে মণ্ডলযুক্ত এবং সূক্ষ্মাগ্র করিতে হয়, দৈর্ঘ্যে এ গুলির এক একটী ১০।১২ হাত করিতে হয়। এই পরতালার রশিটীর মণ্ডলের মধ্য দিয়া ছুর (অগ্রভাগ) পরিচালন করতঃ হস্তীর পশ্চাৎপদে বেষ্টন করিয়া প্রথম বন্ধন দেওয়াকে প্রচলিত ভাষায় নাগপেঁচ নেওয়া বলে। হস্তীটী পদ পশ্চাতে যে ভাবে রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে সেই ভাবেই তাহাকে বাঁধিতে হইবে। দাইদারের

হাত যাহাতে হস্তীর গাত্র স্পর্শ না করে এবং হস্তী যাহাতে রোমে আকর্ষণ জনিত কষ্টানুভব না করে এ বিষয় দাইদার বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। নাগপেঁচ দেওয়ার পর দুইটীর একটী রশিদ্বারা অপর পদে (যে পদলগ্ন রশি দাইদার হাতে রাখিবে তদ্বিপরীত পদে) একটী বড়শিগের লাগাইবে। তৎপর ঐ রশির অবশিষ্ট ভাগ দিয়া অপর পদে আরও একটী বড়শিগের দিবে; একপদ হইতে পদান্তরে গ্রন্থি দেওয়ার সময় উভয় পদের মধ্যভাগে রশির যে অংশটী থাকিবে তাহাতে একটী একটী করিয়া পেচ উঠিবে। প্রথম রশিটী শেষ হইলে তাহা একদিকের পদলগ্ন রশির সহিত ভাল রকম আবদ্ধ করিয়া পরে অপর পদলগ্ন রশিটীদ্বারা পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্ববৎ এক পদ হইতে পদান্তরে বড়শিগের দিতে থাকিবে। এই রশিটীও প্রায় শেষ হইলে কুমৃকীর উপরিস্থিত মাহুতগণ দাইদারের ইঙ্গিতমত তাহাকে আরও রশি যোগাইবে, দাইদার সেই রশির মণ্ডলের সহিত হস্তীর পদলগ্ন রশির ছুর বাঁধিয়া নিবে এবং পূর্ব্ববৎ বড়শিগের দিতে থাকিবে, এই ভাবে বড় গুণ্ডা হস্তীর পক্ষে ৬ হইতে ৮ রশি বাঁধিলেই যথেষ্ট। ৭।৮ ফিট উচ্চ হস্তিনীর পক্ষে ৪।৫ রশিই যথেষ্ট। রশি বাঁধার কার্য্য প্রায় শেষ হইলে, শেষ রশিটির কতকাংশ বদ্ধহস্তীর পদদ্বয়ের মধ্যস্থিত রশির সহিত জড়াইয়া বাঁধিতে হইবে, ইহাকে মাঁজা লওয়া বলে। মাঁজা শেষ হইলে পরতালা ভরা শেষ হইল। পরতালার রশি বাঁধা শেষ হইলে তাহাতে কিছু জল নিক্ষেপ করিতে হয়, ইহাতে বন্ধন দৃঢ় হয়। অনেক সময় শিক্ষিত কুমৃকীর হস্তে রশি দিলে সে তাহা টানিয়া বন্ধন দৃঢ় করিতে পারে; পরতালা ভরা শেষ হইলে হস্তীর একটী পশ্চাৎপদে দোমা (একপ্রকার রশি এ গুলি ১০।১৫ সের হইতে প্রায় অর্দ্ধ মণ পাটদ্বারা প্রস্তুত হয় এবং এ গুলির মণ্ডল ও ছুর থাকে। এক একটী দোম ৬ গুণ করিতে হয়, দৈর্ঘ্যে ১০।১৫ হইতে ২০।২৫ হাত করিতে হয়) লাগাইয়া তাহার ছুরটী কুমৃকীর ফাঁড়ীর সহিত বাঁধিয়া, দাইদার সিঁড়ির কুমৃকীতে উঠিবে। যদি হস্তী বৃহৎকায় এবং বলবান হয়, তবে ৩।৪ টী দোমা বাঁধিয়া সেগুলি কুমৃকীর ফাঁড়ীর সহিত বাঁধিতে হইবে। এ স্থলে সিঁড়ির ব্যবহার সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলা যাইতেছে। যখন দাইদার পরতালা ভরিবার জন্য কুমৃকী হইতে নীচে নামিবে, তখন যদি আরণ্য হস্তীটী চঞ্চল হইয়া উঠে এবং ভিড়ান কুমৃকীগুলি তাহাকে চাপিয়া রাখিতে অক্ষম হয়, তখন দাইদার অতি ক্ষিপ্রগতিতে সিঁড়ির কুমৃকীকে অগ্রপদ উত্তোলন করার জন্য হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিবে এবং

কুম্‌কী পা উঠাইলে দাইদার তাহাতে আরোহণ করতঃ তাড়াতাড়ি সিঁড়ির রশিতে পা তুলিয়া দিবে এবং উপরিস্থিত মাহুতের হস্তাবলম্বনে অতি দ্রুতগতিতে আরোহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। যদি দাইদার তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কুম্‌কীতে উঠিতে না পারে তবে সে কুম্‌কীর উদরের নিম্নে বসিয়া থাকিয়া নিজকে নিরাপদ করিবে। বড় গুণ্ডা হইলে দাইদারকে অনেকবার এই প্রকার উঠা নামা করিতে হয়। সিঁড়ির কুম্‌কীতে যে মাহুত থাকিবে সে কেবল প্রতিনিয়ত দাইদারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং তাহার ঈঙ্গিত মত কার্য্য করিবে, দাইদারকে নিরাপদ করার জন্য সিঁড়ির কুম্‌কীর প্রয়োজন, এই কুমকী অতি শান্ত প্রকৃতির এবং সুশিক্ষিতা ও ঈঙ্গিতজ্ঞা হওয়া চাই, নতুবা বিপদ সম্ভাবনা।

কুমকীর ফাড়ীতে দোমা বাঁধা হইলে ভিড়ান কুম্‌কীগুলিকে সরাইয়া নিতে হয়, এই অবস্থায় আরণ্য হস্তীটী কুম্‌কীকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া থাকে, কুম্‌কী দুর্ব্বল হইলে অনেক সময় ভূশায়ী হইয়া যাইতে পারে। আরণ্য হস্তী আকর্ষণ আরম্ভ করিলে কুম্‌কীগুলি তাহাকে বিপরীত দিকে টানিয়া নিবে। এই দৃশ্য বড় আনন্দ ও উৎসাহ জনক, বড় গুণ্ডা হইলে ৪।৫টী কুম্‌কীর সাহায্য ব্যতীত তাহাকে স্থানচ্যুত করা কঠিন, যাহা হউক আবদ্ধ হস্তীটীকে টানিয়া তাহাকে কোটের খুটি অথবা কোটের অভ্যন্তরে বড় বৃক্ষ থাকিলে তাহাতে বাঁধিতে হইবে। এই কার্য্যকে গাছ লওয়ান বলা হয়। ক্রমশঃ

সুসঙ্গ দুর্গাপুর শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।
রাজধানী।

——০:(*):০——

ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

বাঙ্গালার যখন বড় দুর্দ্দিন—"ছিয়ত্তরের মন্বন্তর" যখন বাঙ্গালার শস্য-শ্যামলক্ষেত্র ভীষণ শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল; বাঙ্গালার চঞ্চল সিংহাসনে বসিয়া যখন নাম মাত্র "নবাব গুলি খায় আর ঘুমায়—ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্ লেখে, বাঙ্গালী কান্দে আর উৎসন্ন যায়—" সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে উত্তর বঙ্গে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ প্রধূমিত হয়।

বাঙ্গালার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, ইংরেজ শাসন-আরম্ভ কালের একটী ভীষণ

বিপ্লব। বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "আনন্দমঠ" এই সন্ন্যাসী-বিপ্লবের জ্বলন্ত ইতিহাস।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, এবং তাহাদিগকে স্ত্রী পুত্র পরিবারও প্রতিপালন করিতে হইত না। তাহারা এক অভিনব ধর্ম্মমত প্রচারের ছলনায় দস্যুতা করিত। দেখিতে দেখিতে দেশের নিরন্ন ভিক্ষুক দলে দলে এই সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। দেশে অত্যাচারের খরস্রোত প্রবাহিত হইল। ইহারা কেবল দস্যুতাদ্বারা ধন রত্ন ও শস্য লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত না; নরহত্যা গৃহদগ্ধ এবং মনুষ্য চুরী ও ইহাদের ব্যবসায় ছিল। অসহায় অবস্থায় বলবান বালক বা যুবক দেখিলেই তাহারা কলে কৌশলে ধরিয়া লইয়া গিয়া সন্ন্যাসীমন্ত্রে দীক্ষিত করিত (১)। এইরূপে অতি অল্পকাল মধ্যেই ইহাদের দল বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষা ঋতুতে প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র সন্ন্যাসী নিম্নবঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া অধিবাসীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও গৃহাদি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে গবর্ণমেণ্ট প্রতিকারপরায়ণ হন—Captain Thomson সৈন্য সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসী দমনে অগ্রসর হন, সন্ন্যাসীরা কাপ্তেনকে হত্যা করিয়া ইংরেজ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে ও বিজয় গৌরবে উল্লাসিত হইয়া অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তুলে (২)। ১৭৭৩ সনে ওয়ারেণ হেষ্টিংস পুনরায় আর একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, পরবর্ত্তী সেনাপতিও সন্ন্যাসী-হস্তে নিহত হয় (৩)। ওয়ারেণ হেষ্টিংস চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; সন্ন্যাসীরা অবসর ও উৎসাহ পাইয়া কোম্পানী চালানী রাজস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীদিগের ভীষণ বিপ্লবে—প্রজার করুণ আর্ত্তনাদে, রাজকোষের অর্থের অনটনে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভীত হইয়া পড়িলেন। হেষ্টিংস তিন দিক হইতে তিনদল সৈন্য সন্ন্যাসীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। Captain Edward, Captain Stewart, Captain Jones উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে সন্ন্যাসী দলনে অভিযান করিলেন।

---

(১) Hastings' letter to Joseas Du Pre—9th March 1773.
(২) Annals of Rural Bengal by W. W. Hunter.
(৩) Warren Hastings' letter, Dated 31/3/1773.

এই সময় এই ভীষণ বিপ্লব ময়মনসিংহ জেলার অস্থি, মজ্জা শোষণ করিতে অগ্রসর হয়। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এতৎপ্রদেশে আসিয়া মধুপুরের নিবিড় অরণ্যে ও সন্ন্যাসীগঞ্জে (১) আড্ডা স্থাপন করে এবং ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে।

সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিতেছে শুনিয়া হেষ্টিংস একবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন (২) কিন্তু যখন শুনিলেন তাহারা এই সুবিশাল নদ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছে তখন তিনি বিপুল বিক্রম ও উৎসাহের সহিত তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। অভিযানের অভিনব ঘটা বুঝিয়া সন্ন্যাসীরা কিছু দিন আত্মগোপন করিয়া রহিল। হেষ্টিংস নিশ্চিন্ত হইলেন। কিছু দিন পর সন্ন্যাসীরা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল! হেষ্টিংসও যথাযোগ্য প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপ বহুদিন চেষ্টা করিয়াও ওয়ারেণ হেষ্টিংস সন্ন্যাসী দমনে পরাঙ্মুখ হইলেন। তাঁহার শাসনকাল সন্ন্যাসী বিপ্লবের ভীষণ অরাজকতায় কলঙ্কিত রহিল।

* * * * * * * *

১৭৮১ সনে সন্ন্যাসীর দল আলাপসিংহ ও জফরসাহী পরগণায় প্রবেশ করিয়া জমিদার ও প্রজার অর্জ্জিত শস্য, ক্ষেত্র হইতে কাটিয়া লইয়া গেল। জমিদারগণ

---

(১) সন্ন্যাসীগঞ্জ—বর্ত্তমান জামালপুর টাউনের নিকট "পলটন" বলিয়া যে স্থান পরিচিত সেই স্থানে সন্ন্যাসীরা আসিয়া প্রথম আড্ডা স্থাপন করে এবং তাহাদের নামানুসারে সেই স্থানকে সন্ন্যাসীগঞ্জ নামে অভিহিত করে। সন্ন্যাসীগঞ্জের নাম বর্ত্তমান সময়ে লোপ পাইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্রে ও রেনেল সাহেবকৃত মানচিত্রে এই সন্ন্যাসীগঞ্জের নাম দৃষ্ট হয়।

(২) Sir George Colebrooke নিকট Hastings এর লিখিত ১৭৭৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের চিঠিতে Warren Hastings এর মনের ভাব কতকটা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা চিঠির সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "In my last I mentioned that we had every reason to suppose Sennassie Fakeers had entirely evacuated the company's possession. Such were the advices I then received and their usual progress made this highly probable. But it seems they were either disappointed in crossing the Brahmaputra river &. &."

অনন্যোপায় হইয়া ১৭৮২ সনের ৩০শে জানুয়ারী রেভিনিউ বোর্ড সমীপে প্রতিকারপ্রার্থী হন। (১) ১৪ই ফেব্রুয়ারী রেভিনিউ বোর্ড হইতে ঢাকার চিফের (Chief of Dacca) উপর সৈন্য প্রেরণ করিয়া ও সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়া জমিদারদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদত্ত হয়। (২) ঢাকার Chief জফরসাহী অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যগণ বিপন্ন হইয়া ঢাকা প্রস্থান করে। সন্ন্যাসীদিগের উলঙ্গ অত্যাচার খরস্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকে। মার্চ্চমাসে সন্ন্যাসীরা মালঙ্কার কাছারী লুণ্ঠন করে। জমিদারগণ পলায়ন করিয়া বাসাবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া জুনমাসে পরগণার ইজারাদার রামজীমাল পুনরায় রেভিনিউ বোর্ডে এই বিপুল অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করেন। (৩) রেভিনিউ বোর্ড রামজীমালের আবেদন প্রাপ্ত হইয়া বেলুহার (বর্ত্তমান ভুলুয়া) রেসিডেন্টকে এতৎপ্রদেশে আসিয়া নূতন জেলা স্থাপন করিতে আদেশ করেন। (৪) সন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যে দলে দলে আসিয়া চারিদিক হইতে লুণ্ঠন করিতে থাকে। ৪ঠা জুলাই পুনরায় সেরপুর, জফরসাহী, ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহের জমিদারগণ রেভিনিউ বোর্ডে অত্যাচার দমনের জন্য প্রার্থনা করেন। (৫) এইবার রেভিনিউ বোর্ড মিঃ হেন্‌রী লেজকে সন্ন্যাসীদমন জন্য ময়মনসিংহে প্রেরণ করেন। (৬) মিঃ লেজ প্রথমে ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থ বেগুণবাড়ীর কোম্পানীর কুঠিতে আসিয়া অবস্থান করেন। বেগুণবাড়ীতে পঁহুছিয়া লেজ, সন্ন্যাসী ও জমিদারদিগের প্রতি, উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় জ্ঞাপন জন্য বিজ্ঞাপনী প্রচার করিলেন। (৭) নির্দ্দিষ্ট তারিখে বেগুণবাড়ীর

---

(১) Bengal M S S letter No. 4 d/. 30/1/1782.

১৭৮২ সনের পূর্ব্বে এ জেলার এতৎসম্বন্ধীয় কোন কাগজ পত্র রেভিনিউ বোর্ডে নাই। জেলা-কালেক্টরীতেও নাই। সুতরাং সন্ন্যাসীর দল ইহারও পূর্ব্ব হইতে এতৎপ্রদেশে অত্যাচার করিতেছিল কি না নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে না।

(২) Mss. letter No 50 d/, 14/2/82.

(৩) Petition of Ramji Mal. Mss. No. 146. d/. 3/6/82.

(৪) Mss. letter No. 153 d/. 3/6/82.

(৫) „ 177 d/. 4/7/02.

(৬) „ 190

(৭) „ 236 d/. 3/10/82.

কুঠিতে জমিদারেরা আসিয়া স্ব স্ব অবস্থা ও দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করিলেন; সন্ন্যাসীরা উপস্থিত হইল না। লেজ সন্ন্যাসীদিগের বিরুদ্ধে মন্তব্য লিখিয়া রেভিনিউ বোর্ডে রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন। (১)

১৭৮৩ সনে সন্ন্যাসী-দলপতি সাহামজরদ (Shah Madgerud) পুনরায় জফরসাহী পরগণা লুণ্ঠন করিয়া কৃষককুলের সর্ব্বনাশ করিল; লেজ সাহেব ভীত হইয়া পড়িলেন ও ঢাকার চীফকে অধিক সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ঢাকার চীফ রেভিনিউ বোর্ডে লেজ সাহেবের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে রেভিনিউ বোর্ড সৈন্য প্রেরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াও ঢাকার Chief কে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে উপদেশ প্রদান করেন (২)।

লেজ সাহেব ইত্যবসরে তাঁহার অল্প সংখ্যক অনুচর লইয়া সাহামজরদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। দুইপক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। দস্যুদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। অনেক সন্ন্যাসী হত হইলে দলবল লইয়া দস্যুদলপতি মজরদ বনমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া পড়ে। (৩) লেজসাহেব জয়লাভ করিয়া ভবিষ্যতের গুরুতর আক্রমণ ভয়ে ঢাকা পুনরায় সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ঢাকার চীফ্ প্রথমে সৈন্য প্রেরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন; তৎপর ৫০ জন সিপাহী প্রেরণ করেন। (৪) বর্ত্তমান জামালপুরের নিকটবর্ত্তী সন্ন্যাসীগঞ্জ নামক স্থানে সেনানিবাস (Cantonment) স্থাপিত হয়। ইহাতে সন্ন্যাসীগঞ্জের সন্ন্যাসীদল স্থানত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এর পর এপ্রিলমাসে পুনরায় ময়মনসিংহের জমিদারগণ সন্ন্যাসীর অত্যাচার লেজ সাহেবের কর্ণগোচর করেন। (৫) লেজ নিজ সৈন্য ও জমিদারদিগের লাঠিয়াল লইয়া এক বৃহৎ দল গঠন করিয়া সন্ন্যাসী

---

(১) Mss. letter No. 255

(২) " 311 d/. 13/1/83.

রেভিনিউ বোর্ড ঐ চিঠিতে ঢাকার Cheif কে লিখিয়াছিলেন—

"direct him (Ledge) to use everymeans in his power to apprehend them but not to run in any risk by detaching a force that is not fully adequate to the service."

(৩) Bengal Mss. letter No. 317

(৪) Do 367 March 10th & 24th.

(৫) Do 396 d/. 17/4/83.

দিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এইরূপ নানা উপায়ে সন্ন্যাসীদিগের অত্যাচার দমন করিয়া লেজ সাহেব লক্ষ্মীপুর চলিয়া যান। লেজ সাহেব চলিয়া গেলে পরও সন্ন্যাসীরা মাঝে মাঝে গ্রামে গ্রামে আসিয়া অত্যাচার করিত।

১৭৮৬ সনে ডানকনসন সাহেব সন্ন্যাসীদমনে নিযুক্ত হইয়া রঙ্গপুরে যান। তাঁহার চেষ্টায় সাহা মজরদ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। ইহাতে সন্ন্যাসীর দল অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সাহা মজরদ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেলে মধুপুরে জয়সংগীর ও সেরপুরে ভূপালগীর আবির্ভূত হয়। এবং পুনরায় অরাজকতা দেশময় বিস্তৃত হইতে থাকে। ক্রমে প্রজার করুণ আর্ত্তনাদে ভূম্যধিকারী ও ভূম্যধিকারীর কাতর প্রার্থনায় রেভিনিউ বোর্ড ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। রেভিনিউ বোর্ড ইতিপূর্ব্বে বেলুহার কালেক্টরকে এ প্রদেশে আসিয়া নূতন জেলা স্থাপন করিতে অনুমতি করিয়া, সে অনুমতি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন; এইবার রেভিনিউ বোর্ড সে পূর্ব্বাদেশের শেষ মীমাংসা করিলেন—ময়মনসিংহে নূতন জেলা স্থাপিত হইবার আদেশ হইল। দেশ অরাজকতা হইতে রক্ষা পাইল। ১৮৮৭ সনের ১লা এপ্রিল বেলুহার কালেক্টর মিঃ রটন আসিয়া ময়মনসিংহ জেলার ভার গ্রহণ করিলেন।

এদিকে নূতন জেলা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া ভূপালগীর সেরপুরের জমিদার দিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অভিনব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম সন্ন্যাসধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়িল। জয়সিংগীরের দল তখনও মধুপুরে প্রবল থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের শান্তিভঙ্গ করিতে লাগিল। ১৭৯০ সনে জয়সিংগীরের বিরুদ্ধে জেলা কালেক্টর রিয়র্ড সাহেব সৈন্য প্রেরণ করেন। (১) জয়সিং ধৃত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বিত হয়। জয়সিংহের সঙ্গে সঙ্গে এ জেলা হইতে সন্ন্যাসীর অত্যাচার একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। এই সন্ন্যাসীর বংশধরেরা অদ্যাপি মধুপুরের স্থানে স্থানে বাস করিতেছে। তাহাদের প্রাচীন আড্ডার ভগ্নাবশেষ এখনও মধুপুরের বনভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া অনেক জমিদার ইহাদিগকে বহু নাপেরাজ তালুক প্রদান

---

(১) "The detachment I sent on the 24th ultimo to apprehend Joysing Gyr the Sanease's Sarder has been successful." Mymensingh Collectors letter to Governor General in council. d/. 1/2.1791.

করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে এখন ও অনেক তালুক সন্ন্যাসীদিগের বর্ত্তমান বংশধরেরা ভোগ করিতেছে। মধুপুরের সন্ন্যাসীরা পীর-সন্ন্যাসী নামে পরিচিত।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

কাব্যালোচনা।

(ললিত পদাবলীযুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাণী ও অলঙ্কার)

আমার জনৈক বন্ধু সে দিন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন—"আজকাল বাবু কথাটার কোন মূল্য নাই, পূর্ব্বে বাবু বিশেষণটী, দানশীল উদারহৃদয় সৌখীন বড়লোকের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইত; আর এখন—আফিসের পীয়নটী বাবু, দোকানের মুদিভায়া বাবু, এমন কি বড়লোকের বরকন্দাজটী পর্য্যন্ত বাবু"। বন্ধুর কথাটা বঙ্গের কবি-সম্প্রদায়ের প্রতিও প্রযোজ্য; কিছুদিন পূর্ব্বে কবি শব্দে, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি জন কতক প্রতিভাশালী মহাপুরুষের নাম স্মৃতিপথারূঢ় হইত; আর এখন রাম কবি, শ্যাম কবি, কত কবিরই আবির্ভাব দেখিতে পাই, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। এই কবি-বহুল দিনে কাব্য সম্পর্কে যত আলোচনা হয় ততই দেশের মঙ্গল। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে, ললিত পদাবলী সংযুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাণী ও অলঙ্কার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আজকাল অনেকের ধারণা, কাব্য লিখিতে বসিয়া, ভাষা-পদ ছন্দোমাধুর্য্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই। ইঁহারা অলঙ্কার বিন্যাসের ও তেমন একটা আবশ্যকতা অনুভব করেন না। ইঁহাদের মত এই—ছন্দোবন্ধন পরিপাটী হউক বা না হউক, পদাবলী ললিত হউক বা শ্রুতিকঠোর হউক, অলঙ্কার বিন্যাসে কৃতিত্ব দেখাইতে পার আর না পার; তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাবটুকু ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিলেই অতি উপাদেয় কাব্য রচিত হইল। কি ভ্রান্ত সংস্কার! আমরা কিছুতেই এ অর্ব্বাচীন ও অসমীচীন মতের পরিপোষক হইতে পারিতেছি না।

কাব্য কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলিয়া গিয়াছেন—"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ

কর্ণেষু বমতি মধুধারাং"। অর্থ—প্রকৃত কবির কাব্যের কি গুণ আছে, বিদিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রবণমাত্র তাহা কর্ণে মধুধারা বমন করে। কথাটা অতি যথার্থ এবং সর্ব্ববাদী সম্মত। কাব্য, কি সম্পদে সম্পন্ন হইলে, শ্রুতিমূলে মধুধারাবমনকারিণী শক্তিটুকু লাভ করিতে পারে, এখন তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

প্রবীন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৩০৭ সনের আশ্বিন সংখ্যা প্রদীপের "কাব্য-ও কবিত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের উপর্য্যুক্ত বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"কথাটাত ঠিক্। কোন সুগৃহিণীর পরিপক্ক ব্যঞ্জন যখন আস্বাদন কর, তখন তাহাতে কোন্ কোন্ মসলাখানি কি মাত্রায় দিয়াছে, তাহা জানিবার পূর্ব্বে কি মন আনন্দরসে মগ্ন হয় না? ব্যঞ্জনের যেমন স্বাদ কাব্যের তেমন কবিত্ব ইত্যাদি"। দৃষ্টান্তটী বেশ। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে একটু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি কাব্যের, কর্ণে মধুধারাবর্ষী জিনিষটীকে ব্যঞ্জনের স্বাদ, সুতরাং কাব্যের কবিত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া একটু ভ্রমান্ধতার পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যের কোথায় কি গুণ আছে, তাহা জানিবার পূর্ব্বেই যদি শ্রুতিমাত্র কর্ণে মধুধারা বর্ষিত হয়, তবে এই ক্রিয়ার কর্ত্তাকে ললিত পদাবলী সংযুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাণী না বলিয়া কবিত্ব বলা যায় কিসে? এবং সুগৃহিণীর পরিপক্ক ব্যঞ্জনের ঘ্রাণের সঙ্গে তাহাকে তুলিত না করিয়া স্বাদের সঙ্গেই বা তাহার তুলনা কি প্রকারে খাটিতে পারে? বস্তুতঃ সুগৃহিণীর পরিপক্ক ব্যঞ্জনের যেমন ঘ্রাণ, প্রকৃত কাব্যের তেমন ললিত পদাবলী সংযুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাণী; লোকের আস্বাদন স্পৃহা উদ্রিক্ত করিবার জন্য উভয় জিনিষেরই তুল্য প্রয়োজন রহিয়াছে।

ফলতঃ মানব হৃদয়ে ললিত পদাবলী সংযুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাণীর প্রভাব অসাধারণ। কাকের কর্কশ রব কে শুনিতে ইচ্ছা করে? কোকিলের তানলয়সংবদ্ধ সুমিষ্ট সঙ্গীতে কাহার হৃদয় না আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়? "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" বাক্যের বক্তা অপেক্ষা "নীরস তরুরয়ং পুরতো ভাতি" বাক্যের রচয়িতা অধিকতর সম্মানের পাত্র নন, একথা কোন্ গুণগ্রাহী রসজ্ঞ ব্যক্তি বলিতে পারেন? ললিত পদবিন্যাস এবং ছন্দোবন্ধনে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই কবিবর ৺ভারতচন্দ্র বাঙ্গালী মাত্রেরই চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "পলাশীযুদ্ধ কাব্য" ললিত পদাবলী সংযুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাণীর অসামান্য গৌরব জগত সমক্ষে ঘোষণা করিতেছে—উহার প্রত্যেকটী

কথা কাণের ভিতর দিয়া গিয়া মর্ম্ম পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। যে কাব্যে ভাষার ঝঙ্কার নাই, পদের লালিত্য নাই, ছন্দোবন্ধনের পারিপাট্য নাই, সে কাব্য মৃত। সে কাব্যের কবি রন্ধননৈপুণ্যবিহীনা, অপরিপক্কা গৃহিণীর ন্যায় লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণে অসমর্থ। সে কবির কাব্যনিহিত ভাবটুকু অনশনদুর্ব্বল পুরুষটীর মত ধীরে ধীরে হৃদয়ের দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বারে পৌছিতে পারে বটে কিন্তু দুর্গজয় পূর্ব্বক তথায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নয়।

তৎপর অলঙ্কারের কথা। মানব জগতে যেমন কায়িক ও মানসিক, এই দুই প্রকার অলঙ্কারের অস্তিত্ব দেখা যায়, কাব্যজগতে তেমন শাব্দিক ও আর্থিক এই দ্বিবিধ অলঙ্কারের প্রচলন রহিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত শব্দালঙ্কার প্রচলিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে অনুপ্রাসই প্রধান এবং প্রয়োজনীয়। অপর কোন অলঙ্কারের অভাবহেতু কাব্যের অঙ্গ-সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র লঘুত্ব ঘটে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। অনুপ্রাস যথোপযুক্ত স্থানে ব্যবহৃত হইলে শব্দের বেশ লালিত্য সম্পাদিত হয়; কিন্তু উহার অত্যধিক প্রয়োগ কর্ণের পীড়াদায়ক এ কথা স্বীকার্য্য। দুইটী দৃষ্টান্ত দেখুনঃ—

"নন্দনে মন্দার পুষ্প চিরপ্রস্ফুটিত।"

"নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।"

প্রথমটী কর্ণে বেশ লাগে, কিন্তু দ্বিতীয়টী একটু শ্রুতিকঠোর হইয়া পড়িয়াছে।

অর্থালঙ্কারে কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হয়। সুতরাং উহার অভাবে কাব্যের গৌরবহানি অনিবার্য্য। নির্জ্জীবকে সজীব করিতে, সামান্যকে মহানে পরিণত করিতে অর্থালঙ্কারের অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। অলঙ্কার এবং তৎপ্রয়োগস্থান নিরূপণে সফলকাম হওয়া সাধারণ লোকের কার্য্য নয়। যিনি উহাতে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তিনি গভীর চিন্তাশীল ও প্রতিভাশালী কবি এবং তাঁহার রচিত কাব্য যে অতি উপাদেয় কাব্য, তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিব। তন্ময়তার অর্থ যদি "বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত একীভূত হওয়া, তাহার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়া এবং তাহার মধ্যেই বাস করা" হয় এবং একথা যদি ঠিক হয় যে, "কবির ভাবাবেশে আবিষ্ট চক্ষু ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় হৃদয়ের ভাবময় দেখে; সুতরাং উপমা রূপক স্বভাবতঃই প্রসূত হয়।" তবে কেন না বলিব, যে কবির কাব্যে উপমা রূপক ইত্যাদি অলঙ্কারের লীলা-খেলা নাই তিনি তন্ময়তা-শক্তিহীন অসমর্থ কবি। এবং তাঁহার কাব্য প্রকৃত কাব্য-সংজ্ঞা পাইবার অধিকারী নয়।

অর্থালঙ্কারেরও অনেক প্রকারভেদ আছে। বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, সমাসোক্তি, স্বভাবোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারেরই প্রচলন দেখা যায়। দৃষ্টান্তদ্বারা প্রত্যেকটীর গুণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অর্থালঙ্কার প্রয়োগে কাব্যের রসপ্রদায়িকা শক্তি কতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বক্তব্য বিষয়টী কিরূপ স্ফুটতর অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা প্রদর্শনই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন জন্য কবি কালিদাসের রঘুবংশ হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ইন্দুমতী স্বয়ম্বরা হইয়াছেন। মহারাজ অজের গলে বরমাল্য অর্পিত হইয়াছে। স্বয়ম্বর সভার এক দিকে বিজয়োৎফুল্ল বর পক্ষ, অপর দিকে ভগ্নমনোরথ বিষাদ-ক্লিষ্ট নৃপবৃন্দ; এক দিকে আলোক, অপর দিকে অন্ধকার। স্বয়ম্বর সভার সেই অপূর্ব্ব শোভা অলঙ্কার সাহায্যে অমর কবি কি উজ্জ্বল ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, দেখুন—

"প্রমুদিতবরপক্ষমেকতস্তৎ
ক্ষিতিপতি মণ্ডলং মন্যতো বিতানম্
উষসি সর ইব প্রফুল্লপদ্মং
কুমুদবনপ্রতিপন্ননিদ্রমাসীৎ।"

বঙ্গানুবাদ— একদিকে বরপক্ষ অনন্দ-বিহ্বল,
অন্যদিকে নৃপচয় বিষন্ন-বদন,
মুদিলে কুমুদ আঁখি, হাসিলে কমল
উষায় উছলে শোভা সরসে যেমন।

রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র জানকীর উদ্ধার সাধন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন; প্রকৃতির শতবিধ সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া তাঁহাদের রথ অগ্রসর হইতেছে। সম্মুখে, বিপুলকায় সাগর বিরাজিত। তাহার বিরাট দেহে শত শত নদনদী, আপন আপন ক্ষুদ্র দেহ মিশাইয়া দেওয়ায় কি অপূর্ব্ব শোভার উদয় হইয়াছে, রামচন্দ্র পুলকবিহ্বলা জানকীর নিকট তাহা বর্ণনা করিতেছেন—

"মুখার্পণেষু প্রকৃতিপ্রগল্ভাঃ
স্বয়ং তরঙ্গাধরদানদক্ষঃ।
অনন্যসামান্যকলত্রবৃত্তিঃ
পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ।"

বঙ্গানুবাদ— "অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা খেলিছে সাগর ;
শত মুখে নদীকুল চুম্বিছে তাহায়,
প্রদানি তাদের মুখে তরঙ্গ-অধর ;
চতুর সরিৎ-পতি তোষিছে সবায়।"

পাঠক ! কিসে কি হইল ! মর্ত্তের মন্দার বৃক্ষে স্বর্গের পারিজাত কুসুম ফুটিল ! শূন্য উদ্যান, তরু-লতা-ফল-পুষ্প-মঞ্জরী-মুকুলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল ! মরুভূমে মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইল ! কাচ, কাঞ্চনে পরিণত হইল ! ধন্য অমর কবি কালিদাস ! তুমিই সার্থক লেখনী ধারণ করিয়াছিলে ; যতদিন জগতে কাব্যের আদর থাকিবে ততদিন তোমার অতুল কীর্ত্তি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

নূপুর।

কোমল চরণ দুটি জড়ায়ে যতনে
দুখানি অলক্তআভাবিম্বিত নূপুর ;
বসন্তসঙ্গীত যেন বাঁধিয়া চরণে
নিমেষে নিমেষে ওই বাজে সুমধুর।
কি সৌভাগ্য নূপুরের সার্থক জীবন—
মগ্ন হয়ে আছে সুধাপরশের রসে !
শতদলদল ঘিরে ভ্রমর যেমন
তাই বুঝি শতবার গুঞ্জরে হরষে।
অথবা কি, হে কল্যাণি, নারীরূপ লয়ে
আপনি পরেছ পদে মায়ার বন্ধন
তুমি স্বেচ্ছাকৃত বন্দী মানব আলয়ে
গৃহ-কারাগার তুমি করেছ নন্দন।
নূপুর দুখানি বুঝি তাই শত ছলে
তোমারি মহিমা, নারি, গায় কুতূহলে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

পঞ্চম বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত।

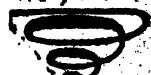
—— ০:(*):০ ——

লেখকগণের নাম।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার এম্. এ. বি. এল., শ্রীমন্মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি. এ., শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী, শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি. এল., শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ., শ্রীমনোমোহন সেন, শ্রীকামিনীকুমার দে রায়, শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী ও সম্পাদক।

ময়মনসিংহ সুহৃদ্ যন্ত্রালয় হইতে
শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত কর্তৃক
প্রকাশিত।

ফাল্গুন, ১৩১১।



বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৸০ দেড় টাকা   এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

সূচী।



বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"আরতি"র জন্য আমরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, একটী প্রেস আনয়ন করিয়াছি, গ্রাহকগণ অবগত আছেন। একটী প্রেসদ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না বলিয়া, আর একটী প্রেস ও তদুপযোগী সরঞ্জামের অর্ডার দিয়াছি; সুতরাং অর্থের নিতান্ত অনাটনে পড়িতে হইয়াছে। গ্রাহকগণের অনুকম্পা ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। আশা করি দ্বিতীয় সংখ্যা "আরতি" প্রাপ্তি মাত্র সকলে স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিয়া উপকৃত করিবেন।

নিবেদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর পণ্ডিত

ম্যানেজার।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। ময়মনসিংহ, ফাল্গুন ১৩১১। দ্বিতীয় সংখ্যা।

নবযুগের নবশিক্ষা।

অনন্ত কালপ্রবাহের ব্যবচ্ছেদ নাই। সূর্য্যের উদয়াস্ত কাল দিন। ষড় ঋতুর অবস্থিতি কালের পরিমাণ দ্বারা বর্ষ গণনা হইয়া থাকে। শত বৎসরে শতাব্দি হয়। কিন্তু আমরা যে সময়-বিভাগের কথা বলিব তাহা উপরোক্ত কোন সঙ্কেত দ্বারা নিয়মিত হয় না, তাহা মানব জাতির উন্নতি ও অবনতি দ্বারা গণিত হইয়া থাকে।

ভগবানের সাক্ষাৎকার মানব-উন্নতির চরম সীমা। যে শিক্ষায় মানুষকে বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্ম উন্নতির দিকে প্রধাবিত করে, এই প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। মানুষ আদিতে যখন প্রকৃতির সন্তান ছিল, তখন প্রভাত-সূর্য্যোদয় দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছে, অগ্নির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে, বিদ্যুতের চঞ্চল জ্যোতিঃ দেখিয়া চমকিত হইয়াছে। প্রকৃতির অভ্যন্তরে মানুষ একটী শক্তির আভাব পাইয়া তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এই চেষ্টা হইতে অন্তর্দৃষ্টি ও দর্শন শাস্ত্রের সূত্রপাত। আমাদের দেশে যেমন ক্রমে বেদ উপনিষদ ও দর্শনের বিকাশ হইয়াছে অন্যান্য সভ্যদেশের ইতিহাসেও তদনুরূপ দেখা যায়। প্রত্যেক জাতি আপন আপন জীবনোপায় সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে অন্তর্দৃষ্টির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে। পৃথিবীর সভ্যজাতি সমূহ এক সময়ে বিজ্ঞানের আলোচনা অপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিল। যদিও অতি প্রাচীনকালে চীন দেশে বারুদ, দিগদর্শন যন্ত্র ও কাগজের আবিষ্কার হইয়াছে, ইয়োরোপে আর্কিমিডিস্ আপেক্ষিক গুরুত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তথাপি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের সহিত বিজ্ঞানের তুলনা হয় না। ইয়োরোপের মধ্যযুগ পর্য্যন্ত গ্রীক-দর্শন সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে।

এই দর্শন শাস্ত্র ক্রমে তর্ক শাস্ত্রে পরিণত হইয়া ভারতে ও ইয়োরোপে এক সময়ে নাস্তিকতার সৃষ্টি করিয়াছিল। যাহা সত্য নহে তাহা লইয়া মানুষ অধিক দিন থাকিতে পারে না। প্রকৃত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মানুষ অধিক দিন অন্ধকারে হস্ত সঞ্চালন করিতে পারে না।

একজন ইংরেজ লিখিয়াছেন—"যাহা মানুষের করায়ত্ত নহে তজ্জন্য বুদ্ধের ন্যায় ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকা অলসতা মাত্র"। বর্ত্তমান সময়ে মানুষের মনে এই ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। লর্ড বেকন ইয়োরোপে প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার ব্যর্থ-গতি লক্ষ্য করিয়া নূতন শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অনুধাবন ও পরীক্ষা তাহার মূল সূত্র। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের আরম্ভ এই সময় হইতে বলা যাইতে পারে। লর্ড বেকনের পর হইতে ইয়োরোপে বিজ্ঞানের উন্নতি দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার এবং বিদ্যুতের শক্তি ও গতি নির্ণয় তাহার একটী অংশ মাত্র।

ইয়োরোপে জর্ম্মান জাতি পূর্ণমাত্রায় এই বৈজ্ঞানিক যুগের ফল সংগ্রহ করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে সত্য, কিন্তু কার্য্যকরী বিজ্ঞানে বর্ত্তমান সময়ে জর্ম্মান জাতি সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছেন। জর্ম্মান জাতি এক সময়ে দর্শনের আলোচনায় ইয়োরোপে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উপনিষদের মূল্যবান তত্ত্ব সংগ্রহ জন্য জর্ম্মানিতে সংস্কৃত শাস্ত্র যত্নের সহিত পঠিত হইত। কিন্তু জেনার যুদ্ধে নেপোলিয়ানের হস্তে জর্ম্মানির লাঞ্ছনা হওয়ার পর জর্ম্মান জাতি কার্য্যকরী বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে জাতীয় অস্তিত্ব ও শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

জাপান বৈজ্ঞানিক যুগের আর একটী কৃতি সন্তান। জাপান পঞ্চবিংশতি বর্ষে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সভ্য জগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। রুষ, জাপানের হস্তে পরাজিত হইয়া জাপানকে বৈজ্ঞানিক উন্মাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে সকল জাতিকেই তাহা করিতে হইবে। উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক আলোচনা ব্যতীত কোন জাতিই নিজ শক্তি অব্যাহত রাখিতে পারিবেন না। মানবজাতি বাধ্য হইয়া জড় জগতের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতেছে। অভিনব শক্তি অভিনব ভাবে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে।

মানুষ বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাতে জড়জগতে প্রথম প্রবেশ করিয়া

অল্পমতি বালকের ন্যায় জড়জগৎকে অন্তর্জ্জগতের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়া ছিল। তাহা ধৃষ্টতা মাত্র; সে চেষ্টা আপনা হইতে ব্যর্থ হইয়াছে। নিউটনের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন—"আমি জ্ঞান সমুদ্রের তীরে বসিয়া কেবল উপল খণ্ড সংগ্রহ করিতেছি।" যাঁহারা সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা জড় ও শক্তি দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন? শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন না, আলো কি? তেজ কি? বিদ্যুৎ কি? পৃথিবীর সমগ্র বস্তু এক উপাদানে না বহু উপাদানে গঠিত? পরমাণুর শেষ পরিণতি কি? অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র তাঁহার নবাবিষ্কার দ্বারা পৃথিবীকে আরও চমৎকৃত করিয়াছেন। জীবন কি? জীবজগৎ, উদ্ভিদ ও জড়ে কোনও পার্থক্য আছে কি? তিনি প্রমাণ করিয়াছেন এক মহান সত্তা সকলকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

বিজ্ঞান হইতে অন্তর্দৃষ্টিতে পুনরাবর্ত্তন কি কেবল ভারতবর্ষে হইয়াছে? তাহা নহে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও এখন দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রকৃতির অন্তস্থল ভেদ করিতে না পারিয়া তাঁহাদের বাক্য নিবৃত্তিত হইয়াছে। অগাষ্ট কম্‌টে, হারবার্ট স্পেনসারের দাম্ভিকতা আর শুনা যায় না। লর্ড কেলভিন এখন বিনীত ও শঙ্কিত, সভয়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতেছেন। জাপানের স্বদেশ বাৎসল্য, আত্মোৎসর্গ কোথা হইতে আসিল? তাহার অনুসন্ধান করিলে সকল শক্তির মূলাধারে যাইয়া পৌঁছিবে। মেঃ নোবেল ডাইনামাইট আবিষ্কার করিয়া মনে করিয়াছিলেন পৃথিবীতে যুদ্ধ অসম্ভব হইবে। তিনি ডাইনামাইটের লোকক্ষয়কারিণী শক্তি দেখিয়া তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ লোক হিতের কার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। কে তাঁহাকে এই প্রবৃত্তি দিল? মানুষ বাহিরের দিকে চলিয়া যাইতে চায় কিন্তু একটী শক্তি তাঁহাকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের প্রধান পুরুষ এডিসন বিজ্ঞান-আলোচনায় কিরূপ আত্মহারা, হইতেন, অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"এক সময়ে আমি পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রা না যাইয়া একটী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলাম।" তিনি বৈজ্ঞানিক সাধনায় নিযুক্ত হইয়া সময় সময় এমনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন যে বাহ্যজগৎকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। এই তন্ময়তা সমাধির নিকটবর্ত্তী নহে কি? তাঁহাকে একদিন এইরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া একজন বন্ধু বলিয়াছিলেন, এই মুগ্ধ অবস্থা হইতে তাঁহাকে জাগ্রত করা পাপ।

বাহ্য জগতের সহিত এইরূপ অভিনব পরিচয় অন্তর্দৃষ্টির অনুকূল। বর্ত্তমান যুগে এক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী। মানুষ অন্তর্দৃষ্টি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপথে পরিচালিত হইয়াছিল। প্রকৃতি পুনরায় আপনার সন্তানকে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পথে পরিচালিত করিয়া যথাস্থানে আনয়ন করিতেছেন। যিনি বিজ্ঞানতত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। এই অনন্ত বিশ্বে অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনি কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, বিদ্যুৎ তাঁহার শকট চালনা করিতেছে, কিন্তু বিদ্যুৎ কি? উত্তাপে জীবিত আছেন, আলোতে দেখিতেছেন, উত্তাপ ও আলোক কি? উত্তর পাইবে সকলের মূলেই এক মহাশক্তি বিদ্যমান। বিজ্ঞান আমাদিগকে এক সর্ব্বমঙ্গলময়ী মহাশক্তি চিনাইয়া দিতেছে। ইহাই নবযুগের নবশিক্ষার সার বস্তু। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তিনিই কৃতার্থ হইবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

খেদা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক একটী হস্তীকে গাছ লওয়ান হইলে ক্রমে অপরাপর হস্তীগুলিকেও ঐ প্রকারে পরতালা ভরিয়া গাছ লওয়াইতে হইবে। ৩। ৪ বৎসর বয়স্ক শাবকগুলি তাহাদের মাতার সঙ্গে আপনাআপনি চলিয়া আসে, অতএব তাহাদিগকে পরতালা ইত্যাদি ভরা নিষ্প্রয়োজন। ৫। ৬ ফিট উচ্চ হস্তীগুলিকে পরতালা না ভরিয়া ডোলমারিয়া কুমুকীর ফাঁড়ার সহিত বাঁধিয়া দিলেই চলে। এই রশি বাঁধাকে প্রচলিত ভাষায় ফাঁসিয়ারা বলে। পরতালায় আবদ্ধ হস্তীগুলির গলায় রশি লাগান কার্য্যকে ডোলমারা বলে; ইহা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহাই এখন সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। ডোল ও দোমার গঠন একই প্রকার, তবে ডোলগুলি দোমা অপেক্ষা অনেক স্থূল ও লম্বা হয়। ৯। ১০ ফিট উচ্চ গুণ্ডার জন্য ১১ মণ কি ১৷৵ মণ পাটের ২৫। ৩০ হাত লম্বা এবং ১৬। ১৭ ইঞ্চ স্থূল ডোল প্রস্তুত করিতে হয়। এতদপেক্ষা ছোট হাতীর জন্য ১৫। ২০

সের হইতে ২৫। ৩০ সের পাটদ্বারা ১৫।২০ হাত হইতে ২০। ২২ হাত লম্বা ১০। ১২ ইঞ্চ স্থূল ডোল প্রস্তুত করিলেই হইতে পারে।

যে হস্তীগুলিকে ফাঁসি মারিয়া কুম্‌কীর ফাঁড়ার সহিত বাঁধা হয় সে গুলিকে তৎক্ষণাৎ কোট হইতে বাহির করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে জলপান করাইয়া সুবিধা জনক স্থানে গাছে বাঁধিতে হইবে। গাছে বাঁধার সময় তাহাদের পশ্চাৎপদে ২। ৩ রশির পয়তালা করিতে হইবে। কুম্‌কীর ফাঁড়ার সাহত ডোল বাঁধিয়া ডোলের শিরোভাগে একটী ফাঁদ প্রস্তুত করতঃ পয়তালাভরা হস্তীর গলদেশে আটকাইয়া দেওয়া হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ফাঁদটী গলদেশে দেওয়ার সময় আরণ্য হস্তিটী শুণ্ড ঊর্দ্ধে উত্তোলন না করিয়া নিম্ন দিকে আকুঞ্চিত করিয়া ফেলে, কোনও কোনও স্থলে ২। ১ বার শুণ্ড উত্তোলন করে বটে কিন্তু এরূপ ঘটনা বিরল। ফাঁদটী যাহাতে হস্তীর গলদেশে একেবারে আবদ্ধ হইয়া তাহার শ্বাসরোধ না হয় এতদর্থে একটী ছোট রশিদ্বারা ফাঁদের মুখ বদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়; ইহাকেই চাঁর ভরা বলা হয়। এক একটী বড় হস্তিনীকে কোট হইতে বাহির করার সময় ২ হইতে ৩। ৪ টী কুম্‌কীর সাহায্য লইতে হয়। ৫। ৬ ফিট্ উচ্চ হাতীগুলিকে বাহির করার জন্য এক একটী কুম্‌কীই যথেষ্ট। এতাদৃশ দুইটী হাতী একটী বলিষ্ঠা কুম্‌কীর সঙ্গে বাঁধিলেও ক্ষতি নাই।

বড় গুণ্ডার গলদেশে ২টী বড় ডোল মারিয়া কুম্‌কীর ফাঁড়াতে বাঁধিতে হইবে, অতঃপর পশ্চাৎ পদদ্বয়ে ২টী কি ৩টী দোমা বাঁধিয়া কুম্‌কীর ফাঁড়ায় বাঁধিতে হয়, তৎপর কুম্‌কী জড়াইয়া পয়তালা খুলিয়া দিতে হয়। পশ্চাৎ পদদ্বয়ের বন্ধন (পয়তালা) মুক্ত হওয়া মাত্র হাতীটী সবেগে দৌড়াইতে ইচ্ছা করে, এ অবস্থায় কুম্‌কীগুলি তাহাকে টানিয়া রাখে; বিশেষ বলিষ্ঠা কুম্‌কী না হইলে বিপত্তির আশঙ্কা থাকে। এস্থলে একটী কথা বলা প্রয়োজন,—বড় গুণ্ডাকে কেবল কোটের খুঁটির সহিত গাছ না লওয়াইয়া কোটের বাহিরে আরও ২। ৩টী খুঁটি গাড়িয়া দিলে ভাল হয়, ইহাকে আগরাম্ গাড়া বলে। কোটের খুঁটির সহিত দোমা বাঁধিয়া পুনরায় আগরাম্ ও কোটের খুঁটিতে রশি বাঁধিয়া বন্ধন দৃঢ় করিতে হয়। বড় বড় গুণ্ডাকে কোট হইতে বাহির করিতে ৫। ৬ টী কুম্‌কীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

হস্তীগুলির গলায় ডোল মারিয়া তাহাদিগকে ২। ১ দিন কোটের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলে ভাল হয়; কেননা তাহারা তখন বন্ধনমুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করে বলিয়া গলদেশে ও পদদ্বয়ে গভীর বেদনাযুক্ত ক্ষত উৎপাদিত হয়। সুতরাং

কোটের বাহিরে আনিবার সময় তাহারা তত বলপ্রকাশ করিতে পারে না। যে ২। ১ দিন হাতী কোটের মধ্যে থাকিবে ঐ সময় তাহাদিগকে ঘাস দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং যদি কোটের মধ্যে কোন প্রস্রবণ না থাকে, তবে কলাগাছ দিলে কতকটা জলের অভাব-পূরণ হইতে পারে।

৯। ১০ ফিট্ উচ্চ গুণ্ডাকে ডোলমারা বড় সহজ ব্যাপার নহে; ইহারা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির হয় এবং কুমৃকী সহসা তাহাদের সম্মুখীন হইতে সাহসিনী হয় না। বড় গুণ্ডার অগ্র পদদ্বয়ে ফাঁদ লাগাইয়া, ফাঁদের রশি অগ্রবর্ত্তী কোন বৃক্ষে অথবা খুঁটিতে এরূপভাবে টানিয়া বাঁধিতে হইবে, যেন হস্তিটী সহসা এদিক সেদিক নড়িতে না পারে, এই কার্য্যকে প্রচলিত ভাষায় আগাড়ী ভরা বলে। আগাড়ী ভরিয়া, ডোলমারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সহজ। ইহাতেও সুবিধা না হইলে সম্মুখের দক্ষিণ পদের সহিত পশ্চাতের বামপদ এবং সম্মুখের বামপদের সহিত পশ্চাতের দক্ষিণ পদ দৃঢ়রূপে টানিয়া (Crosswise) বন্ধন করতঃ ডোলমারা উচিত।

গড়-দাখিলী হাতীগুলিকে বাহির করার পর যদি দেখা যায় যে পাতবেড়ে আরও হাতী আছে, তবে কোটটী আবার দৃঢ় করিয়া পূর্ব্ববৎ জঙ্গল ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করতঃ পুনরায় খেদা করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট হস্তী গড় দাখিল হইলে তাহাদিগকে পরতালা ইত্যাদি ভরিয়া পূর্ব্ববৎ কোট হইতে বাহির করিতে হইবে।

অধিকাংশ আরণ্য জন্তুই আবদ্ধ হইলে চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং অতি উপাদেয় খাদ্য সম্মুখে স্থাপিত দেখিয়াও তাহা স্পর্শ করে না, কিন্তু আরণ্য হস্তীর স্বভাব এই যে, তাহারা আবদ্ধ হওয়া মাত্রেই আহারে প্রবৃত্ত হয় অনেক পুং হস্তী অনেক্ষণ পর্য্যন্ত আহার করে না বটে, কিন্তু ২। ১ দিনের পরই আহারে প্রবৃত্ত হয়। হস্তীগুলিকে কোট হইতে বাহির করিয়াই নিকটবর্ত্তী প্রস্রবণে অথবা নদীতে জল পানার্থ নিতে হয়। জলে নেওয়া মাত্র তাহারা শুণ্ডদ্বারা গাত্রে জল প্রক্ষেপ ও জল পান করে, এবং জল হইতে তীরে তুলিলে তাহারা স্বীয় স্বীয় গাত্র ধূলিধূসরিত করে, ইহাতে তাহাদের শরীর অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে এবং ক্লান্তিও দূরীভূত হয়। হস্তী কখনও কদর্য্য আহার করে না এবং নির্ম্মল জল ভিন্ন পান করে না, অতএব আবদ্ধাবস্থায় তাহাদিগের পানাহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হস্তীগুলিকে জল পান করাইয়া বৃক্ষচ্ছায়াযুক্ত সুবিধাজনক স্থানে বাঁধিতে হইবে

এবং পোষ না মানা পর্য্যন্ত প্রত্যহ তাহাদিগকে এই প্রকারে এক এক বার জলপানার্থ প্রস্রবণে অথবা স্রোতস্বতী নদীতে নিতে হইবে। এই দৈনন্দিন কার্য্যকে খোলবাঁধ করা বলে। খোলবাঁধ করার জন্য কতকগুলি লোক ও কুম্‌কী নিযুক্ত রাখিতে হয় এবং তাহাদিগকে ঘাস দেওয়ার জন্যও উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আরণ্য হস্তীগুলিকে পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে নিম্ন ভূমিতে আনয়ন করার সময় বিশেষ সতর্কতাবলম্বন বিধেয়। তাহাদিগকে কোট হইতে বাহির করিয়া নিম্ন ভূমিতে আনয়ন করার জন্য জঙ্গল ইত্যাদি কাটিয়া পরিসর রাস্তা করাইতে হইবে এবং যাহাতে কোনও সঙ্কটাপন্ন রাস্তায় হস্তীগুলিকে আনা না হয় তৎপক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতি দুরারোহ পর্ব্বতের উপর দিয়া আরণ্য হস্তীসহ কুম্‌কী আসিলে অনেক বিপদের সম্ভাবনা। এতদর্থে কতকগুলি কুলি নিযুক্ত করিতে হয়। খেদার কুলিদ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন করান যাইতে পারে। পীল্‌খানায় সর্ব্বদাই কতকগুলি প্রহরী নিযুক্ত রাখা সঙ্গত, কেন না পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক সময় আরণ্য পুং হস্তী পীল্‌খানায় উপস্থিত হইয়া বিশেষ উৎপাত ঘটাইতে পারে। ইতঃপর নিম্ন ভূমিতে হস্তীগুলি আসিলে পরও পীল্‌খানা রক্ষার্থ ৪।৫ জন প্রহরী নিযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য।

কোনও কোনও আরণ্য হস্তী অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির থাকে এবং তাহারা গলার দোমা চর্ব্বণ করতঃ কাটিয়া ফেলে, এই প্রকার হস্তীগুলিকে গলায় লৌহ শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ করাই নিরাপদ। এতাদৃশ হস্তীর গলার দোমা সম্মুখবর্ত্তী খুঁটি অথবা গাছে না বাঁধিয়া উপরিভাগে কোনও দৃঢ় বৃক্ষ শাখায় বাঁধিতে হয় অথবা দোমাটী অগ্র পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া উদরের নিম্নভাগে আকর্ষণ করতঃ পশ্চাৎবর্ত্তী খুঁটিতে অথবা গাছে বাঁধিলেও দোমা কাটা হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

ধৃত হস্তীগুলিকে যত সত্বর বিক্রয় করা যায় ব্যবসায়ের পক্ষে ততই সুবিধা, অতএব হস্তী ধৃত হওয়া মাত্র ব্যবসায়িগণকে সংবাদ জানান উচিৎ।

ধৃত হস্তীগুলির পশ্চাৎ পদদ্বয়ে এবং গলদেশে বন্ধনজনিত ক্ষত উৎপাদিত হইলে তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে; গলার ডোল খুলিয়া অগ্র পদদ্বয়ে বাঁধিয়া তাহাতে দোমা লাগাইতে হইবে এবং পশ্চাৎপদদ্বয়ে পরতালা না বাঁধিয়া অন্য প্রকার শ্লথ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। এই প্রকার বন্ধনকে খাজুরা বাঁধা বলে, ইহা কি প্রকার তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। হস্তীর স্কন্ধদেশ অত্যন্ত স্ফীত হইলে তাহাকে ডোলদ্বারা না বাঁধিয়া ইছাকলসী

নামক নরম রশিগুলি বাঁধিতে হইবে, এগুলিও দোমার ন্যায় বটে কিন্তু ৬ গুণ না হইয়া ৩ গুণ বেশি বিশিষ্ট হয় এবং পাকেও কড়া হয় না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মহাবলশালী মদমত্ত দুরন্ত আরণ্য হস্তী ২।৩ মাস মধ্যে মানুষের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর বশতাপন্ন হইয়া তাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হইতে থাকে। ২।৩ বৎসর পর আরণ্য হস্তীগুলিকে মুক্ত করিয়া দিলে তাহারা পর্ব্বতে আরোহণ করার ইচ্ছা করে না এবং পলায়নপর হয় না। আমাদের হস্তীগুলিকে অনেক সময় মুক্তাবস্থায় জঙ্গলে বিচরণ করিতে দেওয়া হয়, ইহাতে তাহাদের মনে স্ফূর্ত্তি এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

সম্প্রতি খেদা সম্বন্ধে ২।৩ টী সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করতঃ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। খেদা কার্য্যে মাসিক ৬০০৲ কি ৭০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে এবং অন্ততঃপক্ষে ৪০০ শত কুলি এবং অন্যান্য প্রকার চাকর নিযুক্ত করিতে হয়। ২৫।৩০টী কুমকীর কমে খেদা হইতে পারে না এবং ২।৩ মাসে ৬০।৭০ টী হাতী ধরিতে না পারিলে খেদায় লাভ হওয়া কঠিন। গারোহীলে এখন হাতীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প অতএব এ প্রদেশে খেদায় লাভ হওয়ার আশা কম। বিশেষ চেষ্টাদ্বারা গারোহীলে এখনও ২।৪ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ৫০।৬০ টী হাতী ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার কিছু নিশ্চয় নাই।

আমরা বর্ত্তমান বর্ষে, প্রত্যেক ধৃত হস্তীর ১০০৲ টাকা রয়েল্‌টি (Royalty) এবং তদুপরি রাজস্ব দেওয়ার নিয়মে গারোহীলে খেদা করার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে পাট্টা পাইয়া আগামী বৈশাখমাস পর্য্যন্ত গারোহীলে খেদা করার অধিকারী হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত আমাদের খেদায় ৩১ টী হস্তী ধৃত হইয়াছে। এখনও রীতিমত খেদাকার্য্য চলিতেছে, আমরা নিজেই খেদাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি; ফলাফল ভগবানের হস্তে।

খেদা সম্বন্ধে সংক্ষেপে প্রায় সমস্ত কথাই বলা হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ২।২ টী ভ্রম রহিয়াছে, বারান্তরে সে গুলি সংশোধিত করার চেষ্টা করিব।

খেদা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি যথা সম্ভব বিশদভাবে লিখিবার প্রয়াস করিয়াছি; কিন্তু ভাষার পারিপাট্যের প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখি নাই, ইহাতে কোন ত্রুটি হইয়া থাকিলে পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন। উপসংহারে বক্তব্য এই যে মল্লিখিত প্রবন্ধ-গুলি পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

রাজা রঘুনাথ সিংহ।

করতোয়ার বিজন উপকূল ক্ষণকালের মধ্যেই যাত্রিগণের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শাস্ত্রে আছে করতোয়ার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। তাই আজ শুভক্ষণে বহু দূরদেশ হইতে বহুলোক এই মহাতীর্থস্থানে সমবেত হইয়াছে। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ তর্পণ করিতেছে, কেহ গরীব দুঃখীকে ভোজন করাইয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। চারিদিকে একটা ভারি ব্যস্ততার ভাব। একটু দূরে একটা নির্জ্জন স্থানে একজন পশ্চিম দেশবাসী ক্ষত্রিয় পুরুষ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিকবাস, বিস্তৃত ললাটে উজ্জ্বল চন্দনের ফোঁটা। একখানি নামাবলীদ্বারা তাঁহার সুবিশাল সুগঠিত দেহ আবৃত। এই অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল তিনি একজন অসামান্য লোক হইবেন। এক ব্রাহ্মণ মন্ত্র বলিতেছিলেন আর সেই গৈরিকবাসপরিহিত পুরুষ একখানি কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিভরে মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে পরুষ ভাষায় বলিল "ব্রাহ্মণ! শাস্ত্রাধ্যয়ন কর নাই, অর্থ লোভে যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতেছ"। সেই সৌম্য ক্ষত্রিয় পুরুষ এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি গ্রীবা বক্র করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন এক দৃঢ়কায় সুন্দর ব্রাহ্মণ যুবক কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহাদের ক্রিয়া-কলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছে।

যুবকের বয়স পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরের অধিক হইবে না। তাহার দেহ সুদীর্ঘ, বাহু মাংসপেশীময়, বক্ষ উন্নত, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল। তাহাকে দেখিয়া ক্ষত্রিয় পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে"? যুবক অবিচলিত চিত্তে উত্তর করিলেন "আমি যেই হই না কেন, আমি শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ"। যুবকের নির্ভীকতায় সেই ক্ষত্রিয় পুরুষ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং যুবককে যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করাইতে অনুরোধ করিলেন। যুবক অতি বিশুদ্ধভাবে মন্ত্র পাঠ করাইলেন। নিষ্ঠাবান পুরুষ অতিশয় প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজজী ক্যা দক্ষিণা চাহিয়ে"। পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণকে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যুবক বলিলেন আমি শাস্ত্র ব্যবসায়ী নই, অর্থেরও আমার প্রয়োজন নাই।

---

* এই প্রবন্ধের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আমার প্রিয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু রমণী মোহন দাস এম্, এ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রঃ লেঃ

ক্ষত্রিয় পুরুষ—"তবে কি আমি আপনার কোন উপকার করিতে পারিব না?"

ব্রাহ্মণ যুবক—"মহারাজ, আমি সুসঙ্গের অধিপতি রঘুনাথ ঠাকুর, আপনি দিল্লীর সম্রাট আকবর সাহের প্রধান সেনাপতি ক্ষত্রিয় বীর মানসিংহ। আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। আমি আপনার নিকট অর্থ ভিক্ষা চাই না, যদি আপনি আমার উপকার করিতে যথার্থ অভিলাষী হইয়া থাকেন তবে আমাকে যে 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, আমার প্রার্থনা, এই সম্বোধনটী দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে চিরস্থায়ী করিয়া আপনি স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় দেন।" ব্রাহ্মণ যুবক জানিতেন, ব্রাহ্মণের প্রতি মানসিংহের প্রগাঢ় ভক্তি, তাই তিনি ঈদৃশ আব্দার করিতে ভীত হন নাই। মানসিংহ, রঘুনাথ ঠাকুরকে দিল্লী গেলে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে জানাইলেন। রঘুনাথও দিল্লী যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

দিল্লীশ্বর আকবর দ্বাদশ ভূঞার সর্ব্বপ্রধান যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে কোন প্রকারে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব সুবিখ্যাত রাজা মানসিংহকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাস্ত ও ধৃত করেন। অতঃপর মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন কিন্তু পথিমধ্যেই প্রতাপ মৃত্যুর হস্তে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই ঘটনা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

রাজা মানসিংহ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মোগল সম্রাটের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। দিল্লীশ্বরের অনুজ্ঞায় মানসিংহ গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না সত্য, কিন্তু তিনি স্বধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন। তিনি হিন্দুর ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে ত্রুটী করিতেন না। মানসিংহ প্রতাপকে দিল্লী প্রেরণ করিয়া কতিপয় মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে বগুড়ার অন্তর্গত পবিত্র করতোয়া তীর্থে আগমন করেন, তথায় যে প্রকারে সুসঙ্গাধিপতি রঘুনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই স্থলে একটী ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিতেছি। যে সময়ে রঘুনাথ সুসঙ্গের অধিপতি ছিলেন ঠিক সেই সময়েই দ্বাদশ ভূঞার ঈশা খাঁ ঢাকার নিকট সাহাজখাঁর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতে-ছিলেন। ঈশা খাঁ তখন দিল্লীশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কর বন্ধ করিয়া স্বাধীনভাবে পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি রঘুনাথের প্রাধান্য দেখিয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে প্রয়াস পান। সুযোগ পাইয়া একবার ঈশা খাঁ রঘুনাথকে

কারারুদ্ধ করেন সুসঙ্গ পরগণার গারোরা রঘুনাথের অতিশয় বাধ্য ছিল। কথিত আছে বহু সংখ্যক গারো আসিয়া রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই খাল কাটিয়া নৌকায় রঘুনাথকে লইয়া পলায়ন করে। আজও সেই খাল "রঘুখালী" নামে প্রসিদ্ধ। রঘুনাথ ঈশা খাঁ কৃত এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে করতোয়া তীর্থে তিনি সম্রাটের প্রিয় সেনাপতি মানসিংহের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ঈশা খাঁর অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের মানসেই তিনি মানসিংহের নিকট "মহারাজ" উপাধিলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

রঘুনাথ জানিতেন সম্রাট আকবরের দরবারে মানসিংহের অসীম প্রতিপত্তি। মানসিংহের অনুরোধ দিল্লীশ্বর কখনও উপেক্ষা করিতেন না। তাই স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় তিনি দিল্লী যাত্রা করিলেন, রঘুনাথ দিল্লী পৌঁছিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে মোগল-কুলগৌরব আকবর সাহেব পরলোক গমন করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তখন সম্রাট হইয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। ইহা ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের কথা। পূর্ব্বে ভারতে গুণের আদর ছিল। সাধারণ লোকও স্বীয় প্রতিভা দেখাইবার সুযোগ পাইত। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কাহারও শক্তির পরিচয় পাইলে সম্রাট তাহাকে উপেক্ষা করিতেন না বরং যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতেন। ভারতের প্রধান প্রধান নরপতিগণের প্রাচীন বংশেতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অতি সামান্য অবস্থা হইতেই প্রতিভাবলে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। রঘুনাথের অসাধারণ বল বিক্রমের সংবাদ জাহাঙ্গীরের কর্ণে পৌঁছিল।

দিল্লীপতিও রঘুনাথের গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বহু সম্মান পূর্ব্বক প্রধান দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। একদিন সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বীয় পরিষদ সমভিব্যাহারে একটী নবক্রীত অশ্বের দৌড় দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অশ্বটী নিতান্ত অদম্য ছিল, তাহার পৃষ্ঠোপরি কেহই উঠিতে পারিত না। যখন সকলের প্রয়াসই বিফল হইল, তখন রঘুনাথ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বীয় শক্তির উপর রঘুনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সম্রাটের সম্মুখে সেই দুর্দ্দান্ত অশ্বকে তিনি অবলীলাক্রমে দৌড়াইয়া আনিলেন। জাহাঙ্গীর দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ রঘুনাথকে তাঁহার বিক্রমের পরিচায়ক "সিংহ" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। অধুনাও সুসঙ্গের নরপতিগণ সেই গৌরবসূচক উপাধি ভোগ করিতেছেন।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন চাঁদ রায় কেদার রায় দুই ভ্রাতা দ্বাদশ ভূঞার এক ভূঞা পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহারা বিক্রমপুর রাজত্ব করিতেন। চাঁদ রায় কেদার রায় দিল্লীশ্বরের বিপক্ষতাচরণ করিলে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য সম্রাট, রঘুনাথকে প্রেরণ করেন। রঘুনাথ অতি কৌশলে চাঁদ রায় কেদার রায়কে আবদ্ধ করিয়া রাজপুরী লুণ্ঠন করেন। তখন নিয়ম ছিল লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠিত দ্রব্যের একচতুর্থাংশ পাইত আর সমস্ত বাদসাহের ভাণ্ডারে প্রেরণ করিতে হইত। চাঁদ রায় কেদার রায়ের লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে একটী অষ্টধাতু নির্ম্মিত দশভুজা মূর্ত্তি রঘুনাথ পাইয়াছিলেন। রঘুনাথ সেই মূর্ত্তি স্বীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই অষ্টধাতু মূর্ত্তি এখনও সুসঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন।

অতঃপর রঘুনাথ দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সম্রাট তাঁহাকে বহু সম্মান পূর্ব্বক স্বীয় দরবারে গ্রহণ করিলেন। জাহাঙ্গীর সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথকে পুরস্কার প্রদানের আদেশ করিলেন। এই সুযোগে রঘুনাথ দেওয়ান ঈশা খাঁর অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করেন ও বাদসাহের নিকট হইতে রাজোপাধি ও পৃথক সনদ প্রাপ্ত হন। তদবধি সুসঙ্গ ঈশা খাঁর হস্ত চ্যুত হয়। বহুকাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়া রঘুনাথ পঞ্চহাজার গারো তাম্বো (অর্থাৎ গারোদের উপর শাসন ক্ষমতা) ও দরগাই মুন্সী উপাধি লাভ করেন এবং ৩৫০ জন নায়কের উপর শাসক নিযুক্ত হন। "পঞ্চহাজারী" তখনকার দিনের অতিশয় সম্মানিত পদ ছিল তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

রাজা রঘুনাথ বিপুল সম্মানে ভূষিত হইয়া বহুসংখ্যক মোগল ও পাঠান বংশীয় সৈনিক সহকারে মহাসমারোহে রাজধানী সুসঙ্গ দুর্গাপুর উপনীত হইলেন। রঘুনাথের পাঠান ও মোগল সৈনিকের বংশধরগণ অদ্যাপিও সুসঙ্গ পরগণায় খাঁ এবং বেগ নামে পরিচিত। রঘুনাথের সময়ই সুসঙ্গের গৌরব দেশময় প্রচারিত হয়। তাঁহার বল বীর্য্যেই সুসঙ্গ রাজ-পরিবার আজও পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্ব প্রধান সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

রঘুনাথের বাহুবল ও সাহসিকতা সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। আমরা যে দুইটী ঘটনার কথা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

রঘুনাথের পিতা তাঁহাকে রাজধানী হইতে কিছু দূরবর্ত্তী কোন টোলে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। গুরুগৃহে থাকিয়া রঘুনাথকে পাঠাভ্যাস করিতে হইত। সেই সময়ের একটী ঘটনায় সকল লোক বিস্মিত হইয়াছিল। একদিন

প্রভাতে টোল হইতে রাজধানীর মধ্যপথে কোন বৃক্ষতলে একটা মরা ব্যাঘ্র পড়িয়াছে দেখা গেল। ব্যাঘ্র-শরীরে তীক্ষ্ণধার তীর বিদ্ধ রহিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানের পর ব্যাঘ্র-হত্যাকারী ধরা পড়িল। তিনি আর কেহই নন স্বয়ং রঘুনাথ। প্রকাশ পাইল রঘুনাথ রজনীযোগে একাকী স্বীয় পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। পথিমধ্যে ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। নির্ভীক রঘুনাথ হস্তস্থিত তীরদ্বারা ব্যাঘ্রকে আহত করিয়া চলিয়া যান। ব্যাঘ্র সেই ভীষণ আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

রঘুনাথের বিবাহ ব্যাপারটী আরও বীরত্ব ব্যঞ্জক। সুসঙ্গের জোয়ারদারগণ রাজপরিবারের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে কাপুরুষেরা বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহসী হইত না। একবার দুষ্টেরা বৈর নির্য্যাতন মানসে এক অভিনব ষড়যন্ত্র করিল। রওনা গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ জোয়ারদারের কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ স্থির হইল। রঘুনাথ বুঝিতে পারিলেন না, এই বিবাহ ব্যাপারের পশ্চাতে কি ভয়ানক পৈশাচিক অভিনয়ের আয়োজন হইয়া রহিয়াছে। তিনি বরবেশে অল্পসংখ্যক সহচর সহিত রওনা উপস্থিত হইলেন; যথাশাস্ত্র বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। রঘুনাথ বাসরগৃহে নীত হইলেন, কিন্তু সেখানে তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে বড়ই বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন তাহার নবপরিণীতা রাজ-মহিষী পর্য্যঙ্ককোণে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে ক্রন্দন করিতেছেন। রঘুনাথ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না থাকায় তিনি লজ্জাত্যাগ করিয়া বলিলেন "বাসর ঘরে স্বামীর সহিত আলাপ করা লজ্জাহীনতার কাজ সন্দেহ নাই কিন্তু যখন আমি আপনার পত্নীরূপে গৃহীত হইয়াছি তখন আপনার সুখ দুঃখেরও আমি অধিকারিণী, সুতরাং আপনার অবশ্যম্ভাবী বিপদের কথা জানিয়া নীরব থাকিলে আমার মহাপাপ হইবে। দুষ্টলোকেরা আপনার প্রাণনাশ করার জন্য আয়োজন করিয়া আপনাকে এখানে আনিয়াছে, বিবাহ উপলক্ষ মাত্র। রঘুনাথ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই বাসরগৃহ সশস্ত্র শত্রু কর্ত্তৃক পরিবৃত। আসন্ন বিপদ, দুর্ব্বলকে অবসন্ন করিয়া ফেলে কিন্তু সবলের প্রাণে অদম্য সাহসের সঞ্চার করিয়া দেয়। রঘুনাথ স্বীয় উত্তরীয়দ্বারা নবপরিণীতা ভার্য্যাকে পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া বিরাট যষ্টিহস্তে বাসরগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার ভীমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কেহই সম্মুখে অগ্রসর হইল না। রঘুনাথ রাজ-মহিষীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া একবারে রাজধানীতে আসিয়া পড়িলেন। সেই ষড়যন্ত্রের পর

হইতে সুসঙ্গ রাজপরিবারের কুমারেরা বিবাহ সভায় সশস্ত্র উপস্থিত হন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রতিফল।

১

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নির্দ্দয় তিরস্কারে অনুতপ্ত ব্যথিত শৈলেশচন্দ্র যখন ভবিষ্যৎ আশাগর্ভ এপ্রেন্টিসী চাকুরিটী ছিন্ন পাদুকাবৎ পরিত্যাগ করিয়া বেগে প্রস্থান করে, তখন তরঙ্গ-ভঙ্গময় নৃত্যশীল একটা বিরাট আন্দোলনস্রোত ফৌজদারী কাছারীর প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরিণতবয়স্ক কর্ম্মচারগণ বলিলেন "ছেলেটা নিতান্ত উদ্ধত ও অপরিণামদর্শী আপনার পা'য় আপান কুঠারাঘাত করিল"। তেজোদৃপ্ত যুবকবৃন্দ বলিলেন "সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে; কারণে-অকারণে এমন মর্ম্মভেদী তিরস্কার নারী-প্রকৃতির পুরুষ ভিন্ন কে সহ্য করিতে পারে। শৈলেশ প্রকৃতই পৌরুষশালী পুরুষ"। আর তিরস্কর্ত্তা সেরিস্তাদার মহাশয় বলিলেন "পেঠে নাই চাম রাধাকৃষ্ণের নাম, বাড়ীতে দু'বেলা দু'মোঠা অন্ন জোটে না তার আবার দেমাক্ দেখ; গবর্ণমেন্টের কোন বিভাগে প্রবেশ করিতে না পারে আমি এমন করে ছাড়্‌ব"। মুখে যাহাই বলুন, সেরিস্তাদার মহাশয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা উগ্র চিন্তাবিষধরের পুনঃপৌনিক দংশনে একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; ভাবনা এই—উদ্ধত ছেলেটা চলিয়া যাওয়ার সময় রাগরক্তিম নয়নে তাহার প্রতি যে বিষদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতিফল প্রদানের একটা অচঞ্চল অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, না জানি কোন অন্ধতমসাচ্ছন্ন কালনিশিতে, একটা অবাঞ্ছিত ভীমদণ্ড তাহার বিরলকেশ মস্তকে পতিত হইয়া তাহার সাধের ভবলীলা, সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক পদমর্য্যাদা ও প্রভুত্বের অবসান করিয়া দেয়।

২

সন্ধ্যার সময় শৈলেশচন্দ্র ভগ্নমনে, একমাত্র আত্মীয় ও আশ্রয়দাতা মাতুল মহাশয়ের গৃহে ফিরিয়া আসিল। গুণধর ভাগিনেয়ের কীর্ত্তি-কাহিনী ইতঃপূর্ব্বেই জিহ্বা হইতে জিহ্বান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক জঘন্য সংস্করণে অবিনাশচন্দ্র বসুর শ্রবণ পথের পথিক হইয়াছিল। বসু মহাশয়ের হৃদয়ে এতক্ষণ বাৎসল্য ও কর্ত্তব্য

বুদ্ধির মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, শৈলেশচন্দ্রের আগমনে তাহার সুমীমাংসা হইয়া গেল— অবিনাশ বাবু ক্রোধের বশীভূত হইয়া শৈলেশচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "এত বেয়াদবী কেন?" এ কথার উত্তরে শৈলেশচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু অবিনাশ বাবুর অবিরাম বাক্য বর্ষণে বাঁধাপ্রাপ্ত হইয়া নীরবে শুনিতে লাগিল— "গরীবের ছেলে, তা'য় আবার লেখা পড়ায় বিদ্যাসাগর। তার আবার এত আস্পর্দ্ধা কেন? যদি জানিতাম বাড়ীতে ভাতের অভাব নাই; বিদ্যার অসাধারণ তেজে এখানে না হউক ওখানে চাকুরীর পথ আপনা হইতে খুলিয়া যাইবে, তাহা হইলে তোমার এ ব্যবহার প্রশংসনীয় হইত সন্দেহ নাই। কিসের জোরে তোমার এত অহঙ্কার এত তেজ? যদি ভাল চাও, তবে অদ্যই সিরিস্তাদার মহাশয়ের নিকট যাইয়া অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নতুবা আমার নিকট তোমার স্থান নাই।" মাতুল মহাশয় হইতে ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহারের পরিবর্ত্তে অন্যায্য কটূক্তিলাভ করিয়া শৈলেশচন্দ্র ছিন্নজিহ্ব সিংহের ন্যায় নীরবে কিন্তু ক্রোধবিকম্পিত কলেবরে, ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিল। তখন পূর্ব্বগগনে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া উঠিয়াছেন। শৈলেশচন্দ্র বোধ হয় মনে ভাবিয়া থাকিবে, জীবনসংগ্রামের প্রথম যুদ্ধে সে পরাজিত লাঞ্ছিত তাই চন্দ্রের মুখে আজ এত বিদ্রূপের হাসি। যাহার অন্তর-রাজ্য অমাঅন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বাহিরের আলো তাহার পক্ষে বোধ হয় অসহনীয়, তাই শৈলেশচন্দ্র নিরালোক শয়ন-প্রকোষ্ঠে আসিয়া দ্বারে অর্গল আঁটিয়া দিল।

৩

তখনও আকাশের আকবর, পূর্ণিমা রজনীর "খোসরোজ মেলা" সমাপন করিয়া অন্তর্হিত হন নাই; তখনও নববধূ উষা স্বীয় ব্রীড়াবনত বদন খানির অবগুণ্ঠন উন্মোচনে শঙ্কায় সঙ্কুচিত হইতে ছিলেন; তখনও কর্ম্মকোলাহলে মেদিনী তেমন মুখরিত হইয়া উঠে নাই, এমনি সময়ে, প্রতিদিন যেমন আসে, আজিও তেমনি শৈলেশচন্দ্রের মাতুল ভ্রাতা সুশীলচন্দ্র শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ খানা হাতে করিয়া 'পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল' আওড়াইতে আওড়াইতে দাদার শয়ন-প্রকোষ্ঠে আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু দাদাকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া ধীরে ধীরে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিল "বাবা! দাদা গেল কোথায়?" পুত্রের কথায় পিতার মনে একটা অমঙ্গলাশঙ্কা জাগিয়া উঠিল, তিনি অতি ব্যস্তভাবে শৈলেশচন্দ্রের শয়ন ঘরের দিকে ছুটিয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্রেই টেবিলের উপরিস্থ এক খানা চিঠি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

অত্যাগ্রহে তাহা হাতে লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন :—

মামা!

চলিলাম, আকাশচ্যুত নক্ষত্রটীর মত অনির্দ্দিষ্ট পথের নিঃসঙ্গ যাত্রী হইয়া ছুটিয়া চলিলাম, জানি না কোন্ অপরিচিত রাজ্যে যাইয়া বিশ্রামলাভে সমর্থ হইব। অনুতাপে তনু জ্বলিয়া যাইতেছে; অনুতাপ এই—কেন সম্মুখের প্রবেশিকা পরীক্ষাটা না দিয়া, এই অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই হাতের পুঁথী বাক্সে পুরিয়া ভাতের জন্য চাকুরী করিতে গিয়াছিলাম। হেলা-উপেক্ষার গুরুভারে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বুঝিতে পারিয়াছি সম্পন্ন এবং পদ-মর্য্যাদাহীন ব্যক্তির জীবন ধারণ বৃথা; বুঝিতে পারিয়াছি, বিদ্যাহীনের জীবন পথিপার্শ্বস্থ সারমেয় শিশুর জীবন হইতে অধিকতর মূল্যবান নহে। যদি ফিরিয়া আসা বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তবে ফিরিব, নতুবা শৈলেশের অবশিষ্ট জীবন অজ্ঞাতবাসে কর্ত্তিত হইবে। আমার অনুসন্ধান বৃথা।

হতভাগ্য

শৈলেশ।

পরম স্নেহাস্পদ একমাত্র ভাগিনেয়ের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে অবিনাশ বাবু বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন, এবং শৈলেশের হৃদয় বজ্রকোঠর তিরস্কারে অনুবিদ্ধ করার স্মৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ে জাগরিত হইয়া তাহাকে অনুতাপের অরুন্তুদ বেদনায় অধীর করিয়া তুলিল। তিনি শৈলেশের অনুসন্ধানার্থ নানা স্থানে লোক প্রেরণ করিলেন কিন্তু শৈলেশের বাক্যই সফল হইল তাহাকে কোথায়ও পাওয়া গেল না। শৈলেশের তিরোধানের তিন দিন পর একটী বিকৃত ও পূতিগন্ধি মৃতদেহ নদজলে ভাসিয়া আসিয়া সাধারণের স্নানেরঘাটে আট্‌কাইয়া গেল, স্নান করিতে যাইয়া অনেকেই তাহা দেখিয়া আসিলেন। জানি না কি সূত্রে সমগ্র নগরময় রাষ্ট্র হইল, শৈলেশ জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অবিনাশ বাবু শুনিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন।

৪

বৈষয়িক উন্নতি বিদ্যা বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। পুরুষকারের অপ্রচুরতাহেতু পুরুষের ভাগ্যলিপির হিরণ্ময় অধ্যায় মসিমলিন অঙ্গার স্তূপে কলঙ্কিত হইতে পারে না। মানুষের ভাগ্যের বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়গতি রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই; পুরুষকার বল, যত্ন চেষ্টা বল, সে গতির সম্মুখে দাঁড়াইলে, ভাগীরথীর গতিরোধকারী পর্ব্বতের ন্যায় কেহ বিদীর্ণ হয়, কেহ মত্ত ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া

যায়। সিরিস্তাদার মহেন্দ্রনাথ রায়ের জীবন তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। রায় মহাশয় প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর পাঠ সমাপনান্তে মা সরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শিক্ষানবিশরূপে গবর্ণমেণ্ট আফিসে প্রবেশ করেন। সে আজ ৩০ বৎসরের কথা। তখন ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, তাই স্কুলের বেত্রদণ্ডচিহ্নিতপৃষ্ঠ অমনোযোগী ছাত্র আফিসের পুরাতন কর্ম্মচারিগণের সঙ্গতদাবী পদদলিত করিয়া কয়েক বৎসরের ক্রমিক প্রমোশনে বহু লোকের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতারূপে ফৌজদারী আদালতের সিরিস্তাদারীপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এবং কোন উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর অনুগ্রহাতিশয্যে, শতবিধ বেআইনী কার্য্যের অনুষ্ঠানে মজুত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ও অক্ষত দেহে আত্মরক্ষা করিতে রহেন। আর অদৃষ্ট-চক্রের কুটিল আবর্ত্তনে আসন্ন-অবসর মহেন্দ্র বাবু একটী নগণ্য অপরাধে কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া আজ ৫ বৎসর যাবত জীবন্মৃত অবস্থায় কাল যাপন করিতেছেন; শত চেষ্টায়ও কোন ফলোদয় হয় নাই।

রায় মহাশয়ের পূর্ব্বার্জ্জিত অর্থের যে অংশ গৃহে সঞ্চিত রহিত, তদ্দারা তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু উর্ব্বরতাশালিনী সিরিস্তাদার-সীমন্তিনী প্রতি বৎসর এক একটী কন্যা-রত্ন উপহার দিয়া সংসারটাকে একটু অসচ্ছলতায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। যে প্রকারেই হউক রায় মহাশয় ৬টী মেয়েকে ১০ম বর্ষ মধ্যেই সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়া গৌরীদানের ফল লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে সপ্তম মেয়ে মৃন্ময়ীকে নিয়া বুঝি আর মান সম্ভ্রম থাকে না। মিনু ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশে পা দিয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাবটী পর্য্যন্ত আসিল না। মহেন্দ্র বাবুর চোখে ঘুম নাই, আহারে রুচি নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই রাত দিন কেবল একই চিন্তা মিনুর বিবাহের কি করিব। চিন্তায় চিন্তায় তাহার মস্তকের মসিকৃষ্ণকেশরাশি রজতশুভ্র হইল; চক্ষু, কোটরে প্রবেশ করিল; স্থূলদেহ, কঙ্কালসার হইল। তথাপি কোন বরের পিতার করুণা হইল না। অনন্যোপায় হইয়া রায় মহাশয় একখানা বিখ্যাত সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বিজ্ঞাপন প্রচারের এক মাস পর, সুদূর সাগর-উপকূলবর্ত্তী সন্দীপ হইতে বিবাহের একখানা প্রস্তাবপত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্রে লিখা ছিল, পাত্র সঞ্জীবচন্দ্র ঘোষ সন্দীপের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, বয়স ২৭ বৎসর, জাতিতে কুলীন কায়েস্থ। দানের প্রত্যাশী নন। পত্রখানা পাঠ করিয়া মহেন্দ্র বাবুর মনে হইল যেন গুরুভার মৈনাক পাহাড়টা তাহার স্কন্ধের উপর হইতে সরিয়া

পড়িল ; যেন অতল সাগরবক্ষে, তলায়মান দেহটার সম্মুখে সহসা একটা সুরম্য আশ্রয়-দ্বীপ জাগিয়া উঠিল। রায় মহাশয় কাল বিলম্ব না করিয়া পাত্র দর্শন এবং বিবাহের কথোপকথন ও দিন স্থিরীকরণ জন্য সন্দ্বীপে লোক প্রেরণ করিলেন। প্রেরীত লোক মঙ্গলবার্ত্তা নিয়া অচিরেই মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। শুভদিনে সন্দ্বীপের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, শ্রীমান্ সঞ্জীবচন্দ্র ঘোষের সহিত ভূতপূর্ব্ব সিরিস্তাদার মহেন্দ্রনাথ রায়ের ৭ম মেয়ে শ্রীমতী মৃন্ময়ী রায়ের শুভ উদ্বাহক্রিয়া মহাসমারোহে সন্দ্বীপে সম্পন্ন হইয়া গেল।

৫

বিবাহের এক বৎসর পরের কথা বলিতেছি, রায় মহাশয়ের বাস-নগরে সঞ্জীবচন্দ্রের বদলীবার্ত্তা কলিকাতা গেজেটে বিঘোষিত হইল। বদলীবার্ত্তা প্রাপ্তির পরদিন জামাতার একখানা চিঠি শ্বশ্রূ মাতাঠাকুরাণীর হাতে আসিয়া পঁহুছিল, তাহাতে লিখা ছিল, "আমি আগামী ১লা মাঘ পঁহুছিব, আমার জন্য একখানা পাকাবাড়ী ঠিক করিয়া রাখিবেন।" উত্তরে শাশুড়ী ঠাকুরাণী লিখিলেন, বাড়ী স্থির হইল কিন্তু তাঁহাকে প্রথমতঃ তাঁহাদের ক্ষুদ্র আবাসেই উপস্থিত হইতে হইবে।

জামাতা আসিতেছেন বলিয়া রায় মহাশয়ের বাড়ী বহুদিন পর আবার শ্রী ধারণ করিয়াছিল। আর বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছিলাম পৌষের সংক্রান্তি দিন রাত্রিতে রায়-গৃহিনী প্রমুখা মহিলাবৃন্দের সিঞ্চিনীধ্বনি ও কলহাস্যে অন্তর্ব্বাটী মুখরিত ছিল।

৬

নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্বশুর বাড়ীতে নব জামাতার শুভাগমন হইল। সঙ্গিনীপরিবৃতা রায়-গৃহিনী অন্তরাল হইতে জামাতার চারুদেহ, কমনীয়কান্তি ও চন্দ্রবদন সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। অন্দর মহলে ধ্বনি উঠিল "জামাতা রূপে কার্ত্তিক, গুণে গণেশ"। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী জামাতার নিরহঙ্কারভাব ও মধুর ব্যবহারে বড়ই সন্তোষ লাভ করিলেন, তাঁহাদের মুখে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রশংসাধ্বনি আর ধরে না। কিন্তু জামাতার মুখের দিকে চাহিতে যাইয়া রায় মহাশয়ের মস্তক একটু নত হইয়া পড়িল।

* * * * * * *

পরের দিন আফিসের পুরাতন আমলাবর্গ আদালত গৃহের দ্বার হইতে উঁকি দিয়া নূতন হাকিম দেখিতে যাইয়া দেখিল, সেই ৯ বৎসর পূর্ব্বের উদ্ধত ও বিতাড়িত এপ্রেন্টিস্ বালক শৈলেশচন্দ্র আজ সঞ্জীবচন্দ্র নামে পরিচিত ও ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চ মঞ্চে সমারূঢ় হইয়া অতি স্থির ধীরভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন।

ময়মনসিংহ জেলা স্থাপন ও বন্দোবস্ত।

লেজ সাহেব এতৎপ্রদেশে আসিয়া কেবল সন্ন্যাসী দমনেই নিযুক্ত ছিলেন না। রাজস্ব আদায়ও করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারদিগকে কয়েদ রাখিয়াও খাজানাদি আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রেভিনিউ বোর্ড তাহাকে কয়েদ রাখিতে নিষেধ করায় তিনি জমিদারদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কাননগুর কার্য্যালয় পুনঃ স্থাপনের অনুমতি হইলে স্থানে স্থানে কাননগুর আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৮৫ সনে আলাপসিংহ ও সেরপুরের জমিদারদিগের বিবাদ লইয়া রেভিনিউ বোর্ডকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

১৭৮৬ সনে পুনরায় সন্ন্যাসীর উপদ্রব সূচিত হইলে রেভিনিউ বোর্ড অনন্যোপায় হইয়া ১৭৮৭ সনে জেলা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এবং সেই সনের ১০ই এপ্রিল বেলুহার কালেক্টরকে ময়মনসিংহে আসিয়া নূতন জেলার ভার গ্রহণ করিতে অনুমতি করেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বেলুহার কালেক্টর মিঃ ডব্লিউ রটন এ জেলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তৎকালে এই জেলার কতকাংশ ঢাকার কালেক্টরের অধীন ছিল ও অবশিষ্ট অংশ মিঃ ডাউসন, লেজ ও চাম্পিয়ণের অধীনে শাসিত হইত। (১) মেঃ রটন উঁহাদের নিকট হইতে কাগজ পত্র গ্রহণ করিয়া নূতন জেলা স্থাপন করেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হয়। রাজচন্দ্র রায় নামক কোন ব্যক্তি কালেক্টরের দেওয়ান নিযুক্ত হন। মেঃ রটনের সাময়িক সাহায্য জন্য মিঃ ওয়াল্টেয়ার মেগুয়ার ও মিঃ প্রাইডেন নামক দুইজন সহকারী কর্ম্মচারীও এ জেলায় প্রেরিত হন।

---

(১) Dowson, Lodge এবং Champeon তৎকালে কোথায় থাকিয়া এই জেলার কোন অংশ শাসন করিতেন নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করা গেল না। বোর্ডের লিখিত (১০ই এপ্রিল ১৭৮৭) চিঠিতে বেলুহার কালেক্টর কে লিখিত হইয়াছে "We have written Mrs. Day, Dowson, Lodge and Champeon to deliver over to you such of the annexed mahals as were under their superintendence &c." Day ঢাকার কালেক্টর ছিলেন, এবং Lodge লক্ষ্মীপুরে ছিলেন ইহা অবগত হওয়া গিয়াছে। অপর দুইজন বোধ হয় সেলবরস (বর্ত্তমান বগুড়া) ও অন্য কোন পার্শ্ববর্ত্তী জেলার কালেক্টর কিম্বা রেসিডেন্ট ছিলেন। জেলা স্থাপনের পূর্ব্বে আলীয়া কাগমারী ও বড়বাজু পরগণার অংশ সেলবরসের কালেক্টরের অধীন ছিল।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের চিঠি দ্বারা রেভিনিউ বোর্ড রটন সাহেব কে এই জেলার ভূমি বন্দোবস্তের ভার প্রদান করেন। রটন সাহেব উপর্য্যুক্ত আদেশ অনুসারে জেলার ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন অতি অল্প পরিবর্ত্তনের সহিত তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইয়াছিল। তাহার বন্দোবস্ত-রিপোর্ট পাঠ করিলে দেশের তৎকালীন অবস্থা ও ইতিহাস পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

রটন সাহেবের ভূমি বন্দোবস্তের বিশ বৎসর পূর্ব্বে ১১৭৪ বঙ্গাব্দে সাইকস্ (Mr. Sykes) সাহেব এই জেলার বন্দোবস্ত করেন। ইহার পর এই বিশ বৎসরের মধ্যে মিঃ রেজা খাঁ, মিডল্টন, ঢাকার কমিটী অব সার্কুট, রাউস, সেক্সপিয়ার প্রভৃতিও সময় সময় এই জেলার ভূমি বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। রটন সাহেবের বন্দোবস্ত রিপোর্টে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বন্দোবস্ত ১১৯৫ সনের বন্দোবস্ত বলিয়া খ্যাত। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী এই রিপোর্ট প্রদত্ত হয়। নিম্নে এই বিস্তৃত রিপোর্ট হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

(১) মমিনসিং—হিস্যা চারি আনা, সদর জমা ২৯৩৫১৲। এই হিস্যা পরগণা জফরসাহীসহ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচান্দের নামে লিখিত আছে। ইহার বর্ত্তমান মালীক হরনাথের দুই বিধবা পত্নী। তাঁহারা ৺ কাশীধামে বাস করেন। শ্যামচান্দ ও রুদ্রচান্দ এই দুই জন এই অংশের ইজারাদার এবং বর্ত্তমানে ইহারাই সম্পত্তির পরিচালন ও শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন। এই মহালের রাজস্ব কাসীমআলী খাঁর সময়ে ২৬৮৫৯৲ টাকা ছিল, তৎপর বিভিন্ন সময়ে বৃদ্ধি হয়। ১১৭৯সনে জমা বৃদ্ধি হইলে মালীকগণ বৃদ্ধিহারে রাজস্বদানে অস্বীকার করায় মহাল ভিকন ঠাকুরের নিকট, তাহার পুত্রের নামে পাঁচ বৎসর ম্যাদে ইজারা প্রদত্ত হয়। পাঁচ বৎসর পরে মালীকগণ ধৃত হারে রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত হইলে তাঁহাদিগকে দেওয়া যায়। তাঁহারা ১১৮৭ সনে মিঃ সেক্সপিয়ারের নিকট হইতে ৪০৯৯৲ টাকা রাজস্ব কমাইয়া লন। পরবৎসর পুনরায় মিঃ জন সোর রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন। বর্ত্তমান বন্দোবস্তে ভূমির উৎপাদিকাশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মিঃ জন সোরের ধৃত রাজস্বই স্থির রহিল।

শ্যামচান্দ রুদ্রচান্দ ঋণ গ্রস্ত। রাজস্ব গ্রহণের পক্ষে বিশেষ রকম উপায় অবলম্বন না করিলে পরিশেষে গবর্ণমেন্টকে নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

(২) মমিনসিং—হিঃ চারি আনা, রাজস্ব ২৯৭৫০৲। এই মহাল ১৮৮৪ সন হইতে রতনমালা ও নারায়ণী (দেব্যা)র নামে লিখা যায়। ইহারা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কিশোর রায়ের পত্নী। কিশোর নিঃ সন্তান পরলোক গমন করিলে তাঁহার বিধবা পত্নীদ্বয় মহাল প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে রতনমালার মৃত্যু হইলে নারায়ণী সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করেন। ইহাতেই বর্ত্তমান বিবাদের সৃষ্টি। বিধবার সম্মতি ক্রমে এই মহালের সরকারী রাজস্ব জন্য শ্যামচান্দ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই তরফের মফস্বলের প্রধান কর্ম্মচারী উদয় নারায়ণ ঘোষ ও সদানন্দ রায়। এই মহালের রাজস্ব ও পূর্ব্বোক্ত চারি আনীর ন্যায় সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছিল। উভয় অংশই সমপরিমাণে ঋণগ্রস্ত। ভূমির উৎপাদিকা শক্তিও অনুরূপ মিঃ সোরের ধৃত রাজস্ব স্থির রহিল।

(৩) মমিনসিং—হিঃ চারি আনা, রাজস্ব ২৯৩৫০৲। এই অংশের মালীক যুগল রায়। ইনি মৃত কৃষ্ণগোপাল রায়ের দত্তক পুত্র। পূর্ব্বোক্ত অংশদ্বয়ের ন্যায় এই মহালের খাজানা হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে। মিঃ সোরের ধৃত রাজস্বই স্থির রহিল। যুগল রায় নিজেই নিজ হিস্যার সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও সুনিয়মে খাজানা প্রদান প্রভৃতি কর্ত্তব্য নিপুণতার জন্য শ্যামচান্দ ও রুদ্রচান্দ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে সুযোগ প্রাপ্ত হন না। ইহাদিগের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সর্ব্বদা চলিতেছে। এমন কি রেভিনিউ বোর্ডও ইহাদিগের নালিশ শুনিয়া শুনিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। রতনমালার মৃত্যুর পর নারায়ণীর সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণই এই কলহের কারণ।

(৪) মমিনসিং—হিঃ চারি আনা, রাজস্ব ২৯৩৫১৲। এই অংশ শ্রীকৃষ্ণের ২য় পুত্র গঙ্গানারায়ণের দত্তক পুত্র হরনাথের। হরনাথই এই পারিবারিক বিবাদের প্রধান কারণ। ইনি প্রথমে শ্যামচান্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে যে রূপে রতনমালা ও নারায়ণীর অংশের সহিত যুগল রায়ের অংশ একত্র শাসিত হইত সেইরূপ হরনাথ এবং শ্যামচান্দের অংশও একত্র পরিচালিত হইতে ছিল। সময়ে উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের উপর অসন্তুষ্ট হয়। হরনাথের অপ্রাপ্ত বয়ক্রম হেতু সুবিধা পাইয়া এবং বিহিত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সহিত দত্তক গৃহীত হয় নাই এই চলিত অপবাদ মূলে প্রলুব্ধ হইয়া শ্যামচান্দ শিশু হরনাথকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইলেন অপর পক্ষে যুগল রায় ও এই সময়ে রতনমালা ও নারায়ণীর মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিলেন। বিধবাদ্বয় শ্যামচান্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন ও তাহাদের স্ব স্ব

হিস্যা পৃথক করিয়া নেন হরনাথ ও যুগল রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজ সম্পত্তি নিরাপদে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। মহালের পূর্ব্বজমা স্থির রহিল;

(৫) আলেপাসং—হিস্যা আট আনা, রাজস্ব ৩৫০০০৲ টাকা। এই মহাল শ্যামকিশোর ও চন্দ্রকিশোর আচার্য্যের রক্ষণাবেক্ষণে পরিচালিত হইতেছে। এই আট আনা হিস্যার অৰ্দ্ধেক চার আনা উভয়ের নিজ ও অপর চারি আনা কৃষ্ণকান্তের বিধবা পত্নী গঙ্গা দেব্যার। এই জমিদারী বিষণরাম আচার্য্যের নামে লিখিত ছিল। মিঃ ডানকাণের ডিক্রীক্রমে গঙ্গা দেব্যার নাম তাহাতে ভুক্ত হয়। কামটী অব সার্কুট পাঁচ বৎসরের জন্য এই মহালের ৪০৬১২৮১ গণ্ডা বার্ষিক রাজস্ব ধার্য্য করেন। ১১৮৪ সনে ও তৎপরবর্ত্তী দুই বৎসরে রাজস্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৩০৬০০৲ টাকা ধার্য্য হয়। মিঃ সোর পরবৎসর ৪৪০০৲ বৃদ্ধি করিয়া দেন। বর্ত্তমান বন্দোবস্তে তাহাই স্থির রহিল।

(৬) আলেপাসং—হিস্যা চার আনা, রাজস্ব ১৭১০০৲ টাকা। এই হিস্যার মালীক রুদ্ররাম আচার্য্য ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, রুদ্ররাম মহালের শাসন সংরক্ষণ করেন। কাসেমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ১৭৩৪০৷৵৫৷ কড়া ছিল। রেজা খাঁ রাজস্ব হ্রাস করেন। অতঃপর মিঃ মিডল্টন বৃদ্ধি করিয়া ১৮৩৯১৷৴১১ গণ্ডা ধার্য্য করেন। কমিটী অব সার্কুট আরও বৃদ্ধি করিয়া, ২০১২৫৷৴ করেন। এই জমা পাঁচ বৎসর স্থির থাকে। ১১৮৪ সনে মিঃ রাউস এই জমা হ্রাস করেন। মিঃ সেরাপিয়ার ইহা অপেক্ষাও হ্রাস করেন, অতঃপর মিঃ হলেণ্ডের সময় আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ১৪৭০০৲ টাকা ধার্য্য হয়। মিঃ সোর এর উপর ২৩০০৲ টাকা বৃদ্ধি করেন। এই জমাই স্থির রহিল। বন্য হস্তীর অত্যাচারে ও সন্ন্যাসীদিগের-দ্বারা বহুতর ক্ষতি হওয়ায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর এইরূপ রাজস্ব হ্রাস করা হইয়াছিল।

(৭) আলেপাসং—হিস্যা চার আনা, রাজস্ব ১৭৫০০৲ টাকা। এই অংশের মালীক রঘুনন্দন। অপর ৵০ আনা হইতে এই অংশ ৩,৪ বৎসর বাবৎ পৃথক করা হইয়াছে। রঘুনন্দন উপযুক্ত লোক; রীতিমত খাজানা চালাইতেছেন। শ্যামকিশোর ও চন্দ্রকিশোর ইহার পৈত্রিক অনেক বিষয় হস্তগত করায়, অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইনি তাহাদের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছেন। এই অংশের খাজানা মহম্মদ রেজা খাঁর সময়ে নিজ নজরানা ৭৯৭৵১ গণ্ডা ব্যতীত ১৫৮৫২৮৬৷ কড়া ছিল। মিঃ মিডল্টন বৃদ্ধি করিয়া ১৮৩৯৮৵৫ গণ্ডা করেন, কমিটী অব সার্কুট আরও বৃদ্ধি করিয়া ২০৩ ৶৴৪ গণ্ডা ধার্য্যে এই অংশ শ্যামকিশোর ও চন্দ্রকিশোর আচার্য্যের সহিত ৫ বৎসরের জন্য

বন্দোবস্ত করেন। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত হিস্যার জমা হ্রাসের কারণ অনুসারে ৫০০৬/৪ গণ্ডা জমা হ্রাস হইয়া ১৫৩০০৲ টাকা ধার্য্য হয়। অতঃপর মিঃ সোর ২২০০৲ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেন। বর্ত্তমানে তাহাই স্থির রহিল।

(৮) সুসঙ্গ—হিস্যা ৸৵০ আনা, রাজস্ব ২৬০৪৬৲। রাজা রাজসিংহ এই জমিদারীর মালীক। এই জমিদারী বহু বিস্তৃত হইলেও অধিকাংশই পর্ব্বত ও জঙ্গলময়, বহু অর্থব্যয়েও আবাদের অযোগ্য। কোচ, গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি, প্রজা। ইহারা সময় সময় জমিদারের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়া ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটায়। রাজসিংহকে এই সকল বিদ্রোহ দমন করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি একটা হাটের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সহিত আপোষ বন্দোবস্ত হইয়াছে। বৎসরে ৭।৮ দিন ইহারা ঐ হাটে আসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী জিনিষ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। পার্ব্বত্য প্রজারা, কার্পাস, হস্তীদন্ত, হরিণ, কস্তূরী প্রভৃতি বিনিময়ার্থ লইয়া আসে ও তৎ বিনিময়ে কুকুর, বিড়াল, সরাপ ও লবণ প্রভৃতি লইয়া যায়। রাজা এই বাজারে যে মাশুল প্রাপ্ত হন তাহাদ্বারাই জমিদারীর সরকারী রাজস্ব আদায় হইতে পারে। সুসঙ্গ জমিদারীর খাজানাদ্বারা রাজস্ব চালান সম্ভবপর নহে। সুসঙ্গের যে জমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ তাহা আবাদ হইলে তাহা হইতে এক লক্ষ টাকা সরকারী রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ আয় হইত। যাহাই হউক রাজসিংহের ন্যায় একজন কর্ম্মঠ, সৎসাহসী ও বিচক্ষণ বহুদর্শী লোকের হস্তে মহালের প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কাসেমআলী খাঁ এই হিস্যার রাজস্ব ২৮৭০৩৵১২ গণ্ডা ধার্য্য করিয়াছিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ জমা হ্রাস করিয়া ১৭৮০০৲ টাকা ও নিজ নজরানা ১২৮০৲ টাকা, মোট ১৯০০০৲ টাকা ধার্য্য করেন। অতঃপর মিঃ মিডেল্টন এবং তাহার পর কমিটী অব সার্কিট ক্রমে রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া ২৩৩৩৪৶ আনা ধার্য্য করেন। পুনরায় মিঃ রাউস ১০০০৲ টাকা ও মিঃ সেক্সপিয়র ১৪৮২৲ টাকা কমাইয়া দেন। এর পর রাজস্ব ৯৬৭০৲ টাকা বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধিহারে জমিদার রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিলে জমিদারী রুকন নদ্দী (Rucun nuaddy ?) নামক কোন ব্যক্তির নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইজারা প্রদত্ত হয়। ইজারাদার রাজস্ব পরিচালনে অসমর্থ হওয়ায় ১১৮৯ সনে ৪৫৭৬৲ টাকা রাজস্ব হ্রাস করিয়া জমিদারী পূর্ব্ব মালীককে প্রদান করা হয়। তিনি রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে সেই রাজস্বই স্থির রহিল।

(৯) সুসঙ্গ—হিস্যা ৵০ আনা, রাজস্ব ২৯৭৭৲। এই অংশ রাজসিংহের

পিতামহ তদীয় কন্যাকে বৈবাহিক উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন। ঐ কন্যাকে হররাম সিংহ বিবাহ করেন। তাঁহার পৌত্রেরা বর্ত্তমান মালীক। বিগত বর্ষে বড় পৌত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারা মহাল রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। জমা ভূমির উৎপাদিকাশক্তির পরিমাণ রহিল।

(১০) কিসমত সুসঙ্গ—রাজস্ব ৩৫৩৲। এই মহাল সুসঙ্গের ৵০ আনা হইতে বহু পূর্ব্বের খারিজ। ইহার মালীক রামকান্ত সিংহ। কমিটী অব সার্কুট ইহার খাজানা ৩৫২৲ টাকা ধার্য্য করেন। এরপর ক্রমে দুইবার হ্রাস হইয়া রাজস্ব ২৯৭৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১১৮৮ সনে পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমান জমা ধার্য্য হয়। বর্ত্তমানে ঐ জমাই স্থির রহিল।

(১১) তালুক লক্ষীবারদি—রাজস্ব ৩০১৲ টাকা। সুসঙ্গের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বনভূমি। পূর্ব্বে ইহা সুসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজেদর ও দীনমণি চান্দ (Rajeder DunaManny Chand) এই ভূমি আলাদ করিয়া পৃথক বন্দোবস্ত করেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের পাঁচজন উত্তরাধিকারীর সহিত বন্দোবস্ত হইল।

(১২) কুড়িখাই—রাজস্ব ১০০০০৲ টাকা। মহম্মদ ঘশি এই মহালের মালীক। কাশীমআলী খাঁর সময়ে ইহার রাজস্ব ৮৯৩২॥৵১৪ গণ্ডা ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ ইহার উপর নিজ নজরানা ৪০২॥৴ আনা নির্দ্দিষ্ট করেন। অতঃপর মিঃ মিড্লটন ২৫৯৮৫ গণ্ডা বৃদ্ধি করিয়া দেন, কমিটী অব সার্কুট আরও বৃদ্ধি করিয়া ১০৭৮৪॥৯ গণ্ডা ধার্য্য করেন। এই জমা পাঁচ বৎসর স্থির থাকে। পাঁচ বৎসর পরে হ্রাস হইয়া ৯৩৩৬৲ টাকা ধার্য্য হয়। মিঃ সোর পুনরায় ৩৫০০৲ টাকা বৃদ্ধি করেন। এই হারে রাজস্ব প্রদান করিতে মালীক অসমর্থ হইলে ১১৮৯ সনে ২৫০০৲ টাকা হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। মহম্মদ ঘশি উপযুক্ত ও বহুদর্শী ছিলেন, হইলেও ঋণজালে বড়ই জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জল প্লাবনে মহালের ও প্রজা সাধারণের বহু ক্ষতি হওয়ায় বর্ত্তমানে ৩৩৬৲ টাকা রাজস্ব হ্রাস করিয়া বন্দোবস্ত করা হইল।

(১৩) হাজরাদী—হিস্যা ।৵০ আনা, রাজস্ব ১০৬০০৲। মৃত আছালত খাঁর বংশধরগণ এই মহালের মালীক। মালীকগণ ১১৮১ সনে এই মহালের অর্দ্ধ হিস্যা, মির্জ্জা হোসেনউদ্দিন নিকট বিক্রয় করেন এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক অংশ তাঁহারই নিকট নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রেহাণদায়ে আবদ্ধ রাখেন। বিগত তিন বৎসর হইল রেহাণের ম্যাদ অতীত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও চৌধুরিগণ দাবীর টাকা পরিশোধ করিতে সমর্থ না হওয়ায় মহাল রেহাণদার হোসেনউদ্দিনের অধীনেই

শাসিত হইতেছে। হোসেন মহাল ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায়ে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দেওয়ানী আদালত মির্জ্জার পক্ষে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার ডিক্রী দেন। এ দিকে প্রতিপক্ষ চৌধুরীগণও ওয়াশীলাতের দাবীতে অপর এক নালীশ উপস্থিত করেন। অতঃপর ওয়াশীলাতের ঋণ কর্ত্তন হইলে মহাল মুক্ত হইবে এই আদেশ হইয়াছে। বন্য হস্তীর উপদ্রবে মহাল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব রাজস্বই স্থির রহিল।

(আগামীবারে সমাপ্য)।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।



মাতৃপূজা।

(সঙ্গীত)

অনন্ত সম্পদশালিনী—কাঙ্গালিনী,
　　গাহ জননীর নাম।
সুভাষিণী বিনোদিনী—বিষাদিনী,
　　গাহ জননীর নাম।
চিরশুভকরী, বরাভয়করী,
　　অন্নদা আনন্দধাম।
কল্যাণকারিণী, করুণারূপিনী,
মোক্ষবিধায়িনী—সাধ প্রাণায়াম।
পূর্ণকর, পূর্ণকর মা, মনস্কাম।
জয় জননী, জয় জননী, গাহ অবিরাম।

কবিকূজিতকুঞ্জরাণী, বীণাপাণি,
　　গাহ জননীর নাম ।
রম্য সৌধকিরীটিনী, মণিখনি,
　　কমলার কাম্য ধাম ।
মলয়সেবিতা, শস্যশোভিতা,
　　রসালবকুলশ্যাম !
নির্ম্মলসলিলা, কুসুমকুন্তলা,
　　রবীন্দুউজ্জ্বলা, চির অভিরাম ।
পূর্ণকর, পূর্ণকর মা, মনস্কাম ।
জয় জননী, জয় জননী, গাহ অভিরাম ॥

শ্রীমনোমোহন সেন ।

নির্ভর ।

আহ্বান তব　　শুনিয়া অমনি
　　তোমারে স্মরি'
গৃহ ছাড়ি' আসি'　　অজানা নদীতে
　　ভাসানু তরী ।
নির্ভয় মনে　　অনুকূল বায়ে
　　তুলিয়া পাল
বাহিয়াছি তরী ;　　তুমি ছিলে নাথ
　　ধরিয়া হাল ।

আজি নদী জলে　　ভীম তরঙ্গ
　　উঠেছে জেগে,
রহিয়া রহিয়া　　ক্ষিপ্ত পবন
　　বহিছে বেগে ।
তীর নাহি হেরি,　　টলমল করে
　　জীর্ণ তরী,
ভয় কি আমার,　　তুমি আছ দেব !
　　কর্ণ ধরি' ।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ ।

অদৃষ্ট।

কে বুঝে অদৃষ্টগতি কি লেখা তাহার,
ছার মানবের শক্তি নাহি বুঝিবার।
যদি রে মানবগণে
বুঝিত গো কোন জনে,
অদৃষ্ট অদৃশ্য কভু রহিত না আর।
জ্ঞানের সাগর মথি,
কভু কোন জ্ঞানী যদি
বুঝিতে পারিত সেই অক্ষর তাহার,
অন্ধের নয়ন আগে
মরীচিকা আলো জাগে,
কেহ না পড়িত ভ্রমে মৃগ তৃষ্ণিকার।
কে বুঝেছে এই ভবে
পরে কোথা কি যে হবে।
কে মুছাবে রেখা এক, এ মায়া খেলার ?
কত জ্ঞান, কত তত্ত্ব,
কত শিক্ষা কত সত্য,
তন্ন তন্ন খুঁজে সবে কল্পনা মাঝার।
কল্পনা যে শুধু ছায়া
কবির কল্পিত মায়া,
সত্য নিরূপণ কোথা, মাঝখানে তার ?
আমি এ কল্পনা-বনে
বৃথা অদৃষ্টের সনে,
খুঁজে মরি বাক্য রাশি, হেরি চারিধার।
আজ মুহূর্ত্তের পরে
এই জীবনের তীরে,
কি তরঙ্গ আসিবেক, কি তুফান তার।
প্রত্যেক তরঙ্গে রঙ্গে
এই জীবনের সঙ্গে,

আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, অসংখ্য অপার।
প্রতি হিল্লোলের ভরে
কোথায় গেছেছি দূরে,
কে জানে কোথায় তল, কিনারা তাহার।
অদৃষ্ট অদৃষ্ট বলি
অন্ধ পথ বেয়ে চলি,
কোথা আলো, কোথা দিক্ সম্মুখে আমার।
এই অন্ধকার কালো,
ওগো জগতের আলো,
ঢাল জ্যোতি জ্যোতির্ম্ময় সহস্র ধারার!
অন্ধেরে নয়ন দিয়া
দাও পথ দেখাইয়া,
অদৃষ্ট ঘটনা সবি তোমার খেলার।
জ্ঞান তত্ত্ব যাক্ দূরে,
মোহ মুগ্ধ হৃদি পুরে,
মায়াময় থাক জেগে, ছায়ায় মায়ার।
কিছুই না রবে ভবে,
জলে জল বিম্ব যাবে,
ক্ষুদ্র কণা মিলাইবে চরণে তোমার।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বিরহে।

তব হাসে ফুটিত কুসুম রাশি
রঞ্জিত চারু অধরে।
তব ভাষে বাজিত শতেক বীণা,
কত কি মধুর ঝঙ্কারে।
তব মানে ঝরিত মুকুতা-মালা,
বিলোল নীল নয়নে।
তব রাগে রঞ্জিত রম্য কপোল,
বিকচ কমল কিরণে।

তব কটাক্ষে হাসিত বিজলী দাম,
কজ্জল-ঘন উজলি।
তব বেণী দিননে নাগিনী যেন,
নাচিত উছলি উছলি।
তব গ্রীবা হেলনে মরালী যেন
চাহিত আপনা পাসরি।
তব গমনে গুঞ্জত চরণ তলে
শতেক ভ্রমর ভ্রমরী।
তব প্রেম সোহাগে বসন্ত জাগিত,
হৃদয় কুঞ্জ মাঝারে।
তুমি রয়েছ সেথা আদরে সোহাগে,
আমি যে হেথা আঁধারে।

শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী।

কবিতা।

রজতের টিপ্ ভালে নিথর যামিনী,
আজি কে আনিছে আশা,—আধ অচেতন;
নীল নিকুঞ্জের মাঝে উজলি' অবনী,
ফুটেছে তারার ফুল, চারু অগণন।
হে মম অন্তর-লক্ষ্মী—কবিতা-সুন্দরি!
জাগ—জাগ; অই শুন স্বরগ-দুয়ারে,
জ্যোতির্ম্ময়ী দেব-বালা, সহ সহচরী,
ডাকিছে তোমায় সতি! মধুমাখা স্বরে!
ললিত-লাবণ্য-ভরা কম কলেবর,—
রাগিণীর রাণী তুমি,—কেন অচেতন?
জাগ এবে, ব'য়ে যায় যামিনী নিথর,
মন্দিরা পিয়াসী বসি' দ্বারে এক জন।
নির্ম্মল নির্ম্মাল্য তব অতুল ভূতলে,
দাও শিরে,—হে সুন্দরি! দাও আজি তু'লে।

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

"দেশের কথা।" প্রথম ভাগ। শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত।
আমরা এই গ্রন্থখানা সমালোচনার জন্য উপহার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। সখারাম বাবু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত। আমাদের মাতৃভাষা ভিন্ন প্রদেশীয় লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন এবং ভিন্ন প্রদেশীয় হইয়াও দেউস্কর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার অর্চ্চনায় সফলকাম হইয়াছেন, ইহা সেব্য সেবক উভয়ের পক্ষেই গৌরবের কথা।

"দেশের কথা"য় শিক্ষনীয় বিষয় অনেক আছে। "আমাদের দেশ" বলিলে আমরা সংকীর্ণমনা বাঙ্গালী বুঝি, নিজের জেলা টুকু কি বড় জোর সমগ্র বাঙ্গালা প্রদেশটী; কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসী সখারাম বুঝেন 'সমুদ্র-বলয়াঙ্কিতা, হিমাদ্রিকৃত-শেখরা ভারতভূমি'। ইহাই এ গ্রন্থের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষা। গ্রন্থপত্র যত উদ্ঘাটন করা যায় ততই নূতন নূতন বিষয় নয়ন-মনের গোচরীভূত হয়। সখারাম বাবু বড় শুভক্ষণেই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার "বাজীরাও" "মহামতি রাণাড়ে" প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে, "দেশের কথা"য় বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীকেও উর্দ্ধে উত্তোলন করিবে। স্বর্ণ লেখনী উপহার, প্রকৃতই যদি সুনিপুণ, নির্ভীক, স্বদেশবৎসল ও শ্রমশীল সাহিত্যসেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় হয়, তবে আমরা সর্ব্বাগ্রে এই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সখারামের হস্তে স্বর্ণ-লেখনী দেখিতে ইচ্ছা করি।

"দেশের কথা"য় 'ইংরাজ শাসনের দোষ-গুণ,' 'দেশের অবস্থা,' 'মানসিক-অবনতি,' 'কৃষকের সর্ব্বনাশ,' 'রেল ও খাল,' 'দেশীয় শিল্পের ধ্বংশ' ও 'দেশের আয় ব্যয়' ইত্যাদি প্রসঙ্গে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। সরকারী কাগজপত্র, বিবিধ গোপনীয় চিঠিপত্র, বিভিন্ন গ্রন্থ ও সংবাদপত্রের উক্তি এবং দেশীয় ও বিদেশীয় মহাপুরুষবচনসংগ্রহব্যাপারে গ্রন্থকার অত্যদ্ভুত শ্রমশীলতা ও সংগ্রহ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা মার্জ্জিত, মধুর ও প্রাঞ্জল। তাঁহার লিপিকুশলতা ও বিচার-ক্ষমতা প্রশংসনীয়। তাঁহার দেশহিতৈষিতা ও সৎসাহসিকতা বাঙ্গালী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

ইংরাজ-শাসনের দোষ-গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সখারাম লিখিয়াছেন, "ইংরাজের অনেক গুণ নীতিবাদীর চক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু পররাষ্ট্রবিজয় ও সাম্রাজ্য রক্ষা কার্য্যে সে সকল গুণের আবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করিতে

পারিবেন না। ইংরাজের সাহায্যে যদি আমরা সেই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারি, তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই ত্রিশ কোটি বুদ্ধিমান্ শ্রমশীল ও মিতাচার সম্পন্ন জাতির দুঃসাধ্য কার্য্য বোধ হয় জগতে আর কিছু থাকিবে না"। কথাটা বুঝিলাম না। যাহা নীতি-শাস্ত্রের অনুমোদিত তাহাই গুণ; যাহা তাহার অননুমোদিত তাহাই দোষ, এইত বুঝি। সুতরাং যাহা নীতিবাদীর চক্ষে দূষণীয় তাহার আশ্রয়ে অসাধ্য-সাধনের শক্তি-সঞ্চয় কি সম্ভবপর? এবং তাহা কি প্রার্থনীয়? দেউস্কর মহাশয় সে গুণ সমূহের নাম করিলে, আমাদের আলোচনার সুবিধা হইত।

গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন "জাতীয় মহাসমিতির আরব্ধ কার্য্যের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে দেশের কথা প্রচারিত হইল"। তাঁহার গ্রন্থখানা সে সাধু কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। "দেশের কথা"র মূল্য বুঝিতে হইলে উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করা আবশ্যক। আমরা আশা করি শিক্ষিত বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে "দেশের কথা" সাদরে গৃহীত এবং ধর্ম্ম-গ্রন্থের ন্যায় নিত্য পঠিত হইবে।

শিশুতোষ। শ্রীমনোমোহন সেন বিরচিত। বই খানা কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অবলম্বনে, প্রথম শিক্ষার্থিগণের জন্য লিখিত। শিশুশিক্ষার জন্য লিখিত হইলেও আমরা গ্রন্থখানা ৩। ৪ বার পাঠ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি নাই। প্রথম শিক্ষার্থিগণের জন্য এ পর্য্যন্ত যতগুলি পুস্তক লিখিত হইয়াছে, বিষয়-সংস্থান ও রচনালালিত্যে এ খানি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। গ্রন্থখানা ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে মনোমোহন বাবুর লিপিনৈপুণ্য, শব্দ-নির্ব্বাচন-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এ স্থলে দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—

ঐ কার যোগ—তিল হ'তে তৈল হয় দুধে হয় দৈ।
ধানেতে তৈয়ার হয় মুড়ি চিড়া খৈ।

রং—সবুজ বরণ ঘাস পাতা লাল শিমুল ফুল।
হলুদ বরণ পাকা কলা কালো মাথার চুল।
সাদা ধব্ ধব্ দুধ দধি নীল আকাশ খানি।
জরদ রং কমলালেবু আমরা সবে জানি।
বেগুনী রং বেগুনগুলি ঝুল্‌ছে গাছে গাছে।
জানব যখন বড় হব আর যে সব রং আছে।

গ্রন্থকার শিশুদিগের শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ই এইরূপ সরল ও মধুর কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শিশুতোষের গদ্যাংশও বেশ মনোরম হইয়াছে। গ্রন্থখানার ১ম ও ২য় দুই ভাগই একত্র সংযোজিত, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

শিশুতোষ শিশু-পাঠ্য-শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইলে আমরা সন্তোষ লাভ করিব।

মানসিংহ। শ্রীযুক্ত সেখ ফজলল করিম প্রণীত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে অম্বররাজ রাজপূত-বীর মানসিংহের জীবনী বিবৃত হইয়াছে। আমরা "মানসিংহ" পড়িয়া সুখী হইয়াছি। ফজলল করিম এক জন প্রতিষ্ঠাবান্ লেখক তাহাতে সন্দেহ নাই; তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী, লিখিবার কায়দা প্রশংসনীয়। "মানসিংহ" পড়িতে পড়িতে মনে হয় কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দু লেখকের লেখা পড়িয়া যাইতেছি।

শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা মানসিংহ যে সকল রাজপূত-রাজার বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন, হিন্দুর নিকট তাঁহারা দেবতাসদৃশ পূজ্যপাদ। সুতরাং তাঁহাদিগকে "বিড়াল-তপস্বী" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত না করিলেই ছিল ভাল। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ভিন্ন এ দুর্ভাগ্য দেশের দুর্দ্দিন অপনীত হইবে না। যাহাতে একের ব্যবহারে অন্যে ক্ষুব্ধ কি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হন, তৎপ্রতি পরস্পরের দৃষ্টি থাকা প্রার্থনীয়। গ্রন্থখানায় বর্ণাশুদ্ধির আধিক্য দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

খাজা মইনউদ্দিন চিস্তী। ইহাও উক্ত ফজলল করিম সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত মইনউদ্দিন নামধেয় জনৈক মুসলমান-মহর্ষির জীবন-চরিত। ইহাতে খাজা সাহেবের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ দক্ষতা সহকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানা ধর্ম্ম-বিশ্বাসী মুসলমান ভ্রাতাগণের আনন্দ বিধান করিতে পারে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী প্রণীত "অশোকা" ও "হাসি ও অশ্রু"। শ্রীযুক্ত মৌলবী ওসমানআলী বি, এল প্রণীত "আলোকসভা"। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বোধন"। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন প্রণীত "স্বাস্থ্যসহায়"। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত "পদ্য-প্রসূন"। শ্রীযুক্ত লালমোহন সাহা শঙ্খনিধির "ময়মনসিংহের সারস্বত পঞ্জিকা" আমরা সমালোচনার জন্য উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। "আরতি"তে ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

পঞ্চম বর্ষ। তৃতীয় সংখ্যা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত।

—— •:(*):• ——

লেখকগণের নাম।

শ্রীমন্মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি. এ., শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর, শ্রীরেবতীমোহন গুহ এম্. এ. বি. এল., শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ, সম্পাদক।

ময়মনসিংহ সুহৃদ্ যন্ত্রালয় হইতে
শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত কর্তৃক
প্রকাশিত।

চৈত্র, ১৩১১।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

সূচী।

নিবেদন।

ময়মনসিংহ কৃষি-শিল্প-সাহিত্য প্রদর্শনীর অতিরিক্ত কার্য্য বাহুল্যে "আরতি" প্রকাশে বিলম্ব হইল। বৈশাখ সংখ্যা যন্ত্রস্থ। ঐ সংখ্যা সারস্বত সংখ্যা নামে বাহির হইবে। এই সারস্বত সংখ্যা "আরতি"তে সারস্বত কবিতা, পুরস্কার প্রাপ্ত সারস্বত প্রবন্ধ—"ময়মনসিংহের প্রাচীন ও বর্ত্তমান সম্পদ", সারস্বত সাহিত্য বা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের বিবরণ, সারস্বত কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী প্রভৃতি প্রবন্ধ থাকিবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা "আরতি"র জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রেস ও সরঞ্জাম ইত্যাদি আনয়ন করিয়াছি সম্প্রতি আরও টাইপ ইত্যাদি আনাইতে হইবে। গ্রাহকগণের অনুকম্পা ও সহানুভূতির উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। যাঁহারা এখন পর্য্যন্ত "আরতি"র মূল্য প্রদান করেন নাই আশা করি তাঁহারা এই সংখ্যা প্রাপ্তি মাত্র স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্য প্রদানে আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। যাঁহারা মূল্য পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীবিশ্বেশ্বর পণ্ডিত

ম্যানেজার

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, চৈত্র ১৩১১। | তৃতীয় সংখ্যা।

গো-দুগ্ধ।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, এই পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী (mammalia) জীব মাত্রের শৈশবকালে এবং মানবের পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় এমন কি খাদ্য আছে, যাহাতে একাধারে সমস্ত পুষ্টিকর ও উপাদেয় পদার্থ বিদ্যমান? তদুত্তরে বোধ হয় নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যায় যে, তাহা দুগ্ধ। ফলতঃ একমাত্র দুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়াই জীবন ধারণ করা যাইতে পারে; এ কথা অলীক বা অত্যুক্তি নহে। কি বাল্যে, কি বার্দ্ধক্যে, কি সুস্থাবস্থায়, কি রুগ্নাবস্থায়, দুগ্ধের ন্যায় পরম হিতকারী ও সুখসেব্য পদার্থ আর নাই। মাতৃস্তন্য ত্যাগের পর মানবের পক্ষে যে সমস্ত প্রাণিজ দুগ্ধ ব্যবহার্য্য, তন্মধ্যে গো-দুগ্ধই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

চরক সংহিতায় গো-দুগ্ধের গুণ এই প্রকার কথিত হইয়াছে; যথা:—

"স্বাদুশীতং মৃদুস্নিগ্ধং বহলং শ্লক্ষ পিচ্ছিলং
গুরুমন্দং প্রসন্নঞ্চ গব্যং দশগুণং পয়ঃ।
তদেবং গুণমেবৌজঃ সামান্যাদভিবর্দ্ধয়েৎ॥"

অর্থাৎ—মধুর রস, শীতবীর্য্য, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঘন, শ্লক্ষ (সূক্ষ্ম), পিচ্ছিল, গুরুমন্দ (অতীক্ষ্ণ) ও নির্ম্মল। গব্য-দুগ্ধ এই দশ গুণ বিশিষ্ট। ওজঃ পদার্থও এই দশটী গুণান্বিত, অতএব গুণ তুল্যতা হেতু গো-দুগ্ধ ওজো ধাতু বর্দ্ধক।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে:—

"গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রস পাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্র নাশনম্॥
দোষ ধাতু মলস্রোতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেদকরং গুরু।
জরা সমস্ত রোগাণাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা॥"

তাৎপর্য্যার্থ—গো-দুগ্ধ বিশেষ মধুর রস ও মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, স্তন্য-জনক (দুগ্ধ বর্দ্ধক), স্নিগ্ধ, বাতপিত্তনাশক, রক্তপিত্তরোগ নিবারক, দোষ, ধাতু, মল, ও স্রোতঃ সমূহের কিঞ্চিৎ ক্লেদজনক, গুরুপাক এবং ইহা নিত্য সেবনে জরা ও সমস্ত পীড়া প্রশমিত হয়। অষ্টাঙ্গ হৃদয়, সুশ্রুত সংহিতা, নিঘণ্টু ও অত্রি সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থেও গো-দুগ্ধের গুণ বিশেষভাবে বর্ণিত আছে, বাহুল্য বোধে এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

দেশ ও জাতিভেদে দুগ্ধের গুণাদির ইতর বিশেষ।

দেশভেদে এবং গাভীর জাতি ও অবস্থাভেদে দুগ্ধের গুণ ও পরিমাণের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়; এক জাতীয় গাভীরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দুগ্ধের গুণাদির ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গাভীর মধ্যে (১) হিঁসারী (পঞ্জাব দেশীয়) (২) কাটেবারী (গুজরাট ও কচ্ছ দেশীয়) (৩) পেলোরী (মান্দ্রাজ দেশীয়) (৪) গুরগুরিয়া (মুলতান দেশীয়) এবং (৫) নগোরী (নাগপুর ও মধ্য ভারতের) গাভী উৎকৃষ্ট; এ গুলির মধ্যে আবার হিঁসারী ও কাটেবারী গাভীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের এক একটী গাভী ৮০ তোলা পরিমাণ সেরের ১০ হইতে ১৫।১৬ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে, ইহাদের দুগ্ধ সুস্বাদু এবং সদ্‌গুণ বিশিষ্ট।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত গাভী অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশীয় গাভীর দুগ্ধে অধিক নবনীত ও ছানা থাকে।

নিম্নদেশ ও জলাকীর্ণ ভূমিতে বিচরণশীল গাভীর দুগ্ধে জলীয়ভাগ অধিক এবং নবনীত ও শর্করার ভাগ কম থাকে; আর উচ্চ ও শুষ্কভূমি এবং পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে বিচরণশীল গাভীর দুগ্ধে জলীয়ভাগ কম থাকে এবং পূর্ব্ব কথিত উপাদান গুলি (নবনীত ও ছানা প্রভৃতি) অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে।

যে সকল গাভী ক্ষুদ্রকায়, ব্যায়ামশীলা (চরিয়া বেড়ায়), যত্ন-পালিতা ও সুস্থদেহ বিশিষ্টা তাহাদের দুগ্ধ পরিমাণে অল্প হইলেও অধিকগুণ বিশিষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বদা বদ্ধাবস্থায় থাকিলে গাভীর দুগ্ধ তত সুস্বাদু হয় না। কোন কোন পাশ্চাত্য গো-পালক বলেন যে, বদ্ধাবস্থায় রক্ষিত গাভীর দুগ্ধ উৎকৃষ্ট, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা ঠিক নহে; গাভীকে মধ্যে মধ্যে মাঠে চরিয়া বেড়াইতে দেওয়া উচিত, ইহাতে তাহার স্বাস্থ্যও রক্ষিত হয় এবং দুগ্ধ সুস্বাদু ও উপাদেয় হয়।

প্রথম প্রসূতা গাভীর দুগ্ধে নবনীত অল্প এবং জলীয়ভাগ অধিক থাকে, কিন্তু

তাহার দুগ্ধ শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী। দ্বিতীয়বার বৎস প্রসবের পর হইতেই গাভীর দুগ্ধ ক্রমে গাঢ় ও মিষ্ট হইতে থাকে এবং তাহাতে নবনীত প্রভৃতি সার জিনিষের আধিক্য থাকে। ৫। ৬ বৎসর বয়সেরই গাভীর দুগ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৮ বৎসর হইতেই গাভীর দৈহিক বল হ্রাস হইতে থাকে (কিন্তু এ নিয়ম সাধারণ নহে), এবং তৎসহ দুগ্ধের পরিমাণও কমিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে নবনীত ইত্যাদি বাড়িতে থাকে অথচ দুগ্ধ গাঢ় ও মিষ্ট হয়। ১২। ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্তই গাভীর দুগ্ধ ভাল থাকে, অতঃপর গুণের হ্রাস হয়। অতি বৃদ্ধা গাভীর দুগ্ধ তত ভাল নহে। গাভীর বৎস যত বড় হইতে থাকে, তাহার দুগ্ধ পরিমাণে তত কম হইতে থাকে, কিন্তু তাহাতে নবনীত প্রভৃতির পরিমাণ অধিক হইতে থাকে।

দুগ্ধ দোহন ও ব্যবহারপ্রণালী এবং পাত্রের দোষ গুণ বিচার।

গাভীকে পুনঃ পুনঃ দোহন করিলে দুগ্ধে ক্রমে নবনীতের অল্পতা হয় এবং বৎসও দুর্ব্বল হইয়া যায়. ইহাতে গাভীরও বল হানি হয়; অতএব দিবসে দুইবারের অধিক গাভী দোহন করা উচিত নহে। বৎস মাতৃ-দুগ্ধ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, গাভীর দুগ্ধ গাঢ় ও মিষ্ট হয় এবং তাহা অধিক গুণ বিশিষ্ট হয়। দোহনকালে গাভীর অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অর্থাৎ সে যাহাতে চঞ্চল, ভীত অথবা বিমনস্ক না হয় এবং দোহনকারী কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দোহনকালে বৎসকে গাভীর সম্মুখে এমন ভাবে রাখিতে হইবে যে অনায়াসে তাহাকে সস্নেহে লেহন করিতে পারে। হঠাৎ আহার্য্য ও স্থান পরিবর্ত্তনে এবং দোহনকারীর পরিবর্ত্তনে গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, দোহনের পূর্ব্বে গাভীকে কিছু খাইতে দেওয়া উচিত। দোহনের পূর্ব্বে গাভীর স্তন ও ওলান ধুইয়া নিলে ভাল হয়। প্রথম দোহনের সময় কিছু দুগ্ধ পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ ওলানে জমা দুগ্ধ অনিষ্ট-জনক হয়।

দুগ্ধ যেমন জীবনীয় পদার্থের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া ব্যবহার করিলে তেমনই অনিষ্ট-জনক হয়, এমন কি প্রাণনাশকও হইতে পারে; কারণ বায়ব্য দূষিত জীবাণু আকর্ষণ ও সম্প্রসারণ পক্ষে দুগ্ধের অসীম শক্তি আছে; মানব চক্ষুর অবিষয়ীভূত অসংখ্য সূক্ষ্ম জীবাণু বায়ু-মণ্ডলে বর্ত্তমান আছে তাহার অনেক গুলিই বিষাক্ত। অতএব গাভী দোহন করা মাত্র

পাত্রের মুখ তৎক্ষণাৎ আবৃত করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ইহাতে দুগ্ধ, ধূলি, মক্ষিকা এবং দূষিত জীবাণু হইতে রক্ষিত হইবে। দুর্গন্ধও অতি সহজে দুগ্ধে সঞ্চারিত হয়, অতএব পরিষ্কৃত স্থানেই গাভী দোহন করা সঙ্গত। গো-শালার অভ্যন্তরে গো দোহন করিলে তাহা দোহনান্তে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আনা উচিত; মল মুত্রাদিযুক্ত গো-শালাতে এবং পূতিগন্ধময় স্থানে গো দোহন না করাই শ্রেয়ঃ। বাজারে বিক্রয়ার্থ দুগ্ধ প্রায়শই অনাবৃত অবস্থায় আনীত, অতএব এই প্রকার দুগ্ধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া নেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে দুগ্ধের দূষিত জীবাণু (microbes) নষ্ট হইয়া যাইবে। ফলতঃ অগ্নির ন্যায় বিশুদ্ধকারক পদার্থ জগতে আর নাই; তাহাতেই অগ্নিকে পাবক বলা যায়। বাজার হইতে আনীত ও অনাবৃত অবস্থায় বহুক্ষণ রক্ষিত দুগ্ধ কখনও অগ্নিপক্ক না করিয়া ব্যবহার করা সঙ্গত নহে, এ বিষয়ে গৃহস্থ মাত্রেরই দৃষ্টি রাখা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

গো দোহনের জন্য মৃণ্ময়, কাষ্ঠ নির্ম্মিত, কাংস্য, কালাই করা লৌহ (Enamalled Iron) ও দস্তার পাত্রই শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে পুরাতন মেটে হাঁড়ীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গো দোহন করার পূর্ব্বে, যে কোনও প্রকার পাত্রই হউক, তাহা বেশ পরিষ্কৃত করিয়া নিতে হইবে। মাটির হাঁড়ী হইলে তাহা গরম জলে ধৌত করিয়া, অগ্নির উত্তাপে একটু উষ্ণ ও শুষ্ক করিয়া নিতে হইবে; ইহাতে পাত্রস্থিত রোগজনক জীবাণু (Pathogenecegerm) নষ্ট হইয়া যাইবে। ধাতুময় পাত্র, কোন প্রকার অম্ল পদার্থ, বালি এবং ভস্ম (ছাই) দ্বারা ঘষিয়া ফেলিলেই পরিষ্কার হয়। ধাতু পাত্রগুলি অম্ল ইত্যাদি দ্বারা ঘষিয়া পুনর্ব্বার গরম জলে ধৌত করিতে হয়। স্থূল কথা দোহনপাত্র অতি পরিষ্কৃত হওয়া চাই, তদন্যথায় দুগ্ধ অচিরে নষ্ট হইয়া যাইবে।

পাশ্চাত্য মতে কালাই করা তাম্রপাত্র (tinned copper vessel,) দুগ্ধ রক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ তাম্র পাত্রস্থিত দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া যায়, অতএব তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান এই যে :—

"তাম্র পাত্রে পয়ঃ পানং উচ্ছিষ্টে ঘৃত ভোজনং
দুগ্ধে চ লবণং দত্ত্বাৎ সদ্যো গোমাংস ভক্ষণম্" ॥

তাম্র পাত্রে দুগ্ধ পান, উচ্ছিষ্ট ঘৃত ভোজন এবং লবণ যোগে দুগ্ধ পান সদ্য গোমাংস ভক্ষণ তুল্য।

আরও কথিত হইয়াছে :—

"গব্যঞ্চ তাম্র পাত্রস্থং মদ্য তুল্যং ঘৃতং বিনা"

ঘৃত ব্যতীত অন্যান্য গব্য-পদার্থ তাম্র পাত্রস্থ হইলে মদ্য তুল্য হইয়া থাকে।

মতান্তরে কথিত হইয়াছে :—

"পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ তাম্র পাত্রে ন দূষ্যতি"

অনুদ্ধৃতসার দুগ্ধ (যে দুগ্ধের নবনীত প্রভৃতি উঠান হয় নাই) তাম্র পাত্রে রাখিলে দূষিত হয় না।

পাশ্চাত্য মতে রৌপ্যের গিলটী করা (Silver Plated) অথবা রৌপ্য পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে তাহা শীঘ্র অম্লস্বাদ বিশিষ্ট হয়।

লৌহ পাত্রস্থিত দুগ্ধ একটু লালচে (রক্তবর্ণ) হয় এবং তজ্জাত সর প্রভৃতি একটু কাল হয় কিন্তু ইহাতে দুগ্ধ টক হয় না।

পিত্তলের পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে তাহা হরিদ্বর্ণ (সবুজ রং) এবং বিস্বাদ হইয়া যায়।

টিনের পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া তাহা "চা"র (Tea) সহিত মিশাইলে নীলাভ হইয়া যায়, এবং বিস্বাদও হয়।

পোড়া মাটির নূতন হাঁড়ীতে দুগ্ধ রাখিলে তাহাতে মেটে গন্ধ হয়, কিন্তু পুরাতন হাঁড়ী হইলে তাহা হয় না, বস্তুতঃ ইহা দুগ্ধ রাখার পক্ষে উৎকৃষ্ট।

দস্তা অথবা কাঁসার পাত্রও দুগ্ধ রাখার পক্ষে মন্দ নহে।

চীনামাটি ও কাচের পাত্র তাপের অপরিচালক অতএব এ গুলি দুগ্ধ রাখার পক্ষে প্রশস্ত নহে, কারণ এবম্বিধ পাত্রস্থ দুগ্ধ সহজে টক হইয়া যায়।

আজ কাল এলুমিনাম্ নামক এক প্রকার নবাবিষ্কৃত ধাতু পাত্র প্রচলিত হইয়াছে, ইহাতে দুগ্ধ রাখিলে কি প্রকার অবস্থা হয়, তাহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

দুগ্ধ দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখার উপায়।

সাধারণতঃ শীতকালে দুগ্ধ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে অতি সহজে নষ্ট হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন সমতল ভূমিতে খাঁটি দুগ্ধ ১৫।১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এবং পর্ব্বত-শিখরে প্রায় ইহার দ্বিগুণকাল পর্য্যন্ত ভাল থাকে।

রাজ নিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে :—

"মুহূর্ত্ত পঞ্চকাদূৰ্দ্ধং ক্ষীরং ভবতি বিকৃতং।

তদেব দ্বিগুণকালে বিষবদ্ধন্তি মানবম্" ॥

উক্তঞ্চ :—"ক্ষীরং মুহূর্ত্ত দ্বিতয়োষিতং যদপ্তমেবংবিকৃতিং প্রযাতি।
উষ্ণঞ্চ দোষং কুরুতে তদূর্দ্ধং বিষোপমং স্যাদুষিতং দশানাম্" ॥

অর্থাৎ :—"পাঁচ মুহূর্ত্তের (দিবা রাত্রির মানের ত্রিশ ভাগের এক ভাগকে মুহূর্ত্ত বলা যায়) ঊর্দ্ধ কালস্থায়ী দুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায় এবং ইহার দ্বিগুণকালে তাহা মানবকে বিষবৎ নাশ করে। আরও কথিত হইয়াছে যে, অতপ্ত দুগ্ধ তিন মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী হইলে বিকৃত হয়, তদূর্দ্ধ কাল পরে তাহা উত্তপ্ত করিলে দুষিত হয় এবং দশ মুহূর্ত্ত কাল স্থায়ী দুগ্ধ বিষতুল্য হয়। অনেক দূর স্থান হইতে আনীত দুগ্ধ আন্দোলন বশতঃ পাত্রের সহিত পুনঃপুনঃ আন্দোলিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্দেশীয় দুগ্ধ ব্যবসায়িগণ উক্ত দোষ নিবারণার্থ দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে বিল্বপত্র (বিল্লার পাতা) তুলসীপত্র, অথবা ২।৪টী কাঁচা লঙ্কা মরিচ দিয়া রাখে; কেহ কেহ অল্প সর্ষপ তৈল প্রক্ষেপ করিয়া থাকে; কিন্তু এ গুলি কতদূর উদ্দেশ্য সাধক তাহা বলা যায় না। পাশ্চাত্য মতে দুগ্ধে Vanilla (এক প্রকার Orchid পরগাছা,) Salycilic acid (সেলিসিলিক্ এসিড্) অথবা Borax (সোহাগা চূর্ণ) দিয়া রাখিলে তাহা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। পূর্ব্বোক্ত এসিডের কোন প্রকার স্বাদ নাই, অতএব ইহাতে দুগ্ধ বিস্বাদ হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

ময়মনসিংহ জেলা স্থাপন ও বন্দোবস্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৪) হাজরাদী—হিস্যা।৵০ আনা, রাজস্ব ৮৯৫৮৲ টাকা। খোদাদাদ্ খাঁ চৌধুরী এই অংশের মালীক। এই পরগণার মালীকদিগের মধ্যে তিনি একজন অতি বিচক্ষণ ও প্রতিভাবান্ পুরুষ। তিনি ঋণদায়াবদ্ধ মহালের উত্তরাধিকারী হইয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় পক্ষে সুব্যবস্থা প্রয়োজন। কাসিমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ৮৩৫১৸/১৭ গণ্ডা ছিল। কমিটী অব সার্কুট বৃদ্ধি করিয়া ১০৭২২৷৷৮৫ কড়া নির্দ্ধারিত করেন। তৎপর ক্রমে দুইবার হ্রাস হইয়া ৮৯৫৮৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১১৮৮ সনে পুনরায় ১৭৬৪৲ টাকা বৃদ্ধি হয়। ঐ বৃদ্ধি ১১৯২ সনে পরিত্যক্ত হয়। বর্ত্তমানে তাহাই স্থির রহিল।

(১৫) হাজরাদী—হিস্যা ।/০ আনা, রাজস্ব ৮৯৫৮৲ টাকা। খোদানেওয়াজ এবং নবীনেওয়াজ খাঁর পুত্র অলি আলী এবং নেওয়াজ খাঁ এই মহালের মালীক। ইহাদিগের বয়ঃক্রম যথাক্রমে ঊনবিংশ ও সপ্তদশ বর্ষ। নবীনেওয়াজ ১১৭৯ সনে ও খোদানেওয়াজ ১১৮৩ সনে মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহাদের জীবিতকালে মহালের শাসন কার্য্য ও রাজস্বাদি সুচারুরূপে পরিচালিত হইত। খোদানেওয়াজ পীড়িত হইলে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ মহাল পরিচালন করিতেছিলেন। আমলাদিগের হস্তে থাকিয়াই মহাল ঋণদায়াবদ্ধ হয় ও নানারূপ বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়। আমলাদিগের অতিরিক্ত অত্যাচারে অনেক তালুকদার তালুক ছাড়িয়া দেওয়ায় রীতিমত খাজানা আদায় হয় না ও কোম্পানীর রাজস্ব বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর খোদানেওয়াজ খাঁর মৃত্যুর ১ বৎসর পরে ১১৮৫ সনে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই মহাল রঘুরাম মল্লিকের নিকট রেহাণাবদ্ধ রাখেন। ১১৯০ সন পর্য্যন্ত রঘুরামের দায়ে মহাল আবদ্ধ থাকে। অতঃপর মালীকগণ পুনঃগ্রহণ করেন তদবধি আমলাগণ কর্ত্তৃকই মহাল পরিচালিত হইতেছে। রাজস্ব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধির সহিত স্থির রহিল।

(১৬) পং জয়নসাহী—রাজস্ব ১৭৫২৫৲ টাকা। মহম্মদ মনোহর ও নুরহায়দর চৌধুরী এই পরগণার মালীক। কাসিমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ২৩৪০৭৸৵৭ গণ্ডা ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ এই রাজস্ব হইতে ৮২৮৭৸৴৭ গণ্ডা হ্রাস করেন। মিঃ মিডল্টন পুনরায় অল্প বৃদ্ধি করেন, কমিটী অব সার্কুট আরও বৃদ্ধি করিয়া ২০১৫৫।৶১৬ গণ্ডা ধার্য্য করেন। এর পর পুনরায় রাজস্ব হ্রাস হইতে থাকে। প্রথম হ্রাস করেন মিঃ রাউস, তৎপর মিঃ সেক্সপিয়র। সেক্সপিয়র ১৭৫২৫৲ টাকা ধার্য্য করেন। ১১৮৮ সনে পুনরায় ৩০০০৲ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। ও তিন বৎসর বাজে মহাল বলিয়া পরিগণিত থাকে। অতঃপর ১১৯১ ও ১১৯২ সনে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব রাজস্ব ১৭৫২৫৲ টাকা স্থির থাকে। বর্ত্তমানেও তাহাই রহিল।

(১৭) তপে লতিবপুর—রাজস্ব ১৫৮০৲ টাকা। পরগণা জয়নসাহীর অধীন একটী তপ্পা। এই তপ্পার মালীক মনোহর জমিদার। কমিটী অব সার্কুট ইহার রাজস্ব ১৭২৭৴১৮ গণ্ডা ধার্য্য করেন। অতঃপর হ্রাস হইয়া ১৬২৭৲ টাকা ধার্য্য হয়। মহালের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমানে রাজস্ব কিছু হ্রাস করা হইল।

(১৮) পরগণা খালিয়াজুরী—রাজস্ব ১৭০০৲ টাকা। রামশঙ্কর চৌধুরী,

অনুপনারায়ণ চৌধুরী, মোহনরাম চৌধুরী, জয়প্রসাদ চৌধুরী, মাণিকরাম চৌধুরী, আবুলওয়াল্লা চৌধুরী, মহম্মদ গফুর, মহম্মদ রুসন ও মহম্মদ রাজ্জ এই মহালের মালীক। এই মহাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান আয়তন অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ছিল। কাসিমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ৩৫০১৮৫১ গণ্ডা ছিল। অতঃপর অনেক তালুক পৃথক হইয়া যাওয়ায় মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব হ্রাস করিয়া ১০৩৪৫৬। কড়া ধার্য্য করেন। তারপর ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ১৭০০৲ টাকা হয়। বর্ত্তমানেও তাহাই স্থির রহিল। এই মহালের ভূমিতে ধান্য অতি অল্প পরিমাণ উৎপন্ন হয়। জলকর ও মৎস্য বিক্রয় আয়ই এই মহালের প্রধান আয় এবং তাহাদ্বারাই রাজস্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(১৯) তালুক দেবদাস মোহন্ত—রাজস্ব ৮৭৮৲ টাকা। এই মহাল বহুদিন হইল খালিয়াজুরী হইতে বিক্রীত ও পৃথক হইয়া গিয়াছে। মিঃ সোর যে রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহাই স্থির রহিল। মহাল মজিরাম মোহন্তের পক্ষ হইতে মাখমলালের নিকট ইজারা প্রদত্ত ছিল। মজিরাম জগন্নাথ-ধামে বাস করেন। তিনি দেবদাস মোহন্তের উত্তরাধিকারী। এই মহালের আয় হইতে ৩৬০৲ টাকা দেব-কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ার নিয়ম মাখমলাল তাহা অন্যায়রূপে ব্যবহার করায় পণ্ডিতগণের পাতি লইয়া তাহাকে দূরীভূত করার চেষ্টা হইতেছে।

(১)	তপ্পা রণভাওয়াল—	হিস্যা	।৵০	রাজস্ব	৪৪৬৩৲ টাকা
(২)	ঐ	হিস্যা	।৵০	,,	৫২৪৯৲ টাকা
(৩)	ঐ	হিস্যা	।০	,,	৩১৪২৲ টাকা
			১৲		১২৮৫৪৲ টাকা

এই মহালের প্রথম অংশের মালীক মহম্মদ করিম, দ্বিতীয় অংশের মালীক হোসেনআলী ও তৃতীয় অংশের মালীক মহম্মদ অলি। ইহারা তিন ভ্রাতা, করিম ও হোসেনআলী পিতার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভ্ভ সম্ভূত এবং অলি নিকায়িতা স্ত্রীর গর্ভ্ভ সম্ভূত পুত্র। কতিপয় বৃহৎ বৃহৎ মহাল এই পরগণা হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ায় মালীকগণ মহালের রাজস্ব পরিচালনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা ঢাকার আদি ও উচ্চ বংশের সন্তান। বহু পুরুষ যাবৎ এই সম্পূর্ণ পরগণা ভোগ করিতেছে। যে সকল মহাল পৃথক হইয়া গিয়াছে ঐ গুলি এই পরগণা ভুক্ত করিয়া দিলে, মহম্মদ করিম ও তাহার ভ্রাতাদিগের জীবিকার উপায় হয়। গবর্ণমেণ্ট ও সহজে রাজস্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন। কাসিমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ১১০২৪৸৵১১৫ কড়া ছিল; কমিটী অব সার্কুট বৃদ্ধি করিয়া

১৪৪৪৭৶৯ গণ্ডা করেন। মালীকগণ এই বৃদ্ধি রাজস্ব প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায়, রাজস্ব হ্রাস করিয়া ১২৫৭৯৲ টাকা ধার্য্য হয়। অতঃপর ১১৮৮ সনে ১৭৭৪৲ টাকা বৃদ্ধি হয়। ১১৯২ সনে পুনরায় তাহা হ্রাস হয়, বর্ত্তমানে অল্প বৃদ্ধি হইল।

(২১) তালুক মহম্মদ একরাম—রাজস্ব ৮১১৯৲। বহুকাল পূর্ব্বে এই তালুক রণভাওয়ালের অন্তর্গত ছিল। মহালের বর্ত্তমান মালীক মির্জ্জা আবদুল্লা ও মহম্মদ আলি। বোরানউল্লা নামক গোমস্তা মহালের শাসন সংরক্ষণ করে। কাসিমআলী খাঁর বন্দোবস্তে রাজস্ব ৬৫০৫।/১১॥ কড়া ধার্য্য হয়। কমিটী অব সার্কিট বৃদ্ধি করিয়া ৮৩২৩৶১॥ কড়া করেন। অতঃপর মিঃ রাউস, মিঃ সেক্সপিয়র ক্রমে হ্রাস করিয়া ৬৭৬২৲ টাকা নির্দ্ধারিত করেন। এর পর মিঃ সোর ১৪৩৭৲ টাকা করেন, তাহাই বর্ত্তমানে স্থির রহিল।

(২২) তালুক মির আবদুল্লা—রাজস্ব ২১৩৮৲ টাকা। পূর্ব্বে এই তালুক মহম্মদ একরামের অন্তর্গত ছিল পারিবারিক ঝগড়া গোলযোগে ১১৯২ সনে এই তালুক পূর্ব্বোক্ত তালুক মহম্মদ একরাম হইতে পৃথক হইয়া যায়। কাসিমআলী খাঁ ইহার রাজস্ব ১৬৯৫॥৶৮ গণ্ডা ধার্য্য করেন, কমিটী অব সার্কিট রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া ২১৬৯॥৶১২॥ কড়া করেন। পুনরায় হ্রাস হইয়া ১৭৬৩৲ টাকা ধার্য্য হয়। মিঃ সোর ইহার উপর ১৪৩৭৲ বৃদ্ধি করেন, বর্ত্তমানে তাহাই স্থির রহিল।

(২৩) তালুক নুরন্নেছা খানম্—রাজস্ব ১৭৫৯৲ টাকা। পূর্ব্বে এই তালুক রণভাওয়ালের অন্তর্ভূক্ত ছিল। খাজেনেহাল নামক কোন খোজা নুরন্নেছা নাম্নী এক বালিকাকে পালিতাকন্যারূপে গ্রহণ করেন। এই কন্যার নাম অনুসারে এই তালুক পরিচিত। নুরন্নেছা আগারেজার নিকট বিবাহিতা হন। বিবাহের পর হইতে আগারেজা মহাল শাসন করিতে থাকেন এবং মহাল রণভাওয়াল হইতে পৃথক করিয়া নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। ১১৯২ সনে তাহার অংশ অল্প জমায় পৃথক বন্দোবস্ত প্রদত্ত হয়। ইহার কিছু দিন পরে নুরন্নেছা কোন উইল না করিয়া পরলোক গমন করিলে পর, পরগণার চৌধুরীরা মহাল হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন। যদি পত্নীর সম্পত্তিতে পতির কোন দাবী না থাকে তবে এই মহাল গবর্ণমেণ্টের "বিলাত মহালরূপে" গ্রহণ করা অথবা পরগণার সামিল করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আপাততঃ পূর্ব্ব রাজস্বই স্থির রহিল।

(২৪) তালুক নেওয়াজআলী—রাজস্ব ৫০০০৲ টাকা। এই তালুক বহু পূর্ব্বে রণভাওয়াল হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে। নেওয়াজআলী, মাতা

ও পত্নী রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, মাতা ও পত্নী সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। পত্নীর খুড়া মির্জ্জা মাছুমকে উভয়ে মহালের শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহার সময়ে মহাল সুশাসনে পরিচালিত হইয়াছিল। ১৭৮৭ অব্দের মে কি জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকদ্বয় তাঁহাদের আত্মীয় মীর হোসেনের উপর সম্পত্তির শাসনভার প্রদান করেন। এই মহালের অবস্থা অত্যন্ত ভাল থাকা সত্বেও দুইটী অসহায়া স্ত্রীলোকের প্রতি তাকাইয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইল না

(২৫) তালুক মীরমামুদ—রাজস্ব ৫৫০৲ টাকা। এই তালুকও বহু দিন হয় রণভাওয়াল হইতে পৃথক হইয়াছে। মীর সৈয়দআলী ইহার মালীক, মহালের অবস্থা ভাল, রাজস্ব অল্প বৃদ্ধি করা হইল।

২৬ পরগণা সেরপুর দশকাহনীয়া—রাজস্ব ৩৩০০১৲ টাকা। এই মহাল ভীম, প্রতাপনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্রের নামে লিখা যায়। ইহারা পৃথক পৃথক অংশের মালীক, ভীম ৷√০ আনা, প্রতাপনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যেকে ।১০ আনা করিয়া ৷৷√০ আনা এই পরগণার অংশ লইয়া বহুদিন যাবৎ বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। কাসিমআলী খাঁর সময়ে ইহার রাজস্ব ২৫১৮৬৸/১৭। কড়া ধার্য্য হয়। মিঃ মিডল্টন এই রাজস্ব বৃদ্ধি করেন, অতঃপর কমিটী অব সার্কুটের হাতে আরও বৃদ্ধি হইয়া ৩৩৯০৪৶৭। কড়া ধার্য্য হয়। বিগত তিন বৎসরে এই মহালে বহু টাকা বাকী পড়িয়া গিয়াছে। মিঃ রাউস রাজস্ব ৩০০০৶৭। কড়া হ্রাস করিয়া দেন এবং মিঃ সেক্সপিয়র পুনরায় ২৯০৭৲ টাকা হ্রাস করেন এবং রাজস্ব ২৮০০১৲ টাকা ধার্য্য হয়। মিঃ সোর পুনরায় এই রাজস্বের উপর ৫০০০৲ টাকা বৃদ্ধি করেন, এই মহালের ভূমি উৎকৃষ্ট, নানা রকমের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং স্থানও সুবিস্তৃত। ভূমির উর্ব্বরতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃদ্ধি রাজস্বই স্থির রহিল।

(২৭) পরগণে নসীরুজিয়াল—রাজস্ব ৩৭৯৩০৲ টাকা—

হিঃ	।১০ আনা	রাজস্ব	৯৯৪৯৲	টাকা মালীক দুর্গা ব্রহ্মের ওয়ারিশ
হিঃ	√০ আনা	ঐ	২৪৪৪৲	টাকা মালীক কিশোর চাঁদের ওয়ারিশ
হিঃ	৵৩৸ গণ্ডা	ঐ	৫২১৭৲	টাকা মালীক মামুদ মানুয়ারের ওয়ারিশ
হিঃ	√৩৷৷ গণ্ডা	ঐ	২৮৭৮৲	টাকা মালীক অমরকৃষ্ণের ওয়ারিশ
হিঃ	ৎ১৸ গণ্ডা	ঐ	১৫৩১৲	টাকা মালীক প্রেমনারায়ণের ওয়ারিশ
হিঃ	৶১১৷৷ গণ্ডা	ঐ	৮৬৭০৲	টাকা মালীক মহম্মদ মুছাদরের ওয়ারিশ
হিঃ	৶০ আনা	ঐ	৪৮৯২৲	টাকা মালীক রাম রামের পুত্র শ্যামচাঁদ

হিঃ ।০ আনা রাজস্ব ২৪৪৯৲ টাকা মালীক শ্যামকিশোর।

কমিটী অব সার্কুট এই মহালের রাজস্ব ৪২২৭৬৮১৮ কড়া ধার্য্য করেন। ইহার পর রাজস্ব হ্রাস হইতে থাকে, ক্রমে তিন বার হ্রাস হইয়া ৩৪৫৭৬।২ গণ্ডা স্থির হয়। ১১৮৬ সনে মহাল উপর্য্যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। এবং পুর বৎসর হইতে মহাল শাসন সংরক্ষণের ভার মালীকগণ নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ১১৮৮ সনে রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়া ৪৩২০৪৶১৮ কড়া হয়। মালীকগণ এই বৃদ্ধিহারে রাজস্ব পরিচালন করিতে অস্বীকৃত হইলে, মহাল রামদুলাল ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট ইজারা প্রদত্ত হয়। ইজারা প্রদানের পর ইজারাদারের সহিত জমিদারের বিবাদ বাঁধিয়া যায় এবং "খালসা"তে উভয় পক্ষ হইতে নালীশ উপস্থিত হয়। রামদুলাল ঘোষ অতঃপর ইজারা ত্যাগ করেন এবং মহাল পুনরায় কেবল রায়ের জামিনী-সূত্রে বংশীরাম সিংহকে ইজারা প্রদত্ত হয়। জামিনদার ও ইজারা গ্রহীতা উভয়ে মহাল বন্দোবস্তে অকৃতকার্য্য হইয়া ঢাকার চীফ্‌কে তদ্বিবরণ অবগত করান। অতঃপর কমিটী হইতে রাজস্ব হ্রাসের অনুমতি আসিলে ৪২৬৭৶ আনা হ্রাস করিয়া মহাল রামজী মালের হস্তে প্রদান করা হয়। রামজী মাল ১১৯১ সনে কোন রকমে কৃতকার্য্য হইয়া পর বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে ১১৯২ সনে ১নং অংশের ১০০০৲ টাকা রাজস্ব কমাইয়া সমগ্র মহাল খাজেমাইকেলের হাতে প্রদত্ত হয়। খাজেমাইকেলও মহাল বন্দোবস্তে অকৃতকার্য্য হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট মালীকদিগকে তলব করেন। জমিদারগণ "খালসা"য় উপস্থিত হইয়া, খাজেমাইকেলের বিরুদ্ধে এক ওয়াশীলাৎ দাখিল করেন। ১১৯৩ সনে জমিদারগণ মির্জা মামুদকে তাঁহাদের "মাল জামিন" নিযুক্ত করেন। তাঁহার চেষ্টায় রাজস্ব রীতিমত আদায় হইয়াছে। রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইল না।

(২৮) তালুক আমির খাঁ—রাজস্ব ১৪০০৲ টাকা। কোন বিশেষ অনুগ্রহের উপর ১১৯২ সনে এই ক্ষুদ্র মহালটী পরগণা নসীরুজিয়াল হইতে পৃথক করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। বন্দোবস্তের পর হইতে সীমানা লইয়া বিরোধ চলিতেছে। সনদ প্রদত্ত ভূমি হইতে মালীকেরা মহালের ভূমি নানা প্রকারে বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছে। সুতরাং রাজস্ব বর্দ্ধিত করা গেল।

(২৯) তপে বরিকান্দি—রাজস্ব ৪২০৫৲ টাকা। এই মহাল আছালত খাঁর নামে লিখা ছিল। বর্ত্তমানে তাহার উত্তরাধিকারী আসকর খাঁ ও নইম খাঁ মহাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। নইম খাঁ বোবা। আসকর খাঁই সুতরাং প্রকৃত স্বত্ববান্। ঢাকার কতিপয় প্রধান লোকের কতকগুলি তালুক এই মহালের

অন্তর্গত থাকায় কালেক্টরের সাহায্য ব্যতীত আসকর খাঁর এই মহাল হইতে কপর্দ্দক প্রাপ্তিরও আশা নাই। মিঃ সোর জমা বৃদ্ধি করিয়া ৪৭০৫৲ টাকা করিয়াছিলেন। অতঃপর ৫০০৲ টাকা হ্রাস করা হয়, সেই রাজস্বই স্থির রহিল।

(৩০) বড়বাজু—হিস্যা।৶১০ আনা, রাজস্ব ২৯৭০০৲ টাকা। এই মহালের ।৶০ আনার মালীক সিরাজআলী চৌধুরী ও ৵১০ আনার মালীক হরি ব্রজরাজ।

৩১ বড়বাজু—হিস্যা /১০ আনা, রাজস্ব ৩৫২০৲ টাকা। এই অংশের মালীক হর দেবের পুত্র শিবনাথ ও রাধানাথ।

৩২ বড়বাজু—হিস্যা ৵৫ আনা, রাজস্ব ৪০৫০৲ টাকা। এই অংশের মালীক কৃষ্ণ দেবের পুত্র কমলরাম ও গোবিন্দের পুত্র গোকুলরাম। গোকুলরামের কোন সন্তান নাই।

৩৩ বড়বাজু—হিস্যা ৵৫ আনা, রাজস্ব ২৯১৩৲ টাকা। এই অংশের মালীক জয়দেবের সাত পুত্র।

৩৪ বড়বাজু—হিস্যা ৵৫ আনা, রাজস্ব ১৪০৯৲ টাকা। এই অংশের মালীক মামুদ সুফার পুত্র মহম্মদ জিয়াম।

৩৫ পরগণা আটিয়া—হিস্যা ।০ আনা, রাজস্ব ১২০১৲ টাকা। এই অংশের মালীক আলেপ খাঁ চৌধুরী।

৩৬ পরগণা আটিয়া—হিস্যা ।০ আনা, রাজস্ব ১২০১৲। এই অংশের মালীক ইমাম্‌বক্স খাঁ।

৩৭ পরগণা আটিয়া—হিস্যা ॥০ আনা, রাজস্ব ২৭৬৩৫৲ টাকা। এই অংশের মালীক আলিয়র খাঁ। আলিয়র খাঁ ফৌজদারী জেলে আবদ্ধ আছেন।

৩৮ তালুক প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ—রাজস্ব ৬৪৲ টাকা। আটিয়ার অধীন একটী ক্ষুদ্র মহাল ইহার মালীক রাজকিশোর।

৩৯ কাগমারী—হিস্যা ।/০ আনা, রাজস্ব ১৩৪০৬৲ টাকা। এই মহালের মালীক কাশীনাথের বিধবা পত্নী দয়াময়ী চৌধুরাণী।

৪০ কাগমারী—হিস্যা ।৵০আনা, রাজস্ব ১৬৩৫০ টাকা। বিগত আশ্বিন মাসে কৃষ্ণনাথের মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা পত্নী ও দত্তক পুত্র এই মহাল প্রাপ্ত হন।

৪১ কাগমারী—হিস্যা ।/০ আনা, রাজস্ব ১০২০০৲ টাকা। এই মহালের মালীক জগৎ, প্রাণ ও গোপী চৌধুরী এই তিন ভ্রাতা। *

---

* রটন্ সাহেবের বন্দোবস্ত সময়ে ও তৎপূর্ব্বে আটিয়া কাগমারী ও বড়বাজু ঢাকা ও সেলবরসের (বর্ত্তমান বগুড়ার) অধীন শাসিত হইত। বড়বাজুর

৪২ মৌজা হরিপুর বিজুরা—রাজস্ব ৩৬৮৲ টাকা। এই মহাল ফাস্করাণী ও যাদবন্দির নামে লিখিত আছে।

৪৩ মৌজা একরামপুর—রাজস্ব ১২ টাকা। এই মহাল সীতারামের উত্তরাধিকারিগণের নামে লিখিত।

৪৪ বড়বাজু—রাজস্ব ৪০৭৪ টাকা। এই মহাল রঘুরামের পুত্র রামকিশোর রায় প্রভৃতির নামে লিখিত হইয়াছে।

এই তিনটী মহাল হুজুরী মহালের সামিলে মুর্শিদাবাদের অধীন ছিল। সুতরাং পূর্ব্ব ইতিহাস অজ্ঞাত। যে রাজস্ব ধার্য্য আছে তাহা প্রচুর কি অপ্রচুর জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। রাজস্ব আদায় হইতেছে।

৪৫ নাওয়ারা মহাল— * রাজস্ব ২৫৪০৮ টাকা। এই মহালের রাজস্ব সমগ্র প্রদেশের উপর ৭০০০০০ টাকা ধার্য্য ছিল ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। কমিটী অব সার্কুটের ধৃত রাজস্ব স্থির রহিল।

৪৬ পান মহাল—সর্ব্বসাধারণের আপত্তো পানের উপর খাজানা ধৃত হইল না। উপর্য্যুক্ত মহালগুলি ব্যতীত আরও বহু মহাল লইয়া ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য যে সকল মহাল লইয়া প্রথম জেলা গঠিত হইয়াছিল বিভিন্ন সময়ে ঐ সকল মহাল ক্রমে এ জেলা হইতে খারিজ হইয়া তোরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাবনা ও বগুড়া প্রভৃতি জেলাভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল মহালের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(৪৭) বাম—২২০০ টাকা। (৪৮) নোয়াবাদ—৩৯০১ টাকা।

(৪৯) কাশীপুর—১৭১৬ টাকা। (৫০) পং দাউদনগর—৩৮১ টাকা।

(৫১) তপ্পা ফিজাবাদ—৪৬০ টাকা। (৫২) পং গোদা হুসেননগর—৩৫০০ টাকা।

(৫৩) আরঙ্গপুর—১৩১৪ টাকা। (৫৪) পং আনন্দপুর—২৬৮ টাকা।

(৫৫) পং বালেশ্বর—৭১৮৯ টাকা। (৫৬) পং মোড়াকৈর—৫৫৫ টাকা।

(৫৭) পং মুকুল্লা হুসেননগর—১০৮৬ টাকা।

(৫৮) মৌজা হুসেননগর—১২০ টাকা।

(৫৯) তাং রঘুনন্দন—১২৭ টাকা। (৬০) পুটিজুরী—১৪১৯ টাকা।

জমিদারগণও সেলবরসের অধিবাসী ছিলেন। বর্ত্তমান রিপোর্ট প্রদান করিবার সময় মাত্র এই মহালগুলি এই জেলাভুক্ত করা হইয়াছিল। সেই কারণে এই পরগণাত্রয়ের পূর্ব্ব ইতিহাস রটন সাহেব প্রদান করিতে পারেন নাই।

* নাওয়ারা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ময়মনসিংহের বিবরণের ১২১—১২২পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৬১) তাং রাজকৃষ্ণ সেন নয়াবাদ—৩৪ টাকা।

(৬২) মৌজা রিয়াজপুর—১০০ টাকা। (৬৩) পং সতরমণ্ডল—২০০০ টাকা।

(৬৪) দাউদপুর—২৮০০ টাকা। (৬৫) পং সরাইল—২৭৭৩৪ টাকা।

(৬৬) পং তরপ—১০০০ টাকা। তরপ পরগণা বর্ত্তমান সময়ে শ্রীহট্ট জেলার অধীন। বন্দোবস্তের সময় এই পরগণার মালীকগণ অপর মালীক আলীরেজাকে হত্যা করার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড ভোগ করিতেছিলেন।

(৬৭) মৌজা উচাইল—২২৮ টাকা। (৬৮) বেলুহা—৯৯৪৬৯ টাকা। বেলুহা নোয়াখালী জেলাস্থ বর্ত্তমান ভুলুয়া। বেলুহার কালেক্টরী উঠিয়াই ময়মনসিংহে আসিয়া স্থাপিত হয়।

(৬৯) জয়নগর—৯১২৮ টাকা।

(৭০) গোপালপুর মির্জ্জানগর—২৩১২০ টাকা।

(৭১) দাদরা আলিয়াবাদ—১২০০০ টাকা। দাদরা আলিয়াবাদ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী মহালে অবস্থিত।

(৭২) বাজুপুর—১৩৮১৮ টাকা। (৭৩) চৌদাগাঁও (গঞ্জ)—৪২৪৫ টাকা।

(৭৪) কাড়ুয়া—৪৭০০০ টাকা। কাড়ুয়া চট্টগ্রাম জেলার ফেণীনদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রাণী চন্দ্রকলা ও রাজা পশুরাম, প্রভুরাম ও রামকৃষ্ণের সম্পত্তি।

(৭৫) অম্বরাবাদ—৫০০০০ টাকা।

(৭৬) মেহার—২০৯৫২ টাকা। মেহার বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুরা জেলার অবস্থিত। মেহারের কালীবাড়ী অতি প্রসিদ্ধ স্থান।

(৭৭) এব্রাহিমপুর—২৩৩৩ টাকা। (৭৮) তাং আমুদ খাঁ—৫৪০ টাকা।

(৭৯) তাং ইন্দ্রনারায়ণ বসু—১৪০২ টাকা। (৮০) বলরামপুর—৯৮ টাকা।

(৮১) তাং বানিথানম্—৪০ টাকা। (৮২) বালরা—৫৩৩ টাকা।

(৮৩) সাগরদি—১০৪১৭ টাকা। (৮৪) তাং সেখ মাতাব—৬৬ টাকা।

(৮৫) পং শ্যামপুর—৩১০৫ টাকা। (৮৬) তাং রামদেব দত্ত—১০০০ টাকা।

(৮৭) তাং রামকান্ত সিংহ—২৭০০ টাকা। (৮৮) পং কির্দ্দি—২০০০ টাকা।

(৮৯) গৌরচরণ ও গৌরকিশোর—৫৮০০ টাকা।

(৯০) পং ফরাক্কাবাদ—১৪৬৭১ টাকা। (৯১) পুরচান্দি—৭৬৯১ টাকা।

(৯২) তাং মধুমুনিরাম—২৮১ টাকা। (৯৩) মুলচাকুল—৪০০১ টাকা।

(৯৪) কিং মিচাইল—৬৬১ টাকা। (৯৫) তপা নারাইনকুর—৫০০১ টাকা।

(৯৬) গুণনন্দি—৩০৩৩৪ টাকা। (৯৭) তপা দুর্গাপুর—৫২৭৫ টাকা।

(৯৮) পং হামলাবাদ—১৪৯০০ টাকা। হামলাবাদ—এই পরগণা ময়মনসিংহের কালেক্টরের প্রথম দেওয়ান রাজচন্দ্র রায়কে দেওয়া হয়।

(৯৯) সায়েস্তানগর—৩৫৩০ টাকা।•

(১০০) তাং আবদুল হুসেন নারাইনকুর—৭৫ টাকা।

(১০১) পং সিংহেরগাঁও—১৪৬০০ টাকা।

(১০২) তাং মির বাখর—২৫০১ টাকা। (১০৩) তাং মির আছুল—১৩৫ টাকা।

(১০৪) পং মিজুরদি ৫২৬৭ টাকা। (১০৫) দরিবা—৪১৬৪০ টাকা।

(১০৬) গোপালনগর—১৭৫৬ টাকা। (১০৭) তাং লালমামুদ—৩০০ টাকা।

(১০৮) জোত লক্ষ্মণপুর—৪০০১ টাকা।

(১০৯) পং সরিচাল—২০০ টাকা। সরিচাল এই পরগণা বলদাখাল ও মেহের এই দুই পরগণার মধ্যে অবস্থিত।

(১১০) মিচাইল—৭৫০১ টাকা। (১১১) তোড়া—২৬০০০ টাকা।

(১১২) পরগণা কাঞ্চনপুর—৫০০০ টাকা।

(১১৩) জগদিয়া—৫৩৭৫ টাকা। জগদিয়া সমুদ্রকূলে অবস্থিত। চট্টগ্রামের নিকবর্ত্তী মহাল। (১১৪) পাইটখারা—৮১২৯৯ টাকা।

(১১৫) তাং রামগতি বল—২২২ টাকা। (১১৬) তাং গুরুপ্রসাদ—৬২ টাকা।

(১১৭) তপ্পা নথি—২৩০০ টাকা। (১১৮) তরফ রুদ্রবরেরা—৬০৮ টাকা।

(১১৯) আরান্দরাউন্‌টি—১০৩০ টাকা।

(১২০) মৌজে বদরসিমলা—১৯৮ টাকা। (১২১) মৌজে পরকাই—২৫৩ টাকা।

(১২২) মৌজা রসুলপুর—৫৪৬ টাকা। (১২৩) মৌজা ডুবাইল—১০৯৩ টাকা।

(১২৪) মৌজা বন্দেপির—৭৯৫ টাকা। (১২৫) দরিহাতেম—১১৪০ টাকা।

১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫—এই তালুকগুলি সেলবরসের (বর্ত্তমান বগুড়া) অধীন থাকা অবস্থায় সেলবরসের কালেক্টরের দেওয়ান ইন্দ্রজিৎ সিংহ ক্রয় করেন। তাং দখল উপলক্ষে ভয়ানক দাঙ্গা হইলে পূর্ব্ব মালীক আলীয়র খাঁ কারারুদ্ধ হন।

(১২৬) তরফ বয়েরাবাড়ী—১১৭ টাকা। [১২৭] তরফ দুর্গাপুর—২৬৩ টাকা।

[১২৮] তরফ পাঙ্গাসিয়া—১১৭ টাকা।

১২৬, ১২৭, ১২৮—এই তিন মহাল বড়বাজু হইতে বহির্গত হইয়া পৃথক বন্দোবস্তে সেলবরসের কালেক্টরের অধীন ছিল। জেলা বন্দোবস্তের সময় এ জেলায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বে আটিয়ার আট আনির স্বত্ব ছিল।

এই জেলাস্থিত পং পুখুরিয়া, পরগণা হোসেনসাহী ও জোয়ার হোসেনপুর

তৎকালে এ জেলার কালেক্টরের অধীন ছিল না। এই পরগণাত্রয় নাটোরের রাজাদিগের রাজ্যান্তর্গত থাকিয়া রাজসাহীর কালেক্টরীভুক্ত ছিল।

দক্ষিণ সাহাবাজপুর এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বন্দোবস্তের পূর্ব্বেই তাহা ঢাকা জেলার অধীন নীত হয়। *

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

হিন্দু-সমাজ।

এই সমাজ সংস্কারের নবযুগে সংস্কারকদল হিন্দু-সমাজ সংস্কারের প্রয়াসী হইয়া যে ভাবে হিন্দু-ধর্ম্ম গঠন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; তাহাতে স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দু মাত্রেই ব্যথিত, ভীত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তাই আজ উভয়দল মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্মের নানা বিষয়ে, নানা বাদ-প্রতিবাদ আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। দুঃখের বিষয় এই উপলক্ষে কোন কোন মহাত্মা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অযথা আক্রমণ এবং আত্মমত রক্ষণার্থ ভাষার অপব্যবহারে ভদ্রতার সীমাতিক্রম করিতেও ক্রটী করিতেছেন না। কিন্তু এইরূপ হঠকারিতাদ্বারা কেহ যে সমাজ-সংস্কারকার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন ইহা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে। বরং এই অদূরদর্শিতার ফলে হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধন না হইয়া ঘোর বিপ্লবেরই সূত্রপাত হইবে। একেইত হিন্দু সমাজের নিতান্ত দুরবস্থা তন্মধ্যে যদি আবার আত্ম-কলহ উপস্থিত হয়, তবে হিন্দু জাতির কি শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হইবে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই ভাবিবার বিষয়।

দেশ-কাল-পাত্র ও প্রয়োজনানুসারে হিন্দু-সমাজের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া থাকিলেও যাহাতে মূল ধর্ম্মের বা ধর্ম্মাঙ্গের কোন হানি না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধীরভাবে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। হিন্দু-ধর্ম্ম এমন সারশূন্য নহে যে, নব-সংস্কারক দলের ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম অতি প্রাচীন কাল হইতে নানা ধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাত এবং বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী ও নাস্তিক-সম্প্রদায়ের কঠোর তাড়না সহ্য করিয়া, অটল অচলের ন্যায় অবিকৃতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কালের উত্তাল তরঙ্গেও তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কত নব নব ধর্ম্মের উত্থান পতন উন্নতি অবনতি ঘটিল কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্ম এত

* Boards letters No. 44. Dated 5/6/1787.

অত্যাচার সহ্য করিয়াও স্বাতন্ত্র্য এবং গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কারণ হিন্দু-ধর্ম্ম কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের কল্পনা-প্রসূত উপধর্ম্ম নহে। হিন্দু-ধর্ম্ম অনাদি, অপৌরুষেয়, বেদমূলক। সনাতন। হিন্দু-ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দৃঢ় সংস্থাপিত। সুতরাং ইহা কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নহে। হিন্দু-ধর্ম্ম প্রকৃত "মানব-ধর্ম্ম"। যথাশাস্ত্র হিন্দুধর্ম্মানুশীলনদ্বারা মনুষ্য পূর্ণ মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভের অধিকারী হয়। আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান না হইলে কেবল বাহ্য প্রকৃতির সহায়তায় মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না।

(হিন্দু-ধর্ম্ম কেবল উপাসনার বা নৈতিক উন্নতির ধর্ম্ম নহে। যথাবিহিত হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে চলিলে তদ্দ্বারা সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয়। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক উন্নতির জন্য মনুষ্য-জীবনের যাহা কিছু প্রয়োজন, সে সমস্তই হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অন্তর্গত। মানব-জাতির আদি পুরুষ বা মনুষ্যত্ব-লাভের প্রথম পথপ্রদর্শক "মনু" মানব-ধর্ম্মসূত্রদ্বারা হিন্দু-সমাজের যে সমস্ত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা বেদ মূলক, এবং কেবল হিন্দু-জাতির জন্য নহে।) চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় তৎকালে হিন্দু-সমাজে যে জাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) চতুষ্টয় বিদ্যমান ছিল, সমস্ত মনুষ্যই ঐ চারি বর্ণের অন্তর্ভূত। যাঁহারা সদাচার প্রভৃতি সর্ব্ব-সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন, হিন্দু-ধর্ম্মে তাঁহারাই "ব্রাহ্মণ" পদবাচ্য, এবং ক্রমে গুণের তারতম্যানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা তপঃসিদ্ধ যোগ বল সম্পন্ন অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা মহাপুরুষ, তাঁহারাই মুনি ঋষি প্রভৃতি অসাধারণ সংজ্ঞালাভ করিয়াছিলেন। সেই অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা মুনি ঋষিগণ অপৌরুষেয় বেদানুসরণ করিয়া বর্ণানুসারে মানবগণের যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাই হিন্দু-ধর্ম্ম। এবং তদ্বাচক গ্রন্থের নাম ধর্ম্ম-শাস্ত্র। দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থাভেদে ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রযোজক মুনি মহর্ষিগণের মতভেদ থাকিলেও তাহাতে মূলধর্ম্মের কোন অপচয় হয় নাই। যদিও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে (দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থানুসারে) মতভেদ দৃষ্ট হয়, তথাপি সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য এক। সকলেই মোক্ষপ্রার্থী, সকলেই আত্ম-জিজ্ঞাসু, সকলেই স্বকৃতকর্ম্মের অনিবার্য্য শক্তি ও পরলোকের প্রতি বিশ্বাসী, সকলেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী সৎকর্ত্তব্যের পথপ্রদর্শক।

যাহা মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাই ধর্ম্ম। "যোহ ভূদয়ায় সোধর্ম্ম;" যাহাদ্বারা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক মঙ্গল সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম সংজ্ঞায় অভিহিত। সুতরাং মানব-জাতির মঙ্গল-সাধক ধর্ম্ম দুই হইতে পারে না। তবে দেশ, কাল,

পাত্র, উপপত্তি, প্রয়োজন ও প্রবৃত্তিভেদে কতকগুলি ধর্ম্মাঙ্গের (আচার ব্যবহারের) পার্থক্য ঘটিতে পারে। নচেৎ মানবের সাধারণ প্রকৃত ধর্ম্ম এক। এবং তাহা বিজ্ঞান মূলক, সুতরাং মানব-ধর্ম্ম অনাদি অপৌরুষেয়। কথাটী বড় শক্ত, চিন্তা করিয়া না দেখিলে সহসা ইহার তাৎপর্য্যগ্রহণ হইবে না। প্রত্যেক পদার্থের যে ধর্ম্ম তাহা ধর্ম্মী-ধর্ম্মরূপে নিত্য সম্বন্ধে অবস্থাপিত। মানব-জাতির সাধারণ ধর্ম্মও তদ্রূপ অনাদি নিত্য সম্বন্ধে অবস্থাপিত, তবে জড় পদার্থের ধর্ম্ম যেরূপ অবিকৃত থাকে, মনুষ্যের ধর্ম্ম সেরূপ থাকিতে পারে না। শিক্ষা, রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা মানব-ধর্ম্মের আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটে; কিন্তু তথাপি মূল ধর্ম্মের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না।

অন্যান্য পদার্থের ধর্ম্ম যেমন তত্তৎ পদার্থগত নিত্য সম্বন্ধে অবস্থাপিত, মানব-জাতির (মঙ্গল-সাধক) ধর্ম্মও তদ্রূপ মানব-জাতিগত নিত্য সম্বন্ধে অবস্থিত। সেই নিত্যাবস্থিত "মানব-ধর্ম্ম" পরহিতব্রতী অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা ঋষিগণ যোগবলে জ্ঞাত হইয়া সংসারের হিত কামনায় লোক-সমাজে প্রচার করেন। সেই ঋষি-প্রচারিত ধর্ম্মই সনাতন "হিন্দু-ধর্ম্ম"। সুতরাং ঋষিগণও হিন্দু ধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন। তাঁহারা নিত্যাবস্থিত ধর্ম্মের প্রচারক মাত্র। সেই ঋষি-প্রচারিত শ্রুতি সমূহই "বেদ" নামে প্রসিদ্ধ। অতএব বেদ ও অনাদি অপৌরুষেয়। ঋষিগণ বেদ বক্তা বৈ; বেদ কর্ত্তা নহেন।

এক্ষণ দেখিতে হইবে (হিন্দু-ধর্ম্ম কোন ব্যক্তি বিশেষের কল্পনা-প্রসূত ধর্ম্ম নহে। আদিমকালে মানব-জাতি মাত্রেই হিন্দু ছিল। ক্রমে মানব-জাতির সংখ্যাধিক্য হইলে অনাচার অত্যাচারদ্বারা অনেকে পূর্ণ-মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। এবং অনাচারিগণের সংশ্রবে ক্রমে সদাচারের মাত্রা হ্রাস হইতে থাকে। তৎকালে ধর্ম্ম প্রযোজকগণ হিন্দু-ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা ও সাংসারিক কার্য্যের সুব্যবস্থা জন্য গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম এবং ব্যবসায় বিভাগ করিয়াছিলেন। লোক-হিত কামনায় অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা মহাপুরুষগণ যোগ বলে প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্য।) স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার প্রবর্ত্তক, কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে কোন কার্য্যই করেন না। শক্তি-সম্পন্ন মনুষ্যেরদ্বারাতেই স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, সেই জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "চতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং" সুতরাং দেখিতে হইবে হিন্দু-ধর্ম্মের জাতিভেদও সাধারণ মানবের কল্পনা-প্রসূত "খেয়াল" নহে। জাতিভেদদ্বারাই হিন্দু-জাতির উন্নতি

এবং জাতিভেদ প্রথাই হিন্দু-ধর্ম্মের প্রধান উপাদান।

বর্ণ-বিভাগ করিয়া মুনি ঋষিগণ বর্ণ নির্ব্বিশেষে আচার ব্যবহারের বিভিন্ন নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন. সেই নির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহারই তত্তজ্জাতির বর্ণ-ধর্ম্ম; এবং সেই বর্ণ-ধর্ম্ম তত্তজ্জাতির উন্নতির নিয়ামক। ব্রাহ্মণের জন্য যে আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্দারা সাত্ত্বিকতাবৃদ্ধি দেহযোগ সাধনোপযোগী আয়ুবৃদ্ধি, মেধা স্মৃতি ধারণাদি মানসিক শক্তি-সঞ্চয়, ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতি গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। এবং তদ্দারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানোদয় হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করাই হিন্দু-ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, এবং এই জন্যই হিন্দু-ধর্ম্ম জগতের সমস্ত ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আধ্যাত্মিক জ্ঞান কি? তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্য সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিব। জ্ঞান, দুই প্রকার, যে জ্ঞানদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়, তাহার নাম বিষয়-গোচরজ্ঞান, বা সাধারণ জ্ঞান। সেই বিষয়-গোচরজ্ঞান সমস্ত প্রাণীতেই আছে। যথা "জ্ঞানমস্তিসমস্তস্য জন্তোর্ব্বিষয় গোচরে, বিষয়শ্চমহাভাগ জাতিশ্চৈবং পৃথক্ পৃথক্" (চণ্ডী)। বিষয়-গোচরজ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ জাতীয় প্রাণীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পশু পক্ষী কীটাদিতে যে বিষয়-গোচরজ্ঞান আছে, তাহা মনুষ্যে নাই। এবং মানবের বিষয়-গোচরজ্ঞান অন্য কোন শ্রেণীর প্রাণীতে নাই। অতি ক্ষুদ্র কীট স্বশরীর হইতে লূতাতন্তু বাহির করিয়া তদ্দারা যে অসামান্য শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে, মানব সহস্র গুণে বুদ্ধিমান্ হইলেও তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং মনুষ্যগণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সৌকার্য্যার্থ যতই কেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করুন না, তাহা স্বজাতীয় বিষয়-গোচরজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই জ্ঞানদ্বারা জীব-জগতে মানব জাতি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে নাই। কেবল বিষয়-গোচর জ্ঞানের তুলনা করিলে বরং মনুষ্য জাতি অনেক বিষয়ে অনেক জাতীয় প্রাণী অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। অপত্যলাভ মাত্রই স্ত্রী সংসর্গের প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য; পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী সেই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালন করে, অথচ বুদ্ধিমান্ মানব (অবৈধ সংসর্গকে পাশববৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়াও) স্বয়ং ব্যভিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। হিংসাবৃত্তিতে মানব জাতি হিংস্র ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষাও অধম। অধমপশু কুকুরগণ একমুষ্টি অন্নের জন্য পরস্পরে বিবাদ করিয়া ক্ষত বিক্ষত হয়, অথচ যে অন্নের জন্য বিরোধ; তাহা পদতলে দলিত বা কাকাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। সুসভ্য মানব জাতিতেও

ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পরাধীন মানব মানসিকবলের অভাবে সামান্য ধন বা ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড লইয়া পরস্পর বিবাদ (মামলা মোকদ্দমা) করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় বা জেলে যায়, অথচ যে সম্পত্তির জন্য বিরোধ, তাহা ঋণদায়ে অপরের ভোগ্য হইয়া থাকে। আবার যাহারা স্বাধীন জাতি, তাহারা সামান্য ভূখণ্ডের জন্য বিবাদ (মারামারি কাটাকাটি) করিয়া ধন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। স্বাধীন দেশের এক একটী যুদ্ধ বিগ্রহে কত জনপদ শ্মশানে পরিণত, কত পিতা মাতা সন্তান হীন, কত শিশু পিতৃহীন, কত ধনী অর্থের কাঙ্গাল, কত সতীর সতীত্বনাশ হয়, তাহার সংখ্যা নাই। লক্ষ লক্ষ নর-দেহ শৃগাল কুকুরের উদর পূর্ণ করে, নর-শোণিতে পৃথিবী রঞ্জিত হয়, নগর লুণ্ঠন, গৃহদাহ, স্ত্রী শিশু রুগ্ন বৃদ্ধের অকারণ জীবন নাশ প্রভৃতি কত প্রকার দুষ্ক্রিয়া সাধিত হয় তাহারও অন্ত নাই। কেবল স্বার্থের জন্যই মানব এ সমস্ত দুষ্ক্রিয়া সাধন করে, দেশহিত ব্যপ-দেশে মানবগণ যে নর শোণিত পিপাসু রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করে তাহা কি স্বার্থের রূপান্তর নহে? দেশের হিত কি স্বার্থ বর্জ্জিত? এবং সকলেই যে কেবল দেশের জন্য এই সমস্ত দুষ্ক্রিয়া করে তাহাও বলিতে পারি না। সামান্য অর্থের জন্য ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তি (বেতন গ্রহণ করিয়া) স্বজাতির বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিয়া আনন্দে প্রাণ সংহার করে। আহতের আর্ত্তনাদে শোণিত-পিপাসু রাক্ষস-হৃদয়ে অনুমাত্রও দয়ার সঞ্চার হয় না। অথচ সভ্য-জগৎ ঐ সমস্ত নরঘাতীর গুণ গান করিয়া দুর্ব্বল মানবকে নিষ্ঠুরতার অনুকরণ জন্য উত্তেজিত করে। কিন্তু একজন পরাধীন মনুষ্য যদি পত্নীর সতীত্ব রক্ষার্থ উত্তেজিত হইয়া শত্রুর প্রাণ বিনাশ করে, তবে রাজদ্বারে তাহার প্রাণদণ্ডের বা নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। অথচ বেতনভোগী ব্যক্তিগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিনা উত্তেজনায় সহস্র সহস্র মানবের জীবনান্ত, গৃহ-দাহ, নগর লুণ্ঠন, সতীত্বনাশ প্রভৃতি দুষ্কার্য্য করিয়াও সম্মানের অধিকারী হয়। সুতরাং দেখিতে হইবে সুসভ্য জাতি সংসার-সুখের জন্য যত প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারদ্বারা বিলাসের পথ সুগম করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করুন না কেন, কিন্তু সেই বিষয়-গোচর জ্ঞান ইতর প্রাণীর বিষয়-গোচর জ্ঞান হইতে উৎকৃষ্ট নহে। এই বিষয়-গোচর জ্ঞান ভিন্ন যে আর একটী জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এবং মানবজাতি চেষ্টা করিলে সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে বলিয়াই জীব-জগতে মানবের শ্রেষ্ঠতা। আমি পূর্ব্বে যে দুই প্রকার জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, তন্মধ্যে এই শেষোক্ত জ্ঞান তাহার অন্যতর। প্রথমোক্ত সাধারণ জ্ঞানের নাম বিষয়-গোচর জ্ঞান, ও শেষোক্ত জ্ঞানের নাম

আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা পরম জ্ঞান।

(আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহায়তায় মনুষ্য অবিনশ্বর সুখ (মোক্ষ) লাভ করিয়া থাকে।

সুখেচ্ছা জীবের সহজাত ধর্ম্ম, জীব মাত্রেই নিরন্তর সুখ ইচ্ছা করে, দুঃখ কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে মোক্ষ কল্পনাটী জীব-স্বভাব-সুলভ সুখস্পৃহা মূলক। নিরন্তর সুখেচ্ছার পরাকাষ্ঠাই মোক্ষ। সুতরাং মোক্ষরূপ জ্ঞান সকলের থাকুক বা না থাকুক কিন্তু তদ্রূপ অবস্থা বিশেষ প্রাপ্তির ইচ্ছা মনুষ্য মাত্রেরই আছে।

মোক্ষসাধক আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করাই ব্রাহ্মণ জাতির বর্ণ-ধর্ম্ম। এবং মোক্ষই হিন্দু জাতির চরম লক্ষ্য।) (আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

আমাদের বর্ণমালা।

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে মিসর দেশে প্রথমতঃ বর্ণমালার উৎপত্তি হয়। সেমিটিক জাতি মিসর দেশ হইতে বর্ণমালা শিক্ষা করেন; এবং সেমিটিক কুলোদ্ভব ফিনিসিয়াবাসিগণ ইয়োরোপে বর্ণমালা প্রচার করিয়াছেন।

প্রাচীন সাময়িক ইয়োরোপীয় জাতিগণ মধ্যে যুনানী এবং রোমকগণ শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে যুনানীগণ গুরু এবং রোমকগণ শিষ্য। অন্যান্য জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে অসভ্য বর্ব্বর ছিলেন; তাঁহারা আমমাংস ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষকোটরে বা মৃত্তিকা গহ্বরে বাস করিতেন। প্রাচীন কালে ফিনিসিয় নাবিকগণ ভূমধ্যস্থ সাগরের তীরবর্ত্তী নানাপ্রদেশে অর্ণবযানে গমন করিয়া বাণিজ্য করিতেন। ইহারাই প্রথমে যুনানীদিগকে বর্ণমালা শিক্ষা প্রদান করেন।

যুনানী ইতিবৃত্ত লেখক হিরদতাস লিখিয়াছেন যে টায়ারনগরবাসী ক্যাডমাস নামক এক ব্যক্তি কতিপয় ফিনিসিয়াবাসিগণ সহ প্রথমতঃ গ্রীশ দেশের অন্তর্গত বিয়সিয়া প্রদেশে আগমন করেন; কিন্তু বিয়সিয়াবাসিগণ তাঁহাদিগকে এই প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। তাঁহারা বিয়সিয়া পরিত্যাগ করিয়া জগদ্বিখ্যাত আথেন্স নগরে উপনীত হন এবং তথায় কিয়ৎকাল বাস করেন। ফিনিসিয়াবাসিগণ এই প্রদেশে বাস করার সময়ে যুনানীদিগকে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা

দেন ; বিশেষতঃ তাঁহারা তথায় বর্ণমালার প্রচার করেন। যুনানীদিগের মধ্যে ইহার পূর্ব্বে কোন প্রকার বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না। যুনানীগণ প্রথমতঃ এই বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা বর্ণমালার আকারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করেন। যুনানীগণ এই সময়াবধি বৃক্ষপত্রে এবং মেষ বা ছাগ চর্ম্মে গ্রন্থাদি লিখিতেন। (ক)

ভারতবর্ষে কিরূপে কোন্ সময়ে বর্ণমালার ব্যবহার আরম্ভ হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পাশ্চাত্যগণ বর্ণমালার জন্য সেমিটিকগণ নিকট ঋণী, এ জন্য কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত আমাদিগকে তাহাদের ন্যায় অধমর্ণ দলভুক্ত করিতে ইচ্ছুক, কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলেন যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসিগণ হইতে বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছেন।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতের বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন ; তাঁহাদিগের চেষ্টা, যত্ন এবং অধ্যবসায়ে প্রাচীন ভারতের নানা ঘটনার অব্দ নির্ণীত হইয়াছে। যুনানীগণের সেন্দ্রকতাস এবং ভারতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্ণয় হইয়াছে ; 'দেবানামপি প্রিয়দর্শী' পুরাণ বর্ণিত সম্রাট অশোকের নামান্তর মাত্র ইহা স্থির হইয়াছে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রভাবে বৈদিক গ্রন্থের পুনরুদ্ধার হইয়াছে ; তাঁহাদিগের প্রসাদে শ্রদ্ধাস্পদ দত্ত মহাশয় ঋগ্‌বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

কিন্তু এই সমস্ত গুণ থাকিলেও আমরা ইহা নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য যে তাঁহারা অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের বিশ্বাস মতে মাত্র খৃষ্টাব্দের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইদানীন্তন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ মধ্যে অনেকে খৃষ্টধর্ম্মের এই বাক্য বিশ্বাস করেন না ; কিন্তু প্রকাশ্যে অনেকেই ইহার বিরুদ্ধে কোন সত্য নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক হন না। এ জন্য অনেক সময়ে অব্দ নির্ণয় করিতে তাঁহাদের ভ্রম হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ মৌলিক তত্ত্বাবিষ্কারাভিমানী ; আসিয়ার বা আফ্রিকার কোন ব্যক্তি কোন মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্ট প্রমাণাভাবে স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের মূল নীতি এই যে, অন্য দেশীয় কোন ব্যক্তি কোন মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করার

(ক) হিরদতাস ২—৪৫৪৯।
৪—১৪৭।
৫—৫৭ হইতে ৫৯।

উৎকৃষ্ট প্রমাণাভাব হইলে তাহা ইয়োরোপীয়গণ আবিষ্কার করিয়াছেন ইহা অনুমান করিতে হইবে। এ জন্য অনেক সময়ে তাঁহাদের ভ্রম হইয়া থাকে।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোন কোন ইয়োরোপীয় পরিব্রাজক বৌদ্ধ মন্দিরের এবং প্রাচীন সাময়িক খৃষ্ট মন্দিরের সাদৃশ্য দর্শন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে গৃহীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কাল ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্মের বহু পূর্ব্বে প্রচার হইয়াছে বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে তথাপি তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের নীতি, বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতি হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না।

ভারতবর্ষে কোন্ সময়ে লিপি প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন যে বৈদিক সংহিতা রচনা সময়ে এ দেশে বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না; ইহা কতদূর সত্য তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন; মুখে মুখে সম্পূর্ণ গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া তাহা রক্ষা করা কিরূপ সম্ভব বুঝিয়া উঠাও কঠিন। কিন্তু এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে বর্ণমালা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হইয়াছে।

সম্রাট অশোক তাঁহার রাজত্ব কালে ভারতের নানাস্থানে কতকগুলি প্রস্তর-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। নিরক্ষর ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহ কেহ ইহা ভীমের গদা বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সমস্ত প্রস্তর-স্তম্ভে অশোকের সাময়িক নানা প্রকার আদেশ খোদিত আছে। এতদ্ব্যতীত পর্ব্বত-গাত্রে কতক কতক আদেশ খোদিত আছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জেমস্প্রিন্সেপ সাহেব এই সমস্ত শাসনবাক্যের পরিশুদ্ধ পাঠ এবং অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন। এই সমস্ত আদেশ দুই প্রকার বর্ণমালায় খোদিত। আফগানিস্থানের অন্তর্গত কপর্দ্দাগিরির শাসন এক প্রকার বর্ণমালায় এবং দিল্লী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানের শাসন অন্য প্রকার বর্ণমালায় উৎকীর্ণ। প্রথমোক্ত শাসনের বর্ণমালা সেমিটিক বর্ণমালার ন্যায় দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিকে পড়িতে হয়। শেষোক্ত শাসন আমাদের বর্ণমালার ন্যায় বাম হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে পড়িতে হয়।

ইতঃপূর্ব্বে সম্রাট অশোকের সাময়িক বর্ণমালার পূর্ব্ব সাময়িক উৎকীর্ণ কোন বর্ণমালা আবিষ্কার হইয়াছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার কপর্দ্দাগিরির অনুশাসন বাক্যের বর্ণমালা দৃষ্টে এবং তৎপূর্ব্ব সাময়িক কোন উৎকীর্ণ বর্ণমালা দৃষ্ট না হওয়াতে কতিপয় ইয়োরোপীয় পণ্ডিত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ অশোকের সময়ে সেমিটিক জাতি হইতে অথবা যুনানীগণ হইতে বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সমস্ত

যুক্তি একদা একদেশদর্শী।

তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে 'প্রাচীন আর্য্যজাতি' আসিয়াখণ্ডে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থ স্থানে বাস করার সময় তাঁহাদের মধ্যে বর্ণমালার প্রচলন ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার বর্ণমালা প্রচলিত থাকিলে ইদানীন্তন ইয়োরোপীয় জাতিগণের বর্ণমালা ও ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা এক শ্রেণীর হইত। প্রাচীন আর্য্য জাতির ইয়োরোপীয় বংশধরগণ সকলেই যখন সেমিটিক বর্ণমালা ব্যবহার করেন, এবং তাঁহারা স্বয়ং কোন প্রকার বর্ণমালা প্রচার করেন নাই, তখন ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ কোন প্রকার বর্ণমালা প্রচার করা সম্ভবপর নহে। এই যুক্তির প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধার করিলে এই বুঝা যায় যে, যুনানীগণ যখন সেমিটিক বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ কোন প্রকার বর্ণমালা প্রচার করা সম্ভব নহে। এই প্রকার যুক্তির প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক।

যুনানীগণ যে ফিনিসিয়গণ হইতে বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা পণ্ডিত হিরদতাস স্বয়ং লিখিয়াছেন এবং ইয়োরোপীয় বর্ণমালা পাঠে তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। সেমিটিক বর্ণমালা—আলেফ্, বে ইত্যাদি। যুনানী বর্ণমালা—আলফা, বিটা ইত্যাদি। ইংরেজী এ, বি ইত্যাদি। ইহাতে কোন প্রকার প্রভেদ নাই। এক প্রকার বর্ণমালা কেবল নানা দেশে নানা প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে এবং নানা দেশের রুচি ভেদে ও প্রয়োজন অনুসারে নূতন দুই একটী অক্ষর সংযোজিত হইয়াছে। আমাদের বর্ণমালার সহিত ইহার কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই।

ইয়োরোপীয় বর্ণমালায় এবং সেমিটিক বর্ণমালায় মাত্র কয়েকটী অক্ষর। তদ্দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখা সুকঠিন। আমাদের মধ্যে ত বর্গ এবং ট বর্গ দশটী অক্ষর প্রচলিত আছে। ইয়োরোপে এতাদৃশ দুই প্রকার বর্ণমালা দৃষ্ট হয় না। সেমিটিক জাতির মধ্যেও তাহা বর্ত্তমান নাই।

বাস্তবিক অশোকের সাময়িক ইসফজাই প্রদেশস্থ কপর্দ্দিগিরির অনুশাসন বাক্যের বর্ণমালা সম্বন্ধে আমরা প্রকৃত কারণ প্রদর্শন করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে যে স্থান আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থান বলিয়া কথিত হয়, পুরাকালে তাহা ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল। আফগান জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানাপ্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। বেলুচিস্থানের অন্তর্গত হিঙ্গলাজ অদ্যাপি হিন্দু সমাজে পীঠস্থান বলিয়া সমাদৃত। এই আফগানিস্থান মধ্যে মহাভারতে বর্ণিত গান্ধার প্রদেশ অবস্থিত। এক্ষণ ইহা কান্দাহার নামে পরিচিত। এই

আফগানিস্থান মধ্যে শালাতুর গ্রামে বৈয়াকরণ শ্রেষ্ঠ পাণিনি জন্ম গ্রহণ করেন মহাত্মা কর্ণেল টড বলেন যে যাদবগণ কালক্রমে এই আফগানিস্থানে আবাস স্থাপন করেন। কিন্তু পরিশেষে, আফগানিস্থানে নানা প্রকার ম্লেচ্ছ জাতির উপদ্রব আরম্ভ হয়। ইহার নিকটবর্ত্তী বেকট্রিয়া প্রদেশে যুনানীগণ একটী রাজ্য স্থাপন করেন। মহর্ষি পতঞ্জলি সম্ভবতঃ এই রাজ্যবাসিগণ সম্বন্ধে স্বীয় ভাষ্যে দুইটী উদাহরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথাঃ—অরুণৎ যবনঃ সাকেতম্। অরুণৎ যবনো মাধ্যমিকান্। যুনানী-সম্রাট সেকেন্দর আফগানিস্থান অধিকার করেন। এই সমস্ত কারণবশতঃ আফগানিস্থানে ম্লেচ্ছ জাতির আধিপত্য স্থাপিত হয়।

মুসলমান লেখকগণ তাহাদের রচিত নানাপ্রকার মুসলমানি কেচ্ছার গ্রন্থ আমাদের দেশীয় বর্ণমালায় মুদ্রিত করেন; কিন্তু তথাপি তাহারা প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে গ্রন্থের শেষভাগ হইতে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন।

যুনানীগণের প্রাদুর্ভাবে আফগানিস্থানের তদানীন্তন বর্ণমালায় বিদেশীয়ভাবে দক্ষিণ হইতে বামদিকে লিখিত হওয়ার প্রণালী প্রচলিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই সমস্ত শাসনবাক্য সর্ব্বসাধারণের পাঠের জন্য উৎকীর্ণ হইয়াছে। এজন্য তদানীন্তন প্রাদেশিক নিয়মে কপর্দ্দগিরির অনুশাসনবাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে অশোক নরপতির পূর্ব্ব সাময়িক উৎকীর্ণলিপি মধ্য ভারতের সাঞ্চী নামক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব অশোকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

বাস্তবিক অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে লিপি-প্রণালী প্রচলিত ছিল। মহর্ষি পাণিনি ভগবান্ বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। মহর্ষি পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণ, বর্ণমালা প্রচলিত থাকার অকাট্য প্রমাণ। পাণিনি ব্যাকরণে 'লিপিকর' পদের সাধন প্রণালী নির্দ্দেশিত আছে এবং গ্রন্থ-শব্দের উল্লেখ আছে।

মনুসংহিতাতে লিখিত আছেঃ—

বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্যচ্চাপিলেখিতং ৮। ১৬৮

এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থে লিখন প্রণালীর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অতএব সম্রাট অশোকের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে লিপি-প্রণালী প্রচলিত থাকা কোন মতেই সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

কোন কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বলেন ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ এ দেশের আদিম নিবাসিগণ হইতে বর্ণমালা শিক্ষা করেন। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পরে এ দেশীয় আদিম নিবাসীদিগকে কৃষ্ণবর্ণ দস্যু ইত্যাদি নানা প্রকার

কুৎসিতবাক্যে অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক তৎকালে আদিম নিবাসীদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করার সময়ে অনার্য্যগণ মধ্যে কেহ কেহ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিয়াছিল জ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ অনার্য্যগণ বৃক্ষ-কোঠরে বা মৃত্তিকা গহ্বরে বাস করিত। অনার্য্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ প্রণালীতে পারদর্শিতা লাভ করেন, তাহা অনুমান হয়। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের সভা জনৈক অনার্য্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

অনার্য্যগণ মধ্যে আর্য্যদিগের পূর্ব্বে বর্ণমালা প্রচলিত হওয়ার কোন প্রমাণ নাই। আর্য্যগণ অনার্য্যগণ হইতে সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। প্রমাণাভাবে আমরা স্বীকার করিতে পারি না যে আর্য্যগণ অনার্য্যগণ হইতে বর্ণমালা শিক্ষা করেন।

পূর্ব্বকালে এ দেশে যেরূপ বর্ণমালা প্রচলিত ছিল এক্ষণ আর সেরূপ বর্ণমালা প্রচলিত নাই। দেশের রুচিভেদে এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে এই সমস্ত বর্ণমালার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

বিভীষণ-চরিত্র।

(বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস)

বিরাট ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভাসক নিশানাথের সহিত গৃহ-আলোকারী ক্ষুদ্র দীপশিখা এবং গগনস্পর্শী গিরিবরের সহিত নগণ্য বল্মীকস্তূপ যতটুকু সাদৃশ্যের দাবী করিতে পারে, সরস্বতী-কণ্ঠ মহাকবি বাল্মীকির সহিত কবি কৃত্তিবাসের ততোধিক ঘনিষ্ঠতার দাবী সমীচীন নয়; এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত মত। এ কথাও ঠিক যে আদি কবির পাছে পাছে ছুটিতে যাইয়া কৃত্তিবাস অনেক স্থলেই ভূপতিত হইয়াছেন এবং সাগর ভূধরের বিশালত্ব ও বিভীষণ দৃশ্য অবলোকনে ভয়চকিত হৃদয়ে পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু ভূপতিতই হউন আর পশ্চাতেই সরিয়া দাঁড়ান কৃত্তিবাস অলস বা অসমর্থ ব্যক্তি নন, তিনি যখনই বাল্মীকির অনুসরণে অকৃতকার্য্য হইয়া দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখনই কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ন্যায় নূতন একটা কিছু আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন,—তাহার

ফলস্বরূপই আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণে দুই চারিটী নূতন দৃশ্য দেখিতে পাই। এমন স্থলও দুই একটী আছে, যেখানে আদর্শ অপেক্ষা প্রতিকৃতি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে—বাল্মীকির তুলিকা একই চিত্রের সর্ব্বত্র বর্ণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু কৃত্তিবাস আপাদমস্তক একই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া অপূর্ব্ব সাবধানতা ও অসামান্য কলা-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা আজ বিভীষণ-চরিত্র অবলম্বনে কথাটা বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে লিখিত আছে :—

"বিভীষণশ্চ ধর্ম্মাত্মা কৈকস্যাঃ পশ্চিমস্তুতঃ॥
তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ।
নভঃস্থানে দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রণদংস্তথা।
বাক্যঞ্চৈবান্তরিক্ষে চ সাধু সাধ্বিতি তত্তদা॥"

"ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কৈকসীর কনিষ্ঠ পুত্র। সেই মহাসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিবা মাত্র পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল, আকাশ-মণ্ডলে দেবতাগণের দুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল। সেই সময় অন্তরীক্ষে 'সাধু সাধু' এই কথা শ্রুত হইল।" কবি অপূর্ব্ব কৌশলে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, একটী নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষ দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস-কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তারপর বিভীষণ কষ্টসাধ্য তপশ্চরণে নিযুক্ত হইলেন. লোক-পিতামহ ব্রহ্মা স্তবে তুষ্ট হইয়া ভক্তের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন বিভীষণ নির্ব্বিকার চিত্তে বলিলেন—

"প্রীতেন যদি দাতব্যো বরো মে শৃণু সুব্রত।
পরমাপদ্গতস্যাপি ধর্ম্মে মম মতির্ভবেৎ॥"

"সন্তুষ্ট হইয়া যদি আমাকে কোন বর অবশ্য দেয় হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন, সুব্রত! অত্যন্ত বিপদে পড়িলেও ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে।" কি সাধুজনোচিত নম্র ও সংযত প্রার্থনা! এই স্থানেই বিভীষণ-চরিত্রের প্রথম ও চূড়ান্ত বিকাশ। কবি দুইটী মাত্র ছত্রে বিভীষণের সমগ্র হৃদয়টার পরিচয় প্রদান করিয়া অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, বিভীষণ ইচ্ছা করিলেই রাজচক্রবর্ত্তিত্ব ও অনন্ত সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিতেন, কিন্তু আপাতমধুর, পরিণামবিরস পার্থিব সম্পদের অসারত্ব এবং ধর্ম্মের মাহাত্ম্য তিনি বিশেষরূপ অবগত ছিলেন, তাই এতদুভয়ের মধ্যে ধর্ম্মই তাঁহার প্রার্থনীয় হইল।

তারপর রাক্ষস-রাজ রাবণের সভায় বিভীষণের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার-

লাভ ঘটে। রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রের প্রধান অনুচর কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সেই সভায় বন্দীভাবে অবস্থিত। সপরিষদ্ রাক্ষস-রাজ তাহার জীবন নাশের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। সে জনভূয়িষ্ঠা সভা নীরবে রাজার অন্যায় অনুজ্ঞা অনুমোদন করিল। কিন্তু অধর্ম্মের হাতে ধর্ম্মের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ বিভীষণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—তিনি রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি সম্মত বিবিধ উপদেশদ্বারা ভ্রাতাকে সে ধর্ম্মবিগর্হিত আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিলেন। শুধু ইহাতেই বিভীষণের প্রাণ শান্তিলাভ করিতে পারিল না; কারণ তখনও অশোক-কাননাবদ্ধা রঘুকুল-বধূর প্রত্যেক নিশ্বাসপাতে তাঁহার হৃদয়-তটিনীতে বান ডাকিতেছিল এবং সীতাহরণরূপ পাপকার্য্যের শোচনীয় পরিণাম তাঁহার অন্তর্চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশমান্ থাকিয়া তাঁহাকে অসহনীয় যন্ত্রণায় অধীর করিয়া তুলিতেছিল। তাই রাক্ষস-রাজ জানকীর সহিত যে পাপের বোঝা রথে চাপিয়া নিয়া আসিয়াছিলেন, জানকীর সহিত তাহা পুনরায় রামসকাশে পঁহুছাইয়া দিয়া ধর্ম্মের সম্মান এবং নিশ্চয়-মৃত্যুর হাত হইতে রাক্ষস-কুলকে রক্ষার নিমিত্ত উপদেশ-অনুরোধের শতবিধ ডালি রাজভ্রাতা বিভীষণ রাজসিংহাসন সমীপে উপস্থিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুই ফলোদয় হইল না অধিকন্তু বিভীষণকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইল।

বাল্মীকি এ পর্য্যন্ত বিভীষণ-চরিত্র যে শুভ্রোজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, সে বর্ণের তুলনা নাই। যে বর্ণপাত-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ। কৃত্তিবাস অনুকরণ করিতে যাইয়া তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার পরই বাল্মীকি বোধ হয় একটু অসতর্ক ও উন্মক্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তাই শ্বেত বর্ণের তুলিকা হাতে লইতে যাইয়া কৃষ্ণ বর্ণের তুলিকা তুলিয়া ফেলিয়াছেন। পাঠক! অপমানিত লাঞ্ছিত বিভীষণ শ্রীরাম-সকাশে উপস্থিত হইয়া কি নিবেদন করিতেছেন মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—

"অনুজো রাবণস্যাহং তেন চাস্ম্যবমানিতঃ।
ভবন্তং সর্ব্বভূতানাং শরণ্যং শরণাগতঃ॥
পরিত্যক্তা ময়ালঙ্কা মিত্রানি চ ধনানি চ।
ভবদ্গতং হি মে রাজ্যং জীবিতঞ্চ সুখানি চ॥"

"আমি রাবণের অনুজ সহোদর; তৎকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া লঙ্কা, মিত্র এবং ধনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করত আপনাকে সর্ব্বভূতের শরণ স্থল দেখিয়া শরণ লইলাম। এইক্ষণে আমার জীবন, সুখ ও রাজ্যলাভ সমস্তই আপনার অধীন।

ইহাই কি ধর্ম্মনিষ্ঠ বিভীষণের উক্তি! আজ বিভীষণের একি অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন! একদিন যাঁহার নিকট রাজ্য ধন ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি পার্থিব সম্পদ জীর্ণবস্ত্রখণ্ডবৎ উপেক্ষিত এবং ধর্ম্মই একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয় বিবেচিত হইয়াছিল, তিনি আজ রক্ষঃবৈরী রামচন্দ্রকে সর্ব্বশক্তির মূলাধার এবং পরিণামে তাঁহারই বিজয় লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, জীবন, সুখ ও রাজ্যলাভের জন্য রামচন্দ্রের চরণে শরণ লইলেন! কোন্ পাপে কাহার অভিশাপে আজ বিভীষণের এইরূপ অধঃপতন ঘটিল? কবি সাধ করিয়া বহুমূল্য শুভ্র পরিচ্ছদ বিভীষণের অঙ্গে তুলিয়া দিয়া, তাহা আবার মসী রঙ্গে কলঙ্কিত করিয়া বালস্বভাবের পরিচয় দিলেন কেন, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

বাল্মীকির অনুসরণকারী কৃত্তিবাস এ স্থলে স্বীয় গুরুর ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সতর্কতার সহিত ভিন্ন পথে পদার্পণ করিয়াছেন—

"* * * কহে বিভীষণ।
তোমার চরণে মাত্র লইব শরণ ॥
ইহা ভিন্ন যদি অন্য দিকে ধায় মন।
তবে আমি হই যেন কলির ব্রাহ্মণ ॥"

কৃত্তিবাসের বিভীষণকে পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনই দেখিতেছি; বরং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। জীবন অথবা রাজ্য-সুখ লাভের স্পৃহা কিংবা রাবণ কর্ত্তৃক কৃত অপমানের প্রতিশোধ-বাসনা তাঁহাকে রামের চরণ সমীপে উপস্থিত করে নাই,—তিনি শতবিধ চেষ্টায়ও যখন রাক্ষস-রাজকে ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে অসমর্থ হইলেন; যখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে সঙ্ঘর্ষণ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন অনন্ত সুখৈশ্বর্য্য ভোগের দুষ্পরিহার্য্য বাসনা অথবা প্রিয়তম স্ত্রী পুত্রের দুশ্ছেদ্য মায়া-বন্ধন বিভীষণকে পাপের লীলা-নিকেতন লঙ্কার রাজপুরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না—তিনি ধর্ম্মের বিজয় কামনা বুকে লইয়া রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন।

কৃত্তিবাসের লেখনী ইহাতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না; বুঝি ধর্ম্মের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয় নাই, বুঝি বুকের রুধির ব্যতীত ধর্ম্মের তর্পণ হয় না। তাই কৃত্তিবাস রক্ষঃবীর তরণীসেনকে, রামচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে লঙ্কার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেন। তরণীসেন রামচন্দ্রের পরম বন্ধু বিভীষণের পুত্র। বিভীষণ জানিতেন তরণীসেনের প্রকৃত পরিচয় পাইলে, রামচন্দ্র তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করা অপেক্ষা সীতা-উদ্ধার বাসনায় জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক

পঞ্চবটীর বিজন বনে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিবেন। সুতরাং উহাদ্বারা অধর্ম্মের প্রতি প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। সেই জন্য তিনি তরণীসেনকে রামচন্দ্রের নিকট পরিচিত করিতে যাইয়া বলিলেন—

" * * শুন রাজীবলোচন।
রাবণের অন্নেতে পালিত একজন॥
সম্বন্ধেতে ভ্রাতৃঃপুত্র পরিচয়ে জ্ঞাতি।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক পুত্র বড় যোদ্ধাপতি॥"

শুধু ইহাই নয়, কোন্ অস্ত্রে পুত্রের জীবন হনন শক্তি বিদ্যমান পিতা অবিকল্প চিত্তে সমর-ক্লান্ত রামচন্দ্রের নিকট তাহা নিবেদন করিতেছেন—

"শুন প্রভু রামচন্দ্র করি নিবেদন।
ব্রহ্ম অস্ত্রে হইবেক ইহার মরণ॥"

মরি! মরি! কি অপূর্ব্ব চিত্র! এ চিত্র কৃত্তিবাসের স্বকপোল কল্পিত। বাল্মীকি-রামায়ণে এ চিত্রের অস্তিত্ব নাই। জগতের সাহিত্যে এ চিত্রের তুলনা নাই যে সাহিত্যে এরূপ সজীব ধর্ম্ম-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত সে সাহিত্য ধন্য। যে দেশের লোকের এরূপ পাপক্ষয়কারী বিগ্রহ সন্দর্শনের সুযোগ আছে সে দেশের লোক মহাপুণ্যবান্।

পাঠক! এখন তোমাকে লঙ্কার ভয়াবহ সংগ্রামের অবসান-মুহূর্ত্তে উপস্থিত করিব। অতুল সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী, দেব-দানবসেবিত ত্রৈলক্য-বিজয়ী রাক্ষস-রাজ দশানন রাম-সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন দেখিয়া, বাল্মীকির বিভীষণ, সুগ্রীব ও অঙ্গদ প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে রামের নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল। তারপর বিভীষণ ভ্রাতার মৃতদেহ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—"আপনি নিহত হইয়াছেন বলিয়া অদ্য ধার্ম্মিকগণের সেতু ভগ্ন হইল, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম নষ্ট হইল ইত্যাদি।" এ ক্রন্দনের ভিতরে প্রাণ নাই; লৌকিকতা রক্ষার্থ ক্রন্দন করিতে হয় বলিয়া, এ ক্রন্দন; ইহার সহিত অন্তরের সহানুভূতি নাই; বরং এ ক্রন্দনের ভিতরে অন্তরের একটু ব্যঙ্গভাব প্রকটিত। যাহারা আমাদের এ উক্তি সন্দিহান চিত্তে পাঠ করিবেন, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি—

"ত্যক্তধর্ম্মব্রতং ক্রূরং নৃশংসমনৃতং তথা।
নাহমর্হামি সংস্কর্ত্তুং পরদারাভিমর্শিনম্॥

ভ্রাতৃরূপো হি মে শক্রেষ সর্ব্বাহিতে রতঃ।
রাবণ নার্হতে পূজাং পূজ্যোঽপি গুরু গৌরবাৎ ॥”

“এই ক্রূর নিশাচর চিরকাল ধর্ম্মত্যাগী, কেবল পরস্ত্রী হরণ করিয়া বেড়াইয়াছে। আমি ইহার সৎকার করিতে ইচ্ছা করি না। দশানন নামে আমার এক ভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু চিরকাল শত্রুর ন্যায় অহিত কার্য্য সকলই করিয়াছেন; অতএব গুরু গৌরব বশতঃ আমার পূজ্য হইলেও আমার পূজা করিবার উপযুক্ত নহেন।” এই কি ভ্রাতৃশোক কাতরতার পরিচিহ্ন! এই কি তত্ত্বজ্ঞানী সাধুসজ্জনের বাক্য এবং আচরণ! সুকর্ম্মের পুরস্কার এবং কুকর্ম্মের তিরস্কার আত্মারই প্রাপ্য, এই পাঞ্চভৌতিক দেহটার সঙ্গে তাহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। কর্ত্তার ইঙ্গিতে ভৃত্য পরিচালিত সুতরাং লাভালাভ যশঃ অপযশ কর্ত্তারই প্রাপ্য, ভৃত্যের নহে। যে ব্যক্তি পাপচারীর প্রাণহীন দেহটার প্রতিও সমুচিত সম্মান প্রদর্শনে অসমর্থ, নিশ্চয় বলিব, তিনি হিংসায় বনের শার্দ্দূল কেশরীকেও পরাস্ত করিয়াছেন, ধর্ম্মের মূল সূত্রটী পর্য্যন্ত তাহার অভ্যস্ত হয় নাই।

কৃত্তিবাসের বিভীষণ সেরূপ নহেন। রাবণের মৃতদেহ সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয় প্রকৃতই শোকাকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভ্রাতার শবদেহ কোলে করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কত কথা তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল,—কখন ভ্রাতার কুমতি ঘটিয়াছিল বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, কখন বলিতেছেন “কার তরে দিয়া যাও লঙ্কা অধিকার।” কখন বা ভ্রাতার মুক্তিপ্রার্থী হইয়া শ্রীরাম সমীপে নিবেদন করিতেছেন—“তুমি বিনা গতি আর নাহি নারায়ণ।” কবি বলিতেছেন “বিভীষণের ক্রন্দনে শ্রীরাম দুঃখ মন।” ইহাদ্বারাই ক্রন্দনের গুরুত্ব ও সজীবতা প্রকাশ পাইতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন মৃত্যুশোকে অধীর হওয়া ধর্ম্মাত্মার লক্ষণ নহে। এ কথার উত্তরে বলিব শোকের প্রথম আক্রমণে চঞ্চল হওয়া প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ইহার বিপরীত ভাব হৃদয়হীনতারই পরিচয় দেয়। সাক্ষাৎ ন্যায়-ধর্ম্মের অবতার রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের শক্তিশেলাহত অবস্থায় এ কথা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই।

আমরা বিভীষণ-চরিত্রের সকল প্রধান অংশেরই আলোচনা করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাল্মীকির বিভীষণ সাধারণের সম্মুখে আদর্শ পুরুষরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই; অন্য পক্ষে কৃত্তিবাসের বিভীষণ ধর্ম্মাগ্রগণ্যগণের পুরোভাগে আসন পরিগ্রহ করিবার অতি সঙ্গতদাবী প্রতিষ্ঠিতই

উপস্থিত করিবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বাল্মীকি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই লিপি করিয়াছেন, সুতরাং বিভীষণ-চরিত্রের অপকর্ষজনিত নিন্দাবাদ তাঁহার প্রাপ্য নহে। আমরা বলি এ কথা ঠিক নয়, রামায়ণ শুধু দ্রষ্টব্য ঘটনা লইয়াই রচিত হয় নাই—সত্য মূলে মাত্র, সপ্ত প্রকোষ্ঠময় সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদটী বাল্মীকির মহতী কল্পনারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। বাল্মীকি কল্পনার পৃষ্ঠে আরোহণ করত সত্যের সীমা-রেখা লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীনভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়াছেন, সুতরাং স্থলবিশেষে সত্যের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া বাল্মীকিকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

শুষ্কমালা।

শুকায়ে গিয়াছে এত যতনের হার,
একে একে ফুলরাশি, ভূতলে পড়িছে খসি'
বিলুপ্ত হয়েছে নব সুরভি সম্ভার;
তবু তাহা ঘৃণা ক'রে, দেইনি ফেলিয়া দূরে
রাখিতেছি বুকে ধ'রে আ'জ অনিবার;
বিশুষ্ক এ মালিকায়, কি জানি কি আছে হায়
পরাণ শিহরে উঠে পরশে তাহার!
কত কি মরম কথা, যেন তা'য় আছে গাঁথা;
প্রত্যেক কুসুমে যেন ইতিহাস কার!
তাই আ'জ শুষ্কমালা, ফেলি নাই করি হেলা
রেখেছি নির্ম্মাল্য হেন প্রিয় দেবতার!
শুকায়ে গিয়াছে এত যতনের হার!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

ভ্রম সংশোধন—ফাল্গুন সংখ্যা "আরতি"তে প্রকাশিত "রাজা রঘুনাথ সিংহ" শীর্ষক প্রবন্ধের (৪৫ পৃষ্ঠায় ১১শ ও ১৪শ ছত্রে) লিখিত "রওনা" গ্রামের স্থলে "বওলা" গ্রাম হইবে।

খেদা প্রবন্ধে যে সকল ভুল রহিয়াছে তাহা আগামীবারে সংশোধিত হইবে।

 ৫ম বর্ষ   ৪র্থ সংখ্যা। 



আরতি





মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।





সারস্বত সংস্করণ।



    বৈশাখ, ১৩১২।



বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

সূচী।

লেখকগণের নাম।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার এম, এ, বি, এল, শ্রীমনোমোহন সেন, শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী, শ্রীমোহিনীশঙ্কর রায় ও সম্পাদক।

নিবেদন।

৪র্থ সংখ্যা "আরতি" প্রকাশিত হইল। আজও যাঁহারা মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের "আরতি" ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইতেছে। আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

ম্যানেজার—"আরতি"।

৫ম বর্ষের মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

২৬১নং	শ্রীযুক্ত	লোকনাথ সাহা	সদর	১৷৷০
৩৯৩নং	,,	হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	রামগোপালপুর	১৷৷০
৪৫১নং	,,	পূর্ণচন্দ্র রায় মোক্তার	কিশোরগঞ্জ	১৷৷০
৬০৫নং	,,	কৃষ্ণনাথ বিদ্যারত্ন	গুজিয়াম	১৷৷০
৬১৪নং	,,	রাজচন্দ্র কর পোষ্টমাষ্টার	ন্যামতপুর	১৷৷০
৬৭৩নং	,,	তমসারঞ্জন দত্ত	সদর	১৷৷০
৬০৬নং	,,	বিজ্ঞানেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	বাখরাবাদ (কটক)	১৵০

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। ময়মনসিংহ, বৈশাখ ১৩১২। চতুর্থ সংখ্যা।

জন্মভূমি।

অভ্রভেদী চূড়া যার গিরি হিমবান্,
নিম্নে নীল সিন্ধুচ্ছ্বাস চুম্বে পদতল,
সুকণ্ঠে স্বর্ণদী-হার সদা শোভমান্,
ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, দুই কনককুণ্ডল ;
দুই ভুজ ঘাট-গিরি শোভে দুই পাশে,
হৃদয়ে নিহিত শত মণিপূর্ণ খনি,
অঞ্চলে অনন্ত সুধা বিশ্ব-ক্ষুধা নাশে,
লুণ্ঠিতা—ক্ষুধিতা ওই দুঃখিনী জননী।
যার শিল্প, যার বেদ, সাহিত্য জ্যোতিষ,
করেছে ব্রহ্মাণ্ডময় জ্ঞানের প্রচার,
কি অদৃষ্ট হায় তার! দুঃখে অহর্নিশ
বিগলিত অশ্রু নেত্রে, মুখে হাহাকার।
হে বিধি! আসিবে কবে তোমার বিধান,
পতনান্তে হবে পুনঃ শুভ অভ্যুত্থান?

শ্রীমনোমোহন সেন।

ময়মনসিংহের প্রাচীন ও বর্ত্তমান সম্পদ। *

অতি প্রাচীনকালে ময়মনসিংহের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ময়মনসিংহের অধিকাংশই তখন বোধ হয় মহাভারতোক্ত লৌহিত্য সমুদ্রের বিশাল গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। লৌহিত্য সমুদ্র ও এ জেলার অন্যান্য নদ-নদীর আয়তন এবং ভূমিগত প্রাকৃতিক অবস্থার কথা চিন্তা করিলে মনে হয় শুধু এ জেলার নয়, পূর্ব্ববঙ্গেরও প্রায় সর্ব্বত্রই তখন ব্রহ্মপুত্র এবং বঙ্গোপসাগরের সম্মিলিত বারিগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। কালে চর পড়িয়া স্থলভাগের ক্রমবিস্তার ও জলভাগের সঙ্কীর্ণতা ঘটিয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে সমস্ত ময়মনসিংহ কামরূপের অন্তর্গত ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আর যদি তাহা থাকিয়াও থাকে, ময়মনসিংহ কিরূপে কামরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্ত্তমান জেলার আকারে পরিণত হইয়াছে তাহা ঐতিহাসিকগণেরই বিচার্য্য। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার মীমাংসা হইতে পারে না।

ময়মনসিংহের শ্যামল প্রান্তর যখন জলধি-গর্ভ হইতে উত্থিত হইতে ছিল, তখন অসভ্য বন্য অধিবাসিগণ আসিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিল। কোচ, হদি, হাজং এবং অন্যান্য অসভ্য জাতিগণ এ জেলার প্রাচীন অধিবাসী। পূর্ব্ববঙ্গ যখন সেনবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন ছিল, তখন হইতেই হিন্দুগণ এ জেলায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তখন এ জেলায় মুসলমানের নাম গন্ধও ছিল না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানদিগের হস্তগত হইলে, প্রায় ২৫০ বৎসর এ দেশে পাঠান রাজত্ব চলিয়াছিল। মুসলমানেরা তখন হইতেই এ জেলায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে সমগ্র ভারত অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তখনকার ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করা বড়ই কঠিন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ জেলার স্থানে স্থানে বহু হিন্দু ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বাস করিতেছিলেন। এই সময় কিশোরগঞ্জ উপবিভাগে নারায়ণ দেব নামে একজন কবি জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে আকবর সাহ সমগ্র বঙ্গদেশ মোগলসাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। ইহার অত্যল্প কাল পরেই দ্বাদশ ভৌমিকের নেতা ঈশা খাঁ জঙ্গলবাড়ী অধিকার করেন

* ময়মনসিংহ সারস্বত কৃষি-শিল্প-সাহিত্য প্রদর্শনী উপলক্ষে লিখিত ও পুরস্কৃত। আঃ সঃ।

ও স্বীয় আধিপত্য বিস্তারকল্পে সুদৃঢ় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া, সৈন্যবল বাড়াইতে আরম্ভ করেন। এইরূপ স্বাধীন আধিপত্য বিস্তারের কথা বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে, ঈশা খাঁকে ধৃত করিবার জন্য সম্রাট রাজা মানসিংহকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মপুত্র তটে এগারসিন্দুর দুর্গে উভয়ের বল পরীক্ষা হইলে, মানসিংহ পরাজিত হইয়া ঈশা খাঁর সহিত বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। মানসিংহ-পত্নীর অনুরোধে ঈশা খাঁ দিল্লী যাইয়া তথায় অন্যায়রূপে কারারুদ্ধ হন। কিন্তু অচিরেই মানসিংহ এবং সম্রাট-মহিষীর অনুরোধে আকবর ঈশা খাঁকে মুক্তি প্রদান করেন এবং সসম্মানে তাঁহাকে স্বীয় মস্নদের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া 'মস্নদালী' উপাধি ও বাইশ পরগণার নিষ্কর আধিপত্য প্রদান করিয়া দ্বাদশ জন অমাত্যসহ ঈশা খাঁকে এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। ঈশা খাঁর অমাত্য প্রসিদ্ধ মজলিস্ জালালের আবাস গ্রাম রোয়াইল বাড়ীর ভগ্ন অট্টালিকার কারুকার্য্য এবং স্ফটিক স্তম্ভাদি আজ পর্য্যন্তও দেশীয় স্থপতিবিদ্যার চরম উৎকর্ষের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ প্রদেশই ঈশা খাঁর শাসনাধীন ছিল। এই সময়ে সুসঙ্গ-মহারাজগণের আদি পুরুষ বুদ্ধিমন্ত খাঁর বংশধর রাজা রঘুনাথ ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ ও লাঞ্ছিত হন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজা রঘুনাথ দিল্লী গমন করিলেন এবং কোন কার্য্যোপলক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া, ঈশা খাঁর অধীনতা পাশ হইতে মুক্তি ও বাদসাহ হইতে পৃথক্ সনন্দদ্বারা রাজোপাধি লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাজা রঘুনাথের পূর্ব্ব পুরুষগণ ঈশা খাঁর পূর্ব্ব হইতেই সুসঙ্গে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। ঈশা খাঁর শাসন সময়ের অল্পকাল পরেই গফরগাঁও থানার অন্তর্গত ফরিদপুরে "খানে আলমের" দীর্ঘিকা ও কিশোরগঞ্জের অন্তঃপাতী চারিপাড়া গ্রামের "কুটামন" নামক বিশাল দীর্ঘিকা কর্ত্তিত হয়। এরূপ বিশাল দীর্ঘিকা এ অঞ্চলে আর নাই। প্রবাদ আছে যে "কুটামন" দীঘীর তীরে "নবরঙ্গ" নামে এক রাজার বাড়ী ছিল। মৃত্তিকা-প্রোথিত ইষ্টকরাশি ভিন্ন সেই রাজবাটীর চিহ্নমাত্র এখন আর নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ জেলা বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ ভদ্রলোকগণের আবাসভূমি হইয়া উঠে। এই সময় এ জেলায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা চলিয়াছিল। এই সময়ে নেত্রকোণার অন্তর্গত কাটিহালী গ্রামে পরমহংস পূর্ণানন্দগিরির আবির্ভাব হয়। পূর্ণানন্দ "শাক্তক্রম" "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" "শ্যামারহস্য" "তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী" এবং তাঁহার গুরু ব্রহ্মানন্দ "শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী" ও 'তারারহস্য' নামক দুইখানি

গ্রন্থ রচনা করেন। তখনকার হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষরূপ শিক্ষিত ছিলেন। এই সময় এ জেলায় বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। গুপ্তবৃন্দাবনের সংস্কারক মাধবাচার্য্য "চণ্ডী" ও "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মাধবাচার্য্যই বোধ হয় এতদ্দেশে সর্ব্বপ্রথম চৈতন্য-ধর্ম্ম প্রচার করেন। আটিয়ার নিবিড় অরণ্য আজও তাঁহার নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। এই সময়ে টাঙ্গাইল উপবিভাগে রূপনারায়ণ ঘোষের জন্ম হয়। তিনি "চণ্ডীর অনুবাদ" ও "দুর্গামঙ্গল" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এ জেলায় যে কয়েক জন কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নামও এই স্থানেই উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে টাঙ্গাইল উপবিভাগে "মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর" অনুবাদক অন্ধকবি ভবানীদাসের জন্ম হয়। এবং এই শতাব্দীর শেষভাগে বাজিতপুর থানার নিকটবর্ত্তী সাহাপুর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে অনন্তরাম দত্তের জন্ম হয়। ইনি "ক্রিয়াযোগসার" "লবকুশের যুদ্ধ" ও 'নৈষধ" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরীকৃত "বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলীর" অনুবাদক কবি কৃষ্ণদাসও এই সময়েই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কিশোরগঞ্জের অন্তঃপাতী বনগ্রামে রামেশ্বর নন্দী জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কাশীদাসের ন্যায় অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত এবং অন্যান্য নিত্য ক্রিয়া-কলাপের পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। রামেশ্বরের রচিত মহাভারত "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" গৃহে ও 'গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীতে' সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেখক বাবু দীনেশচরণ সেন ভ্রম বশতঃ রামেশ্বরের জীবিত কাল ১০০ শত বৎসর পরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামেশ্বরের কিছুকাল পরে দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মপুরাণ লিখিত হয়। বংশীদাস একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত "কৃষ্ণগুণার্ণব" গ্রন্থ তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। গঙ্গানারায়ণ দেবের নিবাস কিশোরগঞ্জের অন্তঃপাতী ধারীশ্বর গ্রামে। ইনি বর্গীর হাঙ্গামার সময় জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগের হিসাব নিকাশ করিতে মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন। এই সময়ে উক্ত প্রদেশ বর্গীর হাঙ্গামায় উৎসন্ন হইয়া যায়। কবি সেই বিপ্লব বর্ণনা করিয়া "ভাস্কর পরাভব" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানা বহু জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিকতত্ত্বে পরিপূর্ণ। "শোকসংবাদ" ও "লবকুশের চরিত্র" নামক তাঁহার আরও দুইখানি গ্রন্থ আছে। গঙ্গানারায়ণের

সময়ে উক্ত গ্রামে জগন্নাথ দাস নামক একজন সাধক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'দুর্গাপুরাণ" একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। তিনি 'নিগম' 'হাড়মালা' প্রভৃতি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনসঙ্গীতগুলি প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট বড়ই আদরে গৃহীত হইত। সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহও এই সময়েই "ভারতী-মঙ্গল" "রাগমালা' "পদ্মপুরাণ" ও "মনসা-পাঁচালী" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে এ জেলার বাজার দর অত্যন্ত সস্তা ছিল. এই সময় এতদঞ্চলে টাকায় আট মণ চাল বিক্রয় হইত। ক্রমে বাজার দর বৃদ্ধি পায় এবং মুর্শিদকুলি খাঁর সময় টাকায় চারি মণ চাল বিক্রয় হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুনরায় চালের দর কমিয়া যায়, সরফরাজ খাঁর শাসন সময়ে এই প্রদেশে পুনরায় চালের মণ দুই আনা হইয়াছিল। বাজার দর এইরূপ ভাবে কতদিন চলিয়াছিল তাহা জানা যায় না। এই শতাব্দীর মধ্যভাগেই মুসলমানদিগের অদৃষ্টাকাশে কাল মেঘের সঞ্চার হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাদসাহদিগের "সমুদয় মানব জাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গভূমি" ইংরেজ বণিকদিগের হস্তগত হইল। ঈশা খাঁর বাইশ পরগণার মধ্যে এগারটী আরঙ্গজেবের আমলেই তাঁহার বংশধরদিগের হস্তচ্যুত হইয়া বর্ত্তমান অন্যান্য জমিদারদিগের আদি পুরুষগণের সহিত বন্দোবস্ত হইয়া যায়। এখন আরও চারিটী পরগণা তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। এই সময় হইতে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগেরও অধঃপতনের সূত্রপাত হইল।

এ জেলায় ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে লোকের অবস্থা একরূপ মন্দ ছিল না। লোকের ধন ধান্য ছিল, স্বাস্থ্যও বাহুবল ছিল; "হা অন্ন হা অন্ন" করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া মরিবার আবশ্যকতা ছিল না। লোকের অভাব অল্প হইলে দুঃখও অল্প হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সভ্যযুগের বিলাসিতা তখনও সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই। মোটা ভাত মোটা কাপড়েই লোকের দিন চলিত। লোকে ঘরে বসিয়া হাতের লেখা রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত ও প্রফুল্লচিত্তে সাংসারিক কার্য্য সমুদয় নির্ব্বাহ করিত। যুবকগণ লাঠী খেলিত, তরবারি ভাঁজিত এবং আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইত। দেশে, বিদেশী জিনিসের আমদানীর আবশ্যক হইত না। কৃষকগণ কোনও রূপে ক্ষেত্রে একমুষ্টি শস্য ছড়াইয়া দিতে পারিলেই শস্য-সম্পদে গৃহ-প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া যাইত। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা গৃহ-কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া বিকাল বেলায় নিজ নিজ চরকায় সূতা

কাটিত। স্ত্রীলোকেরা বাতির তৈলের জন্য 'ভেরণা" এবং "বৈশ্বরাজের" বীচি হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া লইত। কেরোসিন অথবা রেড়ী তৈলের অভাবে কাহারও গৃহে প্রদীপ জ্বলিত না, এমন শুনা যায় নাই। মামলা মোকদ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। কেহ কোনও অপরাধ করিলে গ্রামের মধ্যে যিনি মাতব্বর তিনিই তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। গুরুতর অপরাধের জন্য সমাজের উপর শাসনভার অর্পিত হইত। অবসর সময়ে সকলেই গান বাজনা করিয়া সময় কাটাইত। 'ঘাটু' পদ্মপুরাণ' 'কবি' এবং 'দুর্গাপুরাণ' ইত্যাদি গান তখন সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এ জেলার যে কয়জন প্রাচীন লেখক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে "স্বরূপ-চরিত্র" প্রণেতা রঘুনাথ দাস, 'দুর্গাপুরাণ' "কালীপুরাণ" এবং "পদ্মপুরাণ" রচয়িতা মুক্তারাম নাগ, "দারাশেকোর" অনুবাদক সদানন্দ মুন্সী, "সন্দ্বীপ-বর্ণনা" রচয়িতা শোভারাম মুন্সী, "সত্যমঙ্গল" প্রণেতা আরাধন বাগচী, "উদ্ধব-গীতা" প্রণেতা বিষ্ণুরাম নন্দী, কাশীখণ্ডের অনুবাদক কেবলচন্দ্র বসু, "জগদ্ধাত্রী-গীতাবলী" রচয়িতা রাজা জগন্নাথ সিংহ, "চণ্ডীকাব্য" রচয়িতা রামানন্দ এবং "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" রচয়িতা রামগোপাল দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ রাজত্ব ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই এ দেশে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ভীষণরূপে দেখা দিল। এই সময় বহুলোক অন্নাভাবে স্ত্রী পুত্র বিক্রয় ও শেষে নিজকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছিল। দরিদ্র লোকেরা পেটের জ্বালায় তখন আহার পাইলেই মজুরী করিত। এই সময়ে মধুপুরের বার তার্থের সুবৃহৎ পুষ্করিণীর সংস্কার এবং কিশোরগঞ্জের পরামাণিকদিগের একুশরতন ও বিশাল দীর্ঘিকার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিশোরগঞ্জের প্রসিদ্ধ ঝুলন মেলা এই বাড়ীর প্রাঙ্গনেই বসিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ সুন্দর বাড়ী আর ছিল না। ১৩০৪ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে বাড়ীটীর সম্পূর্ণরূপ ধ্বংস সাধিত হইয়াছে। ১৭৭৮ সনের ১লা মে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এখানে জেলা স্থাপন করেন। কিন্তু দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। ইংরেজ-শাসনকাল হইতে দেশের ইতিহাসও নূতন আকার ধারণ করিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতেই ভূম্যধিকারিগণের অবস্থা উন্নত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান সময়ে ময়মনসিংহ বঙ্গদেশের একটী প্রধানতম জেলা। এখন এ জেলায় বহু জাতীয় এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস।

এ জেলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় তিন গুণ। এবং মুসলমান ব্যতীত ব্রাহ্ম এবং খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক এ জেলায় বাস করেন।

১৮৪৬ সনে এ জেলায় সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। সর্ব্বপ্রথমে নারায়ণগঞ্জে একটী মধ্যইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ সনে গবর্ণমেণ্ট জিলাস্কুল ও ১৮৬৪ সনে এই নগরে একটী নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ সনে সন্তোষের জমিদার স্বনামধন্যা জাহ্নবী চৌধুরাণী স্বকীয় আবাস গ্রামে "জাহ্নবী স্কুল" নামে একটী এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপন করেন। ইহাই এ জেলার সর্ব্বপ্রথম বেসরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের "নিম্নশিক্ষা বিষয়ক" মন্তব্য প্রকাশিত হইলে বহু প্রাইমেরী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩ সনে এই নগরে Mymensingh Institution প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমেই শিক্ষার স্রোত দেশময় বিস্তারিত হইল। এবং লোকের মন শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। সেই ফলেই বর্ত্তমান সময়ে এ জেলায় উক্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮টী হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মধ্যইংরেজী স্কুলের সংখ্যা ৫৬টী, মধ্যবাঙ্গালা স্কুলের সংখ্যা ৫৮টী, উচ্চপ্রাইমেরী স্কুলের সংখ্যা ২৫৯টী, এবং নিম্নপ্রাইমেরী স্কুলের সংখ্যা ১৫৬০টী। ইংরেজী শিক্ষা এ জেলায় এখনও তেমন প্রাবল্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ এ জেলায় ভদ্রলোক অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোক-সংখ্যা অধিক এবং ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত অল্পদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ চাকুরীজীবী লোকের সংখ্যা এ জেলায় অত্যন্ত কম ছিল। অল্পদিন যাবৎ লোকসমূহ উদরান্নের জন্য চাকুরীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। অবস্থার সচ্ছলতা বশতঃই হউক অথবা পূর্ব্বে মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ে ভূমির স্বল্প আয়েই ভদ্রলোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত বলিয়াই হউক, এ জেলার লোক বাড়ী ছাড়িয়া চাকুরীর জন্য বিদেশে যাইতে নারাজ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। তাই বাধ্য হইয়া সকলেই এখন চাকুরীর জন্য শিক্ষালাভ করিতে মনোযোগী হইয়াছে। শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের অভাবে এ জেলা বাসীর শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিতেছে দেখিয়া, সন্তোষের স্বনামখ্যাত জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় নিজ ব্যয়ে প্রমথ-মন্মথ কলেজ স্থাপন করিয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। ১৯০১ সনে মিঃ এ, এম, বসুর যত্নে এই নগরে Mymensingh City College প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এ জেলায় ১১টী মাদ্রাসা এবং ৩৪টী টোল আছে। বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য Alexander Girls' School

নামে একটী মধ্যবাঙ্গালা স্কুল ছিল। ১৯০৪ সনে এই বিদ্যালয়টীকে Entrance স্কুলে পরিণত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় এই জেলায় ১২টী উচ্চ প্রাইমেরী এবং ২৪৫টী নিম্নপ্রাইমেরী বালিকা বিদ্যালয় আছে। অন্তঃপুর-স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার জন্য এই নগরে বহুপূর্ব্বে "অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা সমিতি" নামে একটী সমিতি ছিল। কালে তাহা উঠিয়া যায়। অতঃপর কলিকাতা প্রবাসী ময়মনসিংহবাসিগণের যত্নে "ময়মনসিংহ সম্মিলনী সভা" নামে একটী সভা কলিকাতায় স্থাপিত হয়। সম্মিলনীর চেষ্টায় অন্তঃপুর-স্ত্রী-শিক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষা গৌরবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে মিঃ আনন্দমোহন বসু সর্ব্বপ্রথম Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চগণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। মিঃ মহিমচন্দ্র ঘোষ এ জেলার সর্ব্বপ্রথম সিভিলিয়ান। কলাবিদ্যায় ইটালী প্রত্যাগত শশিকুমার হেস এবং উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে তাহাদের এ জেলাবাসী একজন, ভারতের জাতীয় মহাসমিতির কোনও অধিবেশনে সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগেও এ জেলায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা চলিয়াছিল। পূর্ণানন্দ বংশের ৺ রাজকৃষ্ণ ন্যায়ভূষণ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের মত চাহিয়া পাঠাইলে, তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিদ্বারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মাঘানের ৺ কালী বিদ্যালঙ্কার একজন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত ভ্রান্তিপূর্ণ প্রতিপাদন করিয়া "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বাবশিষ্ট" নামক একখানা উক্তশ্রেণীর তত্ত্বগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্ত্তমান সময়ে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নাম ময়মনসিংহবাসীর গৌরব স্থল। আগুজিয়া নিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন 'কর্পূরাদি' স্তোত্রের ব্যাখ্যা লিখিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চাও বিশেষরূপ চলিয়াছিল। ১৮৬৬ সনে এই নগরে "বিজ্ঞাপনী" নামে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র আনীত হয়। এই যন্ত্র হইতে "বিজ্ঞাপনী" নামে প্রথম সংবাদপত্র পরিচালিত হইত। সেরপুর, সুসঙ্গ, মুক্তাগাছা ও ময়মনসিংহ এই সময়ে সাহিত্য চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। ১৮৬৫ সনে সেরপুর হইতে হরচন্দ্র চৌধুরীর "বিদ্যোন্নতি সাধিনী" নামক মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। ইহার পর সেরপুর হইতে "উপাসনোল্লাসিনী" এবং "শ্রীবৎসোপাখ্যান"

প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সনে "সেরপুর বিবরণ" মুদ্রিত হয়। ১২৮৮ সনে তথায় চারুযন্ত্র স্থাপিত হইলে, "চারুবার্ত্তা" নামক সাপ্তাহিকপত্র বাহির হইতে থাকে। এই সময় সেরপুরে "সুধাকর" নামে অপর একখানা সাপ্তাহিক পত্রের ও আবির্ভাব হইয়াছিল। সুসঙ্গ রাজধানী হইতে ১৮৮৫ সনে "আর্য্য-প্রদীপ" ও ১৮৮৭ সনে "আর্য্য-প্রভা" বাহির হয়। ইতিমধ্যে "কৌমুদী" নামে আর একখানা পত্রিকা বাহির হয়। এই সময়ে রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহের 'অশ্বতত্ত্ব,' 'গো-তত্ত্ব,' 'আম্র' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'জাতীয় সঙ্গীত' 'উত্তরা-বিলাপ' 'মানস-কানন' 'প্রভাত-প্রতিভা' প্রভৃতি সুসঙ্গের সাহিত্য চর্চ্চার ফল। ১২৯৭ সনে প্রাচীন কবি রাজা রাজসিংহ রচিত 'রাগমালা' ও 'মনসাপাঁচালী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মুক্তাগাছার বিদ্যোৎসাহী জমিদার কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরীর গৃহে রীতিমত সাহিত্যালোচনা হইত। মুক্তাগাছায় "আনন্দ যন্ত্র" নামে একটী মুদ্রাযন্ত্র ছিল; এই যন্ত্র হইতে 'সুহৃদ্' নামে একখানা সংবাদপত্র ও 'প্রমোদী' নামে একখানা মাসিকপত্র বাহির হইত। 'মৃগ ও মৃগয়া', 'আফগান যুদ্ধের বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ মুক্তাগাছার সাহিত্য চর্চ্চার ফল। এই নগর হইতে বিজ্ঞাপনী উঠিয়া গেলে, কতক দিন সাহিত্যালোচনা বন্ধ ছিল। তৎপর 'তত্ত্বোপদেশ সংগ্রহ' ও 'অবিস্তার-দশ আইন' প্রভৃতি গ্রন্থ ও "বাঙ্গালী" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়; এবং "আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিকা" নামে একখানা পত্রিকা এই সময়ে কতকদিনের জন্য বাহির হইয়াছিল। এই সময় ময়মনসিংহে কালীনারায়ণ সান্যাল কর্ত্তৃক 'ভারতমিহির' যন্ত্র স্থাপিত হয়। এই যন্ত্র হইতে ১৮৭৫ সনে "ভারতমিহির" নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে মাঝে মাঝে 'ধূমকেতু' নামক একখানা সামাজিক শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপাত্মক পত্র প্রকাশিত হইত। ১৮৭৮ সনে "সঞ্জীবনী" নামে একখানা সাপ্তাহিকপত্র বাহির হইয়া, দেড় বৎসরকাল চলিয়াছিল। ১৮৮০ সনে 'ভারতমিহির' যন্ত্র হইতে 'সর্ব্বশাস্ত্রসংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ সনে কালীনারায়ণ বাবু 'আনন্দযন্ত্র' ক্রয় করিয়া "ভারতমিহির" যন্ত্রের সহিত সম্মিলিত করেন। ইহার পর 'বঙ্গবিলাপ' ও 'বঙ্গসুহৃদ' নামক দুইখানা মাসিকপত্র প্রচারিত হয়। ১৮৮৬ সনে 'ভারতমিহির যন্ত্র' কলিকাতায় উঠিয়া যায়। ইহার অল্পকাল পরেই সেরপুর হইতে 'চারুযন্ত্র' এই নগরে আনীত হইয়া 'চারুবার্ত্তা' প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময়ে মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভিন্ন জেলাবাসী সাহিত্য-সেবকগণ দ্বারা ময়মনসিংহের সাহিত্য চর্চ্চা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই সময় যাদবচন্দ্র লাহিড়ী 'কুলকালিমা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ

করেন। ১২৯৫ সনে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের আগমনোপলক্ষে এই নগরে 'কুমার' নামক মাসিক পত্রের আবির্ভাব হয়। ১৩০০ সনে 'চারুবার্ত্তা' বন্ধ হইয়া যায় এবং ১৩০১ সনের বৈশাখ মাসে এই নগরে "চারুমিহিরের" জন্ম হয়। ১৩০৭ সনের আষাঢ় মাসে "আরতি" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই নগরে 'চারুযন্ত্র' 'বাসন্তী' এবং 'সুহৃদ্ যন্ত্র' নামক তিনটী মুদ্রাযন্ত্র আছে।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে ব্রজনাথ বিশ্বাসের নবপ্রবন্ধ, ছাত্র-জীবন ও বিধবা; কৃষ্ণকুমার মিত্রের বুদ্ধদেব-চরিত ও মহম্মদ-চরিত; প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর পদ্মা, দীপালী, গীতিকা, আরতি, গান প্রভৃতি; উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সেকালের কথা; মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের আশাকাব্য, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি; দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্যের অহল্যা, গায়ত্রী; অমরচন্দ্র দত্তের লহরী ও অরূপা; অম্বুজাসুন্দরী দাসীর প্রীতি ও পূজা; রামপ্রাণ গুপ্তের হজরৎমহম্মদ; হেমচন্দ্র ঘোষের মানস-প্রবাহ; গগনচন্দ্র রায়ের তীর্থামৃতসার; প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য।

জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ভূমিকর্ষণ প্রায় সকল দেশেরই প্রধান অবলম্বন। ভারতের প্রায় অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বঙ্গদেশের ভূমি কৃষিকার্য্যের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। ময়মনসিংহ এই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির একটী প্রধানতম জেলা। এই জেলার প্রায় শতকরা আশী জন লোক কৃষিজীবী। অতএব কৃষিই এ জেলার প্রধান সম্বল। নদ নদী ও খাল বিলের আধিক্যই এ জেলার ভূমির উর্ব্বরতার একমাত্র কারণ। উপযুক্তরূপ চাষ করিলে এ জেলায় না হয় এমন শস্য নাই। 'ময়মনসিংহের বিবরণী' প্রণেতা এ জেলার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, পাট, নীল, গোলআলু, ইক্ষু, চা, তুলা, তিল, সরিষা, তামাক, মুগ, মসুর, খেসারী, মাষ, নারিকেল, সুপারী, পান, আম, কাঁটাল, তেঁতুল, কলা, গারোকচু এবং বেগুণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নীল এবং চা'র চাষ এখন আর হয় না। এ সমস্ত ব্যতীত এ জেলায় মটর, অরহর, কাওন, চিনা, কফি, ওল, মেটেআলু, মরিচ, পিয়াজ, এবং রসুন ইত্যাদি প্রায় সমস্ত জিনিসই অল্প-বিস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৭৯৭ সনে এ জেলায় বিলাতী আলুর চাষ প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এ জেলার আলু অন্যান্য স্থানের আলু অপেক্ষা সুস্বাদু। ১৮০৩ সনে এ জেলায় নীলের চাষ আরম্ভ হয়। অতি অল্প সময়ে ইহা বিশেষ ফল লাভ করিয়াছিল। ইক্ষু এবং পাটের চাষও এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। ১৮৬৮ সনে সুসঙ্গের

মহারাজগণের যত্নে ও ব্যয়ে তথায় চা'র চাষ আরম্ভ হয়। সুসঙ্গের অন্তর্গত বিজাপুরে মহারাজগণের চা'র বাগান ছিল। ১৮৭২ সনে "জামালপুর আদর্শ কৃষি-বিভাগ" বিলাতী তুলার চাষের উদ্যোগ করেন। এই সময়ে নীলের কারবার উঠিয়া যায়। এ জেলার কৃষিজাত প্রধানশস্য ধান্য। ধান্যের পরেই প্রধান কৃষি পাট। এ জেলার জামালপুর, হাজরাদী এবং হোসেনপুর অঞ্চলের ন্যায় উৎকৃষ্ট সোণামুগ কোথাও জন্মে না। কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোণা অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পান জন্মে। ঐ অঞ্চলে প্রচুর সুপারীও জন্মিয়া থাকে। কাগমারী পরগণায় যথেষ্ট আম জন্মে কিন্তু তত সুমিষ্ট নহে। এ জেলার উচ্চ এবং চরাভূমিতে প্রচুর কাঁটাল জন্মিয়া থাকে। তেঁতুল, কলা, আনারস প্রভৃতি সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। নালিতাবাড়ী অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন হয়। এ জেলার বেগুণ ও সর্ষপতৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বনজ ঔষধি-বৃক্ষ এ জেলায় অপর্য্যাপ্ত জন্মে ও অন্যত্র রপ্তানী হয়। বাঁশ এ জেলার সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে।

ভৈরববাজার, করিমগঞ্জ, দত্তেরবাজার ও সুবর্ণখালী এ জেলার আমদানী রপ্তানীর প্রধান স্থান। এই সকল স্থানে ত্রিপুরা হইতে কার্পাস, সুপারী, মরিচ, পিয়াজ প্রভৃতি; দক্ষিণ হইতে নারিকেল, হুঁকার খোল; শ্রীহট্ট হইতে চূণ, শীতলপাটী, বেত, তেজপত্র, কমলা ও কমলামধু; কলিকাতা হইতে চিনি, কাপড়, লৌহ, গম, ময়দা, সুজি প্রভৃতি এবং ব্রহ্মদেশ ও বাখরগঞ্জ হইতে কাষ্ঠ ও চাউল আমদানী হইয়া থাকে। চামড়া, শীতলপাটী, পণির, ঘৃত, মধু, সরিষা, তিল এবং লঙ্কা প্রভৃতি এই জেলা হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। নীলের সময় এই জেলা হইতে প্রচুর পরিমাণে নীল রপ্তানী হইত। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে চা'ও এ জেলা হইতে ভিন্ন জেলায় যাইত। ডালুর কার্পাস প্রসিদ্ধ। ইহা নালিতাবাড়ীর নিকট ডালু নামক স্থানে উৎপন্ন হয়। কার্পাস, চাউল প্রভৃতির আমদানী রপ্তানী উভয়ই হইয়া থাকে। বিশ, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে চাউল অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইত। আমদানীর আবশ্যক হইত না। শুক্না মাছ এ জেলার একটী প্রধান রপ্তানীর জিনিস। কোম্পানীর আমলে ফরাসীরা এই জেলা হইতে শুক্না মাছ পশ্চিম দেশে রপ্তানী করিত। ঢোলাদিয়া ও খালিয়াজুরীতে তাহাদের দুইটী কারবারের স্থান ছিল। কিশোরগঞ্জের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে এখনও বিস্তর শুক্না মাছ চট্টগ্রামে ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এ জেলার শুক্না মাছ ব্যবসায়ীরা রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বর্ত্তমান সময়েও শুক্না মাছ রপ্তানী করিয়া তাহার বিনিময়ে প্রচুর তামাকের আমদানী

করিয়া থাকে। গারো-পাহাড়ের পাদদেশে ভঙ্গেরবাজার হইতেও বেত, তরৈবাঁশ, তেজপত্র, এবং নানা জাতীয় পক্ষীর আমদানী হইয়া থাকে।

নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসের আমদানী ও রপ্তানী হিসাবে গড়ে আমদানী জিনিসের সংখ্যা অনেক অধিক। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ তিনগুণ বেশী ছিল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে চাউল ও কাপড়, ভিন্ন স্থান হইতে এই স্থানে অতি অল্প পরিমাণে আমদানী হইত। মোটামুটি হিসাব করিলে দেখা যায়, জিনিসের আমদানীর পরিমাণ অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ পাঁচ গুণ অধিক; পাটের রপ্তানীর পরিমাণ বাদ দিলে আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর আট গুণ হইবে। আমদানীর তুলনায় পাট, তিল এবং সরিষা এই জেলা হইতে অধিক রপ্তানী হইয়া থাকে। গরু ও ঘোড়ার ব্যবসায়ীর জন্য সাল্টীয়ার হাট ও জামালপুরের মেলা প্রসিদ্ধ। সুসঙ্গ দুর্গাপুরের পাহাড়ে বহু বন্য হস্তী ধৃত হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে ময়মনসিংহ সূক্ষ্ম বস্ত্র-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বাজিতপুরের মস্‌লিন ও কিশোরগঞ্জের তঞ্জাব, দিল্লীর বাদ্‌সাহদিগেরও চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইত। কিশোরগঞ্জের শিল্প-দ্রব্যের মধ্যে সরফরআলী, জঙ্গলখাশ, সপনম, আবরওয়াগঞ্জের তেঁতেনী ধুতি ও উড়ানী বঙ্গবিখ্যাত ছিল। মুসলমানদিগের পর এই সকল বস্ত্রের প্রতি ওলন্দাজদিগের দৃষ্টি পড়ে। ওলন্দাজগণ কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া মস্‌লিনের ব্যবসায় করিতেন। তাঁহাদের পর এই সমস্ত কুঠি ইংরেজ বণিক্‌দিগের হস্তগত হয়। এই সময় কিশোরগঞ্জের পরামাণিকদিগের মস্‌লিনের ব্যবসায় বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কিশোরগঞ্জের বস্ত্র-শিল্পেরও অবনতি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও কিশোরগঞ্জ এবং বাজিতপুরের তঞ্জাবচাদর ও গোলাবতনধুতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাজিতপুরেও মিহি কাপড়, চাদর, গোলাবতনধুতি ও গরদের কাপড় প্রস্তুত হয়। এই মহকুমার পাথরাইল এবং ছোটবিন্নাফৈর গ্রামের তন্তুবায়গণ উৎকৃষ্ট রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। জালালিয়া ও সুনখির জোলারা কয়েক বৎসর যাবৎ কোট, প্যাণ্টালুন ও সার্টের উৎকৃষ্ট ছিট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নেত্রকোণার অন্তর্গত সান্দিকোণা গ্রামে এণ্ডি প্রস্তুত হয়। সুতার উৎকৃষ্ট চারখানা প্রায় সকল স্থানের যোগীরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। জামালপুরের অন্তর্গত ইস্‌লামপুরের কাঁসার জিনিস সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কাগমারীতেও কাঁসার জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। দৌলতপুর এবং ইস্‌লামপুরে লৌহের জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। টোকের ঘটী উৎকৃষ্ট। কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত

করগাঁও ও বাজিতপুরের লৌহ নির্ম্মিত সামগ্রী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাজিতপুরের মিস্ত্রীর কার্য্যও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাওয়ালে গজধার পাটী প্রস্তুত হয়।

উপসংহসারে আমাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিয়া রাখিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। আমাদের দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের অবস্থা যতদিন না উন্নত হইবে, ততদিন কৃষিকার্য্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। এ জেলার অশিক্ষিত কৃষক-সম্প্রদায় মাটীর উর্ব্বরতার উপর যতদূর নির্ভর করে, নিজের অধ্যবসায় ও যত্নের উপর ততদূর নির্ভর করে না। গোময় ব্যতীত অন্য কোন সার সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা নাই। কোনও জমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, কি উপায়ে উহাকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যাইতে পারে, তৎ সম্বন্ধে আমাদের দেশের কৃষকগণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। দেশের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কৃষকগণকে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির কৌশল শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কৃষক সম্প্রদায়ের অনভিজ্ঞতার ফলে এ দেশের ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি দিন দিনই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। এরূপ ভাবে আর কতক দিন চলিলে, কৃষক-কুলের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকেরও সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। আমাদের আর উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। অবশ্য Jamalpur Model Farm এবং Gouripur Experimental Farm এ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দেশের ছোট বড় সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত প্রকৃত উন্নতিলাভ অসম্ভব। জমিদারগণের বাগানের কৃষিজাত জিনিস এবং সাধারণ কৃষকের জিনিসের মধ্যে কি বিভিন্নতা তাহা "ময়মনসিংহ সারস্বত প্রদর্শনীতে" সম্যক্ উপলব্ধি হয়। "ময়মনসিংহ সারস্বত-সমিতি" প্রতিবৎসর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীদ্বারা এ জেলার এক মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন।

জমিদারগণ এ জেলার রত্নস্বরূপ। এ জেলার প্রত্যেক মহৎকার্য্যে তাঁহাদের সম্পর্ক প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে জড়িত আছে। তাঁহাদের অর্থ সাহায্য এবং সহানুভূতি ভিন্ন এ জেলার কোনও মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব। সদরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে, গৌরীপুরের ভূম্যধিকারিণী বিশ্বেশ্বরী দেবী সেই চিকিৎসালয়ের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রচুর অর্থদান করেন। এই চিকিৎসালয়ের সঙ্গে মহারাজ সূর্য্যকান্তের প্রতিষ্ঠিত Mackenzie Eye Ward এবং ভবানীপুরের সতীশ বাবুর নিজ নামে প্রতিষ্ঠিত একটী Out door Dispensary আছে। সদরের মহিলা-চিকিৎসালয়টী মুক্তাগাছার বিদ্যাময়ী দেবীর অর্থ

সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নগরের Raj Rajeswari Water Works ও Town Hall মহারাজ সূর্য্যকান্তের দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। রামগোপালপুরের রায় যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে এই সহরে একটী Technical School প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গোলোকপুরের কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর অর্থ সাহায্যে Alexander বালিকা বিদ্যালয় গৃহটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা এখন শিশু। কলিকাতার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবল স্রোত বঙ্গের এই সুদূর সীমান্তে পৌছিতে না পৌছিতেই অর্দ্ধপথে শূন্যে মিশাইয়া যাইত। এই নগরে "ময়মনসিংহ সভা" নামে একটী রাজনৈতিক সভা এতদিন নামে মাত্র আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছিল; কিন্তু বিগত বর্ষে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব যখন সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গকে আলোড়িত করিয়াছিল, তখন এই সভা যে বিপুল উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা ময়মনসিংহবাসী কখনও ভুলিতে পারিবে না। বঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের কি হইল তাহা আমরা জানি না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে সেই উপলক্ষে যে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। আর কিছু হউক না হউক সেই আন্দোলনেরদ্বারা ময়মনসিংহের জাতীয় জীবন অনেকটা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে; প্রাণহীন ময়মনসিংহ একটু সজীব হইয়া উঠিয়াছে। "বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির" বর্ত্তমান অধিবেশন এই সজীবতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। *

শ্রীমোহিনীশঙ্কর রায়।

সারস্বত সাহিত্য।

(মুদ্রিত গ্রন্থ)

বিগত ৮ই, ৯ই, ১০ই, ১১ই, ১২ই বৈশাখ ময়মনসিংহ সারস্বত-সমিতির অষ্টাবিংশ বার্ষিক "কৃষি-শিল্প-সাহিত্য প্রদর্শনী" হইয়া গিয়াছে।

জেলার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্য-সেবীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য সমিতি এবার গ্রন্থ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সারস্বত-সমিতির এই অনুষ্ঠান নূতন।

---

* এই প্রবন্ধে 'মসনদালী ইতিহাস' ও 'ময়মনসিংহের বিবরণের' সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রঃ লেঃ।

দেশের সাহিত্য-চর্চ্চার স্রোত কিরূপ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে, দেশের শিক্ষিত সমাজের নিকট তাহার বিবরণ অপরিজ্ঞাত থাকা উচিত নহে—অন্ততঃ সাহিত্য-সেবীদিগের নিকট নহে। কিন্তু এই বিবরণ অবগত হইবার উপায়ও নিরতিশয় সহজ সাধ্য নহে।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া এইরূপ একটা বিবরণ সংগ্রহের বিধান করিয়াছেন। আইন অনুসারে প্রত্যেক মুদ্রাযন্ত্র দায়ী থাকায়, যে কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলেই তাহার একখণ্ড করিয়া গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে পঁহুছিয়া থাকে। এবং কলিকাতা গেজেটে ঐ সকল প্রাপ্ত গ্রন্থের ত্রৈমাসিক তালিকা বাহির হয়। পূর্ব্বে এই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রদত্ত হইত। কয়েক বৎসর যাবত ঐ মতামতের "কলামটী" উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাই হউক কলিকাতা গেজেটের ত্রৈমাসিক তালিকা হইতে মোটামুটি দেশের উৎপন্ন সাহিত্যের সংখ্যা অবগত হওয়ার সুবিধা থাকিলেও সাহিত্য-ক্ষেত্রের সম্যক্ ভাব-গতিক অবগত হইবার উপায় অতি সামান্য। গ্রন্থকারদিগের উৎসাহ দানের পক্ষেও সেই নীরস তালিকা ততদূর কার্য্যকরী নহে।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেট হইতে remark columnটী তুলিয়া ফেলিলে গ্রন্থকার সমাজের ভিতর একটু অসন্তোষ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্য সমাজের এই অসন্তোষ ভাব লক্ষ্য করিয়া "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্" এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

পরিষদের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রস্তাব করেন—

"প্রতিবৎসর পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিবৎসরের নূতন প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে ভাল হয়। তাহা হইলে প্রতিবৎসরে সাহিত্যের গতির একটা আলোচনা হয় ও পাঠকগণেরও ভাল গ্রন্থের সংবাদ জানিবার কতকটা উপায় হয়। পরিষদ্ যে সকল গ্রন্থ প্রশংসার যোগ্য মনে করেন, যদি তাহাদেরও তাহাদের গ্রন্থকারগণের নাম উল্লেখ করেন; তবে তাহাদেরও উৎসাহ বর্দ্ধন করা হয়।"

সত্যেন্দ্র বাবুর এই প্রস্তাবে পাইওনীয়ার পত্রে যথাসম্ভব অনুকূলভাবে সমর্থিত হয়। অতঃপর বিগত তিন বৎসর যাবৎ পরিষদ্ প্রস্তাবিত উপায়ে প্রতি বৎসরের প্রকাশিত গ্রন্থের বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

পরিষদের এই বিবরণ, প্রাদেশিক সাহিত্যের বিবরণ ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নহে এবং গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ সম্ভবপরও নহে। কেন না অনুনয় বিনয় অপেক্ষা আইনের শক্তি প্রবল।

যাহা হউক কলিকাতা গেজেটের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ও পরিষদের বাৎসরিক আলোচনা সমগ্র বঙ্গদেশের প্রাদেশিক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় প্রদান করে বটে কিন্তু তাহা একটী নির্দ্দিষ্ট জেলার সাহিত্যালোচনার চিত্র পৃথক ভাবে প্রদর্শন করিতে পারে না।

প্রতি জেলার সাহিত্য লইয়া যদি প্রতি জেলায় জেলায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা হয় তাহা হইলে আলোচনার উদ্দেশ্য বহু পরিমাণে সফলতা লাভ করিতে পারে এবং তাহা হইলে নিশ্চয় সুফল প্রসব করিবে।

ময়মনসিংহ সারস্বত-সমিতি এই সুসঙ্গত উদ্দেশ্য লইয়া বর্ত্তমান বর্ষ হইতে বার্ষিক কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর সহিত সাহিত্য প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলার ভিতরে তৎ অধিবাসী ও প্রবাসিগণদ্বারা এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এবং প্রাচীন কবিদিগের লিখিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি যাহা পল্লীতে পল্লীতে কীটমুখে লয়প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছিল, সেই সকল গ্রন্থের সংগ্রহ এবং প্রদর্শনের চেষ্টা "ময়মনসিংহ সারস্বত-সমিতি" করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীদিগের গ্রন্থ প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রদর্শিত গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত ছিল—আধুনিক ও প্রাচীন। আধুনিক পুস্তকাকারে লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ "আধুনিক গ্রন্থকুঞ্জে" ও প্রাচীন তুলট কাগজে লিখিত গ্রন্থ "প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থকুঞ্জে" প্রদর্শিত হইয়াছিল।

আধুনিক গ্রন্থগুলি তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। (ক) বাঙ্গালার মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীগণের গ্রন্থ, (খ) এ জেলার লেখকগণের লিখিত, মুদ্রিত গ্রন্থ ও (গ) আধুনিক অমুদ্রিত হস্তলিখিত গ্রন্থ। প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থকুঞ্জে সে কালের মনুষ্য বিক্রয়ের দলিল (আত্মবিক্রয় কবচ), ভূমি বিক্রয়ের দলিল, শত বৎসর পুর্ব্বের জমা খরচ, সেকালের বাজার হিসাব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লিখিত গদ্য চিঠি ইত্যাদিও রক্ষিত হইয়াছিল।

(ক) বাঙ্গালার মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীগণের গ্রন্থ। এই বিভাগে যে সকল গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা ৫৩। এই ৫৩ খানা গ্রন্থের ২ খানা নাটক, ১ খানা ইতিহাস, ১ খানা জীবনী, ১ খানা ভ্রমণ-কাহিনী, ২ খানা খাদ্যপাক সম্বন্ধীয়, ৪ খানা উপন্যাস, ২ খানা স্কুলপাঠ্য, ৬ খানা গদ্য সাহিত্য ও ৩৪ খানা পদ্য।

সাহিত্য প্রদর্শনী গৃহের প্রবেশ পথের সম্মুখেই দক্ষিণ পার্শ্বে মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীগণের গ্রন্থরাশি শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল।

গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্ত্রীগণের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত গ্রন্থকর্ত্রীগণেরই গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিম্নে গ্রন্থকর্ত্রীগণের নাম প্রদত্ত হইল :—

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ, শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ, শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস, ৺ পঙ্কজিনী বসু, শ্রীমতী হেমলতা দেবী, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু, শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী, শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী, শ্রীমতী বিভাবতী সেন, শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র বি, এ, শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রীমতী শৈলনলিনী দেবী, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী, শ্রীমতী স্নেহলতা রচয়িত্রী, শ্রীমতী কামিনী রায় বি, এ, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শ্রীমতী সরলা দেবী বি, এ।

কোন কোন গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহাদের কোন কোন পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় করায় ঐ সকল গ্রন্থ প্রদান করিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারও কোন কোন পুস্তকের সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় ঐ সকল গ্রন্থ প্রদান করিতে না পারিয়া তাঁহারা দুঃখিত হইয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য সমিতি পুস্তকের প্রকাশক ও বিক্রেতাদিগের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীগণের মধ্যে শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসী, কুমারী কুমুদিনী মিত্র, ও শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী ময়মনসিংহবাসিনী। এবং শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ শ্রীমতী বিভাবতী সেন ও শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ ময়মনসিংহের প্রবাসিনী।

(খ) এ জেলার লেখকগণের লিখিত মুদ্রিত গ্রন্থ—এই তালিকা মুদ্রিত হইবার সময় পর্য্যন্ত ২৩৯ খানা গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এবং তালিকা মুদ্রিত হইলে পর আরও ১২ খানা পুস্তক হস্তগত হইয়াছে। সুতরাং এই তালিকার গ্রন্থ সংখ্যা ২৫১, গ্রন্থকারের সংখ্যা ১০১। এই ১০১ সংখ্যক গ্রন্থকারের মধ্যে ২৪ জন প্রবাসী ও ৭৭ জন জেলাবাসী। এই ৭৭ জন গ্রন্থকারের মধ্যে—২৩ জন কিশোরগঞ্জ বিভাগের, ২১ জন টাঙ্গাইল বিভাগের, ১৫ জন সদর বিভাগের, ৯ জন নেত্রকোণা বিভাগের ও ৯ জন জামালপুর বিভাগের। গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম, নিবাস, পুস্তকের পৃষ্ঠা ও বিষয় মুদ্রিত তালিকায়

প্রদত্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ৺ হরচন্দ্র চৌধুরী কৃত "শ্রীবৎসোপাখ্যান" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; ১২৬৮ বঙ্গাব্দে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং বিগত ৪৬ বৎসরে ময়মনসিংহে যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত কয়েকখানা গ্রন্থ একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়া যাওয়ায় তাহার উদ্ধার সাধনের চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

এই ২৫১ খানা গ্রন্থের মধ্যে—২০ খানা সংস্কৃত, ২৪ খানা ইংরেজী ও বাকী ২০৭ খানা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) স্কুল ও কলেজ পাঠ্য ও (২) সাধারণ পাঠ্য গ্রন্থ।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর পুস্তকের সংখ্যা ৭০ খান। এই গ্রন্থ গুলির লেখকদিগের নাম প্রদত্ত হইল :—শ্রীকালীনাথ দে, জারৈতলা কিশোরগঞ্জ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘটক পাথরাইল টাঙ্গাইল, শ্রীকৃষ্ণনাথ বিদ্যারত্ন বনগ্রাম কিশোরগঞ্জ, শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী খালিয়াজুরী নেত্রকোণা, শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মৃগা কিশোরগঞ্জ, শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় জারৈতলা কিশোরগঞ্জ, শ্রীবৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী চরপাড়া সদর, শ্রীশ্রীনাথচন্দ সদর, শ্রীকিশোরীমোহন কাব্যতীর্থ বাণীগ্রাম কিশোরগঞ্জ, S. Ray মসূয়া কিশোরগঞ্জ, শ্রীসারদারঞ্জন রায় এম্, এ মসূয়া কিশোরগঞ্জ, শ্রীমুক্তিদারঞ্জন রায় এম্. এ মসূয়া কিশোরগঞ্জ, শ্রীশ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত, শ্রীশ্যামাচরণ কুশারী* শ্রীনন্দগোপাল ঘটক পাথরাইল টাঙ্গাইল, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল মালতী টাঙ্গাইল, শ্রীহরিমোহন রায় মহিষকুরা সদর, শ্রীকুঞ্জমোহন রায় বি, এল, পাথরাইল টাঙ্গাইল, শ্রীমনোমোহন সেন * , ৺ গিরিশচন্দ্র চৌধুরী নান্দিনা কিশোরগঞ্জ, শ্রীবিশ্বেশ্বর পণ্ডিত ছত্রপুর সদর, ৺ গগনচন্দ্র রায় জাওলা নেত্রকোণা, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ বাঘিল টাঙ্গাইল, নওসের আলী খাঁ ইউসফজী করটীয়া টাঙ্গাইল, শ্রীনিমাইচরণ করণী সাল্টীয়া সদর, শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ সেকান্দরনগর কিশোরগঞ্জ, শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত সদর, শ্রীহরিচরণ রায় কিশোরগঞ্জ।

অবশিষ্ট সাধারণ পাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা ১৮১। এই গ্রন্থগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল।

(ক) জীবনী, (খ) ইতিহাস ভূগোল, (গ) নাটক, (ঘ) গল্প উপন্যাস, (ঙ) কলাবিদ্যা, (চ) চিকিৎসা (স্বাস্থ্যবিজ্ঞান,) (ছ) স্মৃতি, (জ) দর্শন, (ঝ) কৃষি, (ঞ) জ্যোতিষ, (ট) ধর্ম্মবিষয়ক, (ঠ) আইন, (ড) নিয়মপ্রণালী বিষয়ক, (ণ) ব্যাকরণ, (ত) সাহিত্য, (থ) পত্রিকা, (দ) বিবিধ।

(ক) জীবনী—এই বিভাগে ৮ খানা গ্রন্থ। গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম ও নিবাস প্রদত্ত হইল। ১। হজরতমহম্মদ শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত কেদারপুর, টাঙ্গাইল। ২। স্বরূপদামোদর শ্রীরসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী টাঙ্গাইল। ৩। বুদ্ধদেব-চরিত, ৪। মহম্মদ-চরিত, ৫। রাজা (সপ্তম এডওয়ার্ড) ৬। রাণী (আলেকজাণ্ড্রা) শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র বাঘিল, টাঙ্গাইল। ৭। মাতৃ-চরিত শ্রীবৈদ্যনাথ কর্ম্মকার জঙ্গলবাড়ী, কিশোরগঞ্জ। ৮। হাজি মহম্মদ মহাসীন শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত ময়মনসিংহ।

(খ) ইতিহাস, ভূগোল—এই বিভাগে ৫ খানা গ্রন্থ। ১। মোগলবংশ শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত কেদারপুর, টাঙ্গাইল। ২। আফগান বিবরণ ৺ কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। ৩। সেরপুর বিবরণ, ৪। বংশানুচরিত ৺ হরচন্দ্র চৌধুরী সেরপুর জামালপুর। ৫। ময়মনসিংহের বিবরণ শ্রীকেদারনাথ মজুমদার গচিহাটা, কিশোরগঞ্জ।

(গ) নাটক, গীতিনাট্য ও দৃশ্যকাব্য—এই বিভাগে ৪ খানা গ্রন্থ। ১। কৌমুদীসুধাকর (সংস্কৃত) মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সেরপুর জামালপুর। ২। বৈদেহীনির্ব্বাসন ৺ দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী "দেবনিবাস", সদর। ৩। রণরাও শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি, এ, রায়পুর নেত্রকোণা। ৪। পার্ব্বতী শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরী * * *।

(ঘ) গল্প-উপন্যাস—এই বিভাগে ৯ খানা গ্রন্থ। ১। ক্ষেমঙ্করী শ্রীহরিদাসাহু দাস নেত্রকোণা। ২। বিষাদপ্রতিমা ৺ রামচন্দ্র চৌধুরী নপাড়া, নেত্রকোণা। ৩। অহল্যা, ৪। গায়ত্রী ৺ দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী "দেবনিবাস" সদর। ৫। লহরী, ৬। অরূপা (আত্মিক উপন্যাস) শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত সদর ময়মনসিংহ। ৭। ভক্তিলীলা (আধ্যাত্মিক উপন্যাস) শ্রীশ্রীনাথ চন্দ সদর ময়মনসিংহ। ৮। প্রফুল্ল (গল্প) শ্রীকেদারনাথ মজুমদার গচিহাটা, কিশোরগঞ্জ। ৯। কুলকলঙ্কিনী ৺ দীনেশচন্দ্র বসু * *।

(ঙ) কলাবিদ্যা—এই বিভাগে ২ খানা গ্রন্থ। ১। বেহালাশিক্ষা, ২। হারমোনিয়মশিক্ষা শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মসূয়া, কিশোরগঞ্জ।

(চ) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান—এই বিভাগে ৫ খানা গ্রন্থ। ১। গো-পালন শ্রীকমলকৃষ্ণ সিংহ (রাজা) সুসঙ্গ, নেত্রকোণা। ২। স্বাস্থ্য-সহায় শ্রীগিরীশচন্দ্র কবিরত্ন * *। ৩। গার্হস্থ্যবিজ্ঞান শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা। ৪। হস্তী-চিকিৎসা ৺ কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, সদর। ৫। শুশ্রূষা শ্রীশ্যামাচরণ দে ডোহাখলা, সদর।

(ছ) স্মৃতি—এই বিভাগে ৪ খানা গ্রন্থ। ১। উদ্বাহচন্দ্রালোক, ২। শুদ্ধিচন্দ্রালোক মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সেরপুর, জামালপুর। ৩। ৪। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা বঙ্গানুবাদ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীহরসুন্দর তর্করত্ন সেরপুর, জামালপুর।

(জ) দর্শন—এই বিভাগে ৫ খানা গ্রন্থ। ৫ খানাই মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত, বেদান্তদর্শন বিষয়ক ফেলোসিফের লেক্‌চার।

(ঝ) কৃষি—এই বিভাগে ২ খানা গ্রন্থ। ১। আম্র শ্রীকমলকৃষ্ণ সিংহ সুসঙ্গ, নেত্রকোণা। ২। আদর্শকৃষি শ্রীশশিভূষণ গুহ (সারস্বতের ব্যয়ে মুদ্রিত)।

(ঞ) জ্যোতিষ—এই বিভাগে ১ খানা গ্রন্থ। গ্রন্থখানা কবিতায় লিখিত জাতকবিজ্ঞান—শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র সিংহ ঘাগড়া, নেত্রকোণা।

(ট) ধর্ম্মবিষয়ক—এই বিভাগে ২৮ খানা গ্রন্থ। ১। গীতার্থ সন্দীপনী শ্রীহরিদাস নেত্রকোণা। ২। লৌহিত্য-জ্ঞান-দীপিকা শ্রীব্রজকান্ত স্মৃতিপঞ্চানন সাখুয়াই, সদর। ৩। নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি শ্রীদুর্গাদাস রায়* ৪। উপদেশ-শতকম্ শ্রীহরসুন্দর তর্করত্ন সেরপুর, জামালপুর। ৫। গৃহস্থের আদর্শদেহত্যাগ, ৬। মাতা পিতা ও যোগাভ্যাস শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস গুপ্ত * *। ৭। ঈশ্বরোপাসনা শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল, মালতী টাঙ্গাইল। ৮। পারলৌকিক শ্রীরজনীকান্ত গুহ টাঙ্গাইল। ৯। ব্রহ্মোপাসনা শ্রীশশিভূষণ তালুকদার টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত। ১০। তত্ত্বজ্ঞান-তরঙ্গিনী ১ম খণ্ড, ১১। শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত-সিন্ধু শ্রীমৎ দ্বারকানাথ তালুকদার তর্কবাগীশ টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত। ১২। নববিধানতত্ত্ব শ্রীদুর্গাদাস বসু বাঘিল, টাঙ্গাইল। ১৩। বৈষ্ণব-সুহৃদ্ শ্রীবিশ্বেশ্বর পণ্ডিত ছত্রপুর, সদর। ১৪। কোরাণ সরীফ্ ১ম খণ্ড, ১৫। ২য় খণ্ড, ১৬। ৩য় খণ্ড, ১৭। ৭ম খণ্ড, ১৮। সহিবোখারী সরীফ্ ১ম খণ্ড, ১৯। ফতওয়ার-আলমগিরি ১ম খণ্ড, ২০। জোব্দাতলনসায়েল ১ম খণ্ড, ২১। ২য় খণ্ড শ্রীমুইনদ্দিন করটীয়া, টাঙ্গাইল। ২২। বিশ্বদর্শন শ্রীবিপিনচন্দ্র স্মৃতিভূষণ চাপুরিয়া, সদর। ২৩। উপাসনোল্লাসিনী ২য়, ৩য় ভাগ ৺ হরকিশোর চৌধুরী সেরপুর, জামালপুর। ২৪। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপদাঙ্কতত্ত্বম্, ২৫। স্বপ্নবিলাসামৃত, ২৬। বৈধ-ভক্তিকা, ২৭। বৈষ্ণব-মঙ্গল, ২৮। রূপচিন্তামণি, উমাকান্ত শর্ম্মা ডাঙ্গা টাঙ্গাইল।

(ঠ) আইন—এই বিভাগে ১১ খানা গ্রন্থ। ১। শ্রীঅভয়চন্দ্র দত্ত কৃত হিন্দু-ল। ২। ৺ হরিকিশোর রায় কৃত An abstract of the Full Bench Rulings of the Calcutta High Court ৩। শ্রীদ্বারকানাথ তালুকদার

কৃত নূতন খাজানা আইনের সরল ব্যাখ্যা। ৪। শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস কৃত উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেট। ৫। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার কৃত Hindoo Wills Act. ৬। শ্রীশ্যামাকান্ত রায় কৃত ১৮৮২ সনের ১৪ আইন, ৭। ১৮৮২ ৪ আইন ৮। মহম্মদীয় আইন, ৯। বাঙ্গালা ল রিপোর্ট ১ম খণ্ড, ১০। ৭ম খণ্ড, ও ১১। ফৌজদারী রিপোর্ট ১ম ভাগ।

(ড) নিয়ম প্রণালী বিষয়ে ৬ খানা গ্রন্থ। ১। জমিদারী কার্য্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ১ম সংস্করণ, ২। ২য় সংস্করণ মহারাজা শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর মুক্তাগাছা সদর। চৌকিদার ও কনেষ্টবলের হাত বই শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ বালীগাঁও কিশোরগঞ্জ। ৪। Laws of Foot Ball ৫। Laws of Cricket. শ্রীসারদরঞ্জন রায় এম্-এ, মসূয়া কিশোরগঞ্জ। ৬। দলিল রেজেষ্টরী শিক্ষা শ্রীনওসের আলী খাঁ করটীয়া টাঙ্গাইল।

(ঢ) ব্যাকরণ—এই বিভাগে ৩ খানা গ্রন্থ। ১। কাতন্ত্রছন্দ প্রক্রিয়া সংস্কৃত, ২। অলঙ্কারসূত্রম্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সেরপুর, জামালপুর। উনাদি সূত্রম্ শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যার্ণব মসূয়া, কিশোরগঞ্জ।

(ণ) সাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল—গদ্য সাহিত্য ও পদ্য সাহিত্য। গদ্য সাহিত্য ২৫ খানার ২০ খানা বাঙ্গলা ও ৫ খানা ইংরেজী। ১। শোকোচ্ছ্বাস শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ*। ২। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘটক প্রণীত আদর্শ সতী-চরিত্র ও ৩। সদ্ভাব তরঙ্গিনী। ৪। ৺ যাদবচন্দ্র লাহিড়ী কৃত কুলকালিমা। ৫। শ্রীগঙ্গাদাস বসু কৃত আর্য্যজীবন ১ম ভাগ। ৬। শ্রীরাধানাথ ঘোষ কৃত নূতন আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ। ৭। শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত ছেলেদের রামায়ণ ও ৮। সে কালের কথা। ৯। শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস প্রণীত ছাত্র-জীবন ও ১০। বিধবা। ১১। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত দর্শন ও বিজ্ঞান ও ১২। সাহিত্য ও সমাজ। ১৩। নওসের আলী খাঁ ইউসফজী প্রণীত বঙ্গীয় মুসলমান। ১৪। ৺ হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত মনুষ্যের মহত্ব ও ১৫। শ্রীবৎসোপাখ্যান। ১৬। ৺ কিশোরীমোহন চৌধুরী কৃত আর্য্যনারী। ১৭। মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত শিক্ষা। ১৮। শ্রীশ্রীনাথ চন্দ প্রণীত ইন্দ্রপ্রস্থ। ১৯। শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস প্রণীত নবপ্রবন্ধ। ২০। ৺ হরচন্দ্র চৌধুরী কৃত ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির প্রচলিত ক্রিয়া কাণ্ড।

ইংরেজী ৫ খানা গ্রন্থ। (১) Rent Question in Bengal (২) A Critical Essay on the Hindu Law of Adoption, (৩) Strike but hear

(৪) The Defence of Nund Kumar ৺কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, সদর। (৫) Chandrashekhara শ্রীমন্মথনাথ রায় চৌধুরী সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

পদ্য সাহিত্য ৫৪ খান। তন্মধ্যে মহাকাব্য ২ খানা, ১ খানা বাঙ্গালা ও ১ খানা সংস্কৃত। ১। দশানন বধ শ্রীহরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী সেরপুর, জামালপুর। ২। চন্দ্রবংশম্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সেরপুর জামালপুর।

কাব্য ৫ খানা। তন্মধ্যে ৪ খানা বাঙ্গালা, ১ খানা সংস্কৃত। ১। রাজর্ষি-কুমার শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার কুমারুলী, সদর। ২। গীতভারতম্ শ্রীত্রৈলোক্য-মোহন নিয়োগী বি, এল, মাহাম্মদপুর, টাঙ্গাইল। ৩। মহাশ্মশানকাব্য কায়কোবাদ * *। ৪। গৌরাঙ্গ শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী সন্তোষ, টাঙ্গাইল। ৫। মহাপ্রস্থান কাব্য ৺দীনেশচন্দ্র বসু * *।

খণ্ডকাব্য ৩২ খানা। ১। গাঁথা শ্রীরমেশচন্দ্র সিংহ সুসঙ্গ। ২। বোধন, ৩। যোগ ও বিয়োগ শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সুখারী, সদর। ৪। দময়ন্তী বিলাপ শ্রীজগদানন্দ ভৌমিক দিঘপাইত, জামালপুর। ৫। প্রেম ও ফুল, ৬। কুসুম, ৭। কস্তুরী, ৮। চন্দন ও ৯। ফুলরেণু শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস*। ১০। ফুলেরতোড়া শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ বালীগাঁও, কিশোরগঞ্জ। ১১। মানসপ্রবাহ শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ মালতী, টাঙ্গাইল। ১২। সঙ্গিনী ও ১৩। রঙ্গিনী শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ * *। ১৪। বিলাপলহরী শ্রীগগনচন্দ্র রায় জাওলা, নেত্রকোণা। ১৫। পদ্মা, ১৬। গীতিকা, ১৭। আরতি ও ১৮। দীপালী। শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী সন্তোষ। ১৯। দুরাশাকাব্য, ২০। সুখমুকুরকাব্য ৺দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী। ২১। বারমাস, ২২। বাখাতেঁতুল শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী ফরিদপুর, সদর ময়মনসিংহ। ২৩। নয়নাম্বু ২৪। অশ্রুধারা, ২৫। কুসুমস্তবক শ্রীতারাসুন্দর ব্যাকরণতীর্থ সেরপুর, জামালপুর। ২৬। শৈশবকুসুম নওসের আলী খাঁ ইউসফজী করটীয়া, টাঙ্গাইল। ২৭। কুসুমকোরক, ২৮। কুসুমস্তবক ৺কিশোরীমোহন চৌধুরী সেরপুর, জামালপুর। ২৯। পুষ্পাঞ্জলি কৃষ্ণনাথ বিদ্যারত্ন। ৩০। বনকুসুম শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার কুমারুলী, সদর। ৩১। বামাবোধিনী শ্রীগগনচন্দ্র রায় জাওলা নেত্রকোণা। ৩২। কবিকাহিনী ৺দীনেশচন্দ্র বসু *।

অনুবাদ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ৩ খানা যথা (১) শ্লোকমালা শ্রীকালীনাথ দে আরৈতলা কিশোরগঞ্জ, (২) ঋতুমালা শ্রীগিরিশচন্দ্র কবিরত্ন *। (৩) দিগ্বিজয়রত্নম্ শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মৃগা, কিশোরগঞ্জ।

সঙ্গীতগ্রন্থ ৬ খানা। ১। সাধন সঙ্গীত শ্রীগিরীশচন্দ্র কবিরত্ন * *।

২। সারস্বত সঙ্গীত শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ মালতী, টাঙ্গাইল। ৩। গান (স্বরলিপিসহ) শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী সন্তোষ, টাঙ্গাইল। ৪। প্রিয় সঙ্গীত ১ম ভাগ, ৫। ২য় ভাগ শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত সদর। ৬। সারিগান ৺ শ্যামচাঁদ গুপ্ত কেদারপুর, টাঙ্গাইল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তিকা ৫ খানা। ১। চিন্তা ও চাবুক শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী। ২। উত্থান শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। ৩। আবেদনম্ শ্রীকৃষ্ণনাথ বিদ্যারত্ন। ৪। ভারত দুর্ভিক্ষ শ্রীবিশ্বেশ্বর পণ্ডিত। ৫। ক্রন্দন ও সান্ত্বনা শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

প্রাচীন কবির গ্রন্থ ১ খানা। ১। কবি রাজসিংহ কৃত রাগমালা ও সংক্ষিপ্ত-মনসা পাঁচালী রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ প্রকাশিত।

(থ) পত্রিকা—এই বিভাগে ৬ খানা গ্রন্থ। ৫ খানা মাসিক ও ১ খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১। সেরপুর বিদ্যোন্নতিসাধিনী (ময়মনসিংহের প্রথম মাসিকপত্র) ২। ধর্ম্মপ্রকাশ, ৩। বাঙ্গালী, ৪। হানিফী, ৫। আরতি। বিজ্ঞাপনী—ময়মনসিংহের প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা।

(দ) বিবিধ—এই বিভাগে তিন খানা। ১খান ইংরেজী ও ২ খান বাঙ্গালা। ১। Claims of Tangail, ২। সেরপুর বংশাবলী ও ৩। সেরপুর পরগণার অংশ নিরূপণ ৺ হরচন্দ্র চৌধুরী সেরপুর, জামালপুর।

আধুনিক ও প্রাচীন অমুদ্রিত গ্রন্থের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

প্রদর্শনী।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার নানা স্থানে প্রতি বর্ষে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী হইতেছে। প্রতিবৎসর জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন সময়ে প্রদর্শনী হইয়া থাকে। এই সকল প্রদর্শনীদ্বারা দেশের কি উপকার হইতেছে ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে।

দেশের অর্থের সংরক্ষণ ও তাহা বৃদ্ধি করিতে হইলে কি কি উপায়ে দেশের অর্থাগম হইতেছে ও হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা জানা আবশ্যক। দেশের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশের মৌলিকশক্তিসমূহের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সময় সময় জন সংখ্যা গণনাদ্বারাও জনসাধারণ কি উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেশের

অবস্থা অবগত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহা প্রচুর নহে।

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান। সর্ব্বপ্রকার শিল্পে সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া কৃষিই আমাদের শেষ অবলম্বন হইয়াছে। যে সকল কারণে আমাদের এ দুরবস্থা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। মূল কথা আমরা প্রাশ্চাত্য জাতি সমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সক্ষম হই নাই। শিল্প-শক্তি সম্পন্ন জাতির সংঘর্ষে থাকিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র দুর্ব্বল জাতির যে অবস্থা হইয়া থাকে, আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় ইহার ফল। ভারতবর্ষে তাহা অনেকবার হইয়াছে। ইংলণ্ড কৃষি প্রধান স্থান নহে অথচ সেখানে দুর্ভিক্ষ নাই। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখিয়া ইংরেজ-রাজের চৈতন্য হইয়াছে। কৃষির উন্নতির জন্য বৃহৎ আয়োজনে চেষ্টা হইতেছে। ইহা দুর্ভিক্ষ কমিশনের ফল।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতের নানাস্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতেছেন, নানাপ্রকার কৃষি-যন্ত্র, সার ও বীজের ফল প্রদর্শন করিতেছেন। কৃষির উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন জিলাতে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সকল সমিতি হইতে বীজ বিতরিত হইবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে যেমন বীক্ষণ ও পরীক্ষা আবশ্যক কৃষিতেও তাহাই। বরং উহাতে অধিকতর জটিলতা ও ফলের অনিশ্চয়তা থাকাতে অধিকতর অভিনিবেশের আবশ্যক। ভারতের কৃষক বিজ্ঞানের জটিলতা বুঝে না কিন্তু তাহারা মূর্খ নহে। পাটের চাষ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এদেশে একরূপ ছিল না কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কৃষক পাটের চাষ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ইহাদের চক্ষের সমক্ষে অর্থাগমের বিশেষত্ব দেখাইলে ইহারা তাহা অনুধাবন করিবে—ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের ফল কৃষকদিগকে দেখাইতে হইবে ও কৃষকদিগের চেষ্টার ফল প্রতি বৎসর লক্ষ্য করিতে হইবে। এজন্য কৃষি প্রদশনীর প্রয়োজন। কৃষি-বিজ্ঞানের কার্য্যকারক বাবু নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এবার বগুড়া প্রদর্শনীতে কৃষিযন্ত্র ও সার লইয়া যাইয়া কৃষকদিগকে তাহার ব্যবহার বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কৃষির জন্য যত্ন করিতেছেন। তাহাতে দেশে অর্থাগম হইবে। দুর্ভিক্ষ-জনিত লোকের অকাল মৃত্যুর অনেকটা সংখ্যা হ্রাস পাইবে। কার্পাস ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে ভারতের কৃসির সহিত অন্য দেশের কৃষির প্রতিযোগিতা নাই। ভারতের তুলার আঁস দীর্ঘ নয় বলিয়া মেঞ্চেষ্টার তাহা ব্যবহার করিতে পারেন না। ভারতে তুলার উন্নতি করিয়া তুলার চাষ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

শিল্পে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া থাকে। এ দেশ হইতে যাওয়ার সময় একমণের পাটের যে মূল্য হয় পুনরায় ভিন্ন আকারে এ দেশে আসিয়া উহার ১০ গুণের অধিক মূল্য হইয়া থাকে। শিল্প-কুশল হাতের সমক্ষে কৃষকজাতি কখনও দাঁড়াইতে সমর্থ নহে।

আত্মসম্মান-জ্ঞান জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। দরিদ্র হৃদয় মধ্যে আত্মসম্মান-জ্ঞান অসম্ভব। শুধু অপেক্ষাকৃত ধনবান্ উচ্চশ্রেণী লইয়া জাতীয়-জীবন গঠনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। জাতীয়-জীবন গঠন করিতে হইলে কৃষক ও শিল্পকর শ্রেণী যাহাতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে কোনরূপ অভাবে পতিত না হয় এবং ক্রমে সচ্ছলতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা করা উচিত। তাহাদের অর্জ্জিত শক্তি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার আদর করিতে হইবে। তাহারা আমাদের একজন, ও তাহাদের প্রতিভা যত্নের সহিত পালিত ও আদৃত হইতেছে ইহা তাহাদিগকে বুঝিতে দিতে হইবে। স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারদ্বারা এই মহান উদ্দেশ্য সংশাধিত হইতে পারে।

আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মিলন-ক্ষেত্র এবং জাতীয়-জীবন গঠনের পুণ্যভূমি। প্রদর্শনীর সাহায্যে অশিক্ষিত কৃষি-শিল্পকরকে ক্রমে শিক্ষিত কর ; তাহাদের হস্তজাত দ্রব্য ব্যবহার কর। তাহা হইলে তাহারা জাতীয় জীবনের শক্তি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

আমাদের দেশের শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্তর্জ্জাতীয় প্রদর্শনীতে এ দেশের বহু অপকার সাধিত হইবে। কলিকাতা অন্তর্জ্জাতীয় প্রদর্শনীর পরে দেখা গিয়াছে যে, জর্ম্মানী এ দেশজাত বহু সুন্দর শিল্পজাত দ্রব্যের অনুকরণ করিয়া এ দেশে পাঠাইয়াছেন। আমাদের দেশীয় লোকের কর্ত্তব্য এ গুলিকে বিষের ন্যায় বর্জ্জন করা, কিন্তু এ দেশের ক'জন সুলভ দ্রব্যের প্রলোভন উপেক্ষা করিতে পারেন ?

দেশীয় প্রদর্শনীতে এই বিষময় ফল প্রসূত হওয়ার অপেক্ষাকৃত কম সম্ভাবনা ; প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে এক শিল্পকর, সমশ্রেণীর অপর শিল্পকরগণের কার্য্য দেখিতে পারে। তাহাতে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় ও প্রতিযোগিতার ইচ্ছা জন্মে, তাহার মূল্য সামান্য নহে। দেশীয় শিল্পকরের প্রতিভা বিকাশ করার ইহা অপেক্ষা অধিক সুযোগ নাই। দেশে কোন্ জিনিসের আদর অধিক তাহা প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পকর বুঝিতে সমর্থ হয়। শিল্প সম্বন্ধে দেশের রুচি সর্ব্বদা সমান থাকে না। এই পরিবর্ত্তনগুলি জানিবার স্থান প্রদর্শনী-ক্ষেত্র।

দেশের সর্ব্বত্র প্রদর্শনী হইতেছে—ইহা সময়ের শুভ চিহ্ন। আমরা যেরূপ অবস্থার বিপর্য্যয়ে আত্ম নির্ভরের ক্ষমতা শূন্য হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত কৃষি-শিল্পের উন্নতি করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি কৃষি-শিল্পের প্রতি আকর্ষিত হইয়াছে। ইংরেজ রাজপুরুষদিগের সহায়তা লাভ করিলে আমরা অচিরেই কৃষি-শিল্পের উন্নতির দিকে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিব, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

ঘাটু।

অষ্টাবিংশ সারস্বত প্রদর্শনীতে গ্রাম্য-গীতির ব্যবস্থা ছিল। ময়মনসিংহ নগরের কতিপয় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গায়ক এবং যে সকল পণ্য-ব্যবসায়ী দিবসের পরিশ্রমের পর সঙ্গীতে আরাম-অবসর সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকে সারস্বত-ক্ষেত্রে দুই রাত্রি গ্রাম্য-গীতি শুনাইয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন। ঘাটু এই গ্রাম্য-গীতির এক প্রধান অংশ ছিল। "আরতি"র সারস্বত সংস্করণে ঘাটুর আলোচনা ভরসা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিগত শতাব্দীর প্রথমভাগে অথবা তৎপূর্ব্ব শতাব্দীর শেষভাগে লালা আনন্দীরাম নামক একজন শ্রীহট্টবাসী এই সঙ্গীতের প্রবর্ত্তনা করেন। বর্ত্তমান সময়ে ময়মনসিংহের পূর্ব্ববিভাগে ইহার বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের পূর্ব্ব প্রান্ত অধিকতর নিম্ন বলিয়া বর্ষাকালে প্রায় অধিকাংশ স্থল জলমগ্ন থাকে। বর্ষাকালে যখন সমস্ত পথ, ঘাট ও মাঠ জলে ডুবিয়া যায় তখন গৃহস্থদিগের অন্য কোন বিশেষ কার্য্য থাকে না; সুতরাং কেবল বসিয়া বসিয়া সময় অতিবাহিত করা নিতান্ত কষ্টকর বিবেচনায় সেই সুদীর্ঘ অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিবার জন্যই বোধ হয় এই ঘাটু গানের প্রচলন হইয়াছিল। বর্ষাকালে হাট বাজার করা ও ঘাস সংগ্রহ করার জন্য প্রতি গৃহস্থেরই এক এক খানা নৌকার প্রয়োজন; আছেও তাই। নৌকায় উঠিয়া ঘাটে ঘাটে নৌকা লাগাইয়া গান করা হইত বলিয়া এই সঙ্গীতের নাম ঘাটু হইয়া থাকিবে।

প্রত্যেক ঘাটু গানের সম্প্রদায়ে একটী করিয়া ছোট বালক থাকে। তাহাকে ঘাটুর ছোক্‌রা বলা হয়। ঐ বালক মেয়ের পোষাক পরিধান করিয়া নানাপ্রকার সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তালের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নৃত্য করে এবং সঙ্গীতের

সময় সঙ্গীত "বাত্তাইয়া" দেয়। "বাতান" কথাটী হিন্দীমূলক। ঘাটুর অনেক গানই হিন্দী মিশ্রিত। সঙ্গীতের অন্তর্গত ভাবগুলি শ্রোতাগণকে অঙ্গভঙ্গীদ্বারা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া "বাতানে"র মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জন্যই নৃত্যকারী বালকের প্রয়োজন।

ঘাটু ঢোলক, বেহালা ও মন্দিরা সংযোগে গীত হয়। প্রত্যক গানের চারিটী অংশ—আরম্ভ, তালফের, মিল ও ছম্। "ছম্" প্রত্যেক সঙ্গীতের শেষ অংশ। ইহা সংস্কৃত "সম্" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। "সম্" শব্দের অর্থ সম্যক্ (শোভন)। মূল সংগীতের চুম্বক গ্রহণে "ছম্" রচিত হইয়া থাকে। এই "ছম্"দ্বারা সঙ্গীতের সম্পূর্ণ মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়। "ছমে"র ভাব ও তাল নর্ত্তনশীল; এই অংশ ছোক্‌রাদ্বারা নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গীত হইয়া থাকে। যখন বালিকাবেশে সুসজ্জিত বালক, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ঘাটুর ঐ তরল অংশ গান করিতে থাকে তখন উহাতে পল্লী-সুলভ এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত-শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠে। উহা বস্তুতঃই চিত্ত-উন্মাদকর এবং আবেশ উৎপাদক।

ঘাটু গানগুলি নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—(১) গৌর, (২) বংশী, (৩) সাজন, (৪) রূপ, (৫) জলভরা, (৬) সেজুয়া, (৭) ভোর, (৮) বিরহ ইত্যাদি। আমরা প্রত্যেক বিভাগের এক একটী সঙ্গীতের অংশ বিশেষ প্রদান করিয়া উহা বুঝাইতে যত্ন করিব।

১। গৌর বন্দনা সঙ্গীতঃ—

গৌরা উদয় হৈল নদিয়ায়।
(ওরে) নীরদবরণ পরিহরি সোণার গৌর কায়।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করি, সবে বলে হরি হরি
গৌরা ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়॥
ইত্যাদি—

২। বংশী ঃ—

রাধাকৃষ্ণ কীর্ত্তনে বাঁশের বংশী এক বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। আমরা বংশীর সমস্ত সঙ্গীতটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(আরম্ভ)

বল বংশী রে, কেন রে তুই নিদারুণ, ফুঁকারিছ ঘন ঘন.
পাগল করিলে কেন. সুমধুর স্বরে।
কিবা যাদু জান রে বংশী ধ্বনি শুনে বনে আসি, হইয়ে উদাসী।

তালফের—

বল বল বংশী তোমার জন্ম কোন্ স্থানে,
সদায় রাধা রাধা, বল, কে শিখাইল রাধার নামে।

মিল—

সপ্তছিদ্রে সপ্ততানে, কি সুধা ঢালিয়ে কানে,
(ওরে) পাগলিনী কর্‌লে রাধারে।

ছম্—

ওগো সখী গো শুন গো মোহনবংশী বাজে কোন্ বনে।
বংশী বাজে যেই বনে, যাব আমি সেই খানে
বনে যাইয়ে আন্‌ব সখী বংশীবদনে,
বাঁশী শুনে অভাগিনী বাঁচি না প্রাণে।

৩। সাজন ঃ—

সখিগণ রাধিকাকে সাজসজ্জা করিয়া জল আনিবার জন্য যমুনায় যাইতে অনুরোধ করিতেছেন—

এস গো রাধিকে, ওগো প্রাণাধিকে,
বেশ্ করে বেশ করে দেই তোরে।
সাজাইব এম্নি কইরে, যেন সে বেশ হেরে,
মনোহারীর মন বাঁধা পড়ে।
ও তোর যেথানে যা সাজে গো সখি
দিব মনসাধে সযতনে ও বিধুমুখী।
করে দিব কিঙ্কিনী, কর্ণে কুণ্ডল পৃষ্ঠে বেণী,
গলে গজমতি মালা,
রাঙ্গা চরণ সাজাব নূপুরে, বাজিবে গো রুণু রুণু
হবি গো সুখী॥

৪। রূপ ঃ—

শ্রীমতী রাধিকা জল আনিতে যাইয়া যমুনারকুলে কৃষ্ণরূপ দর্শনে বিমোহিত

---

* "বাঁশী বাজান জান না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী কালারে, আমার প্রাণত মানে না।"
এই সর্ব্বস্পর্শী সংগীতটীও এই বংশীর অন্তর্গত।

হইয়া পড়িয়াছেন। এবং ঘরে যাইয়া সহচরীদিগের নিকট নিম্নলিখিতরূপে হৃদয়ের উদ্বেগ ব্যক্ত করিতেছেন—

এইছে রূপ দেইখে আইলাম, সই হিউয়া না মানে।
দেইখে আইলাম যমুনারে. মোহনচূড়া হেলা বায়ে,
কলসী ভরিয়ে রইলাম রূপ নিরখিয়ে।

ইত্যাদি—

৫। জলভরা ঃ—

অপরাহ্নে সখিগণ সমভিব্যাহারে কমলিনী সেই কদম্বতরু শোভিত, নির্ম্মল-সলিলা-তটশালিনী-সুন্দর-যমুনা-তীরে জল আনিতে যাইয়া, উপহাসরত নটবরের রূপ মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইয়া বলিতেছেন—

(আমার) জল ভরিতে কি হইল সই, ঘাগড়ি ভরিয়া লই,
যখন কিনারায় থুই, ঢালিয়ে দেয় কানাই।

ইত্যাদি—

৬। সেজুয়া ঃ—

রাধিকা সখিগণ সমভিব্যাহারে রজনীযোগে কুঞ্জবনে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের আসার আশায় কুসুম সজ্জা করিয়া বসিয়া আছেন। পুষ্পের পালঙ্ক. পুষ্পের শয্যা, পুষ্পের আস্তরণ। লতায় লতায় শাখায় শাখায় গলে গলে পুষ্পমালা দুলিতেছে, শ্রীমতী ও সখিগণ আজ পুষ্পাভরণে সুসজ্জিতা, পুষ্পগন্ধে আজ কুঞ্জবন পরিপূর্ণ; কিন্তু এখনও কৃষ্ণচন্দ্র কুঞ্জবনে পদার্পণ করিলেন না। রজনী প্রায় অবসান হইয়া আসিল দেখিয়া শ্রীমতী উৎকণ্ঠিত চিত্তে সখিগণের প্রতি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সেজুয়ার বর্ণনীয় বিষয়—

মাধবী কৈরবী ফুলে, সেজুয়া সাজাইলাম সই।
আসবে বইলে আশা দিয়ে সে বন্ধু আর আইল কই।
হৃদয় পিঞ্জিরার পাখীয়া, উড়ে সই গেল কই, শিকল কাটিয়া।
অতি যতনের শুয়াপাখী. উড়ে সই গেল কৈ, আমায় দিয়ে ফাঁকি।
হায় রে হায়, দহেরে ছাতিয়া, ফুলের সজ্জা দেও গো সখী
জলে ভাসাইয়া। ইত্যাদি—

৭। ভোর ঃ—

নিশি শেষে যখন বংশীবদন অতি সন্তর্পণে ভয়ে২ নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিতে-ছিলেন তখন সখিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন এবং অভিমানিনী রাধিকা

সখিগণকে উপলক্ষ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে যাহা বলিতেছেন তাহাই ভোরের বর্ণনীয় বিষয়। এখানে কোন সহচরী কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

ভোরের বেলায় রে বন্ধু কুঞ্জেতে আইস না
গত হইল সারানিশি, ওরে ফুলের শয্যা হৈল বাসী, ও কালশশী—
নিরদয়, ছিলে গতনিশি যার বাসরে, তারে কেন নৈরাশ কৈরে
নিশি ভোরে কর্‌লে আগমন।
তুমি যাওহে চন্দ্রাবলীর পাশে, যে তোমারে ভালবাসে
হেথা বন্ধু নাহি প্রয়োজন
ঘুমাইছে কমলিনী তোমায় হের্‌বে না। ইত্যাদি

৮। বিরহ :—

বিরহই ঘাটু গানের প্রাণ। এই বিরহ-সঙ্গীত অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী ও উন্মাদকর। নায়িকা বিরহ-শয্যায় কোকিলের কুহুধ্বনিতে শিহরিয়া উঠিতেছেন। কুসুমসৌরভসুবাসিত মলয় মারুত স্পর্শে স্পন্দিত হইতেছেন, মাধবী রজনীর নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে বিগত সৌভাগ্য-স্মৃতির তাড়নে আক্ষেপ করিতেছেন। রাধিকার এই সকল উক্তি বিষয়ক সঙ্গীতগুলিই বিরহ সঙ্গীত। মেঘদূতে বিরহ-বিধুর যক্ষ মেঘ দর্শনে তাহার করুণ মিনতি প্রিয়ার নিকট বহন করিতে যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ঘাটুর নায়িকাও সেইরূপ কোকিলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

অভাগিনীর দুঃখ বাতিয়া রে কোকিলা কইও পীতবাসে।
যেই নগরে পিউ সেই নগরে চলি যাও।
ওরে পিউর চরণে কইও মেরা মিনতিয়া। ইত্যাদি—

এই বিরহ যখন চরমে উঠিল সেই সময়ের গান এইরূপ :—

কইও দুঃখ্ বন্ধের লাগ পাইলে গো, নিরলে।
আমার বন্ধু চিকণকালা, বাজায় বাঁশী কদমতলা,
আমারে কি পড়ে বন্ধুয়ার মনে গো।
আসি মৈলে এই করিও, না ভাসাইও না পুড়িও,
বাইন্ধা রাইখো তমালেরই ডালে গো, নিরলে।

অজ্ঞাতনামা পল্লী-কবির উক্ত সঙ্গীতের পার্শ্বে আমরা খ্যাতনামা কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর এইরূপ একটী সঙ্গীতের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

এ দেহ দহন করো না দহন দাহে,

ভাসা'ও না দেহ যমুনা প্রবাহে,
বান্ধিয়া রাখিও তমালেরই ডালে। ইত্যাদি—।

বন্য ফুলের সৌরভ কত মধুর এবং গ্রাম্য-গীতির ভাব কিরূপ সরল ও সহজ পাঠকগণ তুলনায় তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ঘাটু গানের উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিয়া পাঠকগণ উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে রাধাকৃষ্ণ পূজিত; মহাজন পদাবলীতে যে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত এবং কবি, যাত্রা ও থিয়েটারে যে রাধাকৃষ্ণের চরিত্র গীত ও অভিনীত সেই রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনেই ঘাটু গান রচিত হইয়া থাকে। ঘাটু, গ্রাম্য-কবির গান। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম্য-কবি আপন রুচি প্রবৃত্তি অনুসারে রাধাকৃষ্ণকে এক এক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহার স্থানে স্থানে ভাবের আবর্জ্জনা এবং রসের অবিলতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি, যাত্রা এবং থিয়েটারেও সময়ে সময়ে সেইরূপ পঙ্কিলতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেও গ্রাম্য-কবির কবিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি, প্রকৃতি হইতে কবিত্বের রেণুকণা সংগ্রহ করিয়া গ্রাম্য-গীতি রচনায় যে শক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহা অনেক উচ্চশ্রেণীর কবিজনেরও স্পৃহনীয়। পূর্ব্বে হিন্দুগণ এই ঘাটুর উৎসাহদাতা এবং সংরক্ষক ছিলেন। এখন মুসলমানগণও ঘাটু গাইয়া থাকেন। প্রত্যেক ঘাটুর দল দুই পংক্তি হইয়া প্রতিযোগিতায় উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে নিয়ম উঠিয়া যাইতেছে।

ঘাটুর সমস্ত অঙ্গগুলি পর্য্যালোচনা করিলে এবং বিশেষভাবে বালকের নৃত্য এবং "বাতানে"র দিকে লক্ষ্য করিলে মনে হয় ঘাটুতে একাধারে টেপ্পো, যাত্রা, কবি, কীর্ত্তন, অভিনয় এবং নৃত্যকলার সমাবেশ হইয়াছে। যাঁহারা ঘাটু রচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা অবজ্ঞার পাত্র নহেন। স্কটলণ্ডের কৃষক কবি রবার্ট বারন্স্ তাঁহার গ্রাম্য-ভাষায় কি অপূর্ব্ব কবিত্বই না দেখাইয়া গিয়াছেন! অনেক অপরিজ্ঞাত বারন্স্ এই গ্রাম্য কবি-সমাজে লুকাইয়া আছেন। ইহাদের কবিত্ব, মার্জ্জিত করিতে হইলে ইহাদের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের পরিচয় আবশ্যক।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ঘাটুর গানগুলি রক্ষিত হইবার যোগ্য। যিনি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম্য-কবিগণের ঘাটু গানগুলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিতে পারিবেন, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।

শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আমরা ৺ লালমোহন সাহা শঙ্খনিধির "ময়মনসিংহ সারস্বত পঞ্জিকা" উপহার প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইয়াছি। দেশভেদে সূর্য্যের উদয়াস্ত কালের বিভেদ ঘটে এ কথা নিশ্চয়; সুতরাং প্রত্যেক জেলার সূর্য্যের উদয়াস্ত কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পঞ্জিকা গণিত হওয়া প্রার্থনীয়। ৺ লালমোহন সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত পঞ্জিকায় সে নিয়ম প্রতিপালিত হইয়াছে। পঞ্জিকা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অল্প, সাধারণ জ্ঞানে যতদূর বুঝি তাহাতে বলিতে পারি, পঞ্জিকা খানা বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমাবেশে এবং নির্ভুল গণনায় অতি উপাদেয় জিনিস হইয়াছে। ৺ লালমোহন সাহা পূর্ব্ববঙ্গের একজন ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি আজ পরলোকে। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত গৌরনিতাই সাহা ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইবেন।

দৃক্‌সিদ্ধ বঙ্গ পঞ্জিকা—এই পঞ্জিকাখানা পূর্ব্ববঙ্গ-পঞ্জিকা-সংস্কার-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতেও গণনার শুদ্ধি রক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন করা হইয়াছে। আজকাল বাজারে পঞ্জিকার অভাব নাই; কিন্তু একটার সহিত অপরটার মতের ঐক্য থাকা প্রায়শঃই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই পঞ্জিকা-বিভ্রাটের দিনে পূর্ব্ববঙ্গ-পঞ্জিকা-সংস্কার-সমিতি পঞ্জিকা প্রকাশ কার্য্যে মনোযোগী হইয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, সমিতি পঞ্জিকা গণনায় যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পন্থা। জ্যোতিষ বচন ও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা না দেওয়ায় পঞ্জিকাখানা একটু অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ভরসা করি, ভবিষ্যতে সমিতি এই অভাব দুরীকরণে যত্নবান হইবেন।

পদ্য-প্রসূন—শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত। ষোলটী কবিতার সন্নিবেশে এই পদ্য গ্রন্থখানা বিরচিত হইয়াছে। পদ্য-প্রসূনের ভাষা সরল, উহার দুই একটী ফুলের গন্ধ আমাদের নিকট ভালই লাগিয়াছে। এই নবীন কবি উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

স্থানাভাব বশতঃ এবারেও অন্যান্য গ্রন্থের সমালোচনা ও "খেদা" প্রবন্ধের শুদ্ধিপত্র দিতে পারি নাই।

বর্ত্তমান "সারস্বত সংস্করণ আরতি"তে কেবল "সারস্বত কৃষি-শিল্প-সাহিত্য প্রদর্শনী" সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা হওয়ায়, অন্যান্য লেখকের প্রবন্ধ দেওয়া হয় নাই। লেখকগণ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

পঞ্চম বর্ষ। পঞ্চম সংখ্যা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীমন্মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি. এ., শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর [illegible] শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীরেবতীমোহন গুহ এম্. এ. বি. এল্., শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি এ., শেখ ফজলল করিম, শ্রীদর্পণচন্দ্র রায় বি. এ., ও সম্পাদক।

ময়মনসিংহ সুহৃদ যন্ত্রালয় হইতে
শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২।



বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১॥০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

সূচী।

নিবেদন।

৫ম সংখ্যা "আরতি" প্রকাশিত হইল। আজও যাঁহারা মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের "আরতি" ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইতেছে। আমাদের বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা যেন ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

বিঃ দ্রঃ আষাঢ় ও শ্রাবণের যুগ্ম সংখ্যা "আরতি" ৩০শে শ্রাবণের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর পণ্ডিত
ম্যানেজার - "আরতি"।

শ্রীমনোমোহন সেন প্রণীত

শিশুতোষ

সুন্দর চিত্র ও সুমধুর কবিতায় সুশোভিত

বর্ণ বানান শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।

মূল্য এক আনা।

ময়মনসিংহ পুস্তকালয়ে এবং আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

নং কলেজ ষ্ট্রীট,

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২। } পঞ্চম সংখ্যা।

হিন্দু-সমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্ষত্রিয় জাতির আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণ জাতি হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন। ক্ষত্রিয় জাতির জন্য যে আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা রজোগুণের বৃদ্ধি, দুষ্ট দমনাদিরূপ রাজ-ধর্ম্মের বিকাশ, বীরত্বলাভ ও তদুপযোগী দেহ গঠিত এবং নির্ভীকতা, ইত্যাদি গুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বাল্যে অস্ত্রশিক্ষা, যৌবনে স্বদেশ রক্ষার জন্য জীবনোৎসর্গ এবং বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভ করাই ক্ষত্রিয় জাতির চরম লক্ষ্য। অথবা সম্মুখ যুদ্ধে দেহত্যাগদ্বারা অক্ষয় স্বর্গলাভ ক্ষত্রিয় জাতির অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম।

শিল্প-বাণিজ্যাদিদ্বারা স্বদেশের ধনবৃদ্ধি করা বৈশ্য জাতির বর্ণ ধর্ম্ম। এবং বার্দ্ধক্যে বিষয়-বাসনা পরিহার পূর্ব্বক মোক্ষলাভ করা তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

শূদ্র জাতির আচার ব্যবহার দেব দ্বিজ সেবার অনুকূল; এবং দেব দ্বিজাদির সেবাদ্বারা মুক্তিলাভ তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

জাতি চতুষ্টয় একমাত্র হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত হইলেও স্ব স্ব জাতির আচার, ব্যবহার, শিক্ষা এবং উদ্দেশ্য ভেদদ্বারা আকৃতি, প্রকৃতি, বুদ্ধি, ব্যবসায় প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য জন্মিয়াছে। অথচ জাতি চতুষ্টয়ের একীভূত শক্তিদ্বারা মহাশক্তিশালী হিন্দু-জাতি সংগঠিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক ভাব, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ইত্যাদি পূর্ণ মানবত্ব ক্ষত্রিয়াদি অন্য জাতি ত্রয়ে নাই। প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণ জাতির অপ্রতিহত প্রভাব ছিল; দৈহিক বলে, মানসিক শক্তিতে, শাস্ত্রজ্ঞানে, শস্ত্র-বিদ্যায় ব্রাহ্মণ জাতিই সমস্ত জাতির

শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। যেহেতু ব্রাহ্মণই সমাজ-পতি, নিয়ম-কর্ত্তা, রাজ-কার্য্যের সহায় এবং হিন্দু জাতির পরিচালক ছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ বাহু বলে রাজ্য শাসন করিতেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দু রাজত্বের প্রকৃত রাজা ছিলেন। অস্ত্র-বিদ্যায় ব্রাহ্মণ জাতির কিরূপ অধিকার ছিল, তাহা পুরাণবেত্তাদিগের অবিদিত নাই। ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয় জাতির অস্ত্রগুরু ছিলেন। দৈহিক বলেও ব্রাহ্মণ জাতি অগ্রগণ্য ছিলেন। পরশুরাম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু সাত্ত্বিক গুণের আধিক্যহেতু, জীব হিংসার্থে অস্ত্রধারণ ব্রাহ্মণের জাতীয়ধর্ম্ম ছিল না। এতাদৃশ প্রবল শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ জাতি লোক হিতার্থে স্পৃহাশূন্য হইয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনাতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। শত সহস্র রাজমুকুট যাঁহাদের চরণ প্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইত, সমস্ত হিন্দু-সমাজ যাঁহাদিগের অঙ্গুলী সঙ্কেতে পরিচালিত হইত, সম্রাটগণ আজ্ঞাবহ দাসরূপে যাঁহাদিগের চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেন, ইচ্ছা করিলে যাঁহারা অতুল ধনের অধিকারী হইতে পারিতেন, তাঁহারা কেবল সমাজের হিত কামনায় অনাসক্ত চিত্তে ফল-মূলাহারী কুটীরবাসী ভিক্ষাজীবী হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। লোক-হিত ব্রতই ব্রাহ্মণ জাতির প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। এরূপ মহানুভব না হইলে কি কেহ সমাজ-শাসক হইতে পারে?

ঋষিগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের জন্য যে আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, পুরুষ-পরম্পরা ঐ নিয়ম প্রতিপালিত হওয়ায় হিন্দু জাতি এক বংশ সম্ভূত হইলেও কালে তাহা চারিটী পৃথকজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। জাতি বিশেষের আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, ব্যবসায়াদি তত্তৎ জাতির গুণের নিয়ামক হওয়ায় প্রত্যেক জাতিতেই তত্তজ্জাতীয় সদ্‌গুণ সকল পরিস্ফুট হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ জাতি আকৃতি, প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক বল, সত্যনিষ্ঠা, সাত্ত্বিক ভাব এবং অন্যান্য গুণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করায় অন্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা সমাজের পূজনীয় হইয়াছিলেন।

ক্ষত্রিয় জাতির আকৃতি, প্রকৃতি, দৈহিক বল, অস্ত্রশিক্ষা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আত্মোৎসর্গ, দুষ্ট-দমন, শিষ্ট-পালন, ন্যায়-নিষ্ঠা, নির্ভীকতা প্রভৃতি সুরোচিত সদ্‌গুণ সকল ক্ষত্রিয় জাতিকে বীরত্বে জগতের শীর্ষস্থানীয় এবং রাজগুণে বিভূষিত করিয়াছিল। হিন্দু জাতির প্রকৃত উন্নতির সময় রাজ-জাতি বলিতে একমাত্র ক্ষত্রিয়কেই লক্ষ্য করিত। তৎকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন জাতি নৃপতি বা সম্রাট হইতে পারিত না।

বৈশ্য জাতির আকৃতি, প্রকৃতি, শিল্প-নৈপুণ্য, ব্যবসায় বুদ্ধি, বৈশ্য জাতিকে

অতুল সম্পদের অধিকারী করিয়াছিল। "রত্ন-গর্ভা" ভারত-ভূমির বরপুত্র বৈশ্যগণ অতুল বৈভবে জগতের সমস্ত ধনীবৃন্দকে পরাস্ত করিয়াছিল। সেই সুযশ আজিও ভিখারিণী ভারত, মাতাকে "রত্ন-প্রসূ" বলিয়া আধুনিক সভ্য জাতির লোভের বিষয় করিয়া রাখিয়াছে।

শূদ্র জাতিও আকৃতি প্রকৃতিতে এবং জাতীয় সদ্গুণে বিভূষিত ছিল।

হিন্দু-ধর্ম্ম এক হইলেও পরতঃপর উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণ হীন জাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত উৎকট সংসর্গে স্বজাতীয় সদ্গুণ ভ্রষ্ট হইবে আশঙ্কায়, ধর্ম্ম-প্রয়োজক ঋষিগণ শাস্ত্র শাসনদ্বারা জাতিভেদ প্রথা এবং জাতীয় বন্ধন দৃঢ় করিয়াছিলেন। কেহ ঐ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া হীন সংসর্গ করিলে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হইত, এবং অনুলোম বিলোম সংসর্গে (সন্তানোৎপত্তি হইলে) বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হইত।

কালক্রমে লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি শিথিল হওয়ায় মৌলিক জাতি চতুষ্টয় হইতে হিন্দু-সমাজে নানাপ্রকার বর্ণ-সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। স্বজাত্যুক্ত ধর্ম্ম পালন না করিয়া হীন সংসর্গ করিলে পাতিত্ব ঘটিত বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজ-চ্যুত হইত না। তবে যাহারা শাস্ত্র-শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিত, তাহাদিগকে একদা হিন্দু সমাজ হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইতে হইত।

শাস্ত্রাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা হিন্দুসমাজচ্যুত হইত, তাহারাই হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ সংজ্ঞায় অভিহিত। কালক্রমে সমাজচ্যুত বিধর্ম্মীদলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে; তন্মধ্যে কতিপয় শক্তিশালী মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্ম উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইতেই মুসলমান, বৌদ্ধ এবং খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে।

বিজাতীয় ধর্ম্মের আচার, ব্যবহার, উদ্দেশ্য প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গ, হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তবে, যে ব্যবহারিক নীতি মনুষ্যকে সভ্য বলিয়া পরিচিত করে, তাহার কতকাংশ হিন্দু-সমাজ হইতে গৃহীত বা হিন্দু-সমাজের অনুরূপ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সুখেচ্ছা জীবের সহজাত ধর্ম্ম। সুতরাং হিন্দু-জাতিও যেমন সুখপ্রার্থী, বিধর্ম্মিগণও তদ্রূপ সুখাভিলাষী; কিন্তু এক্ষণ সংস্কারকদল যে সভ্য জাতির অনুকরণে হিন্দু-ধর্ম্মের সংস্কার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সুখেচ্ছার সহিত হিন্দু-জাতির সুখেচ্ছার সম্পূর্ণ বিভিন্নতা বিদ্যমান। হিন্দুর সুখ অন্তর্মুখ (অন্তর্জগত লইয়া;) আধুনিক সভ্য জাতির সুখ বহির্মুখ (বহির্জগত লইয়া।) হিন্দুর উদ্দেশ্য, বাসনা ত্যাগ করিয়া নিত্য সুখলাভ, পাশ্চাত্য সভ্যজাতির উদ্দেশ্য

বাসনার চরিতার্থতা দ্বারা ঐহিক সুখলাভ; যে কোন উপায়ে হউক, বাসনার চরিতার্থতাই সভ্যজাতির পরম পুরুষার্থ।

হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য জাতি ছলে, বলে, কৌশলে বা প্রলোভনে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া স্বধর্ম্মের পুষ্টি সাধনে যত্নবান্। কিন্তু হিন্দুগণ বিধর্ম্মিগণকে স্বধর্ম্মভুক্ত করা দূরে থাকুক, হিন্দুগণ মধ্যে যাহারা অনাচার, অত্যাচারদ্বারা শাস্ত্র-শাসন উল্লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকেও সমাজচ্যুত করিয়া স্বধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করেন। ইহাদ্বারা যদিও পরধর্ম্মের পুষ্টিসাধন ও স্বধর্ম্মের ক্ষীণতা জন্মে, তথাপি হিন্দুগণ স্বধর্ম্মের পবিত্রতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। হিন্দু জাতির নিকট বাহ্য চাকচিক্যশালী অধিক পরিমাণ গিল্টীকরা দস্তা বা তামা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের অধিক আদর। হিন্দু-ধর্ম্মে গিল্টীর আদর নাই। বিশুদ্ধ কাঞ্চনে অন্য ধাতু মিশাইয়া সুবর্ণের মহিমা নষ্ট করা হিন্দু-ধর্ম্মের অভিপ্রায় নহে।

এতক্ষণ যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইল, তদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে জাতিভেদ প্রথাই হিন্দু-ধর্ম্মের মূল ভিত্তি।

স্ব স্ব জাত্যুক্ত আচার ব্যবহারের ভেদহেতু এক দেশবাসী হইয়াও জাতিভেদে যে আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য হয়, পূর্ব্বেই সংক্ষেপে তদ্বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণ তৎসম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আবশ্যক হইতেছে।

ব্রাহ্মণ জাতি—শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, ব্রহ্মণ্যতেজোব্যঞ্জক, উদারমুখমণ্ডল, উন্নতনাসিকা, প্রশস্তললাট, আয়তউজ্জ্বলনেত্র, দীর্ঘায়ুঃ, নিরাময়, ক্ষমাশীল, সুশ্রী এবং প্রশান্তমূর্ত্তি।

ক্ষত্রিয় জাতি—রক্তাভ, ব্রাহ্মণ হইতে অপেক্ষাকৃত খর্ব্বদেহ, বিশালবক্ষঃ, প্রশস্তললাট, ঈষৎগোলাকারবঙ্কিমনেত্র, বিশালবাহু, উন্নতনাসিকা, বীরত্বব্যঞ্জক-সুগঠিতদেহ, সুগভীরনাভি, ভীতিচিহ্নবিবর্জ্জিত, প্রতিজ্ঞাপূর্ণমুখমণ্ডল এবং ভীমকান্তমূর্ত্তি।

বৈশ্য জাতি—পীতবর্ণ, মধ্যমাকার, উন্নতললাট, প্রসন্নবদন, স্থূলদেহ ও শ্রীমান্।

শূদ্র জাতি—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায়, বিনয়পূর্ণমুখমণ্ডল, অনায়ত উজ্জ্বলনেত্র, কৃষ্ণকেশ, ক্ষীণমধ্য এবং শান্তমূর্ত্তি।

বর্ণ চতুষ্টয়ের আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে মনিষিগণ হিন্দু-ধর্ম্মের একটী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মণ জাতিকে মস্তক, ক্ষত্রিয় জাতিকে বাহু, বৈশ্য জাতিকে উদর, এবং শূদ্র জাতিকে পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের দৈহিক পরিমাণ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন তত্ত্ব সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশিত করা হইল।

মানব-দেহের সাধারণ দৈর্ঘ্য স্ব স্ব হস্তের পরিমাণে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত (সাড়ে তিন হাত) পরিমিত। কিন্তু এই নিয়মটী সকল জাতির পক্ষে একরূপ নহে; ব্রাহ্মণ স্বহস্তের পরিমাণে পাদ ন্যূন চতুর্হস্ত (পৌণে চারি হাত,) ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে সার্দ্ধ পাদ ন্যূন, বৈশ্য স্বহস্তের পরিমাণে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত। এবং শূদ্র জাতি স্বহস্তের পরিমাণে স্বপাদ ত্রিহস্ত (সোয়া তিন হাত) পরিমিত বহু কালের অনাচার অত্যাচারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জাতিগত আকৃতি প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিলেও ভূত চিহ্নের উজ্জ্বল রেখা অতীতের অন্ধকারে একদা বিলীন হয় নাই; এখনও তাহার ক্ষীণ চিহ্ন প্রত্যেক জাতিতেই অস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক্ষণে আর ব্রাহ্মণের পূর্ব্বের কিছুই নাই, বর্ত্তমান সময়ে কেবল যজ্ঞসূত্র ধারণ মাত্রই (তাহাও আবার কাহারও কাহারও নাই) ব্রাহ্মণের চিহ্ন হইয়াছে। বহুশত বর্ষের পরাধীনতায় ও অনাচার অত্যাচারে ক্ষত্রিয় জাতির আর সে দৈহিক বল বীর্য্য বা ক্ষত্রিয়োচিত গুণ কিছুই নাই। তথাপি ভূত গৌরবের ক্ষীণ চিহ্ন যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তদ্দ্বারা জাতিগত বৈষম্য এখনও কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে। জাতিগত দৈহিক দৈর্ঘ্যের পরিমাণ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণ তাহা ঠিক পূর্ব্বানুরূপ না থাকিলেও একদা সর্ব্বজাতির দৈহিক দৈর্ঘ্যের পরিমাণ সমতা প্রাপ্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণ জাতি যে স্বহস্তের পরিমাণে এক পাদ কম চতুর্হস্ত (পৌণে চারি হাত) এবং শূদ্র জাতি স্বহস্তের পরিমাণে সার্দ্ধ ত্রিহস্তের ন্যূন তাহা এখনও অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বর্ণধর্ম্ম যথাশাস্ত্র প্রতিপালিত হওয়াতেই হিন্দু জাতির প্রকৃত উন্নতি হইয়াছিল, বহু সহস্র বৎসরের আচার ব্যবহারে যে জাতিগত পার্থক্য জন্মিয়াছে তাহা সহজে লুপ্ত হইবার নহে। হিন্দু এবং মুসলমান জাতি বহু কাল হইতে এক দেশবাসী হইলেও আচারগত বৈষম্য হেতু অদ্যাপি আকৃতি প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

এতক্ষণ জাতিভেদ সম্বন্ধে যে যে বিষয় আলোচিত হইল, তদ্দ্বারাই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে জাতিভেদ প্রথাই হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাণ।

জীবন রক্ষার প্রধান কারণ যেমন খাদ্য, তদ্রূপ জাতীয়-জীবন রক্ষার প্রধান কারণ আচার। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত আচার দ্বারাই হিন্দু-ধর্ম্ম জীবিত রহিয়াছে।

উপযুক্ত খাদ্যাভাবে যেমন জীবনী শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত ও শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রাচার উপযুক্তরূপে প্রতিপালিত না হওয়ায় হিন্দু-ধর্ম্মের জীবনী শক্তি ক্রমে ক্ষীণ এবং হিন্দুর সমাজ-শরীর নানারূপ রোগগ্রস্ত হইতেছে। হিন্দু জাতির আচার ব্যবহারের মধ্যে খাদ্যাখাদ্যের বিচারই সর্ব্বপ্রধান। জাতিভেদ-প্রথা যেমন হিন্দু ধর্ম্মের প্রাণ, হিন্দু-ধর্ম্মের আচার খাদ্যাখাদ্যের বিচার তদ্রূপ জাতিভেদের জীবন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আচার ব্যবহারের তারতম্যেই জাতিগত আকৃতি প্রকৃতির বৈষম্য ঘটিয়াছে। এক্ষণে ইহাই দেখাইব যে খাদ্যাখাদ্যের বিচারই তাহার প্রধান কারণ।

হিন্দু-ধর্ম্মের প্রত্যেক বিষয় সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক তিনভাগে বিভক্ত। সুতরাং খাদ্য দ্রব্যও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিকভেদে তিন প্রকার। লঘু, পুষ্টিকর, মধুর, অনুত্তেজক অথচ মানসিক সদ্বৃত্তিবর্দ্ধক দ্রব্য সাত্ত্বিক খাদ্য। শারীরিক বল, বীর্য্য, সাহস, দম্ভ, ক্রোধ প্রভৃতি রজোগুণ বর্দ্ধক এবং উত্তেজক গুরুপাক দ্রব্য রাজসিক খাদ্য। আলস্য, মত্ততা, মোহ, তন্দ্রা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি নৈসর্গিক দুষ্প্রবৃত্তি বর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, কটু বিদাহী, পর্য্যুসিত, শুষ্ক, মাদক প্রভৃতি অপকৃষ্ট দ্রব্য তামসিক খাদ্য।

সাত্ত্বিক দ্রব্য ভক্ষণে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ক্ষমাশীলতা এবং সৎপ্রবৃত্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণ জন্মে। রাজসিক দ্রব্য ভক্ষণে দৈহিক বল বৃদ্ধি, এবং দম্ভ, অভিমান, বৈরনির্য্যাতন প্রভৃতি রজোগুণ জন্মে। তামসিক দ্রব্য ভক্ষণে দৌর্ব্বল্য, আলস্য, মোহ, হিংসা, দ্বেষ, ইন্দ্রিয়পরতা প্রভৃতি জঘন্য তামসিক ভাব জন্মে।

ঋতু, মাস, তিথি, দিবা, রাত্রি এবং কালানুসারে যে যে দ্রব্য ভক্ষণের বিধি-নিষেধ হিন্দু-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত মানবশরীরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক মুনিঋষিগণ গভীর গবেষণাদ্বারা ঐ সমস্ত দ্রব্য (দেশ-কাল-পাত্রানুসারে) মানবশরীরের সহিত নিয়মিত করিয়া আয়ু, বল, স্বাস্থ্য এবং মানসিক সদ্বৃত্তি নিচয় বৃদ্ধির উপায় স্থির করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সংহিতা ও আহ্নিক-তত্ত্ব আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সমস্ত নিয়ম কেবল হিন্দু-ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর নহে—তাহা আয়ুর্ব্বেদ এবং বিজ্ঞানসম্মত। ঋষিগণের অভিপ্রায় সম্যক্ বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। তথাপি যুক্তিদ্বারা যতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি, এ সমস্ত নিয়ম কেবল কল্পনা-প্রসূত নহে।

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যথাশাস্ত্র নিয়ম প্রতিপালন করিলে, তদ্দ্বারা মানব (কেবল হিন্দুর নহে) জাতির শারীরিক মানসিক সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

যদিও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির জন্য খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং হিন্দু জাতিসাধারণের জন্যও খাদ্যাখাদ্যের কঠোর বিধিনিষেধ ব্যবস্থিত আছে, তথাপি ইহা বুঝিতে হইবে যে, হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয় ব্যক্তিগণও ঐ সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে আংশিক ফলভাগী হইতে পারে—পুরুষ-পরম্পরায় নিয়ম প্রতিপালন করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এক জীবনে তদ্রূপ ফল পাওয়া অসম্ভব।

চেতন অচেতন উভয়বিধ প্রাণীর পক্ষেই আহারীয় দ্রব্য আয়ু এবং শারীরিক-মানসিক উন্নতি-অবনতির প্রধান সাধক। কেবল চৈতন্যময় জীব নয়, অচেতন প্রাণী বৃক্ষাদিও আহারীয় দ্রব্যগুণে দীর্ঘজীবী এবং পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ভূ-রস, জল, বায়ু প্রভৃতিই পাদপজাতির আহারীয় দ্রব্য। উপযুক্ত সার প্রদান, নিয়মিত জল-সেচন প্রভৃতি দ্বারা অচেতন প্রাণীর যেরূপ আয়ুবৃদ্ধি ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্যের নিয়মিত ব্যবহারে চৈতন্যময় প্রাণী মাত্রেরই আয়ু এবং দৈহিক উন্নতি হইয়া থাকে। দৈহিক উন্নতি-অবনতির সহিত মানসিক উন্নতি-অবনতির অতি নিকট সম্বন্ধ। বিশেষতঃ কতকগুলি আহারীয় দ্রব্য নির্দ্দিষ্টরূপে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি এবং মানসিক সৎ অসৎ বৃত্তিগুলি সতেজ করে। অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা ঋষিগণ গভীর গবেষণাদ্বারা এবং যোগজ নেত্রে বস্তুতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া লোকহিত-কামনায় দেশ-কাল-পাত্র-উপপত্তি-প্রয়োজন ভেদে তাহা যথেষ্ট বিনিয়োগের নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

যতদিন হিন্দু-জাতি খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে শাস্ত্রবিহিত বিধি-নিষেধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, ততদিন জাতীয় শক্তি, আয়ু, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছিল। যে সময় হইতে হিন্দু-সমাজে স্বেচ্ছাচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তদবধি হিন্দুগণ ক্ষীণায়ুঃ, অল্পবীর্য্য, রুগ্ন, অলস এবং জাতীয় শক্তি হীন হইয়া জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে। যদিও বহুশত বর্ষ হইতে ক্রমে ক্রমে হিন্দু-সমাজে অনাচার স্বেচ্ছাচার প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে স্বেচ্ছাচারের এত প্রাবল্য ছিল না, এবং সেই জন্যই যে তাৎকালিক হিন্দুগণ বর্ত্তমান সময়ের হিন্দুগণ অপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ, বলবান্ এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ ছিলেন,

ইহা বোধ হয় পাশ্চাত্যশিক্ষাবিকৃত ব্যক্তিগণ ভিন্ন চিন্তাশীল হিন্দু মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

কেহ কেহ বলেন, বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঋষিগণ দেশের জল বায়ুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সমস্ত খাদ্যাখাদ্য এবং আচার ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহা সময়ের উপযোগী নহে; সুতরাং সংস্কারকগণের মতে তাহার পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ যদি তোমার আমার বুদ্ধি লইয়া কার্য্য করিতেন, তবে এতকাল কেন, দশ বৎসর পরেই তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের সুশাসন অদ্যাপি হিন্দু-সমাজে বিদ্যমান থাকিত না। ঐ সমস্ত নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারে, হিন্দুকুলে আজিও ঐরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় নাই।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ যোগজ নেত্রে বস্তুতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া কিরূপ অভ্রান্ত ব্যবস্থা করিতেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত পাঠকগণকে না দেখাইয়া পারিতেছি না।

বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশে রাজানুমোদিত "এলোপ্যাথিক" চিকিৎসা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে এ দেশের অতি পুরাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা একদা লুপ্ত হইবার কথা। কিন্তু সত্যের আদর কখনও লুপ্ত হইতে পারে না। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা রাজার সহায়তায় যতই কেন উন্নতি লাভ করিয়া না থাকুক, যতই উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যদ্বারা অকৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুত কেন না হউক, তথাপি দশ পনর বৎসর পরে পরেই ঔষধের গুণের তারতম্য হওয়ায়, "ফার্ম্মাকোপিয়া" পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় মতের এক একটী পৃথক্ তৈল, ঘৃত এবং বটিকাদির ন্যায় এলোপ্যাথিক মতের পাঁচ সাতটী মূল ঔষধ মিলিত হইয়া এক একটী মিশ্রঔষধ প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঔষধ মিশাইবার ও মাত্রা স্থির করিবার ভার চিকিৎসকের (ডাক্তারের) উপর ন্যস্ত। সার্জ্জন জেনারল হইতে ৮৲ টাকা বেতনের কম্পাউণ্ডার পর্য্যন্ত নিজ নিজ বিবেচনা মতে ঔষধ সংযোগ এবং মাত্রা স্থির করিয়া থাকেন। এলোপ্যাথিক মতে ৮।১০টী ঔষধের অধিক একত্র মিলাইয়া (কোন রোগে) এ পর্য্যন্ত ব্যবহারের নিয়ম কেহই করিতে পারেন নাই। অথচ আয়ুর্ব্বেদীয় মতে শতাধিক মূল ঔষধ নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় একত্র মিশাইয়া এক একটী তৈল, ঘৃত, বটিকাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু যে তৈল, ঘৃত বা বটিকায় যে মাত্রায় যত গুলি ঔষধ একত্র মিলাইবার নিয়ম সহস্র সহস্র

বৎসর পূর্ব্বে ঋষিগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে, অদ্যাপি কোন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন নাই ; এবং পরিবর্ত্তনেরও আবশ্যক হয় নাই—কারণ উপরোক্ত ঔষধ সমূহে রোগারোগ্যশক্তি এখনও পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। এতদ্দ্বারা ইহাই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ যোগজ-জ্ঞানে দ্রব্য সমূহের ভৈষজ্যতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া যে রোগের জন্য যে যে দ্রব্যের রাসায়নিক সংযোগ এবং মাত্রা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন বা সে শক্তি সাধারণ মানবের নাই। অভ্রান্ত সিদ্ধান্তই "বেদ" নামে অভিহিত। ঋষি-প্রচারিত ভৈষজ্যতত্ত্ব যদি অভ্রান্ত না হইত, তবে তাহার নাম কখনই "আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্র হইত না।

এই দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে, বহু সহস্র বর্ষের পূর্ব্বনির্ব্বাচিত ঔষধ যদি বর্ত্তমান সময়েও কার্য্যকর হয়, তবে তৎসমকাল নিরূপিত খাদ্যাখাদ্য বা আচার, ব্যবহার ও প্রণালী উপকারী না হইবে কেন? আধুনিক সংস্কারকগণ প্রাচীন আহার ব্যবহারকে যতই কেন ঘৃণার চক্ষে না দেখুন, কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদিগের আদর্শ লইয়া নব-হিন্দু-ধর্ম্ম গঠন করিতে চান, সেই সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশবাসিগণও হিন্দু-জাতির আহার-ব্যবহার হইতে অনেক হিতকর বিষয় গ্রহণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য সভ্য জাতির মধ্যে যাঁহারা যোগ শিক্ষার পক্ষপাতী (থিওসফিষ্ট,) তাঁহারা আহার, ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হিন্দুমতে চলিয়া থাকেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে হিন্দুর আচার, ব্যবহার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

এক্ষণ সংস্কারকগণকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যে বলেন, "জাতিভেদদ্বারা হিন্দু-সমাজের অনিষ্ট হইতেছে, খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই।" ইহা কি যুক্তিমূলক? সংস্কারকগণ কি হিন্দু-ধর্ম্ম স্থির রাখিয়া তাহার সংস্কার করিতে চান, না তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া কেবল হিন্দু নামে পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন?

যদি হিন্দু-ধর্ম্ম স্থির রাখিয়া কোন কোন অংশের সংস্কার করিতে হয়, তবে জাতিভেদ প্রথা বা হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত খাদ্যের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। কারণ জাতিভেদই হিন্দু-ধর্ম্মের মূল উপাদান এবং খাদ্যাখাদ্যের বিধিনিষেধ জাতীয়তার প্রাণ। সুতরাং খাদ্যাখাদ্যের বিচার না থাকিলে জাতিভেদ থাকিবে না; জাতিভেদ না থাকিলে হিন্দু-ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। হুঁকার "নৈচা এবং খোল" বদলাইলে অবশিষ্ট কি থাকে? তবে মুখে বলা যায় "আমার সেই

হুঁকা।” তদ্রূপ জাতিভেদ এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার রহিত হইলে হিন্দু-ধর্ম্ম নামে একটা স্বেচ্ছাচারের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। হিন্দুগণ এরূপ স্বেচ্ছাচার ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহেন। যাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া অন্য সমাজে স্থান পায় না, তাহারাই “বৈদিক হিন্দু” নাম দিয়া সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মুসলমান সমাজে যথেচ্ছাচার চলে না, খৃষ্ট সমাজভুক্ত হইতে হইলে রীতিমত গির্জ্জায় যাইতে হয়, ব্রাহ্ম-সমাজেও উপাসনার প্রয়োজন; সুতরাং না-ওয়ারিশী হিন্দু-সমাজ ভিন্ন স্বেচ্ছাচারীর স্থান কোথায়?

এক্ষণে উপসংহারে উন্নতিশীল সংস্কারকগণের নিকট এই প্রার্থনা, তাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার রীতিনীতি লইয়া কোন একটা নূতন ধর্ম্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারত উদ্ধার করুন, তাহাতে হিন্দু-সমাজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা না করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আমরা যে আঁধারে আছি, সেই আঁধারেই থাকিতে চাই।

যে হিন্দু-জাতি ধর্ম্মের জন্য ইহজগতের সমস্ত সুখ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাহারা কখনই সংস্কারকগণের প্ররোচনায় আর্থিক উন্নতির জন্য অভক্ষ্য ভক্ষণ, জাতিত্যাগ বা হীন সংসর্গ করিতে ইচ্ছুক নহে। ঐহিক সুখই যে জাতির পরম-পুরুষার্থ সেই পরলোকবাদী হিন্দুগণ কখনই তাহাদের অনুকরণে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা।

গত ২৫।৩০ বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আলোচনায় আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ উন্নতি-অবনতির একটা হিসাব বুঝিতে পারিব। এ হিসাবে বোধ হয় কিছু লাভ হইতে পারে।

জমিদারগণ।

জমিদারগণ সে কালে অসাধারণ প্রতাপশালী ছিলেন। দেলদুয়ারের মুচি মিঞার ন্যায় অনেক জমিদারই লাঠির জোরে মাটী রক্ষা করিতেন। সকল জমিদারেরই সর্দ্দার আখ্যাধারী সৈন্য বা দস্যুদল ছিল। ইহারা জমিদারের

আদেশে প্রজার ভিটা সমভূমি করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না। ইংরাজ যখন দণ্ডবিধি আইন প্রণয়ন করিলেন, শুনিয়াছি আটিয়ার জমিদারগণ এই আইনকে দুই কুড়ি পাঁচ আইন বলিয়া উপহাস করিতেন। বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রেও তাঁহারা এই দুই কুড়ি পাঁচ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া অবাধে দাঙ্গা হাঙ্গামা এমন কি খুন পর্য্যন্ত করিতেন। সর্ব্বস্বান্ত প্রজা জমিদারের অত্যাচারের কোনই প্রতিবিধান করিতে সাহসী হইত না। ইংরাজ শাসন-কর্ত্তার কঠোর শাসন-শৃঙ্খলা জমিদারের নিকট ব্যর্থ হইয়া যাইত। যখন কোন স্থান লইয়া দুই জমিদারের মধ্যে লড়াই বা যুদ্ধ উপস্থিত হইত, তখন দেখা যাইত দুই পক্ষে সহস্রাধিক লাঠিয়াল বুক পর্য্যন্ত কাপড় বাঁধিয়া লাঠি, বল্লম, রামদা, সড়কী, ঢাল, তলোয়ার, লইয়া কালী কালী রবে ভৈরব নিনাদ করিতেছে, আর দারোগা বাবু চৌকিদার কনেষ্টবল সহ নিকটেই কোন বাটীর অন্তঃপুরে লুকাইয়া আছেন; যখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল লাঠিয়ালগণ তাহাদের স্বকার্য্য (খুন জখম) করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল, তখন দারোগা বাবু স্বগণসহ বহির্গত হইয়া দুই একটী নিরীহ প্রাণী ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। অথবা কিছু করিলেনই না। এইরূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ যুদ্ধ প্রায়ই হইত। অধিকাংশ সময়েই খুন হইত। মৃতদেহ স্বপক্ষ বা বিপক্ষ যাহার হস্তগত হইত সে-ই উহা নদীতে ফেলিয়া দিত অথবা কোন দুর্গম স্থানে পুতিয়া ফেলিত। যে সর্দ্দার নিহত হইত তাহার আত্মীয় স্বজনকে চাকরাণ বা নিষ্করভাবে প্রচুর ভূমি, নগদ টাকা প্রভৃতি দিয়া জমিদারগণ খুন একবারে গোপন করিতেন। মৃত ব্যক্তির পুত্রাদিও ভূমি ও অর্থ পাইয়াই সন্তুষ্ট হইত। অনেক স্থলেই এক খাদা ভূমি ও এক ঢাল টাকা একটী মস্তকের মূল্য ছিল। এই সকল জমিদারী-যুদ্ধ এখনও আছে। এখনও জমিদারেরা জানেন "লাঠি যার মাটী তার।" ইংরাজ-শাসনে এই সকল যুদ্ধের সংখ্যা বড় কমিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অস্ত্রের মধ্যে বন্দুকের ব্যবহার ইংরাজ শাসনের আমদানী। উহা সে কালে ছিল না। লাঠিগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকার হইয়াছে; তবে সর্দ্দারগণ এখন আর সহসা খুন করিতে চাহে না। খুন হইলেও গোপন করা আর পূর্ব্বের ন্যায় সহজ রহে নাই।

জমিদারী সৈন্য বা সর্দ্দার।

দীর্ঘকেশ, রক্তচক্ষু, কৃষ্ণকায়, লাঠিয়ালগণই জমিদারী সৈন্য। দস্যুই বলি আর ঘৃণাই করি ইহারাই কিন্তু বাঙ্গালী-বীরত্বের শেষ চিহ্ন। বাল্যে দেখিয়াছি লাঠিয়ালদিগের বেশ একটু সম্মান ছিল, প্রভুভক্তি, বিশ্বস্ততা, সাহস ও বীরত্বে

অনেকেই প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত ছিল। সর্দ্দারদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই "নিমকহারামী" করিত না। নমঃশূদ্র, মালী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এবং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ বাল্যকাল হইতেই লাঠি খেলা শিক্ষা করিত। সমগ্র নমঃশূদ্র জাতি যেন একটা সামরিক-সম্প্রদায় ছিল। নমঃশূদ্রদিগকে সে সময়ে "চাঁড়াল" বলিত, তাহাদের উপাধি ছিল "চন্দ্র।" লাঠিয়ালী ও কৃষিকার্য্য ইহাদের ব্যবসায় ছিল। এ দেশের অনেক বিখ্যাত লাঠিয়ালই এই চণ্ডাল বা চাঁড়াল জাতীয়। ইংরাজের প্রসাদে চণ্ডালগণ নমঃশূদ্র হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লাঠিয়ালী ত্যাগ করিয়াছে। এখন চণ্ডাল জাতীয় সর্দ্দার আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার সর্দ্দারগণ অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান, ইহাদের মধ্যে আবার পদ্মার তীরবর্ত্তী সর্দ্দারগণই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা যেমন দীর্ঘ, তেমনি বলিষ্ঠ, সাহসও অপ্রমিত; ইংরাজের রেজিমেণ্টে ভর্ত্তি করিয়া দিলে বোধ হয় কোনশ্রেণীর সৈন্য হইতে ইহারা ন্যূন হইবে না।

এখন আর তেমন গুণবান্ সর্দ্দার দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বতন সর্দ্দারগণ বাল্যকাল হইতেই উপযুক্ত ওস্তাদের নিকট লাঠি, তরবারি, রায়বাঁশ প্রভৃতির ভাঁজ শিক্ষা করিত। এখন সর্দ্দার হইতে হইলে শিক্ষা, দীক্ষার প্রয়োজন করে না। যাহার গায়ে একটু জোর আছে, আর বুকে একটু সাহস আছে এবং যে জমিদারের বিবাদস্থলে যাইয়া লাঠির চোটে কাহারও মাথা ফাটাইয়া দিতে পারে, সে-ই সর্দ্দার। এখন সর্দ্দার কথাটা এবং দীর্ঘচুল রাখা অপবাদের মধ্যে আসিয়াছে। সর্দ্দার বলিলেই এখন বুঝায় যে, লোকটা নিতান্তই বদ্‌মায়েস, চোর হওয়াও খুব সম্ভব। ধনী ও জমিদারগণ এই "অন্তশ্চোর বহির্বীর" জীবগণের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দাতা। এই জন্যই অধিকাংশ চুরীর আস্কারা হয় না।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশে লাঠি খেলার আদর ছিল। তখন যাঁহারা বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই দু-চারি হাত লাঠির ভাঁজ ও ঢাল তলোয়ার ধরিতে জানিতেন। বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উৎসবে, এবং অন্য দশ রকম আমোদের মধ্যে সর্দ্দারগণের তরবারির ভৈরব ক্রীড়া দর্শন একটা প্রধান কার্য্য ছিল। প্রশস্ত অঙ্গনে ভদ্র, ইতর নানা শ্রেণীর লোক চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে বসিতেন; মধ্য স্থলে বিজিগীষু সর্দ্দারদ্বয় কাড়ার তালে তালে পা ফেলিয়া "সামালিয়া হাত" "আও মেরা ভাই" প্রভৃতি সাহস-গর্ব্ব-বীরত্বপূর্ণ-আহ্বান ও নিনাদ করিতে করিতে যখন পরস্পর লাঠি ও তরবারির আঘাত করিত তখন তাহাদের উল্লম্ফন, তীর্য্যক্‌গমন, হস্তলঘুতা ও বীরোচিত ভঙ্গী দর্শনে বাস্তবিক শরীর পুলকিত হইত।

তখন এমন সর্দ্দারও ছিল, যাহার হাতে একখানি মাত্র লাঠি থাকিলে চতুর্দ্দিক হইতে ঢিল ছুঁড়িয়াও তাহার গায়ে লাগাইতে পারা যাইত না।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

গো-দুগ্ধ।

২

ফারণহিটের তাপমান যন্ত্রের ৬৫° ডিগ্রী হইতে ৬৮° ডিগ্রী পরিমাণ উত্তাপ-যুক্ত দুগ্ধে এক পাইণ্টে (২০ আউন্স) ২ গ্রেণের ন্যূন সিলিসিলিক্ এসিড্ মিশাইলে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত, এবং ৮৫° ডিগ্রী উত্তাপবিশিষ্ট দুগ্ধে উক্ত পরিমাণ এসিড্ মিশাইলে সমস্ত দিনমান অবিকৃত থাকে। কম উত্তাপের দুগ্ধে পূর্ব্বকথিত এসিড্ ৪ গ্রেণ পরিমাণ মিশ্রিত করিলে তাহা ১২।১৩ দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত ভাবে থাকে।

পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলি ব্যতীত দুগ্ধ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখার জন্য নিম্নোক্ত ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়। যথাঃ—

1. Chemical (রাসায়নিক)
2. Physical (প্রাকৃতিক)
3. Condensation (ঘনীভূতকরণ)

(১) কোনও প্রকার Alkaline salt (ক্ষার পদার্থ, যথা—সোডা, পটাস্ প্রভৃতি) এবং Antiseptic (পচন নিবারক, যথা Alcohol—সুরাবীর্য্য) Chloride of Zinc (ক্লোরাইড অব জিঙ্ক) এবং লবণ প্রভৃতি যোগে দুগ্ধ অবিকৃত রাখার উপায়কে Chemical (রাসায়নিক) উপায় বলা যায়।

(২) কোনও প্রকার শীতল পদার্থ (বরফ ইত্যাদি) যোগে এবং অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ও বায়ুসঞ্চালন (æration) দ্বারা দুগ্ধ অবিকৃত রাখিবার উপায়কে Physical (প্রাকৃতিক) উপায় বলা যায়।

(৩) জ্বাল দিয়া দুগ্ধের জলীয় ভাগ দূর করতঃ শুষ্ক করিয়া তাহাতে শর্করা প্রভৃতি যোগে পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দুগ্ধ অবিকৃত রাখার উপায়কে Condensation (ঘনীভূতকরণ) বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে দ্বিতীয়টিই (Physical) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ফলদায়ক। শৈত্যযোগে (বরফসংযোগে) দুগ্ধ ১৩।১৪ দিন ভাল

থাকে। অগ্নির উত্তাপে দুগ্ধের সমস্ত দুর্গুণ নষ্ট হয় এবং তৎস্থিত বিষাক্ত জীবাণুও নষ্ট হইয়া যায়। ফলতঃ অগ্নির ন্যায় পবিত্রকারক পদার্থ আর জগতে একটীও নাই, তাই ইহাকে পাবক বলা যায়। রুগ্ন ব্যক্তির আনীত, রুগ্না গাভীর অথবা কদর্য্য জল প্রভৃতি মিশ্রিত দুগ্ধ অগ্নির উত্তাপে শোধিত হয়। শৈত্যযোগে রক্ষিত দুগ্ধ ১৪ দিন পরে বিস্বাদ হয় এবং ২৮ দিবস পরে তাহা জমাট বাঁধিয়া যায়। ৩১ দিবস পরে এবম্বিধ দুগ্ধ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। বায়ু সঞ্চালনে (ইরেসন্ দ্বারা) দুগ্ধ তদপেক্ষা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখা যায়, অতএব সংক্ষেপে ইরেসনের উপায় কথিত হইতেছে।

প্রথমতঃ কোনও উচ্চস্থান হইতে দুগ্ধের ধারাপাত করিলে তাহা বায়ু সংযোগে কণা ভাব ধারণ করিবে; এতদবস্থায় সেই দুগ্ধকে তাড়ের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত জালদ্বারা আবৃতমুখবিশিষ্ট পাত্রে প্রবেশ করাইলেই, তাহাকে ইরেটেড্ (বায়ু সঞ্চালিত) দুগ্ধ বলা যায়। বরফ অথবা করকা (Hailstones) প্রভৃতি শীতল পদার্থের উপর বায়ু প্রবাহিত করিয়া সেই শীতল বায়ু দুগ্ধে উপরোক্ত উপায়ে সঞ্চালিত করিতে পারিলে ইরেসন্ আরও উৎকৃষ্ট হয় এবং ইহাতে দুগ্ধ নির্দ্দোষ অবস্থায় অনেকক্ষণ অবিকৃত থাকে।

অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে দুগ্ধ অনেকক্ষণ ভাল থাকে, কিন্তু ইহাতে দুগ্ধের আস্বাদ ও গন্ধের কিছু বিপর্য্যয় ঘটে এবং দুগ্ধস্থিত গ্যাস (Gas) গুলি বাহির হইয়া যায় ও তাহাতে গুণহানি হয়; অতএব দুগ্ধ-পাত্রের মুখ আবৃত করিয়া, অগ্নির উত্তাপে উষ্ণ করতঃ তাহাতে শীতল জলধারাপাতে ঠাণ্ডা করিলে, উপরোক্ত দোষ ঘটে না। এবম্বিধ উপায়ে দুগ্ধ উত্তপ্ত করার অনেক যন্ত্র পাওয়া যায়, সে গুলিকে Refrigerator (রিফ্রিজারেটার) বলে, এ সব যন্ত্র সচরাচরই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

Antiseptic (পচন নিবারক পদার্থ) যোগে দুগ্ধ রক্ষার উপায়টী তত নিঃসন্দেহজনক নহে, অতএব ইহার উপর সর্ব্বদা নির্ভর করা যাইতে পারে না, এই জন্য এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

এখন Condensation (ঘনীভূত করণোপায়) বিষয়ে ২। ৪ টী কথা বলা যাইতেছে। আমেরিকা মহাদেশস্থ নিউইয়র্ক (New York) নগরের অন্তঃপাতী White plain (হোয়াইট প্লেইন) নিবাসী Mr. Gail Borden (মিঃ গেইল বোর্ডেন্) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে চেষ্টা আরম্ভ করিয়া, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম Condensed milk (জমাট দুগ্ধ) প্রস্তুত করণ বিষয়ে

কৃতকার্য্য হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এবম্বিধ দুগ্ধ শর্করাদিযোগে মিষ্ট করতঃ টিনের পাত্রে বদ্ধাবস্থায় তিনি প্রথমতঃ সৈনিক বিভাগে প্রচলিত করেন, অতঃপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত মহাত্মার উদ্ভাবিত উপায়ে প্রচুর জমাট দুগ্ধ অষ্ট্রেলিয়া হইতে দেশ-দেশান্তরে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়।

অধুনা ইংলণ্ড, আয়ার্লণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ডেন্‌মার্ক, নরওয়ে, বেভিরিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় সভ্যদেশ হইতে প্রচুর জমাট দুগ্ধ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। ভারতবর্ষেও আজকাল এবম্বিধ দুগ্ধ নগরে নগরে এমন কি পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত বিক্রীত হইতেছে, ইহা আমাদের পক্ষে শুভসূচক কি না বিবেচ্য। সম্প্রতি কোনও উৎসাহী বঙ্গীয় যুবক Condensed milk (জমাট দুগ্ধ) প্রস্তুত করিয়া টিন-পাত্রে আবদ্ধাবস্থায় বিক্রয় করিতেছেন; এ ক্ষেত্রে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয় এবং উৎসাহ পাওয়ার উপযুক্ত; কিন্তু টিন-পাত্রে দীর্ঘকাল রক্ষিত দুগ্ধ স্বাস্থ্য হানিকর কি না এ বিষয়ে চিকিৎসকগণের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, আমাদের বিবেচনায় ইহা অনিষ্টজনক, শিশুকে এবম্বিধ দুগ্ধ ব্যবহার করান ভাল নহে। আমাদের দেশে ক্রমে যে প্রকার দুগ্ধাভাব হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় দধি প্রভৃতির জন্যও অচিরে আমাদিগকে ইউরোপের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে; অতএব সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন করা দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিবর্গের কর্ত্তব্য।

যে যে অবস্থায় গো-দুগ্ধাদি মানব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় এবং তত্তদবস্থায় ফলাফল।

দুগ্ধ—(১) ধারোষ্ণ, (২) অপক্ব (কাঁচা,) (৩) ফেন, (৪) ঈষদুষ্ণ, (৫) মাখনটানা, (৬) বিশেষভাবে আবর্ত্তিত (ঘন,) (৭) দৃঢ় (ক্ষীরসা বা মেওয়া,) (৮) চূর্ণীকৃত ইত্যাদি অবস্থায় মানব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়, ; এতদ্ব্যতীত শর্করাদি ও অন্যান্য নানাবিধ পদার্থযোগে দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১) ধারোষ্ণ দুগ্ধ। গো দোহন করা মাত্র দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ থাকে, এই অবস্থার দুগ্ধকে "ধারোষ্ণ" বলা যায়; ইহা সফেন, মিষ্ট, মসৃণ এবং ঈষৎ জান্তব গন্ধযুক্ত (Animal smell) এবম্বিধ দুগ্ধ বিশেষ উপকারী। আয়ুর্ব্বেদে ইহার বিশেষ গুণ কথিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে:—

* * * * ধারোষ্ণ মমৃতোপমম্।

ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃত তুল্য।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে :—

"ধারোষ্ণং গোপয়োবল্যং লঘুশীতং সুধাসমং।
দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারা শিশিরং ত্যজেৎ॥
ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারা শীতন্তু মাহিষম্॥"

অর্থাৎ—ধারোষ্ণ গো-দুগ্ধ বলকারক, লঘু, শীতবীর্য্য এবং অমৃতসম, ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর, ত্রিদোষনাশক; ধারাশীতল গো-দুগ্ধ ত্যাগ করিবে। গো-দুগ্ধ ধারোষ্ণ এবং মহিষ দুগ্ধ ধারাশীতলই প্রশংসনীয়।

(২) অপক্ক দুগ্ধ। অপক্ক দুগ্ধ (কাঁচা দুধ) সেবন করা উচিত নহে, কারণ ইহাতে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয় এবং ইহা বিবিধ প্রকার বিষাক্ত জীবাণু (Microbes) দ্বারা দূষিত থাকে। এরম্বিধ দুগ্ধ পান করিতে হইলে কাপড়ে ছাকিয়া একটু উষ্ণ করিয়া নেওয়া কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে :—

"আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরু শ্লেষ্মাংবিবর্দ্ধনং
জ্ঞেয়ং সর্ব্বমপথ্যঞ্চ গব্যমাহিষ বর্জ্জিতম্॥
নারী ক্ষীরন্ত্বামমেব হিতং নতু শৃতং হিতম্॥"

অর্থাৎ—আম দুগ্ধ (কাঁচা দুধ) কফ বর্দ্ধক, গুরু এবং শ্লেষ্মা বর্দ্ধক, অতএব গো ও মহিষ দুগ্ধ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার অপক্ক দুগ্ধই অপথ্য (অহিতজনক) বলিয়া জানিবে; নারী-দুগ্ধ অপক্ক অবস্থায়ই হিতজনক, জ্বাল দেওয়া হইলে তাহা অনিষ্টকারী হয়।

ভাবপ্রকাশে আরও উক্ত হইয়াছে :—

"অর্দ্ধোদকং ক্ষীরং শিষ্টং যোমাল্লঘুতরং ভবেৎ।
পয়োঽভিষ্যন্দি গুর্ব্বামং প্রায়শঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥

অর্থাৎ—দুগ্ধে অর্দ্ধেক পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে তাহা অপক্ক দুগ্ধ হইতে লঘুতর হয়। কাঁচা দুধ প্রায়শঃ গুরু এবং অভিষ্যন্দি (কফবর্দ্ধক)।

(৩) দুগ্ধ ফেন। গাভী ও অন্যান্য দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীজাতীয় জীব দোহনকালে, স্তন্যধারা দোহনপাত্রে আহত হইয়া পাত্রের উপরিভাগে যে ফেন জন্মে তাহাকে "দুগ্ধ-ফেন" বলা যায়।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে :—

"গো-দুগ্ধ প্রভবং কিংবা ছাগী-দুগ্ধ সমুদ্ভবং।
ভবেৎ ফেনং ত্রিদোষঘ্নং রোচনং বল বর্দ্ধনম্॥

বহ্নি বৃদ্ধিকরং পথ্যং সদ্য তৃপ্তিকরং লঘু।
অতিসারেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরেঽজীর্ণে প্রশস্যতে॥"

অর্থাৎ—গো-দুগ্ধজাত ফেন অথবা ছাগী দুগ্ধের ফেন ত্রিদোষঘ্ন, রুচিকারক, বল বর্দ্ধক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, পথ্য, সদ্যতৃপ্তিজনক এবং লঘু। ইহা অতিসারে, অগ্নিমান্দ্যে, জ্বরে এবং অজীর্ণ রোগে প্রশস্ত।

অত্রি সংহিতায় কথিত হইয়াছে :—

"কৃষ্ণগোঽশ্বপয়ঃ ফেনমজানাং বেতি শস্যতে।
মন্দাগ্নীনাং কৃশানাঞ্চ বিশেষাদতিসারিনাম্॥
উৎসাহ দীপনং বল্যং মধুরং বাত নাশনং।
সদ্যো বলকরঞ্চৈব তচ্চ ক্ষীর বিলোড়িতং
ক্ষীণ জ্বরাতিসারে চ সমে চ বিষমে জ্বরে।
মন্দাগ্নৌ কফমাশ্রিত্য পয়ঃ ফেনং প্রশস্যতে॥"

তাৎপর্য্যার্থ—কৃষ্ণা গাভী, অশ্ব, অথবা ছাগদুগ্ধজ ফেন প্রশস্ত; এ সকল মন্দাগ্নি, কৃশ, বিশেষতঃ অতিসারী রোগীর পক্ষে হিতজনক এবং এ সমুদয় উৎসাহবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, মধুর ও বায়ুনাশক। ফেন দুগ্ধের সহিত আলোড়িত হইলে সদ্য বলকারক হয়। দুগ্ধ-ফেন ক্ষীণাবস্থায়, জ্বরাতিসারে, সম ও বিষম জ্বরে এবং কফাশ্রিত মন্দাগ্নিতে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

(৪) ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ। ফারণহিটের তাপমান যন্ত্রের ২১২° ডিগ্রী এবং সেন্‌টিগ্রেড্‌স্কেল তাপমানের ১০০° ডিগ্রী উত্তাপে দুগ্ধ ও জল ফুটিতে আরম্ভ করে এবং ফারণহিটের ৩২° ডিগ্রী ও সেন্‌টিগ্রেডের ০° ডিগ্রীতে জল জমিয়া বরফ হয়, কিন্তু ফারণহিটের ৩০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত শীতল না হইলে দুগ্ধ জমে না। দুগ্ধ ফুটিতে আরম্ভ করিলেই তাহাকে ঈষদুষ্ণ (এক দুই বলকের দুধ) বলা যায়; ইহা রোগী ও শিশুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। ১৫।২০ মিনিট পর্য্যন্ত দুগ্ধ অগ্নির উত্তাপে রাখিলেই ফুটিতে আরম্ভ করে এবং তাহার দূষিত জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়।

(৫) মথিত দুগ্ধ। দুগ্ধের নবনীত মন্থনদ্বারা উঠাইয়া নিলে তাহা একটু নীলাভ হয়; ঈদৃশ দুগ্ধ কিছু উষ্ণ করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়; ইহা বালকের পক্ষে অত্যন্ত হিতজনক। ১২ ঘণ্টার পর এই প্রকার দুগ্ধ ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ ইহার পর তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে :—

"ক্ষীরং গব্য মথাজন্মা কোষ্ণ দণ্ডাহতং পিবেৎ।
লঘু বৃষ্যং জ্বরহরং বাতপিত্তকফাপহম্ ॥"

অর্থাৎ—গব্য অথবা ছাগ দুগ্ধ মথিত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তাহা পান করিলে লঘু, বৃষ্য (বলকারক) এবং বাত, পিত্ত ও কফ নাশক হয়। ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

বন-ফুল।

আমি একটী ক্ষুদ্র বন-ফুল। আমি পাতার আড়ালে থাকিয়া মনের সুখে হাসিতেছি। তোমরা আমায় তুলিও না। দেখ আমার ক্ষুদ্র জীবন; উষার কোমলালোকে ফুটিয়া উঠিয়াছি, মধ্যাহ্নের প্রখর রবিকরে আমি শুকাইয়া যাইব। আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, আমি শতধা হইয়া মাটিতে ঝড়িয়া পড়িব। আমার এত সাধের ফুল-জীবন চিরতরে অবসান হইয়া যাইবে। তাই বলিতেছি তোমরা আমায় তুলিও না।

আমি এতদিন মায়ের কোমল বুকে থাকিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম কবে আমার এ নবীন-জীবন-কুঞ্জে মধুর বসন্ত আসিয়া দেখা দিবে, সে দিন ভ্রমরের সুললিত গুঞ্জনে আমার নীরস চিত্ত প্রফুল্ল হইবে, কোকিলের মাদকতাপূর্ণ অস্ফুট প্রেম-গীতি আমার এ সুপ্ত হৃদয়কে জাগাইয়া দিবে; স্নিগ্ধ কোমল সুরভি সমীরণ স্পর্শে নয়ন মেলিয়া হাস্যময়ী প্রকৃতির জীবন্ত ছবি প্রত্যক্ষ করিব। আমার ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হইবে। আজ এ রমণীয় প্রভাতে আমার হৃদয় অধীর উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিয়াছে। আজ আমার জীবনের শুভদিন! যে শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম আজ তাহাই আসিয়াছে।

অই দেখ সুনীল আকাশে বালার্ক-কিরণ-রঞ্জিত মেঘগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, হেমাভ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া নবীন পল্লবরাজি সুবর্ণ পতাকার ন্যায় দুলিতেছে, সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়া যাইতেছে, প্রভাতবিহগকূজনে দিক্‌দিগন্তর মুখরিত হইতেছে। ধরণী সুপ্তোত্থিতা সুন্দরীর ন্যায় সহাস্য বদনে চারু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। এইবার আমাকে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে দাও। তোমরা আমায় তুলিও না।

আজ আমার জীবনের শুভদিন। কিন্তু হায়! এত কামনা করিয়া, এত প্রতীক্ষা করিয়া, দেবতার নিকট কায়মনোবাক্যে এত আরাধনা করিয়া, যে অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছি সে সুখ এমন ক্ষণস্থায়ী হইল কেন? যদি এমন ক্ষণস্থায়ীই হইল তবে তাহার স্মৃতি চিরজীবনের জন্য প্রাণের ভিতর রাখিয়া যায় কেন? দুর্ব্বিসহ অতৃপ্তির অনল হৃদয়ে জ্বালাইয়া যাইবার আবশ্যকতা কি? ইহাই বুঝি প্রকৃতির নিয়ম। যাহা দশ জনের ভাগ্যে ঘটে আমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। সে জন্য আমি দুঃখিত হইব কেন? যাহার প্রতিকার নাই নীরবে তাহা সহ্য করাই জ্ঞানীর কর্ম্ম। আমার শুভ মুহূর্ত্ত বহিয়া যায়, আমি এখন প্রাণ খুলিয়া হাসিব। দেখিতে দেখিতে আমি ম্লানমুখে চিরজীবনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিব। তোমাদের এ সুখপূর্ণ ধরণী পড়িয়া থাকিবে কেবল আমিই চলিয়া যাইব; তাই বলিতেছি তোমরা আমায় ভুলিও না। আমি এখন প্রাণ খুলিয়া হাসিব।

লোকে বলে আমাদের হাসিতে না কি বড় সৌন্দর্য্য। এমন স্বর্গীয় সুষমা, অতুল মাধুরী না কি এ সংসারে আর কোথায় নাই। যখন আমরা উষার কোমল হেমাভকিরণোদ্ভাসিত হইয়া দলে দলে পাতার আড়ালে ফুটিয়া উঠি, তখন আমাদের ভুবনমনোমোহন হাসির ছটায় বনভূমি আলোকিত হইয়া উঠে। সৌন্দর্য্যাভিজ্ঞ কবিগণ আমাদের হাসির সুবিমল জ্যোতিঃ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যায় এবং অন্তরের সহিত আমাদের সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ভক্তগণ আমাদের রমণীয় মাধুরীর ভিতর ভগবানের সত্তা অনুভব করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে। আমাদের সৌন্দর্য্যে কত নীরস হৃদয় সরস হইয়াছে, কত শুষ্ক প্রাণে প্রেমের স্রোত বহিয়াছে, কত ভোগী যোগী হইয়াছে, কত নাস্তিক আস্তিক হইয়াছে! তা' হো'ক গে'; আমাদের তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা সুন্দর হইলেও তোমরা জান, আর কুৎসিত হইলেও তোমরা জান। আমাদের দু'দণ্ডের জীবন, হাসিবার জন্য ফুটিয়াছি, প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া যাইব। তোমরা আমায় ভুলিও না।

তোমাদের সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণাই যত অনর্থের মূল। তোমাদের ভয়ে আমরা দিন রাত অস্থির থাকি। মায়ের বুকে লুকাইয়া থাকিয়াও নিস্তার নাই। দুষ্ট বালকগুলি সে খান হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কোরকেই আমাদিগকে বৃন্তচ্যুত করে। আবার খেলা সাঙ্গ হ'লে পদাঘাতে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যায়। ছি! কত নিষ্ঠুরতা!

যুবকেরা বড়ই বিলাসী; বড়ই রূপের পাগল। তাহারা কেবল বাগানে বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেড়ায়। শয়ন-মন্দিরে ফুল না রাখিলে ওদের ঘুম পায় না। ফুলের সৌন্দর্য্যে ঘর আলোকিত না হইলে নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না; ফুলের মালা বক্ষে ধারণ না করিলে হৃদয় শীতল হয় না। কিন্তু হায়! যেই সৌন্দর্য্য ম্লান হইল, তরুণ লাবণ্য শুকাইয়া উঠিল, অমনি আদর সোহাগ কমিতে লাগিল। তখন বিরস, বিশুষ্ক ফুলগুলিকে আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না। সেগুলি যেন চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়ায়। যে ফুলের জন্য একদিন প্রাণ অধীর হইয়াছিল, যাহাকে পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব তৃণবৎ জ্ঞান হইয়াছিল, সেই ফুলকে শয়ন-মন্দির হইতে বহিস্কৃত করিয়া না দিলে আর মনে শান্তি নাই। যে তোমাকে আপন জীবন সঁপিয়া দিল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া যে তোমাকে গ্রহণ করিল এই কি তাহার প্রতিদান। যুবকেরা বড়ই চপল, বড়ই ভোগ বিলাসপ্রিয়। কেবল আত্মসুখের জন্য তাহারা অন্যের প্রাণ নাশ করে।

তোমরা যে আমাদের জন্য এমন পাগল, দিন রাত আমাদের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াও, বল দেখি তোমরা কি আমাদের প্রাণের সহিত ভাল বাস? কখনই না। তোমাদের এত আগ্রহ, এত যত্ন কেবলই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য। ভালবাসা কাহাকে বলে তোমরা জান না। কবি বলিয়াছেন "Love looks not with the eyes but with the mind" মানব-হৃদয় প্রেমের পবিত্র পীঠ স্থান। প্রণয় বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। শরীরের সহিত ভালবাসার সম্বন্ধ নাই। যাহার হৃদয়ে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা বলবতী তাহার প্রণয়রূপ স্বর্গীয় বস্তুর আস্বাদলাভ অসম্ভব। প্রেম নিত্য, অবিনশ্বর কিন্তু সৌন্দর্য্যানুরাগ অতি ক্ষণস্থায়ী। তাই বলিতেছি রূপ দেখিয়া কাহাকেও ভাল বাসিও না।

"সৌন্দর্য্যের তরে ভাল বেসো না কখন,
এ নব লাবণ্য নাহি রবে চির দিন
দু'দিনে চলিয়া যাবে মধুর যৌবন
তখন প্রণয়-প্রীতি হয়ে যাবে লীন।"

আমি তোমাদিগকে আমার প্রাণের সৌরভ বিলাইয়া দিতেছি; তোমরা দূর হইতে আমার প্রীতি-উপহার গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হও। আমাকে তুলিও না। দেখ, ভালবাসিতে হইলে আপন স্বার্থ বলি দিতে হয়। আপনার সুখ-দুঃখ পরের সুখ-দুঃখে মিশাইতে হয়, আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া পরের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে হয়। কামনাবিহীন না হইলে প্রকৃত ভালবাসা পাওয়া যায় না।

আমরা পরের জন্য ফুটিয়াছি; পরের জন্য বুক ভরা পরিমল লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমরা আমাদের প্রীতি-উপহার গ্রহণ করিলেই সুখী হইব। একটী প্রাণীকেও সুখী করিয়া যাইতে পারিলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব; আমি সুখে নয়ন মুদিতে পারিব। আমরা পরকে সুখী করিবার জন্য ফুটিয়া থাকি। ফুটিয়াই আমাদের সুখ। আমরা আত্মসুখ প্রত্যাশা করি না; আমরা প্রতিদানের জন্য কাহাকেও সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দেই না। পরের জন্য আমাদের জীবন। আমরা কিছুই চাই না কেবল তোমাদিগকে সুখী করিয়া যাইতে চাই।

"কিছুই চেয়ো নাকো
কেবলি দিতে থাকো
শোণিতে বাড়িবে প্রেম-ঋণ।"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন মহর্ষি প্রাদুর্ভূত হন। বৈদিক এবং পৌরাণিক নানা গ্রন্থে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। "যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা" বলিয়া একখানা স্মৃতিসংহিতা অদ্যাপি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এই সংহিতার ভাষ্য মিতাক্ষরা। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে মিতাক্ষরা সম্মত ব্যবস্থা প্রচলিত।

"বৃহদারণ্যকোপনিষদের" পঞ্চম অধ্যায়ে জনক-বৈদেহ-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১) জনক বৈদেহের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন জনক অযোধ্যাপতি রামের শ্বশুর, অতএব যাজ্ঞবল্ক্য রামের সমসাময়িক। রামের বংশে হিরণ্যনাভ নামে একজন নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহর্ষি জৈমিনির শিষ্য ছিলেন এবং যোগশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকট অধ্যাত্মযোগ শিক্ষা করেন (২)। মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করেন (৩)। এই যজ্ঞে মহর্ষি

---

(১) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩য় কাণ্ড ১০ম অধ্যায় ৯ম অনুবাক্।
(২) ভাগবত নবমস্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ৪।৪।৪৮।
(৩) মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩৩ অধ্যায়। এই যজ্ঞে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু ছিলেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা এবং শতপথ-ব্রাহ্মণ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রচিত। যাজ্ঞবল্ক্য একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার ছিলেন। তিনি একখানা স্মৃতি-সংহিতা রচনা করেন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ রচয়িতা ধর্ম্মশাস্ত্রকার, জনকের সভাসদ্‌, রাজসূয় যজ্ঞের অধ্বর্য্যু এবং হিরণ্যনাভের শিষ্য, ইহারা এক কি নানা ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মধ্যে মতভেদ আছে। বোম্বাই প্রদেশীয় পণ্ডিত বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক বলেন প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে একাধিক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন। মহর্ষি ব্যাস সম্বন্ধেও কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন।

মণ্ডলিক মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মত উপেক্ষা করা সহজ নহে। তিনি বলেন প্রাচীনকালে যে, মাত্র একজন যাজ্ঞবল্ক্য বর্ত্তমান ছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। অতএব একাধিক যাজ্ঞবল্ক্য বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা সঙ্গত (১)। আমরা মণ্ডলিক মহাশয়ের মতানুসরণ করিতে অসমর্থ।

অতি প্রাচীনকালে আর্য্যজাতি নানা শাখায় বিভক্ত হন। এক এক দল এক এক নামে পরিচিত ছিলেন, যথা—পাঞ্চাল, বিদেহ ইত্যাদি। যে জাতি যে প্রদেশে আবাস স্থাপন করেন, সেই প্রদেশ কালক্রমে তাঁহাদের নামানুসারে কথিত হইয়াছে। বিদেহগণ মিথিলা প্রদেশে আবাস স্থাপন করেন। মিথিলা কখন কখন বিদেহ প্রদেশ বলিয়া কথিত হয়। মিথি নামে এই প্রদেশে একজন নরপতি ছিলেন, তাঁহার নামে বিদেহ মিথিলা নামে খ্যাত হয়। মিথিলার অধিপতিগণ জনক নামে পরিচিত ছিলেন। জনক তাঁহাদের উপাধি (২)। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের নরপতিগণ মধ্যে রুষিয়ার অধিপতি জার, জার্ম্মেনীর সম্রাট কৈশর বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন রোমরাজ্যে জুলিয়স, অগাস্তস, এবং তাঁহাদের

ব্রহ্মা; মহর্ষি সুসামা উদ্গাতা; মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু এবং মহর্ষি পৈল ও মহর্ষি ধৌম্য উভয়ে হোতা ছিলেন।

(১) vide Mandlik's Hindu Law Introduction.

(২) রামায়ণ আদিকাণ্ড ৭১ অধ্যায়—

রাজাভূৎ ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতঃ স্বেন কর্ম্মণা।
নিমিঃ পরম ধর্ম্মাত্মা সর্ব্ব সত্ত্ববতাং বরঃ॥
তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনকোমিথিপুত্রকঃ।
প্রথম জনকোরাজা জনকাদপ্যুদাবসুঃ॥

তস্যনিমেঃ মিথিনাম্না চ মিথিলেতি প্রথমো জনকঃ সর্ব্বেষামস্মাকম্‌ জনক শব্দ ব্যবহারার্থত্বে মূলভূতঃ। রামানুজ।

পরবর্ত্তীগণ সিঙ্গর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রামের শ্বশুরের নাম সীরধ্বজ; কিন্তু সাধারণতঃ তিনি জনক বলিয়া কথিত হন (ক)।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পাঠে জানা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন মহর্ষি জনৈক জনক-নরপতিকে যোগ শিক্ষা দেন। এই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণ রচয়িতা (১)। শান্তিপর্ব্বে করাল নামে একজন জনকের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলা প্রদেশে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন (২)। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদ্বারা জনকের সভাসদ্ যাজ্ঞবল্ক্যই শুক্ল যজুর্ব্বেদের ঋষি এবং তিনিই ধর্ম্মশাস্ত্রকার ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই প্রমাণদ্বারা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলা প্রদেশে বাস করিতেন তাহা অবগত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই।

এক্ষণ হিরণ্যনাভের শিষ্যের বিবরণ সমালোচনা করা প্রয়োজন। ভাগবতের বর্ণনা মতে হিরণ্যনাভ রাম হইতে পঞ্চদশ পুরুষ অন্তর। এ জন্য কেহ কেহ বলেন যে হিরণ্যনাভের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে প্রাচীন। পুরাণের সাহায্যে আমরা প্রাচীনকালের নানা বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া থাকি। কিন্তু কাল নিরূপণ সম্বন্ধে পুরাণের প্রতি নির্ভর করিলে অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। ভাগবতে লিখিত আছে হিরণ্যনাভের বংশধর মরু কলিযুগে বর্ত্তমান ছিলেন; মরুর বংশধর বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র সমরে অভিমন্যু কর্ত্তৃক হত হন (৩)। পুরাণের বর্ণনা মতে মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ সম্ভূত হন এবং মনুর কন্যা ইলা হইতে চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইক্ষ্বাকু এবং ইলা সমসাময়িক। ইক্ষ্বাকু হইতে দশরথ তনয় রাম ষট্পঞ্চাশ পুরুষ অন্তর, ইলার পতি বুধ হইতে যুধিষ্ঠির অষ্টচত্বারিংশ পুরুষ অন্তর। রাম ত্রেতাযুগে বর্ত্তমান ছিলেন, যুধিষ্ঠির কলিযুগের প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন (৪)।

(ক) বিষ্ণুপুরাণ—৪।৫।১২। ভাগবত—৯।১৩।১৪।১৮।

(১) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩১১ হইতে ৩১৮ অধ্যায় জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ। ৩১৮ অধ্যায়ে তিনি শতপথ ব্রাহ্মণের ঋষি বলিয়া কথিত।

(২) মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্র ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীন্মুনীন। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ১।২

(৩) ভাগবত—৯।২২

(৪) অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌযুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণো সৌ দেবকীসুতঃ॥

অস্বাভাবিক ঘটনা সংযোগ না করিলে পুরাণের বংশাবলী বিশ্বাস করা কঠিন। পুরাণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে। পুরাণে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণী তাহার প্রচুর প্রমাণ। পুরাণ রচনা সময়ে প্রত্যেক বংশীয় নরপতিগণের বহু নাম বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে যাহাদের নাম প্রসিদ্ধ ছিল, পুরাণ রচয়িতাগণ তাহাদের নামদ্বারা বংশাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন। আমরা পুরাণের কাল সম্বন্ধে সময়ান্তরে সমালোচনা করিব।

ভাগবতে লিখিত আছে যে, হিরণ্যনাভ মহর্ষি জৈমিনির শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি জৈমিনি এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন উভয়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য। বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্ব্বেদের ঋষি (১)। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন মহর্ষি ছিলেন, ইহা প্রকৃত বলিয়া অনুমিত হয়।

যাজ্ঞবল্ক্যের পিতা ব্রহ্মরাত (২)। তাঁহার দুই পত্নী ছিল, মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নী (৩)। তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। কাত্যায়নীর গর্ভে যাজ্ঞবল্ক্যের এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহর্ষি কাত্যায়ন নামে পরিচিত। মহর্ষি কাত্যায়ন-সূত্র রচনা করেন; তিনি পাণিনিব্যাকরণের বার্ত্তিককার।

বৈদিক ঋষিগণ মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ঋগ্বেদ, সামবেদ, বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে তাঁহার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

প্রাচীন সাময়িক ব্যক্তিগণের কাল নির্ণয় করার পন্থা পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা যুনানীদিগের বর্ণিত সেন্দ্রকত্তাস্ এবং ভারতবর্ষীয় পুরাণ বর্ণিত চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সিংহলের ইতিহাস এবং অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ, এবং পালি ভাষায় প্রণীত নানা গ্রন্থের আলোচনাদ্বারা ভগবান্ বুদ্ধদেবের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। চীন দেশীয় পরিব্রাজকগণ প্রণীত গ্রন্থাদি অনুবাদ করিয়া প্রাচীন ভারতের নানা বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা না করিলে অদ্যাপি প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত তমসাচ্ছন্ন থাকিত। কিন্তু এই সমস্ত করিয়া থাকিলেও তাঁহারা যে প্রাচীন ভারতের স্মরণীয় ঘটনার অব্দ নির্ণয় করিতে সমর্থ

জন্মাষ্টমীতত্ত্বে ব্রহ্মপুরাণ
কৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠীর সমসাময়িক।

(১) ভাগবত—৯। ১২। বিষ্ণুপুরাণ—৩। ৫

(২) যাজ্ঞবল্ক্যস্ত তস্যাভূৎ ব্রহ্মরাত সুতোদ্বিজ। বিষ্ণুপুরাণ—৩৫।২

(৩) অথ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বেভার্য্যে বভূবতু মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

সময় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ; স্বজাতি-গৌরব রক্ষা এবং য়িহুদি প্রণীত ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি ইহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। আমরা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া মহর্ষির কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

বিরতি।

সকলেরি যদি থাকে সমাপন,
আমারো হউক শেষ ;
আরতি থামুক, বিরতি নামুক,
আঁধারে ঢাকুক দেশ !
সব যদি শেষে শেষ হ'য়ে যায়,
আমারো হউক শেষ !

প্রভাত আলোকে জ্বালানু যে শিখা
হয়নি যদিও ক্ষীণ,
তবু কোন্ বলে তপ্ত দীপ ধরি'
ঘুরাব সারাটি দিন ?
অবসান এসে ডাকিছে সোহাগে—
আয় কোলে উদাসীন।

যদিও আমার ঢুলিছে না আঁখি,
ক্লান্তি নামেনি কায়ে,
সঙ্গীতমুখর কল্প কুঞ্জ মোর
এখনো শিহরে বায়ে,
তবু মনে হয় ক্ষণেক ঘুমাই
ঘাটে বাঁধি ভরা নায়ে।

পুন জাগে ত্রাস—ঘুমা'তে আরামে
সজাগ না হেরি মোরে,

যদি ছেড়ে যাও, হৃদয়বাসিনী,
অজানায় ঘুমঘোরে ;
জাগিব যখন বুঝিব তখন
বাঁচিয়া রয়েছি ম'রে !

কিন্তু ভক্ত তোর ঘুমায়ে পড়েছে
শ্রান্তি মানি' কতবার,
শিয়রে তাহার ছিলে জাগি' বসি'
জুড়িয়া বীণার তার !
নবোৎসাহে জাগি' সে দেখেছে গলে
দুলিছে সোহাগ-হার !

বীণাটী তাহার তু'লে দিয়ে হাতে
দিয়েছ ধরা'য়ে তান,
ললাটে কুন্তলে বুলা'য়ে অঙ্গুলি
নাচা'য়ে তুলেছ প্রাণ !
মাতিয়া মাতা'য়ে গেয়েছে সে পুন
তোমারি শিখান গান !

আবার তরণী ভিড়াইনু ঘাটে
পাড়ি দিয়ে দূর পার,
দেখিব না কষি' হিসাব, ব্যাপারে
লাভ হ'ল কি এবার।
কে কহিছ ডাকি'—ভিড়েছে তরণী,
চাহিও না কিছু আর !

সকলেরি যদি থাকে সমাপন,
আমারো হউক শেষ,
আরতি থামুক, বিরতি নামুক,
আঁধারে ঢাকুক দেশ।

সব যদি শেষে শেষ হ'য়ে যায়,
আমারো হউক শেষ!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

রহস্যময়ী।

সংশয়ের যবনিকা ছিঁড়ে ফেল আজ,
অপার রহস্যময়ি! উদার আকাশে
ফুটিয়া বাহির হও চাঁদের মতন
করুণ উজল শান্ত মধুরিমা মাখা!
ওপারে লুকা'য়ে র'লে, এ পারে সেবক
চির সন্দেহের মাঝে অজানা মায়ায়
দৃঢ় প্রলোভন-মুগ্ধ! আজি কেটে' দাও
সোণার শৃঙ্খলখানি—স্বপ্ন-প্রহেলিকা!
জানি না কোথায় আদি কোথা অন্ত আছে,
—কোথায় মিলন-ক্ষেত্র, কোথা তা'র পথ,
কেবল অচেনা পথে লুব্ধ মৃগ হেন
মরীচিকা অনুসরি' ধাইতেছি সদা।
একি খেলা? তৃষিতের তৃষা না পূরিতে
ছলনার জাল পাতি কাঁদাও তাহারে?
অতৃপ্ত পিয়াসী আমি—চাই আস্বাদিতে
তোমার মধুর রস।

নিত্য তুলে' আনি
দেবতা পূজার লাগি' অন্তর-মন্দিরে
ভকতি কুসুমরাশি! নিঠুর দেবতা
তথাপি দেয় না ধরা; আড়ালে আড়ালে
আলায়ে পায় রে দুখ—একি মায়া-খেলা!
কোথা আলো? কোথা ছায়া? কোথা শান্তি সুখ?

কোথা তৃপ্তি ? কোথা সাম্য ? কোথা সে সান্ত্বনা ?
কেবল বিদ্রোহী মন হইয়া উতলা
সাধনের পথে বসে' ঘটায় প্রমাদ !
তাই দেবি ! ভক্তের এ কাতর মিনতি—
খুলে' ফেল ব্রীড়া-বাস—কর গো চঞ্চল,
অপূর্ব্ব লাবণ্য-মাখা প্রণয়-শীতল
বিভোল কটাক্ষে তব ; বুঝে লই আজ
কোটি কোটি চাঁদ তারা, কোটি কোটি ধরা,
ভূধর, সাগর, নদী, তরুলতা, প্রাণী,
সবারি অভিন্ন সূত্র—এক কেন্দ্রে সব
ছিল সম্মিলিত পুনঃ হ'বে সম্মিলিত !

আপন্ অপর নাই—নাই ভেদ-জ্ঞান
প্রশান্ত জোছনা সম দীপ্ত সাম্যভাব
সর্ব্বত্র বিকাশে কিবা ! অসীমে-সসীমে
কড়ি-কোমলের মত অটুট মিলন !
দূর হ'তে দূরে তুমি মনে হও মোর
অথচ অন্তর মাঝে নিত্য জেগে' আছ
—অকাট্য শাস্ত্রের বাণী ; তাই-গো নিবেদি—
মনের বেদনা কেন বুঝেও বুঝ না ?
অন্তরবাসিনী তুমি শান্তি-বরষিণী,
দেখাও অরুণ উষা, ভাঙ্গ মোহ ঘোর,
জাগাও সুষুপ্ত-চিতে অনন্ত চেতনা !

শেখ ফজ্‌লল্ করিম।

ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সমিতির

বর্ষ-গণনা সঙ্কেত।

ইষ্টং চাষ্টযুতং দ্বিবাণগুণিতং চেষ্টাম্বরেণাহতং
খব্যোমেন্দুযুতং শ্রুতীন্দুনিহতং স্বাষ্টকমাশেষিতম্।

শুক্রাক্ষিপ্রযুতং শরক্ষিতিহতং যত্তত্র খৃষ্টাব্দকে
"ময়মনসিংহ"-পুরে ব্যধায়ি সমিতিঃ প্রাদেশিকী বর্ষকে॥

ইচ্ছামত কোন অঙ্ক করিয়া গ্রহণ,
তাহার সহিত কর আট সংযোজন।
যোগফলে গুণ করি' বায়ান্ন সংখ্যায়,
যে কোন রাশিতে ইচ্ছা—পূর পুনরায়।
গুণফলে একশত করি' সংযোজন,
যোগফলে চৌদ্দ দিয়া করিবে গুণন।
একশত বিরাশীতে সেই গুণফলে
বিভাগ করিলে যাহা ভাগশেষ মিলে—
তাহার সহিত এবে এক যোগ কর,
যোগফলে কুতূহলে পঞ্চদশে পূর।
যে খৃষ্টাব্দ পাবে, তাহে হয়—সুধীগণ!
ময়মনসিংহে প্রাদেশিক-সভা সঙ্ঘটন॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র শর্ম্মা রায়

ময়মনসিংহ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

"হাসি ও অশ্রু" ও "অশোকা"—শ্রীসরোজকুমারী দেবী প্রণীত। বহুদিন পর দুইখানি প্রকৃত গীতি-কাব্য আমাদের হস্তগত হইল। মানব-শিশুর হাসি-কান্নার ন্যায় নবীন কবিদিগের কাহারও কাহারও কবিতা আমাদিগের মনে দারুণ প্রহেলিকা উপস্থিত করে; আমরা শত চেষ্টায়ও তাহার মীমাংসা করিয়া মূল লক্ষ্য টুকু ধরিতে পারি না। সুখের বিষয় সরোজকুমারী সে শ্রেণীর কবি নহেন। তাঁহার কবিতার সার উদ্ধার করিতে হইলে নিমীলিত নেত্রে ধ্যানপরায়ণ হইতে হয় না। গ্রন্থকর্ত্রী "হাসি ও অশ্রু"তে প্রথম সুর-সাধনা আরম্ভ করেন—সে আরম্ভ অতি সুন্দর—"অশোকা"য় দেখিলাম তিনি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সরোজকুমারী, মাতৃহারা, ভগিনীহারা ; এবং সংসার-কারাতে রমণী যাহাকে কোলে করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করে, বিধাতা একবার দইবার নয়, চারিবার তাহাও কাড়িয়া নিয়াছেন। কবির ভাষায় শুন—

"পেয়েছিনু একে একে স্বর্গের কুসুম চার,
গিয়েছে অদৃষ্ট-দোষে, ইচ্ছা নাহি বিধাতার
ফলে ফুলে শোভা করা, এ কথা কি হবে কয়ে,
সকলি সহিয়া আছি, শুধু তাঁর নাম লয়ে।"

কবির শোকের গভীরতা আমরা পরিমাণ করিতে অসমর্থ। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক কবিতায় বিষাদের সুর উঠিয়াছে ; তিনি হাসিতে যাইয়াও কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। এত শোকে মানুষ বাঁচিতে পারে না। কবি বলিতেছেন—

"সকলি সহিয়া আছি, শুধু তাঁর নাম লয়ে।"

কি সুন্দর আত্মসংযম !

গ্রন্থকর্ত্রীর বিষাদ সঙ্গীতগুলি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার "আকুল মর্ম্মের মাঝে, যে উন্মাদ সুর বাজে" তাঁহার কবিতায় ও সে সুরের অতি সুন্দর প্রতিধ্বনি বাজিয়াছে। কাব্য দুই খানি পাঠ করিতে করিতে কবির সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থলে আমরা অশ্রুপাত করিয়াছি। যিনি এমন ভাবে কাঁদাইতে জানেন তাঁহার শক্তি সামান্য নয়।

সরোজকুমারীর ভাষা সর্ব্বত্রই মার্জ্জিত, মধুর ও প্রাঞ্জল, তাঁহার ভাবুকতা, লিপিচাতুর্য্য ও ছন্দোবন্ধন-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। প্রবল ইচ্ছা স্বত্বেও স্থানাভাব প্রযুক্ত আমাদিগকে স্থল বিশেষ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে হইল।

গ্রন্থ দুইখানির প্রায় প্রত্যেক কবিতায় "ছায়" শব্দের প্রয়োগ কর্ণের পীড়াদায়ক হইয়াছে। ২।৪ টী স্থলে "জড়াইয়া" অর্থে "জড়ায়" শব্দের ব্যবহার দেখিলাম, ইহা প্রশংসার কথা নহে। সাহিত্যকে এরূপ ভাবে আহত হইতে দেখিলে আমাদের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে।

কবি সর্ব্বশেষে গাহিয়াছেন :—

"থেমে যাক দুঃখগীতি, আর অবিশ্রাম
এ দারুণ দুঃখভার, সহিতে পারি না আর
দাও দেব ধৈর্য্য বুকে, আনন্দ আরাম
চিরদিন দয়াময় করি তব নাম।"

আমরাও বিধাতার নিকট তাঁহার শান্তি এবং দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া নিবৃত্ত হইলাম।

"বোধন"—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মহেশচন্দ্র একজন উৎসাহশীল যুবক। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রশংসনীয়। "যোগ ও বিয়োগ" মহেশচন্দ্রের প্রথম এবং "বোধন" দ্বিতীয় গ্রন্থ। গ্রন্থকারের সাহিত্য-সাধনা ক্রমেই সিদ্ধির পথে চলিয়াছে। "বোধনে"র ভাষা সরল; কোন কোন কবিতায় গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা ও উচ্চ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মহেশচন্দ্রের হাত আজও তেমন পাকে নাই, গ্রন্থখানা মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত লোকের হাতে সংশোধন করার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল—তাহা হইলে স্থানে২ যে অসংলগ্নতা, অস্পষ্টতা ও অশুদ্ধতা দোষ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা থাকিত না। যাহা হউক মহেশচন্দ্রের অবিচলিত সাধনা দেখিয়া আশা হয়, কালে তিনি সাহিত্যসেবিগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন।

'লায়লীমজনু'—শ্রীশেখ ফজলল করিম প্রণীত। পারসী-গ্রন্থোক্ত একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত।

কএস সম্রাটপুত্র, "লায়লী" বণিক্ কন্যা। সম্রাট-আবাসে প্রথম সন্দর্শনে, উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর জাগিয়া উঠিল, বিদ্যালয়ের মিলন-কুঞ্জের সুশীতল সমীরণে তাহা পরিপুষ্ট হইল। লায়লীর পিতামাতার কর্ণে সে কথা পৌঁছিল। লায়লী জনক-গৃহে বন্দিনী হইলেন। বিচ্ছেদ-রবিকরে প্রেমের অঙ্কুর মহাদ্রুমে পরিণত হইল। একদিন দুইদিন করিয়া মাসের পর মাস চলিয়া গেল, বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা কএসের আর সহ্য হয় না, প্রতিমুহূর্ত্তে সে মনোমোহিনীর অঙ্গসৌন্দর্য্য স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে প্রেমানলে দগ্ধ করিতে লাগিল। কএস লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া নবীন সন্ন্যাসীবেশে প্রতিদিন প্রিয়ার মিলন-সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও যখন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, তখন কএস লোকালয় ছাড়িয়া কাননবাসী হইলেন। কএসের উন্মত্ততা দেখিয়া লোকে তাহার নূতন নাম রাখিল মজনু (পাগল)। লায়লী রুদ্ধকক্ষে বসিয়া মজনুর চিন্তায় দিন কাটাইতে লাগিলেন, মজনু নির্জ্জন বনে লায়লীর নাম জপ করিতে লাগিলেন। এ ভাবেই উভয়ের জীবনান্ত হইল। এই ক্ষুদ্র ঘটনাই সমালোচ্য গ্রন্থখানির বর্ণনীয় বিষয়।

ফজলল করিম সাহেব একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান লেখক। তাঁহার ভাষাজ্ঞান ও বাক্‌বিন্যাস-নৈপুণ্যের পরিচয় "মানসিংহে" পাইয়াছি। "লায়লী-

মজনু”তেও পাইলাম। লায়লী-মজনুর প্রেম-চিত্র তাঁহার হাতে ফুটিয়াছে বেশ। মানুষ প্রেম-সাধনায় কিরূপ তন্ময় হইতে পারে “লায়লী-মজনু”তে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানিতে বৃত্তান্ত অপেক্ষা বক্তৃতার ভাগ বেশী। আমরা কোন কোন স্থলে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। গ্রন্থকার লায়লী-মজনুর প্রেমকে উচ্চ শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিতে বহু বক্তৃতা করিয়াছেন কিন্তু স্থল বিশেষে বিচ্ছেদ-কাতর কএসের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন “সেই দেবী-দুর্লভ-নিসর্গ-সুন্দর সদ্যবিকশিত মুখ-পদ্ম, সেই অনুন্নত যৌবন-কমল, সেই মন্মথ-শরাসন জিনিয়া আকর্ণ বঙ্কিম কামধনু দু'খানি * * * কএসের তৃষিত হৃদয়কে প্রতিক্ষণে কামানল-বাণে বিঁধিতে লাগিল।” যে প্রেম কামগন্ধে দূষিত তাহার স্থান কোথায়?

ফজলল করিম সাহেব “লায়লী-মজনু” লিখিতে যাইয়া একটু অসতর্কভাবে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন, তাই কোন কোন স্থানের অর্থগ্রহণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম, গ্রন্থকার কএস এবং লায়লীর প্রথম সাক্ষাৎকারের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন—“কএস এ সুর-সুন্দরীকে একবার দেখিলেন; আবার দেখিলেন। কি দেখিলেন—কেমন দেখিলেন, তাহা তাঁহার চক্ষু দুইটাই জানে, আর জানে তাঁহার হৃদয়। কিন্তু সে সাধ কি মিটিল,—সে পিপাসার কি শান্তি হইল? কেবল জ্বলিল, কেবল পুড়িল, কেবল সে অদৃশ্য আগুনের লোলজিহ্বা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যথার্থই যে সে দহন সহ্য করিতে পারিল, সে জগতে অবিনশ্বর নাম প্রাপ্ত হইল। উঃ! সে আগুন কি জ্বলন্ত, আর সে হতভাগাই বা কি স্বার্থহীন আকাঙ্ক্ষী!!”

এ সব দোষ থাকিলেও ফজলল করিম সাহেবের প্রশংসা করিব। তিনি মুসলমান হইয়াও বেশ বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছেন। তাঁহাদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উন্নতি হইবে এরূপ ভরসা আছে। ভরসা আছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম।

পঞ্চম বর্ষ। ষষ্ঠ সংখ্যা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

বি, এ., শ্রীদেবীমোহন

[illegible] মজুমদার, শ্রীরমণীমোহন

কুমার সেন, শ্রীযতীন্দ্রনাথ

চৌধুরী।

মুদ্রাযন্ত্রালয় হইতে

শ্রী গুপ্ত কর্তৃক

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৹ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।৹ চারি আনা।

সূচী।

নিবেদন।

যাঁহারা আজ পর্য্যন্ত "আরতি"র এক বৎসরের মূল্য প্রদান করেন [illegible] তাঁহাদের "আরতি" ভিঃ পিতে প্রেরিত হইয়াছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিঃ পিঃ [illegible] করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। ভরসা আছে কেহই ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

[illegible] অতিরিক্ত কার্য্য বাহুল্য শ্রাবণ সংখ্যা "আরতি" ৩০শে [illegible] বাহির করিতে পারি নাই। [illegible] প্রকাশিত হইল।

শ্রী[illegible]
ম্যানেজার—"আরতি"।

শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত সামাজিক উপন্যাস
আলপা ১৷৹, লহরী ৸৹ আনা। আরতির
গ্রাহকগণ ১৲ ও ৷৹ আনায় পাইবেন।
ম্যানেজার—"আরতি" কার্য্যালয়, ময়মনসিংহ।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। ময়মনসিংহ, আষাঢ় ১৩১২। ষষ্ঠ সংখ্যা।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য।

(২)

বর্ত্তমান সময়ে ঋক্, যজুঃ, সাম, এবং অথর্ব্ব এই চারি প্রকার বেদ প্রচলিত আছে। ইতিহাস এবং পুরাণাদি কখন কখন পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিত হয়। বেদ-বিভাগ সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত আছে, অতি পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ প্রত্যেকে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিতেন। কালক্রমে মানবজাতি অল্পায়ুঃ এবং অল্পবুদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে দ্বাপরের আদিতে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত বেদ সংগ্রহ করিয়া মানবজাতির উপকারার্থ চারিভাগে বিভক্ত করেন, যথাঃ—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। সমস্ত বেদ এক এক ব্যক্তির অধ্যয়ন করা সুকঠিন বিধায় তিনি তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে এক এক বেদ এক এক শিষ্যকে প্রদান করেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তদীয় শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ব বেদ প্রদান করেন। তিনি লোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণ শিক্ষা দেন।

প্রত্যেক বেদ দুইভাগে বিভক্ত, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। যজুর্ব্বেদ পুনঃ কৃষ্ণ এবং শুক্ল দুইভাগে বিভক্ত, ইহার প্রত্যেক ভাগের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ প্রাচীন, শুক্ল যজুর্ব্বেদ তদপেক্ষা আধুনিক। যজুর্ব্বেদের কৃষ্ণ এবং শুক্ল বিভাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—

একদা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের আচার্য্য মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহার এক বালক ভাগিনেয়কে পদাঘাতে বধ করেন, এজন্য তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে পতিত হন। বৈশম্পায়ন তাঁহার শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—

ভো শিষ্যা ব্রহ্মহত্যাপহং ব্রতং।
চরধ্বং মৎকৃতে সর্ব্বে ন বিচার্য্যং ইদং তথা॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন :—

* * * কিমেভি ভর্গবন্ দ্বিজৈঃ।
ক্লেশিতৈরল্পতেজোভি চরিষ্যেহং ইদং ব্রতং॥

বৈশম্পায়ন শিষ্যের এতাদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাগান্বিত হন্। তিনি বলিলেন :—

মুষ্যতাং যৎত্বয়াধীতং মত্তো বিপ্রাবমন্যক।
নিস্তেজসোবদস্যেতান্ যত্বং ব্রাহ্মণ পুঙ্গবান্।
তেন শিষ্যেণ নার্থোঽস্তি মমাজ্ঞাভঙ্গকারিণা॥

তুমি এই ব্রাহ্মণ পুঙ্গবদিগকে নিস্তেজ বলিয়াছ, তুমি তাহাদের অবমাননা করিয়াছ, তুমি আমার আজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ, আমার এরূপ শিষ্যের প্রয়োজন নাই; তুমি আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর।

যাজ্ঞবল্ক্য অতিশয় তেজস্বী ছিলেন, তিনি বলিলেন :—

* * * ভক্তৌ তত্তে ময়োদিতং।
মমাপ্যলং ত্বয়াধীতং যদ্ ময়াতদিদং দ্বিজ॥

হে দ্বিজ, আমি আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ এইরূপ বলিয়াছিলাম, আপনার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই, আপনি তাহা গ্রহণ করুন।

ইত্যুক্তা রুধিরাক্তানি সরূপানি যজূংষি সঃ।
ছর্দ্দয়িত্বা দদৌ তস্মৈ যযৌ চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য গুরুকে এইরূপ বলিয়া রুধিরাক্ত আকার বিশিষ্ট যজুর্মন্ত্র বমন করিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তথা হইতে স্বেচ্ছায় অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজ।
জগৃহুস্তিত্তিরীভূত্বা তৈত্তিরীয়াস্ততে ততঃ॥

ছর্দ্দিতানাং সাক্ষাদ্ গ্রহণ মনুচিত মিতি তিত্তিরাঃ পক্ষিণোভূত্বা জগৃহুঃ ততো হেতোস্তে তৈত্তিরিয়া প্রসিদ্ধাঃ ইতি শ্রীধর স্বামী

বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যগণ তিত্তিরী পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক উদ্গীরিত যজুর্মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এজন্য তাহারা তৈত্তিরীয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

বাস্তবিক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগ তৈত্তিরীয় সংহিতা, ব্রাহ্মণভাগ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিয়া কথিত হয়।

অনন্তর বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যগণ ব্রহ্মহত্যাপহব্রত আচরণ করেন, তদ্দ্বারা তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার হন।

যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় গুরুর অজ্ঞাত যজুর্মন্ত্র পাইবার জন্য ভগবান্ সূর্য্যদেবের আরাধনা করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের সূর্য্যস্তব বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে :—

ইত্যেবমাদিভিস্তেন স্তূয়মানঃ স্তবৈরবিঃ।
বাজিরূপ ধরঃ প্রাহ ব্রিয়তামিতি বাঞ্ছিতম্॥

রবি যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক এইরূপে স্তবদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া বাজিরূপ ধারণ করিয়া কহিলেন, তুমি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর।

যাজ্ঞবল্ক্য স্তদা প্রাহ প্রণিপত্য দিবাকরম্।
যজূংষিতানি মে দেহি যানি সন্তি ন মে গুরৌ॥

যাজ্ঞবল্ক্য দিবাকরকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, আমার গুরু যাহা জ্ঞাত নহে এরূপ যজুর্মন্ত্র আমাকে প্রদান করুন।

এবমুক্তো দদৌতস্মৈ যজূংষি ভগবান্ রবিঃ।
অযাতযাম সংজ্ঞানি যানি বেত্তিনতদ্গুরুঃ॥
যজূংষি যৈরধিতানি বিপ্রৈর্দ্বিজোত্তম।
বাজিনস্তে সমাখ্যাতঃ সূর্য্যাশ্বঃ সোভবদ্যতঃ॥

ভগবান্ রবি তাঁহাকে অযাতযাম নামক যজুর্মন্ত্র প্রদান করিলেন। তাঁহার গুরু এই যজুর্মন্ত্র অবগত ছিলেন না। সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া এই যজুর্মন্ত্র প্রদান করেন। এজন্য এই যজুর্মন্ত্র অধ্যয়নকারিগণ বাজি নামে কথিত হন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের সংহিতা বাজসনেয়ী সংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়।

বিষ্ণুপুরাণের এই উপাখ্যানদ্বারা যাজ্ঞবল্ক্যের সময় নিরূপণ করা সহজ নহে। মহর্ষি বৈশম্পায়ন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য; যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের শিষ্য; কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কাল-নির্ণয় হইলে তদ্দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্যের কাল নির্ণীত হইতে পারে; কিন্তু সে পন্থায় গমন করিতে নানাপ্রকার বাধা অতিক্রম করিতে হয়।

কুরুক্ষেত্র সমর কুরু পাণ্ডবের সমর বলিয়া ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই

অবগত আছেন। ইদানীং কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে কৌরব এবং দ্রুপদগণ কুরুক্ষেত্র সমরের দুই পক্ষ। কুরুক্ষেত্র সমরের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য এবং দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। সে সমস্ত মতের সামঞ্জস্যের চেষ্টা আমাদের মতে বিড়ম্বনা।

সংস্কৃত ভাষায় "রাজতরঙ্গিনী" নামে একখানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। কহ্লণ রাজতরঙ্গিনী রচনা করেন। রাজতরঙ্গিনী কাশ্মীর প্রদেশের ইতিহাস। কহ্লণ পণ্ডিত ১০৭০ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। কাশ্মীরাধিপতি কনিষ্ক শকাব্দ প্রচলন করেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিনীর ন্যায় প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরল। কিন্তু সর্ব্বত্র রাজতরঙ্গিনীর প্রমাণ গ্রাহ্য নহে।

রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে :—

শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরু পাণ্ডবাঃ ॥

কলির ৬৫৩ বৎসর অন্তে কুরু পাণ্ডবগণ ভূমণ্ডলে বর্ত্তমান ছিলেন। কল্যব্দ অবগত হইলে শকাব্দ অবগত হওয়া সহজ।

শাকেষু নব শৈলেন্দু রামযোগে কলের্গতাঃ। শকাব্দের সহিত ৩১৭৯ বৎসর যোগ করিলে কল্যব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান অব্দ ১৮২৭ শকাব্দ এবং ৫০০৬ কল্যব্দ, ইহা প্রত্যেক পঞ্জিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়।

কহ্লণ পণ্ডিত এ সম্বন্ধে যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহা এই :—

ঋক্ষাৎঋক্ষংশতেনাব্দৈঃ যাৎসুচিত্রশিখণ্ডিষু।
উচ্চরে সংহিতাকারৈঃ এবং দত্তোত্রনির্ণয়ঃ ॥
আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য ॥

সপ্তর্ষিমণ্ডল এক নক্ষত্র হইতে শতবর্ষে নক্ষত্রান্তরে গমন করেন, জ্যোতিষ সংহিতাকারগণ এরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির নৃপতির রাজত্ব সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে বর্ত্তমান ছিলেন, তদনুসারে শকাব্দের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন। ৬৫৩+২৫২৬+১৮২৭=৫০০৬ কল্যব্দ।

এই প্রমাণ অনুসারে যাজ্ঞবল্ক্য শকাব্দের অনুমান ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে :—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্ বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ৪।২৪।৩২
তেতু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম। ৪।২৪।৩৪
(তে সপ্তর্ষয়ঃ)

ইহাদ্বারা দৃষ্ট হয় যে পরীক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক কাল পর্যন্ত ১০১৫ বৎসর।

নন্দবংশীয় নরপতির সময়ে যুনানী-সম্রাট সেকেন্দর ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। এই গণনাদ্বারা শকাব্দার পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরীক্ষিতের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে।

শ্রদ্ধাস্পদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যুধিষ্ঠির খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব বিংশতি শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন (১)।

পরীক্ষিত জন্মেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্য হইতে বেদ শিক্ষা করেন (২)। যাজ্ঞবল্ক্য রাজসূয় যজ্ঞে অধ্বর্য্যু ছিলেন, ইহার পরে যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বর্ষ বনে অতিবাহিত করেন, তদনন্তর এক বৎসর বিরাট রাজ্যে ছিলেন। তদনন্তর কুরুক্ষেত্র সমর, তৎপর তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। যুধিষ্ঠিরের মৃত্যুর পরে পরীক্ষিত রাজত্ব করেন। পরীক্ষিতের পৌত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্য হইতে বেদ শিক্ষা করা কতদূর সত্য, নির্ণয় করা কঠিন।

বাস্তবিক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এতাদৃশ প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত শুক্ল যজুর্ব্বেদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অতএব আমরা এই পন্থা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পন্থাদ্বারা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিব।

বৈয়াকরণাচার্য্য পাণিনি অপেক্ষা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আধুনিক। পাণিনি-ব্যাকরণ পাঠ করিলে তৎকালে যজুর্ব্বেদ প্রচলিত থাকা অবগত হওয়া যায়। এই যজুর্ব্বেদ সম্ভবতঃ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ, কারণ পাণিনি-ব্যাকরণে তিত্তির শব্দ হইতে তৈত্তিরীয় পদ সাধনের সূত্র সন্নিবিষ্ট আছে। পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের পাণিনি প্রবন্ধ পাঠ করিলে পাণিনির সময়ে শুক্ল যজুর্ব্বেদ প্রচলিত ছিল না, ইহা অবগত হওয়া যায়।

(১) Indo Aryans Vol II 4-5.

(২) তস্যাপরঃ শতানীকো ভবিষ্যতি। যোগের্ব যাজ্ঞবল্ক্যাৎ বেদ মধীত্য বিষ্ণুপুরাণ ৪.২১।২।

পাণিনি বলিয়াছেন যে প্রাচীন সাময়িক মহর্ষিগণ প্রোক্ত ব্রাহ্মণ ও কল্পশাস্ত্র বুঝাইতে ঐ ঐ ঋষিগণের উত্তর ণি নি প্রত্যয় হয় যথা :—

পুরাণ প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণ কল্পেষু। দৃষ্টান্ত,

শাট্যায়নিনঃ, ভাল্লবিনঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধ স্তুল্যকালত্বাৎ। বার্ত্তিক ভাষ্যঃ—পুরাণ প্রোক্তে-ষিত্যত্র যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। যাজ্ঞবল্ক্যানি ব্রাহ্মণানি।

পাণিনির সূত্র এই যে প্রাচীন ঋষিগণ প্রণীত ব্রাহ্মণ এবং কল্পসূত্র বুঝাইতে তাঁহাদের উত্তর ণি নি প্রত্যয় করিতে হয়। কাত্যায়ন বার্ত্তিক রচনা করিলেন যে যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিদিগের ব্রাহ্মণাদি বুঝাইতে তাঁহাদের উত্তর ণি নি প্রত্যয় হইবে না, অন্ প্রত্যয় হইবে।

পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত এই সূত্রের সমালোচনা করিয়াছেন (১)। তুল্য-কালত্বাৎ এই পদের অর্থ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক ওয়েবরা বলেন যে এই যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত ব্রাহ্মণ শতপথ ব্রাহ্মণ।

ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মধ্যে অনেকে এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, মহর্ষি পাণিনি মগধের নন্দবংশীয় নরপতিগণের রাজত্ব কালে ভূমণ্ডলে বর্ত্তমান ছিলেন। এই নন্দবংশীয় জনৈক নরপতির রাজত্ব সময়ে য়ুনানী-বীর সেকেন্দর ভারতবর্ষে আগমন করেন ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নন্দবংশীয় নরপতিগণ ভগবান্ বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরবর্ত্তীকালে মগধের অধীশ্বর ছিলেন। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতানুসরণ করেন নাই। পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব সাময়িক ঋষি (২)। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি পাণিনির পরবর্ত্তী এবং কাত্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী। পাণিনি খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণ কাত্যায়নের কাল নির্ণয় করিতে পারিলে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাল নির্ণয় হয়। কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের পুত্র (৩)। অধ্যাপক মণিয়র উইলিয়মস্ বলেন কাত্যায়ন, পাণিনির একশত বৎসর পরে বিদ্যমান ছিলেন (৪)। অধ্যাপকের এই মত

---

(১) তৎপ্রণীত পাণিনি ৫৭।৫৮ পৃষ্ঠা।
(২) রজনী গুপ্ত ৯১ পৃষ্ঠা।
(৩) স্কন্দপুরাণ।
(৪) Indian Wisdom দ্রষ্টব্য।

আমাদের নিকট অসঙ্গত বোধ হয় না। অতএব মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা পাঠে যাজ্ঞবল্ক্যের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা যাজ্ঞবল্ক্যের অনেক পরে কোন শিষ্য কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে (১)। বর্ত্তমান মনুসংহিতাও তদ্রূপ ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতা বলিয়া কথিত হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য মহা যোগী ছিলেন, স্মৃতি সংগ্রহকারগণ তাঁহাকে সাধারণতঃ যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়া থাকেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থ মধ্যে শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ অতি উৎকৃষ্ট। শতপথ ব্রাহ্মণে মৎস্যবতার এবং জল প্লাবনের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। আমরা বারান্তরে শুক্ল যজুর্ব্বেদ হইতে কতিপয় উপাখ্যান উদ্ধৃত করিব। শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

ময়মনসিংহে ব্রিটিশ বিচার ও শাসন নীতির প্রতিষ্ঠা।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে বেলুহার কালেক্টর মিঃ ডব্লিউ রটন, মিঃ লেজ্, মিঃ ডাউসন্, মিঃ ডেভিড্ ও মিঃ ডের হস্ত হইতে কাগজ পত্র গ্রহণ করিয়া ময়মনসিংহে নূতন জেলা স্থাপন করিলেন।

ময়মনসিংহে জেলা স্থাপনের পর এতদ্দেশে অরাজকতা কিছু হ্রাসপ্রাপ্ত হইল বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল না।

মিঃ রটন জেলার ভার গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যই নিজ হস্তে রাখিলেন। তিনি জজ, মাজিষ্ট্রেট্ এবং কালেক্টর এই তিন পদেরই ক্ষমতা পাইয়া ছিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল না। বাৎসরিক আদায়ী রাজস্বের উপর হাজারে ১০৲ টাকা কমিশন পাইতেন, তাঁহার অধীনে একজন মাত্র দেওয়ান কর্ম্মচারী ছিল। চাপ্রাসী, পিয়ন, পাইক রীতিমত কিছুই ছিল না। আবশ্যক হইলে জমিদারেরা সৈন্য সামন্ত, পাইক, প্যাদা যোগাইতেন। এই সমস্ত পাইক, প্যাদা যোগাইবার জন্য জমিদারদিগের নান্‌কার জমি ছিল। রটন রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতিক্রমে পুণ্যাহ প্রথা

---

(১) যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্যঃ কশ্চিৎ প্রশ্নোত্তর রূপং যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীতং ধর্ম্মশাস্ত্রং সংক্ষিপ্য কথায়ামস। যথা মনুনোক্তং ভৃগুঃ। মিতাক্ষরা—বোম্বাই সংস্করণ।

প্রচলিত করেন। জেলা স্থাপনের বৎসরে ময়মনসিংহ জেলার স্থানে স্থানে জল প্লাবনে বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। ইহাতে অনেক জমিদার রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইয়া রেহাই প্রার্থনা করেন। রটন উপযুক্ত বিবেচনায় রেহাই মঞ্জুর করিয়া বহু জমিদারকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় মহালের রাজস্ব বাকী পড়িলেই পূর্ব্বের ন্যায় হস্তান্তরিত করা হইত না। উপযুক্ত কাল মধ্যে মালীককে উপস্থিত হইতে অবকাশ দিয়া পশ্চাৎ সর্ব্বোচ্চ ডাকে মহাল বিলি হইত।

জল প্লাবনের পর বৎসর এ জেলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে এ জেলায় চাউলের মণ ২৲ টাকা হইতে ২৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই সময়েও রটন সাহেব বোর্ডে লিখিয়া অনেক দরিদ্র তালুকদার ও জমিদারকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

কালেক্টর রটন অতি সদাশয় এবং মৃদু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে জমিদারদিগের অত্যাচার কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়ে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ পরগণার জমিদার স্বর্গীয় যুগলকিশোর রায় চৌধুরী সিংধা পরগণায় প্রবেশ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহু গ্রাম আগুনে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বহু ধন ও প্রাণ তাঁহার এই অমানুষিক অত্যাচারে নষ্ট হইয়া যায়। রটন সাহেব রেভিনিউ বোর্ডে অত্যাচার-কাহিনী জ্ঞাপন করিলে, রেভিনিউ বোর্ড যুগলকিশোর রায়ের জমিদারী হস্তগত করিতে অনুমতি প্রদান করেন। রটন সাহেবের অনুগ্রহে যুগলকিশোর রায় কেবল মাত্র জামিন প্রদান করিয়াই অব্যাহতি লাভ করেন। ১৭৮৯ অব্দে রটন সাহেব চলিয়া গেলে ষ্টিফেন বিয়ার্ড কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আগমন করেন। এই সময়ে বায়দোম পরগণা ঢাকা হইতে এই জেলার তৌজিভুক্ত হয় ও এই জেলা হইতে তরপ, পুঁটিজুরী প্রভৃতি বহু পরগণা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৯০ অব্দে পুনরায় এ জেলায় সন্ন্যাসীদিগের আবির্ভাব হয় এবং অচিরেই বিদ্রোহ-দমন হইয়া যায়।

ঐ সনে গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের অনুমতি আসিলে ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর রটন সাহেবের পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তই অল্লাধিক পরিবর্ত্তনের সহিত ১০ বৎসরের জন্য ধার্য্য হইয়া যায়। এই সময়ে জমিদারদিগের অধীনে শাসিত সিকিমী তালুকগুলিও পৃথক বন্দোবস্ত করিবার পরামর্শ হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে সে সময়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল ১৭৯০ সনে বেলুহা

পরগণা এ জেলা হইতে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৯১ অব্দে সেরপুরে বক্সার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সেরপুরের জমিদারদিগের কাছারী স্থিত বক্সারী বরকন্দাজদিগের নেতা হিরজী নামক এক ব্যক্তি অন্যায় প্রাপ্তির দাবী করিয়া ১৭৯১ সনের মার্চ্চ মাসে সেরপুরের সাত আনির জমিদারকে সেরপুর হইতে ধরিয়া লইয়া যায় ও প্রায় ১১০০৲ টাকার অধিক নগদ মুদ্রা লুণ্ঠন করে। জমিদার পক্ষের উকীলগণ কালেক্টর বিয়ার্ড সাহেবের নিকট এই বিভ্রাট সম্বন্ধে অবগত করাইলে কালেক্টর মিঃ বিয়ার্ড গোপনে সিপাই সৈন্য প্রেরণ করেন।

সৈন্যগণ কড়ৈবাড়ীর প্রান্তসীমা হইতে জমিদারকে উদ্ধার করিয়া আনে ও চারিজন অনুচরসহ বক্সারদিগের নেতা হিরজীকে ধৃত করিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করে। অন্যান্য অনুচরগণ পলায়ন করিয়া কড়ৈবাড়ীর রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে। কড়ৈবাড়ীর জমিদারের সহিত সেরপুরের জমিদারগণের সীমানা-বিবাদ চলিত থাকায় বক্সারদিগকে কড়ৈবাড়ীর জমিদার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। কড়ৈবাড়ীর জমিদারের সাহায্য পাইয়া বক্সারগণ শক্তি-সঞ্চয় করিতে থাকে ও ১৭৯১ সনের ২৭শে এপ্রিল দুই তিন শত বক্সার পরগণায় প্রবেশ করিয়া সাত আনির জমিদারদ্বয়কে ও বাটওয়ারার আমিনকে নগদ ১২০০৲ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্যাদিসহ ধৃত করিয়া নেয়। এ বার জমিদারদিগকে কোথায় লইয়া গেল তাহার কোন তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া গেল না। সেরপুরবাসিগণ ভীত হইয়া কালেক্টরের শরণাগত হইলেন। কালেক্টর, জমিদারদ্বয় ও সরকারী আমিনের অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করেন। প্রেরিত লোক বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বিয়ার্ড অনন্যোপায় হইয়া সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারলকে এই বিপদবার্ত্তা অবগত করাইলেন ও এ দিকে কড়ৈবাড়ীতে ৬০ ষষ্টী সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কড়ৈবাড়ীর প্রেরিত সৈন্য অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বিয়ার্ড সাহেব পুনরায় সমস্ত বিবরণ গবর্ণর জেনারলকে জ্ঞাপন করেন ও কড়ৈবাড়ীর রাজার নিকট সাহায্য জন্য লিপি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্ট কড়ৈবাড়ীর রাজাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলে করৈবাড়ীর রাজার সাহায্যে বিয়ার্ড সাহেব, আমিন ও জমিদারদ্বয়কে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

তৎকালে জমিদারদিগের খাজানা আদায়ের মাসিক কিস্তি ছিল। প্রতি মাসেই মাসের খাজানা আদায় করিতে হইত। ১৭৯০ অব্দে ময়মনসিংহ

পরগণায় বহু টাকা বাকী পড়িয়া যাওয়ায় বিয়ার্ড সাহেব ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারদিগকে কারারুদ্ধ করেন ও তাঁহাদিগের নিজ তালুক (Private property) বাজেয়াপ্ত করেন এবং মফস্বলে আমিন প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের মালগুজারী ভূমি অধিকার করিয়া লন। এইরূপেও কোন টাকা আদায় না হওয়ায় জমিদারদিগকে মুক্তি দিয়া একজন আমিনকে মহাল তদন্তে নিযুক্ত করেন। আমিন ময়মনসিংহ ও জফরসাহী পরগণাদ্বয় তদন্ত করিয়া জমিদারদিগের অত্যাচার-কাহিনী জ্ঞাপন করিলে বিয়ার্ড সাহেব জমিদারদিগের সমস্ত জমিদারী খাস করিয়া ফেলেন ও মহালে সরকারী কাছারী স্থাপন করিয়া নিজহস্তে উসুল তহশীলের ভার গ্রহণ করেন।

এইরূপ বাকী রাজস্বের জন্য সে সময় আটীয়া পরগণার বার আনা জমিদারীও বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং মহালের মালিকগণ নাবালক থাকায় তাঁহাদিগের তিনজন কর্ম্মচারীকে কারারুদ্ধ করা হয়। সুসঙ্গের দুই আনা অংশও রাজস্ব বাকীর জন্য বিয়ার্ড সাহেব নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেরপুরের সাত আনা অংশেরও সে সময় রাজস্ব বাকী ছিল কিন্তু বিদ্রোহী বক্সারদিগের হস্তে পড়িয়া সেরপুরের জমিদারগণ নিরুদ্দেশ হওয়ায় কালেক্টর সেই মহালের সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু করেন নাই।

১৭৯১ অব্দে সন্ন্যাসীদিগের নেতা জয়সিংহগীর পুনরায় মফস্বলে আবির্ভূত হইলে বিয়ার্ড তাহাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ সনে বর্ত্তমান নসিরাবাদ সহর সৃষ্ট হয়। ইতঃপূর্ব্বে বেগুণবাড়ীর কোম্পানীর কুঠিতে ও আবশ্যকমত স্থানে২ কাছারী হইত। বেগুণবাড়ীর কোম্পানীর কুঠি ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবল প্রবাহে নিমজ্জিত হইলে বর্ত্তমান সহরের অনতিদূরে কাগডলিতে (খাগডৈর) কাছারী প্রস্তুত জন্য বিয়ার্ড সাহেব গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কাগডলিও ব্রহ্মপুত্রের প্রবল প্রবাহের নিকট সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে বলিয়া হোসেনপুরের দক্ষিণে কাওনা নদীর তীরে দগদগা নামক স্থানে সহর স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট চিঠি লিখেন। এই প্রস্তাবে ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহের জমিদারগণ আপত্তি করিলে বিয়ার্ড সাহেব সেহড়া গ্রামে সহর স্থাপন জন্য পুনরায় তাঁহাদের আবেদন পত্র সহ গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া পাঠান। গবর্ণমেণ্ট তদুত্তরে সেহড়াগ্রামে সহর স্থাপন করিতে অনুমতি করিলে বর্ত্তমান স্থানে ১৭৯১খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে এই সহর স্থাপিত হয়। অতঃপর ঐ সনেই একজন সরকারী ডাক্তারও এখানে নিযুক্ত হন।

এই সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার কালেক্টরের দেওয়ান রফৎউল্লা নসিরুজিয়ালের জনৈক তালুকদারকে ধৃত করিয়া বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেন। এই ঘটনা লইয়া ঢাকাস্থিত ময়মনসিংহের প্রধান সহকারী কালেক্টর মিঃ মেগুয়ারের সহিত ঢাকার কালেক্টর মিঃ ডগলাসের অযথা দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছিল। পরে উক্ত তালুকদারকে ছাড়িয়া দেওয়ায়, সে ঝগড়া অল্পেতেই মিটিয়া যায়। অক্টোবর মাসে পুনরায় সেরপুরের জমিদারকে ঢাকার জজ কারারুদ্ধ করেন। এ বারেও সেইরূপ বিবাদ বিসম্বাদের পর জজ সাহেব জমিদারকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

ইতঃমধ্যে রাজসাহীর জমিদার সেরপুরের জমিদারীর অন্তর্গত ৪৭টী গ্রাম অধিকার করিবার জন্য সশস্ত্র লোক প্রেরণ করেন। সেরপুরের চৌধুরীরা গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইলে, বিবাদ গবর্ণমেণ্ট হইতেই নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে এ জেলায় কোন ডাকঘরের বন্দোবস্ত ছিল না। সরকারী ডাক একজন বাহকদ্বারা সদর ডাকঘরে আসিত; সে স্থান হইতে পাইক বরকন্দাজ-দ্বারা কালেক্টর যখন যেখানে থাকিতেন সেই খানে প্রেরিত হইত। ১৭৯১ অব্দের জুলাই মাসে ঢাকা ও ময়মনসিংহ মধ্যে ৯টী ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ পর্য্যন্ত একজন দেওয়ানদ্বারাই এ জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালিত হইতেছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময় অনেক তালুক জমিদারী হইতে খারিজ হইয়া পৃথক্ হইয়া যাওয়ায়, বিয়ার্ড সাহেব কার্য্য-বাহুল্য দেখাইয়া কালেক্টরীর আমলা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং মফস্বল কার্য্যের জন্য কয়েকটী তহশীল কাছারী মঞ্জুর করিতে প্রার্থনা করেন। তদনুসারে কালেক্টরীর জন্য মাসিক ৭০৲ টাকা বেতনে একজন ইংরেজী শিক্ষিত তৌজিনবিশ, ১৫৲ টাকা করিয়া ৪ জন পার্শীনবিশ ও ১২৲ টাকা করিয়া ৪ জন বাঙ্গালানবিশ নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে মফস্বলের আফিসগুলির মঞ্জুরী ও একটী অতিরিক্ত তহশীল কাছারীর মঞ্জুরী আগত হয়। তহশীলদারগণ মফস্বল যাইয়া উসুল তহশীল করিতেন সে জন্য সরকার হইতে দুইখানা নৌকাও তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

এইরূপে ১৭৮৭ অব্দ হইতে ১৭৯১ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজ এ জেলায় শাসননীতি প্রতিষ্ঠার কিছুই করিতে পারিলেন না। কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় লইয়াই ব্যতিব্যস্ত রহিলেন। ১৭৯০ সনে দেশের অবস্থা দেখিয়া জেলা কালেক্টর স্থানে

স্থানে শান্তি রক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিয়ার্ড সাহেব নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে এক একটী পুলিশ ষ্টেশন (থানা) স্থাপন করিতে অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

পরগণা ময়মনসিংহ প্রভৃতির জন্য		কালীগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ।
,, আলাপসিংহ	,,	পরাণগঞ্জ।
তপে হাজরাদী	,,	কটিয়াদী।
পরগণা সেরপুর	,,	চাঁদগঞ্জ।
,, বড়বাজু	,,	সিরাজগঞ্জ।
,, কাগমারী	,,	জগন্নাথগঞ্জ।
,, নসিরুজিয়াল	,,	সের মদন।
তপে রণভাওয়াল	,,	সেরদিবারদিয়া।
পরগণা সরাইল	,,	সের মাচ্‌রা।

১৭৯১ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত রেভিনিউবোর্ড তাহা মঞ্জুর করেন নাই। সুতরাং ১৭৯২ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ময়মনসিংহের বিচার ও শাসনবিভাগের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিয়াছিলেন সরকারী কাগজপত্রে এরূপ কিছু প্রকাশ পায় না।

১৭৯২অব্দে অতিরিক্ত তহশীল কাছারী প্রতিষ্ঠিত হইলে কালেক্টর বিচার ও শাসনকার্য্যে মনোযোগ দিতে অবকাশ পান। ইতঃপূর্ব্বে বিচার ও শাসন বিভাগের কার্য্য জমিদার, ইজারাদার এবং সিজুয়াল দ্বারাই পরিচালিত হইত। কিন্তু সাধারণ বিচার গ্রাম্য পঞ্চায়েতদ্বারা সম্পাদিত হইত। কালেক্টরের হস্তে তখন মাজিষ্ট্রেট ও জজের ক্ষমতা থাকিলেও তিনি তাহা পরিচালনা করিতে সুযোগ পাইতেন না এবং অবকাশও পাইতেন না। গ্রাম্যলোক "কিল খাইয়া কিল চুরী করিত" তথাপি বিদেশে বিপাকে মরিতে আসিত না।

সেকালে সকল জমিদারের উপর বিচার ক্ষমতা ছিল না; যে সকল জমিদার রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিতে পারিতেন সাধারণতঃ তাঁহাদিগের উপরেই বিচার ও শাসনের ক্ষমতা থাকিত। গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত গোপনে ছোটবড় সকল ভূম্যধিকারীই নিজ২ এলাকার বিচার ব্যবস্থা করিতেন। ইহাদের ন্যায় অন্যায় বিচার দেখিবার কেহ ছিল না। যে স্থলে প্রজায় প্রজায় মোকদ্দমা হইত এবং মালীক বিচারক থাকিতেন সেই সকল স্থলে ন্যায় অন্যায়ের পরিমাণ করা যাইত; কিন্তু যে স্থলে মালীক ও প্রজায় বিরোধ এবং মালীকের

গভীর স্বার্থ বিদ্যমান থাকিত সেই সকল স্থলের অত্যাচার ও অবিচারের পরিমাণ কে করিবে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে এইরূপ কয়েকটী অত্যাচারের বিবরণ উল্লেখ করা হইল।

১৭৯০ অব্দে বহু টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়া যাওয়ায় কালেক্টরকে রেভিনিউবোর্ডের নিকট কৈফিয়ত দিতে হয়। রেভিনিউবোর্ড কালেক্টর বিয়ার্ড সাহেবের কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে মফস্বলে যাইয়া প্রজা ও জমিদারের অবস্থা পরিদর্শন ও রাজস্ব বাকীর কারণানুসন্ধান করিতে উপদেশ দেন। কালেক্টর বিয়ার্ড সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের আদেশানুসারে আমিন নিযুক্ত করিয়া মফস্বলের সম্যক্ অবস্থা পরিজ্ঞাত হন। তিনি রিপোর্টে লিখিয়াছেন "ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারদিগের অত্যাচারে ময়মনসিংহ ও জফরসাহী পরগণার ৮০৫৯ ঘর মাতব্বর প্রজার মধ্যে ১০০৫ জন বাড়ীঘর ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। জমিদারী খাসে আনিলে পর অভয় পাইয়া প্রজাগণ তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘরে ফিরিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৬৪০ জন প্রত্যাগমন করিয়াছে।

"আটীয়ার বার আনার জমিদারগণ নাবালক বিধায় এই মহালের শাসন সংরক্ষণের ভার তাঁহাদিগের সরকার গোবিন্দ চাকী, পাঁচু বসু এবং রামচন্দ্র মুখার্জ্জীর হস্তে ন্যস্ত আছে। ইহাঁদের অত্যাচার অপরিসীম। ইহারা প্রজার খাজানা একবার আদায় করিয়া কাগজপত্র গোপন করিয়াছে ও পুনরায় প্রজার নিকট খাজানার দাবী করিতেছে; প্রজা দ্বিতীয়বার খাজানা দিতে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে এবং সরকারী রাজস্ব বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এ দিকে উৎপীড়িত প্রজা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতেছে।

মহালের ১৪০০ মৌজার মধ্যে মাত্র ৫০০ মৌজায় প্রজা আছে ও তাহারাই কৃষিকার্য্য চালাইতেছে।"

কালেক্টর, রাজস্ব বাকী পড়ার জন্য তদন্তে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যদি রাজস্ব বাকী না পড়িত তবে সেই সুদূর পল্লীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা, প্রজা-ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন হইত না। সুতরাং উপায়হীন প্রজা নীরবে তাহা সহ্য করিত। ১৭৯২ অব্দে এই জেলার জন্য অতিরিক্ত তহশীল কাছারী স্থাপিত হইলে জেলা-কালেক্টর তহশীলকার্য্যের ভার তাহাদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া বিচার ও শাসনকার্য্যে মনোযোগ প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পুর্ব্বেই সদর জেলখানা প্রস্তুত

করিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ৬০০০৲ টাকার এক এষ্টিমেট্‌ ও দালানের নক্সা প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে জেলখানা প্রস্তুতের অনুমতি আসিলে একটী ক্ষুদ্র জেলখানা (Jail) প্রস্তুত হয়।

১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন ও বিচার সম্বন্ধীয় মন্তব্য প্রচারিত হইলে অতিরিক্ত মালকাছারিটী উঠিয়া যায় এবং দেওয়ানী বিভাগ পৃথক্ হইয়া যায়। ১৭৯৩ সনের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহের জজ আদালত স্থাপিত হয়। এবং কালেক্টরীর হেড্‌ এসিষ্টাণ্ট মিঃ ওয়াণ্টার মেণ্ডয়ার প্রথম জেলা জজ ও মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৭৯৩ সনের ১৪ই মে তারিখের সকাউন্সেল গবর্ণর জেনারেলের জুডিসিয়েল প্রসিডিং মতে জজ ও মাজিষ্ট্রেট ওয়াণ্টার মেণ্ডয়ার কালেক্টর বেয়ার্ডের হস্ত হইতে শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা বুঝিয়া লইয়া এই জেলায় শাসন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। কালেক্টর বিচার ও রাজস্বের বন্দোবস্তে মনোযোগ প্রদান করেন। সেই হইতে ব্রিটিশ বিচার ও শাসননীতি পৃথক্ ভাবে এ জেলায় প্রবর্ত্তিত হয়।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

গো-দুগ্ধ।

(৩)

৬। ঘন দুধ ও ক্ষীর সুস্বাদু, গুরু এবং বলকারক। শুষ্ক গোময়ের (ঘুঁটের) আগুনে দুগ্ধ আবর্ত্তিত করিলে তাহা অতি সুস্বাদু হয় এবং দুগ্ধের বর্ণও অতি পরিষ্কার হয়। দুগ্ধ জ্বাল দেওয়ার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়; সামান্য অমনোযোগে দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। জ্বাল দেওয়ার সময় দুগ্ধ পুনঃ পুনঃ আলোড়িত করিতে হয়। একটী পাত্রে জল রাখিয়া তদুপরি দুগ্ধপূর্ণ পাত্র রাখিয়া, উভয় পাত্রের সংযোগ স্থল ময়দা অথবা মাটি দিয়া বন্ধ করতঃ দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার বর্ণ অতি শুভ্র হয় এবং দুগ্ধের স্বাদও মিষ্ট হয়। দুগ্ধপাত্রের মুখটী ঢাকিয়া দিলে আরও ভাল হয়।

বিশেষভাবে আবর্ত্তিত দুগ্ধ (ঘনদুধ, ক্ষীর প্রভৃতি)

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে:—

"সুশৃতঞ্চ পয়ঃ পীতং পীযূষাদপি তদ্‌গুরু।"

ঘন দুগ্ধ পান করিলে তাহা পীযূষ (সদ্য প্রসূতা গাভীর দুগ্ধকে পীযূষ বলা যায়) হইতে গুরুপক্ক হয়।

উক্ত গ্রন্থে আরও কথিত হইয়াছে ঃ—

"চতুর্ভাগং সলিলং নিধায় যত্নাৎ যদাবর্ত্তিত মুত্তমং।
সর্ব্বাময়ঘ্নং বলপুষ্টিকারি বীর্য্যপ্রদং ক্ষীরমতি প্রশস্তম্॥

অর্থাৎ—চারিভাগ জল মিশাইয়া দুগ্ধ উত্তমরূপে আবর্ত্তিত করিলে (জ্বাল দিয়া ঘন করিলে) তাহা সর্ব্বরোগ নাশক, বলকারক, পুষ্টিকারক ও বীর্য্যপ্রদ হয়; এতাদৃশ দুগ্ধ অতি প্রশস্ত।

ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে ঘনীভূত অবস্থায় টীনে বদ্ধ হইয়া যে দুগ্ধ আমদানী হইতেছে, তাহাকে Condensed Milk (কন্‌ডেন্‌ষ্ট্ মিল্ক) বলা যায়; এবিষয়ে পূর্ব্বেই বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দৃঢ় দুগ্ধ (ক্ষীরসা বা মেওয়া)।

৭। ঘনীভূত দুগ্ধের জলীয়ভাগ অগ্নির উত্তাপে নষ্ট করিলে তাহাকে ক্ষীরসার বা মেওয়া বলা যায়। ইহা ক্ষীর হইতে গুরু এবং সুস্বাদু; ইহা দ্বারা নানাপ্রকার মিঠাই প্রস্তুত করা যায়। ক্ষীর ও ক্ষীরসা বালকদিগকে অধিক খাইতে দেওয়া উচিত নহে। শীতকালে ক্ষীর এবং ক্ষীরসা অনেকদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে।

চূর্ণীকৃত দুগ্ধ।

৮। দৃঢ় দুগ্ধ (ক্ষীরসা) আরও কিছু উত্তপ্ত করিলেই তাহা চূর্ণ করা যায়। অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে নানাপ্রকার উপাদান যুক্ত চূর্ণ দুগ্ধ এদেশে আমদানী হইতেছে; তন্মধ্যে Horlick's Milk (হর্‌লিকস্ মিল্ক) (2) Allenbary's Milk (এলেন্‌বরিস্ মিল্ক) এবং (3) Nestle's Milk (নেসেলস্ মিল্ক) বিশেষ বিখ্যাত। এ গুলির মধ্যে Horlick's Milk-ই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; বালক ও রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। কিঞ্চিৎ উষ্ণজলে উক্ত প্রকার চূর্ণ মিশ্রিত করত তাহাতে অল্প শর্করা (চিনি) যোগ করিলেই অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে এতাদৃশ দুগ্ধ চূর্ণ প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য।

৯। চিনি, গুড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যোগে দুগ্ধদ্বারা যত প্রকার উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে, এমন বোধ হয়
শর্করাদিযুক্ত দুগ্ধ। জগতে আর কিছুতেই হয় না; এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় পরিত্যক্ত হইল। রাবড়ী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য, শর্করাযুক্ত দুগ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছেঃ—

"খণ্ডেন সহিতং দুগ্ধং কফকৃৎ পবনাপহং।
সিতাসিতাপলাযুক্তং শুক্রলং ত্রিমলাপহম্॥
সগুড়ং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মাকরং পয়ঃ।
ক্ষীরং সশর্করং পথ্যং যদ্বা সাত্ম্যঞ্চ সর্ব্বদা॥"

অর্থাৎ—খণ্ডযুক্ত (খাঁড় গুড় যুক্ত) দুগ্ধ কফকারক ও বায়ুনাশক। চিনি ও মিশ্রিযুক্ত দুগ্ধ শুক্রকারক এবং ত্রিদোষ নাশক; গুড়যুক্ত দুগ্ধ মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক। শর্করাযুক্ত দুগ্ধ পথ্য এবং তাহা সর্ব্বদাই সাত্ম্য (দেহানুকূল)।

১০। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও দুগ্ধের সর সম্বন্ধে ২।১টী প্রয়োজনীয় কথা এখানে বলা যাইতেছে। দুগ্ধের সরকে সংস্কৃত ভাষায়
সন্তানিকা বা দুধের সর। সন্তানিকা বা পয়শ্ছদ বলা যায়। দুগ্ধ ভাল রকম জ্বাল দিয়া শীতল ও নির্ব্বাতস্থানে রাখিয়া দিলে তদুপরি যে আবরণ জন্মে তাহাকেই সর বলা হয়। ইহার গুণ ভাবপ্রকাশে এই প্রকার কথিত হইয়াছে:—

"সন্তানিকা গুরু শীতাবৃষ্যা পিত্তাস্রবাতনুৎ।
তর্পণী বৃংহণী স্নিগ্ধা বলাসবল শুক্রলা॥"

সন্তানিকা (সর) গুরুপাক, শীতবীর্য্য, শুবৃষ্য, রক্তপিত্ত ও বাতনাশক; ইহা তৃপ্তিকারক, বৃংহণী (পুষ্টিকারক), স্নিগ্ধ, বলকারক এবং শুক্রবৃদ্ধিকারক।

দুগ্ধের সর দ্বারা নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত সরপুরিয়া এবং সরভাজা তাহার নিদর্শন। ২।৩ দিনের সর একত্র করিয়া জ্বাল দিলে অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত প্রস্তুত হয়। সর বালকের পক্ষে দুষ্পাচ্য এবং অনিষ্টজনক।

সর পাতার দুগ্ধ একটু ঘনাবর্ত্তিত হওয়া চাই, এবং যে পাত্রে সর পাতিতে হইবে তাহার মুখ কিছু বিস্তৃত (চাপ্টা) চাই। যে ঘরে সর পাতা দুগ্ধ রাখিতে

হইবে তাহা নির্জ্জন এবং নির্ব্বাত হওয়া আবশ্যক। পুনঃ পুনঃ সেই ঘরে লোক যাতায়াত করিলে বায়ু চালিত এবং তাপের অবস্থা (Temperature) পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া সর জমার পক্ষে বিঘ্ন হইবে। গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া না রাখিলে ভাল সর জন্মে না; কিন্তু রাত্রিতে দরজা খুলিয়া রাখা ভাল। সর জমার পক্ষে শীতল দিনই প্রশস্ত। মেঘাচ্ছন্ন দিনে এবং পশ্চিমদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে সর পাতলা হয়। স্থূল কথা মেঘশূন্য, নির্ম্মল ও নির্ব্বাত দিনই সর পাতার পক্ষে উপযোগী। তুষার-পাত আরম্ভ হইলেও ভাল সর জন্মে না।

কি কি রকম গাভীর দুগ্ধ অনিষ্টজনক ও বর্জ্জনীয় এবং দুগ্ধে সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্যাদি।

পাশ্চাত্যমতে প্রসূতা গাভী পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং বৎস প্রসবের কিছু পূর্ব্বাহ্ণে যে দুগ্ধ প্রদান করে, তাহা শিশুর পক্ষে অনিষ্টজনক। সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ বর্জ্জনীয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রসবের পর ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত গাভী যে দুগ্ধ দেয় তাহাকে Colstrum (কলষ্ট্রম্) বলে, প্রচলিত ভাষায় ইহার নাম মাতলা দুধ। ইহা মানবের ব্যবহারোপযোগী নহে; কিন্তু গো-বৎসের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়; কেন না জরায়ুতে অবস্থানকালে বৎসের মল-মূত্রাদি বদ্ধ থাকে, এই কলষ্ট্রম্ সেবনে তাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, কারণ ইহা বিরেচক। অধিক মাত্রায় সেবনে অনিষ্ট সম্ভাবনা।

কলষ্ট্রমের রাসায়নিক উপাদানের অনুপাত নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

			প্রথম দিন	গড়ে
1.	Fat (চর্ব্বী)	...	৮.৫	৪.০
2.	Albumen (শ্বেতসার)	...	১৫.৫	৭.৫
3.	Casein (ছানা)	...	১১.২	৭.৩
4.	Sugar (শর্করা)	...	০.০	৩.০
5.	Ash (অঙ্গার)	...	৩.৩	১.০
			৩৮.৫	২২.৮

উপরোক্ত রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায় যে প্রসবান্তে প্রথমদিনের কলষ্ট্রমে শর্করার ভাগ একবারে শূন্য; ক্রমে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩.০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কলষ্ট্রমের প্রথমাংশে চর্ব্বী, ছানা, শ্বেতসার এবং অঙ্গারের অংশ অত্যন্ত অধিক থাকে এবং ক্রমে সে সমুদায়ের অল্পতা হয়। এই সমস্ত পদার্থ

বৎসের লালার সহিত যুক্ত হইয়া সহজে জীর্ণ হয়। সাধারণতঃ গো-দুগ্ধ ৪র্থ হইতে ১৪শ দিবসে স্বাভাবিক ও বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই সময়টী সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট থাকে না; গাভীর জাতি, স্বাস্থ্য, দৈহিকবল, আহার-বিহার ও প্রতিপালন ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ইহার ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। প্রসবান্তে ৩।৪ দিবস পর কলষ্ট্রম্ চা (Tea) কাফি ইত্যাদির সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ইহাতে মাখনও প্রস্তুত হয়। প্রসবান্তে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত গো-দুগ্ধ ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। আমাদের শাস্ত্রানুসারে প্রসবান্তে নারী, গো, মহিষ ও ছাগী দশদিনে শুদ্ধ হয়, অতএব ১০ দিন পর্য্যন্ত নবপ্রসূতা গাভী ইত্যাদির দুগ্ধ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

বিবৎসা, মৃতবৎসা, দ্বিবৎসা, রুগ্না, অতি বৃদ্ধা, ঋতুমতী, দুর্ব্বলা এবং সদ্যঃ ষণ্ড সংযুক্তা গাভীকে সুখাভিলাষী বর্ণাশ্রমী সাধুগণ দোহন করিবেন না, এবং তাহার দুগ্ধও পান করিবেন না। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।

আজকাল বিবৎসা গাভীকে ফুঁকা দিয়া দোহন করা হয়; এটী অতি নিষ্ঠুর প্রথা, এই উপায়ে লব্ধ দুগ্ধ বর্জ্জনীয়। কঠোর রাজবিধি দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত হওয়া কর্ত্তব্য। বাজার হইতে আনীত দুগ্ধ নানা দোষযুক্ত, অতএব তাহা ব্যবহার না করিতে পারিলেই ভাল, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা সম্ভবপর নহে। অনাবৃত অবস্থায় রক্ষিত দুগ্ধও জ্বাল না দিয়া ব্যবহার করা অনুচিত, এ বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে ভাদ্রমাসে প্রসূতা ও সেই মাসে গর্ব্ভবতী গাভীর দুগ্ধ মূত্রতুল্য, এবং তজ্জাত দধি বিষ্ঠাসম এবং ঘৃত মদিরা তুল্য। এই নিষেধের মূলে কোনও নিগূঢ় কারণ আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া মহাজনবাক্য উপেক্ষা করা সমীচীন নহে। কৃতবিদ্যগণ সত্যাবিষ্কারের চেষ্টা করুন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

বালবৎসা ও বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষজনক। সদ্যঃ প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ঘন থাকে; ইহাকে পীযূষ বলা যায়। প্রসূতায়া গোঃ সপ্তাহং যাবৎ যৎ ক্ষীরং তৎ পীযূষ মাহুঃ—প্রসূতা গাভীর দুগ্ধকে এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত পীযূষ বলা যায়।

বিবর্ণ, বিরস, অম্লস্বাদযুক্ত, দুর্গন্ধি এবং গ্রথিত (জমাট বাঁধা) দুগ্ধ বর্জ্জনীয়; অম্ল ও লবণযুক্ত দুগ্ধ কুষ্ঠরোগজনক, অতএব তাহাও বর্জ্জনীয়।

স্নিগ্ধ, শীতল এবং ঘন দুগ্ধ সর্ব্বদা সেবন করিবে না, কারণ ইহাতে দীপ্তাগ্নি মন্দীভূত হয় এবং মন্দাগ্নি একবারে নষ্ট হয়।

তিন মাসের উর্দ্ধকালের গর্ব্বিণী গাভীর দুগ্ধ—বিদাহী, লবণ-স্বাদযুক্ত, মধুর এবং পিত্তদোষকারক।

এক্ষণে দুগ্ধের সহিত সংযোগ বিরুদ্ধ পদার্থাদি বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত মতগুলির সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

দুগ্ধ লবণ সংযুক্ত করিয়া, চালের গুঁড়ির সহিত এবং সন্ধানক (আমের আচার) মাষ, মুগ, কোশাতকী এবং ঝিঙ্গা, পল্‌তা, ধুন্দুল ও পটলের সহিত সেবন করিবে না। অপিচ মৎস্য, মাংস, গুড়, মুগ এবং মূলার সহিত দুগ্ধ সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ জন্মে। শাক ও জামের রসের সহিত সেবন করিলে তাহা মূর্খ ব্যক্তিকে সর্পবৎ বিনাশ করে।

সুশ্রুত সংহিতার মতে, অভিনব অঙ্কুরিত ধান্যের সহিত অথবা বসা, মধু দুগ্ধ, গুড় ও মাষকলায়ের সহিত গ্রাম্য জন্তুর মাংস, আনূপ জন্তুর (সজল দেশবাসী জন্তুর—মহিষ প্রভৃতির) মাংস ভক্ষণ করিবে না। দুগ্ধ ও মধুর সহিত বাহিনীশাক (কট্‌কী শাক, জাতুশাক (পুষ্কর শাক) ভক্ষণ করিবে না। দুগ্ধের সহিত মূলা, আম্র, জাম, সজারু ও শূকরমাংস ভক্ষণ করিবে না। এবং গোধা (গোসাপ) মাংস, কদলী (কলা) ও লকুচ (ডহুয়া) ফলের সহিতও দুগ্ধ সেবন করিবে না। ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, দুগ্ধের সহিত সর্ব্বপ্রকার মৎস্য (বিশেষতঃ চিলচিম্ অর্থাৎ থরসল্লা মাছ) ভক্ষণ নিষেধ। দুগ্ধ পানের পরে অথবা পূর্ব্বেও লকুচ ফল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। আরও কথিত হইয়াছে যে, অপর কতকগুলি দ্রব্য-সংযোগে দুগ্ধ বিষতুল্য হয়। যথা—বল্লী ফল (কুমড়া, লাউ প্রভৃতি লতা ফল) কবক (ছাতনা, Mushroom) করীর (বংশাঙ্কুর), অম্লফল, লবণ, কুলথ (কলাই) পিণ্যাক (পিঠা,তিল), দধি, তৈল, বিরোহী (যে সকল শাকের অঙ্কুর নিবৃত্ত হইয়াছে), চা'লের পিঠা, শুষ্ক শাক, ছাগ ও মেষমাংস, জাম্বররস সহ চিলচিম মৎস্য (চরক-সংহিতা মতে সর্ব্বপ্রকার মৎস্য), গোধা (গোসাপ) ও শূকরমাংস দুগ্ধের সহিত একত্র ভক্ষণ করিবে না।

সুশ্রুতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, যাহাদের অভ্যাস আছে এবং পরিমাণে অল্প হইলে বহুভোজীর পক্ষে, প্রবল পরিপাক-শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে, ব্যায়ামকারী ও তরুণ-বয়স্ক এবং স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি সেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্যাদি তত অনিষ্টজনক নহে। ফলতঃ সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্যাদি একটু বিবেচনা করিয়া এবং দৈহিক অবস্থাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেবন করাই শ্রেয়ঃ।

যন্ত্রাদি সাহায্যে ও অন্যান্য উপায়ে দুগ্ধ পরীক্ষা।

দুগ্ধ পরীক্ষার জন্য (1) Lactometer (লেক্‌টোমিটার) (2) Hydrometer (হাইড্রোমিটার) (3) Creamometer (ক্রিমোমিটার) ও (4) Lactoscope (লেক্‌টোস্কোপ) প্রভৃতি যন্ত্র এবং Litmus paper (লিট্‌মস্‌ পেপার) নামক এক প্রকার নীল বর্ণের কাগজ ব্যবহৃত হয়; ইহা ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ—Lactometer (লেক্‌টোমিটার) যন্ত্রদ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষার বিষয় বলা যাইতেছে। ইহা, নিম্নভাগে গোলাকৃতি বিশিষ্ট একটী কাচের নল ভিন্ন আর কিছুই নহে; গোলাকার অংশে পারদপূর্ণ থাকে এবং নলের গাত্রে পরিমাপের চিহ্নাকৃতি (Graduated Scale) রেখা থাকে। যে দুগ্ধ পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা ফারণ্‌হিটের তাপমান যন্ত্রের ৮০° ডিগ্রী উত্তাপ বিশিষ্ট হওয়া চাই। এই প্রকার দুগ্ধ একটী চোঙ্গার মত কাচপাত্রে পূর্ণ করিয়া তাহাতে লেক্‌টোমিটার যন্ত্র নিয়োজিত করিলে যদি নলটী M চিহ্ন পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে, তবে দুগ্ধ খাঁটি বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। এস্থলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে যন্ত্রটী দুগ্ধে নিমজ্জিত করার পূর্ব্বে তাহা (দুগ্ধ) বেশ শীতল হওয়া আবশ্যক। দুগ্ধে একভাগ জল মিশ্রিত করিলে নলটী ৩ অঙ্ক পর্য্যন্ত, অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুগ্ধ মিশ্রিত করিলে ২ অঙ্ক পর্য্যন্ত এবং তিনভাগ জল ও একভাগ দুগ্ধ মিশাইলে নলটী ১ অঙ্ক পর্য্যন্ত নিমজ্জিত থাকিবে। কেবল জল হইলে নলটী W চিহ্ন পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকিবে।

পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণায়ক। অতএব দুগ্ধে জল মিশ্রিত থাকিলেও তাহাতে শর্করা, ময়দা প্রভৃতি যোগ করিলে ইহাদ্বারা কৃত্রিমতা নিরূপণ করা দুরূহ।

দ্বিতীয়তঃ—Hydrometer (হাইড্রোমিটার) যন্ত্র সাহায্যে দুগ্ধ পরীক্ষার বিষয় বলা যাইতেছে। ইহাও পরিমাপের চিহ্নযুক্ত কাচের নল ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং ইহারও নিম্নভাগে পারদ থাকে এবং এটীও আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণায়ক। এই যন্ত্র পরীক্ষণীয় দুগ্ধে নিমজ্জিত করিলে, খাঁটি দুগ্ধ হইলে ৩০° ডিগ্রী জ্ঞাপিত হইবে, যন্ত্রে ১০৩০ লিখা থাকে, কারণ জলকে ভিত্তিস্বরূপ (Standard) কল্পনা করত তাহা ১০০০ সংখ্যাসূচক ধরিয়া, যন্ত্রের গাত্রে ০ (শূন্য) চিহ্ন দেওয়া হয়; অতএব ৩০° ডিগ্রী প্রকৃত প্রস্তাবে ১০৩০। খাঁটি দুগ্ধ ১০৩২ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইল যে অকৃত্রিম গো-দুগ্ধের Specific gravity (আপেক্ষিক গুরুত্ব) ১.০৩০ হইতে ১.০৩২ পর্য্যন্ত হয়।

ফারণ্‌হিটের তাপমান যন্ত্রে ৬০° ডিগ্রী উত্তাপযুক্ত দুগ্ধে শতাংশে দশভাগ করিয়া জল মিশাইলে দুগ্ধের গুরুত্ব ৩ তিন ডিগ্রী হিসাবে কম হইতে থাকে।

শতকরা ১৫ ভাগ জল মিশাইলে দুগ্ধ হাইড্রোমিটারে ২৬° ডিগ্রী হয়; যন্ত্রে ১০২৬ লিখা থাকে।

শতকরা	২০ভাগ	জল মিশাইলে	২৩° ডিগ্রী হয়		(যন্ত্রে ১০২৩°)
„	৩৫ „	„	১৮°	„	(যন্ত্রে ১০১৮°)
„	৪৫ „	„	১৫°	„	(যন্ত্রে ১০১৫°)

দুগ্ধের নবনীত উঠাইয়া তাহাতে জল মিশ্রিত করিলে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব উচ্চ হইবে এবং নবনীতের ভাগ অধিক থাকিলে তাহা নিম্ন হইবে।

তৃতীয়তঃ—Creamometer (ক্রিমোমিটার) যন্ত্রদ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষা সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। এই যন্ত্রটী দুগ্ধের সরের (নবনীতের) পরিমাণ নির্ণায়ক। এটাও ডিগ্রী চিহ্নযুক্ত কাচের চোঙ্গা, এটা একটী কাষ্ঠের ফ্রেমে আবদ্ধ থাকে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দুগ্ধদ্বারা এই নল পূর্ণ করত যন্ত্রটী নির্ব্বাত ও নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দিলে ১২ ঘণ্টার পর দুগ্ধের সর নলের উপরিভাগে ভাসিতে থাকিবে; এস্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে দুগ্ধ নলে পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে উত্তপ্ত করিয়া নিতে হইবে। খাঁটি দুগ্ধে সরের স্থূলতা ৮ হইতে ১০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। *

Lactometer (লেক্‌টোমিটার) এবং Hydrometer (হাইড্রোমিটার) যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষণীয় দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির করিয়া, Creamometer (ক্রিমোমিটার) দ্বারা সেই দুগ্ধের সরের স্থূলত্ব অবধারণ করত সর উঠাইয়া পুনর্ব্বার তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিলে সহজে দুগ্ধের পরীক্ষা হয় এবং গুণাগুণও কতকটা নিরূপিত হয়।

চতুর্থতঃ—Lactoscope (লেক্‌টোস্কোপ) যন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষা; এবিষয় বলার পূর্ব্বে Blue Litmus paper (নীলবর্ণের লিট্‌মস্‌ পেপার) দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষার বিষয় বলা যাইতেছে। এই কাগজ ডাক্তারখানায় সচরাচর পাওয়া যায়; ইহার একখণ্ড দুগ্ধে নিমজ্জিত করিলে যদি তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গাঢ় রক্তবর্ণ হয়, তবে দুগ্ধ টকিয়া গিয়াছে (Acidity হইয়াছে) বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং কাগজের বর্ণ অল্প গোলাপী আভা বিশিষ্ট হইলে দুগ্ধ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। দুগ্ধে চাখড়ি বা ময়দা মিশ্রিত

(*) এক একটী যন্ত্র সম্মুখে রাখিয়া প্রবন্ধের এই অংশ টুকু পাঠ করিবেন।
লেখক—

থাকিলে কাগজের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইবে না। রুগ্না গাভীর দুগ্ধ ক্ষারপ্রধান (Alkaline ! এবম্বিধ গোদুগ্ধেও লিট্‌মসের বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে না। নারীদুগ্ধও ক্ষারপ্রধান, ইহাতেও লিট্‌মস্ পেপারের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় না। এতদ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে গোদুগ্ধ স্বভাবতঃই এসিড্‌যুক্ত এবং এই জন্যই তাহাতে চূণের জল মিশাইয়া ক্ষারবিশিষ্ট করত শিশুকে ব্যবহার করান উচিত।

উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ সমবেত উপায়ে দুগ্ধের কৃত্রিমতা অনেকটা নির্ণয় করা যায় বটে, কিন্তু ইহার কোনটীই নিঃসন্দেহজনক নহে।

এখন Lactoscope (লেক্‌টোস্কোপ) যন্ত্রদ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষার বিষয় বর্ণিত হইতেছে ; এই যন্ত্র অনেকটা উন্নত ও নিঃসন্দেহজনক। এই যন্ত্রটী মিউনিচ্ (Munech) নগরবাসী (Professor Fesor) অধ্যাপক ফেছার কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। এ কথা প্রত্যক্ষ যে, দুগ্ধ স্বভাবতঃ অস্বচ্ছ কিন্তু তাহার নবনীত উঠাইয়া জল মিশ্রিত করিলে ক্রমে স্বচ্ছ হয়, জলের পরিমাণ যত বৃদ্ধি করা যায়, দুগ্ধের স্বচ্ছতাও ততই বাড়িতে থাকে। এই Lactoscope যন্ত্র, উপরিভাগে অনাবৃত ও নিম্নভাগে ক্রমে সূক্ষ্মাগ্র বিশিষ্ট একটী কাচের নল, এই সূক্ষ্মাগ্রভাগে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ পরিমাপের রেখা চিহ্নযুক্ত একটী কাচের শলাকা সংযুক্ত থাকে ; ঐ শলাকাটী চক্ষুর মত। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পরীক্ষণীয় গো-দুগ্ধ এই যন্ত্রে পূর্ণ করিলে প্রথমতঃ চিহ্ন রেখাগুলি দেখা যায় না, কিন্তু ঐ দুগ্ধে জল মিশাইতে আরম্ভ করিলে রেখাগুলি ক্রমে স্পষ্ট দেখা যায়, তখন দেখিতে হইবে যে, জল মিশ্রিত দুগ্ধ নলের উপরিভাগে কত উচ্চে অবস্থিত হইয়াছে ; উচ্চতা নিরূপণ জন্য নলের গাত্রে ডিগ্রী চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। এতদ্বারা দুগ্ধে কি পরিমাণ জল মিশ্রিত হইল এবং তাহাতে নবনীতের অংশই বা কত, ইহা অতি সহজে নির্ণয় করা যায়, কারণ জল মিশ্রণের অনুপাত অনুসারে দুগ্ধের স্বচ্ছতার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; দুগ্ধ পরীক্ষার যত প্রকার যন্ত্র এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে Lactoscope-ই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যন্ত্রদ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষার বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল ; বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যন্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত যন্ত্রাদির সাহায্যেই দুগ্ধ পরীক্ষা করিতে হইবে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণদ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিঃসন্দেহজনক, কিন্তু ইহা সকলের পক্ষে এবং সর্ব্বদা সম্ভবপর নহে। সাধারণতঃ ন্যূন পক্ষে খাঁটি গো-দুগ্ধ শতকরা ৮.৬ অংশ Solid (দৃঢ় পদার্থ যথা—ছানা, শ্বেতসার

প্রভৃতি,) ২.৫ অংশ নবনীত ও ৮৮.৯ অংশ জলীয় পদার্থ থাকে। ইহার ব্যতিক্রমে দুগ্ধ কৃত্রিম বলিয়া মনে করিতে হইবে। রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত অন্য কি কি উপায়ে দুগ্ধ পরীক্ষিত হইতে পারে তাহা দেখা যাউক। অকৃত্রিম উৎকৃষ্ট দুগ্ধ অতিশয় গাঢ় অথবা একবারে তরল হয় না এবং এমন সংহত হয় যে ইহার বিন্দুগুলি ছড়াইয়া যায় না ও এই প্রকার দুগ্ধের ফোঁটা মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিলে ছড়াইয়া যায় না। একটী সূক্ষ্ম সূচীর অগ্রভাগে দুগ্ধ সংলগ্ন করিলে অকৃত্রিম দুগ্ধের বিন্দুটী ঝুলিয়া থাকিবে, পড়িয়া যাইবে না। দুগ্ধে জল মিশাইলে তাহা নীলাভ, agate (এক প্রকার প্রস্তর) অথবা opal (শ্বেতবর্ণ প্রস্তর বিশেষ) বর্ণ হয় এবং তাহা মাটিতে ফেলাইলে ছড়াইয়া যায়। এতাদৃশ দুগ্ধ অতি সত্বর টক হইয়া যায় এবং মথিত করিলে তাহাতে ভাল নবনীত জন্মে না।

এস্থলে একটী আবশ্যকীয় বিষয় বলা যাইতেছেঃ—

অল্পদিন হইল যে দুগ্ধবতী গাভী গর্ব্ভিণী হইয়াছে তাহার দুগ্ধ পরীক্ষা দ্বারা অনেক সময় সহজে গর্ব্ভ নির্ণয় করা যায়; যে গাভীকে পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার অল্প পরিমাণ দুগ্ধ দোহন করত অপর একটী গাভীর (যাহার গর্ব্ভ সঞ্চার হয় নাই বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা আছে,) অল্প পরিমাণ দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া দুইটী খড় অথবা দুইটী ছুঁচ উভয় দুগ্ধে নিমজ্জিত করিতে হইবে। অতঃপর দুইটী কাঁচের গ্লাসে কিঞ্চিদূন নির্ম্মল জল পূর্ণ করত খড়ের অথবা সূচীর অগ্রভাগলগ্ন উভয় প্রকার দুগ্ধের এক একটী ফোঁটা তাহাতে নিক্ষেপ করিলে দেখা যাইবে যে, গর্ব্ভিণী গাভীর দুগ্ধ-বিন্দুটী জলে মিশ্রিত হওয়ার পূর্ব্বে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে এবং অপর গাভীর (যেটী গর্ব্ভিণী নহে) তাহার দুগ্ধ জলে একবারে মিশিয়া গিয়াছে। গর্ব্ভিণী গাভীর দুগ্ধ স্বভাবতঃ গাঢ়, সংহত ও কিছু আটাল গুণযুক্ত হয় এবং এই জন্যই তাহা সহসা জলে মিশিয়া যায় না।

গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি করার উপায়।

গবাদির দুগ্ধ বৃদ্ধি করার উপায় বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূতনহে, তথাপি প্রয়োজনবোধে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে। আহার্য্য পদার্থের সহিত দুগ্ধের সম্বন্ধ বিষয়ক প্রস্তাবে এ বিষয় কিছু কিছু বলা গিয়াছে। এস্থলে ইংরেজী গ্রন্থের মতগুলি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইল।

পোতা-ঘাস (Silago) গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক, কিন্তু ভাল রকম প্রস্তুত না হইলে, ইহা ব্যবহারে গুণহানী হয়।

যব, গম ইত্যাদি শস্য অপক্কাবস্থায়, কিম্বা খোসা সমেত এবং খোসা ছাড়ান প্রভৃতি যে কোনও অবস্থায়ই হউক, গাভীকে খাইতে দিলে তাহার পুষ্টি ও দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

কপি, শালগম, গাজর, পার্স্নিপ, রেপ্, মেন্‌গোলড্ ও সুইড্ প্রভৃতি বিলাতী শাক সব্জী ব্যবহারে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। গাজর পার্স্নিপ্ ও শালগম্ সেবনে দুগ্ধে উগ্র গন্ধ হয়; অতএব এগুলি গাভীকে অধিক খাইতে দেওয়া উচিত নহে। মদের ছিব্‌ড়া (শেষাংশ) দুগ্ধ বৃদ্ধিকর, কিন্তু ইহা সেবনেও দুগ্ধে দুর্গন্ধ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

আমার তিনি।

সেই ছোট বয়সের কথা বলিতেছি। এখন আর সে দিন নাই। সে সময়টার সঙ্গে অনেক দূর ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। শুক্লা-দ্বাদশী আর কৃষ্ণা-দশমীতে যতটুকু ছাড়াছাড়ি ততটুকু ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। তখন যে সঙ্কোচের ভাবটুকু ছিল এখন তাহা নাই। তখন উষার অন্ধকার থাকিতে থাকিতে শয্যা ছাড়িয়া বৈঠকখানায় যাইয়া শুইয়া পড়িয়াছি—উদ্দেশ্য, আমার নিশা-যাপনের গুপ্তস্থানটুকু যেন কেহ আবিষ্কার করিতে না পারে। গুরুজনের চক্ষু ও কর্ণকে ফাঁকি দিয়া তখন গভীর নিশিতে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রণয়িনীর সঙ্গে প্রেমসাধনা করিয়াছি। আর এখন দিনে দুপুরে দশজনের সম্মুখে প্রণয়িনীর সঙ্গে মুখামুখী হইয়া বসিয়া বাক্যযুদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করি না। কাজেই ছোট বেলার গুপ্ত কথাগুলি এখন প্রকাশ্যভাবে বলিতে আর কোন বাধা দেখিতেছি না।

আষাঢ় মাস; গঙ্গার জল কর্দ্দমময় ও কর্কট-শাবকসঙ্কুল হইয়া অনেকটা কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। মেঘ বারি-বর্ষণে কৃপণতা দূর করিয়াছেন। সূর্য্যদেব প্রায়ই মেঘের আড়ালে থাকিয়া নিশি-দিবার বিভিন্নতা দেখাইয়া যাইতেছেন। কিরণ ফুটাইবার সুবিধাটা বড় ঘটিয়া উঠিতেছে না। এ হেন আষাঢ় মাসে বড় সাধ হইল, মাহেশে রথ দেখিতে যাইব।

রথের দিবস সকাল বেলায়, আমি, মেজোদাদা, সেজোদাদা পাড়া-প্রতিবেশী কয়েকজন মিলিয়া একটা ছোট খাট দল গড়িয়া বাড়ী হইতে বাহির

হইলাম। ভবানীপুর হইতে ডিঙ্গিতে গঙ্গা পার হইয়া হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। সেদিন ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। টিকেট কিনিতে যাইয়া আমার সার্টের ইস্ত্রিরির পরিণামটা বড় ভাল হইল না। অল্পক্ষণ পরেই গাড়ীখানা বাঁশী বাজাইয়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল।

যে সময়ের যে চিন্তা। আমি গাড়ীতে বসিয়া বঙ্কিমবাবুর "রাধারাণীর" কথা ভাবিতে লাগিলাম।

(২)

রথে মাহেশে বড় ধুম। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অনেকেই মাহেশে রথ দেখিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

তখনও রথে টান পড়িবার একটু বিলম্ব ছিল। আমরা এ দিক সে দিক দেখিয়া বেড়াইতেছিলাম। আমি সকলের পেছনে। আমরা এতক্ষণ জন-সমুদ্রের ক্ষুদ্র-বৃহৎ তরঙ্গমালার সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই বিশ্রাম করিবার মানসে একটা ফাঁকা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেখান হইতে একটু দূরে একটা গাছতলায় কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষ বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। মোটামুটী চিন্তায় তাহাদিগকে ভদ্রগৃহস্থ বলিয়াই অনুমান করিয়া লইলাম। তাঁহাদের পেছনে গাছের গায় হেলান দিয়া একটা বালিকা লোকারণ্য দেখিতেছিল।

অনেকদিনের কথা বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধ-বয়সেও সে ছবিখানা চক্ষুর উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহার পরিধানে একখানা মিহি শান্তিপুরে' শাড়ী, বর্ণ নাতি গৌর নাতি কৃষ্ণ। গড়ন নাতি দীর্ঘ নাতি হ্রস্ব। দৃষ্টি ঈষৎ সলাজ চঞ্চল। বয়স অনুমান বার অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। রসিক পবন, সযত্ন-রক্ষিত বেণীবদ্ধ কুন্তলদাম হইতে দুই একগাছি কুন্তল খসাইয়া লইয়া চোখেমুখে ছুড়িয়া ফেলিতেছিল। বালিকা ঈষৎ বিরক্তির সহিত তাহা যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া রাখিবার জন্য বার বার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিল।

আমি অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া সে মূর্ত্তিখানি দেখিলাম। একটু একটু করিয়া দল ছাড়িয়া ক্রমে সে দিকে আরও খানিক অগ্রসর হইলাম। কিন্তু একটীবারও চারি চক্ষুর মিলন হইল না। এমন সময় তাহাদের সঙ্গীয় চারি পাঁচ বৎসরের একটী বালক কি একটা বায়না ধরিয়া বড় চেঁচামেচি আরম্ভ করিল। কেহ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছে না। তখন বালিকাটী অগ্রসর হইয়া

তাহাকে সযত্নে কোলে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "খোকামণি, কেঁদ না, তা'হলে ঐ ওরা তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।" অঙ্গুলির সঙ্গে সঙ্গে বালিকার দৃষ্টিও সেইদিকে পতিত হইল। ভাগ্য আমার, তাই অঙ্গুলিটী আমার দিকেই হেলিয়া পড়িয়াছিল। বালিকা দেখিল, আমি সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছি। তাই লাজে মস্তক নত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

তখন গোল উঠিল রথে টান পড়িয়াছে। সকলে ছুটাছুটি করিয়া সেইদিকে চলিল। সুতরাং সেই ঘন লোকারণ্যের আন্দোলনে সেই বালিকা-মূর্ত্তি কোথায় মিশাইয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না। যদিচ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পদ্মপলাশনয়না ইত্যাদি না হউক, তথাপি সে মূর্ত্তিখানি আমি বড়ই সুন্দর দেখিয়াছিলাম। কাজেই সে যাত্রা আমার রথ দেখাও হইল না; কলা বেচা কি কলা কেনাও হইল না; আমি কলা খাইয়া আসিলাম।

(৩)

কি ক্ষণে, না জানি মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমি কিন্তু সেই দিনই আমার তাৎকালিক সকল সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম। থাকিয়া থাকিয়া গাছতলার সেই প্রাণারাম মূর্ত্তিখানি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। থাকিয়া থাকিয়া সেই সুধাসিক্ত কথা কয়টী কাণে বাজিত! কত চিন্তা, কত কল্পনা বুকের ভিতর চাপিয়া বসিত, নির্ণয় করিতে পারিতাম না। বৌ-দিদিরা সময় সময় উপহাস করিয়া বলিতেন, "ঠাকুর-পো ফুল ফুটাতে চায়"।

দু'দিন বাদে দেখিলাম সত্য সত্যই ধুমধাম সুরু হইল। একদিন মেজো-বৌদিদি আমাকে বলিলেন "ঠাকুর-পো শুনেছ, শান্তিপুরের হরিমোহন বোসের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব সুস্থির হয়েছে। আর দশদিন বাদে গায় হলুদ পড়্বে।"

মনে আসে, আমি তাঁহাকে একটা বিকট মুখভঙ্গি করিয়া তাড়া করিয়াছিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। বিবাহের প্রস্তাব উঠিলে একটা অব্যক্ত আনন্দে সকলেরই প্রাণটা নাচিয়া উঠে। আমার কিন্তু তা হইল না। কেন? সে কথার উত্তর না দেওয়াই ভাল।

ভাবনা চিন্তায় দেখিতে দেখিতে সেই কয়টা দিন কাটিয়া গেল। যথাসময়ে গায়ে হলুদ পড়িল। আমি বরবেশে শান্তিপুরে চলিয়া গেলাম। শান্তিপুরে

যাইয়া আমার মনের অশান্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। মনে করিলাম এ সব গোলযোগ হইতে দূরে চলিয়া যাই। কিন্তু ঘটিয়া উঠিল না। শুভলগ্নে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কেবল হইল না চারি চক্ষুর মিলন ও শুভদৃষ্টি। কারণ আমি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মাথা গুঁজিয়াই বসিয়া ছিলাম।

অসুখ হয়েছে বলে, অনেকগুলি বক্রহাসি ও বিদ্রূপবাক্যের তাড়না সহ্য করিয়া বাসরের গোলযোগ হইতে মুক্ত হইলাম। গভীর রাত্রিতে যখন শ্বশুরালয়ের সকলেই বিশেষ আরামের সহিত নিদ্রা যাইতেছিল, সেই সময় আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুলিয়া অন্ধকারে গা ঢাকিয়া পলায়ন করিলাম।

(৪)

প্রায় বৎসরকাল কাটিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময়টা আমি আত্মীয়-স্বজনের চক্ষুতে ধূলি দিয়া, কাল্না, কাটোয়া, বর্দ্ধমান, শ্রীরামপুর প্রভৃতিস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এখন আর বলিতে দোষ নাই—অনেকবার মাহেশে যাইয়া সেই রথতলায় সেই বৃক্ষের নীচে বসিয়া রহিয়াছি। আমার অনেক অনুসন্ধান হইয়াছিল বটে, কিন্তু কোন ফল হইল না; কারণ আমি জেলখানা হইতে পলায়িত আসামীর ন্যায় সর্ব্বদা খুব সতর্কতার সহিত গা-ঢাকা দিয়া থাকিতাম।

বর্ষশেষে শান্তিপুরে রাসের ধুম পড়িয়াছে। আমিও খুব সতর্কভাবে চুপি চুপি শান্তিপুরে রাস-লীলাটা দেখিতে গেলাম। আত্মগোপন করিবার মানসে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। পরিধানে গৈরিকবাস, অঙ্গে নামাবলী, গলায় তুলসীর কণ্ঠী, কপালে তিলক, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ; দেখিতে একমত হইল বেশ। এই বেশ লইয়া রাসের দিন নগরভ্রমণে বাহির হইলাম।

যাত্রিগণ গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া, কপালে তিলক ও ছাপ কাটিয়া, দলে দলে বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া বেড়াইতেছে। ফেরিওয়ালারা নানাবিধ জিনিস লইয়া ফেরি করিতেছে। আমি চঞ্চল চক্ষুতে এ সকল দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে চলিয়াছি। একস্থানে দাঁড়াইয়া একদল যাত্রী ফুলের মালা কিনিতেছিল। দলের মধ্যে বালক-বালিকা, যুবতী-বৃদ্ধা সকল রকমে ৮।১০ জন লোক হইবে। আমি একবার সে দিকে চাহিয়া দেখিলাম—দেখিলাম-ত আর চক্ষু ফিরিল না। মন্ত্রমুগ্ধবৎ অচল ও নিস্পন্দভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এমন সময় সেই দলস্থা একজন শ্যামাঙ্গিনী মুক্ত-কুন্তলা যুবতী আমার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন "কি ঠাকুর, সব দৃষ্টিটুকু যে এখানেই খরচ করে

ফেলে, রাস দেখ্‌বে কি নিয়ে!" আমি তাহার তীব্র বিদ্রূপে সচেতন হইয়া একটু অপ্রস্তুত হইলাম। কিন্তু একটা স্ত্রীলোকের নিকট এরূপভাবে অপ্রস্তুত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া নিজকে সামলাইয়া বলিলাম—"ক্ষমা করিবেন, আমার রাস দেখার সাধ এখানেই পূর্ণ হইয়াছে।" যুবতী বলিলেন—"তোমার বাড়ী কোথা?"

"বাড়ী একদিন ছিল বটে, এখন আর সে জিনিসটা নাই।"

"তবু-ত যখন ছিল, তখন কোথায় ছিল?"

"গত বিষয়ের আলোচনা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে।"

এবার যুবতী আমার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হয়!"

"সে আপনার অনুগ্রহ—হ'তে পারে গোকুলে দেখে থাক্‌বেন!" এই বলিয়া আমি একটু হাসিলাম। যুবতীও একগাল হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ঠাকুর-ত বেশ রসিক দেখ্‌ছি। কথাটা বলিয়া যুবতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি যেন চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু মনের ভাবটা গোপন রাখিয়া বলিলাম—"আপনার সঙ্গিনী ঐ ষোড়শীর বাসস্থান কোথায়, জানিতে পারি কি?"

"যুবতী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর রাস দেখ্‌তে এসেছ রাস দেখ্‌তে যাও, ভদ্রঘরের ঝি-বৌয়ের এত খোঁজ খবর নিয়ে কাজ কি?"

কথাটা শুনিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। কাজেই আর সেখানে দাঁড়াইবার সাহস হইল না। ধীরে ধীরে অন্যদিকে চলিয়া গেলাম।

যাবার সময় চাহিয়া দেখিলাম আমার সেই চিত্তচোরা ষোড়শী দুইছড়া বেলফুলের মালা হাতে লইয়া এক একবার আমার দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। এমন সময় দূর হইতে দেখিলাম, একজন হৃষ্টপুষ্ট যুবক আসিয়া তাহাদের দলপুষ্ট করিল। আরও দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত শ্যামাঙ্গিনীর সহিত যুবকের কি কথোপকথন চলিতেছে।

সহসা একটা শোওয়ারশূন্য ঘোটক বেগে ছুটিয়া আসিল। চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আমি সেই গোলযোগে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া একদিকে সরিয়া পড়িলাম। কবি বলিয়াছেন—"নাহি বাঁধে কোন বাঁধা মন বাঁধা যাতে।" গোলযোগ একটু থামিলে, আবার তাড়াতাড়ি পূর্ব্ব লক্ষ্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সেই সময়ে পূর্ব্ব-দৃষ্ট যুবক আসিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে আমার হস্তধারণ করিল।

(৫)

আমি ধরা পড়িয়াছি। যে যুবক আমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, জানিতে পারিলাম, তিনি সম্বন্ধে আমার সম্বন্ধী হন। আর সেই শ্যামাঙ্গিনী মুখরা কামিনী ঠাকুরাণী আমার শ্বশুর মহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রী। যাহা হউক আমি ধরা পড়িয়াছি। ধরা দিয়াছি বলিলেও চলে। আমার সেই শ্যামাঙ্গিনী কুরঙ্গনয়না ঠাকুর-ঝির সহিত কথোপকথনের সময় দেখিয়াছিলাম—যার জন্য এত সাগর মন্থন, তাহার সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু "গোধূলি-ললাটে আহা তারা রত্ন যথা।" বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কোন সৌভাগ্যবান পুরুষের গলে আমার সেই মনোহারিণী বরমাল্য অর্পণ করিয়া ফেলিয়াছেন। কাজেই একটা বিষাদময়ী রজনীতে যে সরলা বালিকাটী আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহার কোলেই মাথা রাখিয়া শান্তির প্রয়াসী হইতে সংকল্প করিলাম।

আমি এখন শ্বশুরবাড়ী। আমার আর সে বেশ নাই। বাড়ীশুদ্ধ একটা আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছে। পাড়া প্রতিবেশিনীরা সে আনন্দে যোগদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। সেই কালো ঠাকুর-ঝি আসিয়া বেশ রকমওয়ারী মতে মানভঞ্জনের পালা গাহিয়া গেলেন। স-বসনা ও বিবসনা শ্যালিকার দল কর্ণ ও কক্ষে লইয়া বড় গোলমাল বাঁধাইয়া দিল। রাত্রি আহারাদির পর আমি শয়ন-মন্দিররূপ জেলখানায় আবদ্ধ হইলাম। শ্রীমতী ঠাকুর-ঝি সদলবলে একটী অবগুণ্ঠিতা কিশোরীমূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া হাস্য পরিহাস ও নানাবিধ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে করিতে আমার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই অবগুণ্ঠিতাকে মধ্যে লইয়া সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। ঠাকুর-ঝি তখন একগাল হাসি ঢালিয়া বলিলেন, "কি বৈষ্ণব ঠাকুর সেদিন খুব ফাঁকি দিয়ে ছিলে, তাই আজ শোধ তুল্‌তে এসেছি।"

অভিযানটা একটু বেশী রকম দেখিয়া আমি সহজেই নত হইয়া পড়িলাম। বলিলাম "সে আমার পরম সৌভাগ্য, এক বিয়েতে দু'বার বাসর জাগা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তায় আবার এ সব মহারথী নিয়ে।"

"মহারথী দেখে ভয় পেয়েছ বুঝি?"

"কতকটা বটে।"

"কেন বল দেখি?"

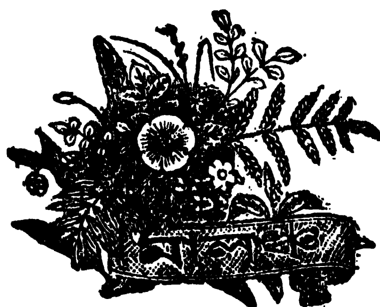
"বাক্য বাণগুলি নিবারণের সন্ধান জানা আছে, কিন্তু নয়ন-বাণ নিবারণের সন্ধান জানিনা বলে।"

তখন সে স্থানে হো হো শব্দে একটা হাসির ফোয়ারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বুঝিবা অবগুণ্ঠনের ভিতরও একটু হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়াছিল। ঠাকুর-ঝি সেই অবগুণ্ঠনবতীকে বলিলেন "দেখেছিস্ প্রমদা তোর বরের কেবল চৈতন্য-চর্চ্চাতেই দিন যায় নাই।" পেছন হইতে অন্য একজন যুবতী বলিলেন, ওলো, প্রমদার কলাবৌপনাটা ভেঙ্গে দে না। চিরকাল কি এম্নি করে সঙ্কোচ থাকবে।"

তখন সকলে বহুবিধ বাক্যের হুল ফুটাইয়া ও জোর জবরদস্তি করিয়া অবগুণ্ঠনবতীকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। কালো ঠাকুর-ঝি তাহার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিয়া আমাকে বলিলেন—"ঘোষ ঠাকুর একবার চেয়ে দেখ দেখি, এমন সোণার কমল পরিত্যাগ ক'রে কোন্ কচুফুলের সন্ধানে গিয়েছিলে।"

আমি একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইলাম। ও, হরিঃ হরিঃ একি! মাহেশের সেই মনোহারিণী প্রেম-প্রতিমা আমার সম্মুখে উপবিষ্টা, তিনি এখন আর কেহ নহেন—"আমার তিনি"।

শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী।



প্রেমালোক।

তোমারে বেসেছি ভাল, তাই মনে হয়
আজি বিশ্ব মোর কাছে এত শোভাময়
ঢল ঢল এ লাবণ্য নব বরষার,
শ্যামল তারুণ্য এই তরু লতিকার,
সুনীল অম্বর জুড়' আজি সারাবেলা
স্নিগ্ধ নব নীরদের সচঞ্চল খেলা,

মেঘচ্ছায়ে অনুজ্জ্বল রবির কিরণ,
হিল্লোলিত শস্যক্ষেত্র হরিত বরণ,
নদীতীরে মুকুলিত কেতকীর বন,
নবজাত তৃণাঙ্কুর—নিবিড় চিকণ,—
যে দিকে ফিরাই আঁখি, নব অনুরাগে
যাহা দেখি সবি আজ বড় ভাল লাগে।
আজি পুরাতন বিশ্ব প্রেমের আলোকে
উঠিয়াছে নবরূপে ফুটি' মোর চোখে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সান্ত্বনা।

একটী উষার স্বপ্ন জগতে নামিয়া
উষা না হইতে শেষ গিয়াছে চলিয়া।
বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি করিয়ে চয়ন
একান্তে গড়িয়েছিল এ মধু স্বপন!
ভাঙ্গিয়া গিয়েছে স্বপ্ন না মিটিতে সাধ
হৃদয়ে রাখিয়ে শুধু দীর্ঘ অবসাদ!
আজো সে নয়ন ধাঁধা হয় নাই গত
বিশ্বময় আঁকা তারে দেখি অবিরত!
যে খানে জাগিছে উষা পূরব গগনে
আমি ভাবি তার ঘুম ভাঙ্গে সেই খানে;
যেখানে বহিছে স্নিগ্ধ মলয় বাতাস
পাই আমি সেথা তার সুরভি নিশ্বাস;
যেখানে হাসিছে শশী উন্মুক্ত আকাশে
হেরি আমি সেও সেথা তার সাথে হাসে;
যেখানে ফুটিছে ফুল কাননের গায়
ফুলরাণী হয়ে "খুকী" নাচিছে সেথায়;
যেখানে ধরিছে পাখী আধ-ফুট তান

আমার স্বপন-বালা সেথা করে গান;
সেখানে ছুটিছে নদী তর তর তরে
সাগরে আনন্দ-মেলা সেথা খেলা করে;
তরু লতা গ্রহ তারা আকাশের গায়
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপৃত আজ তাহার ছায়ায়!
স্বপ্ন নহে, এসে ছিল বিধাতার দান,—
জাগাইতে সুপ্ত প্রাণে নূতন আহ্বান!
আমার এ ক্ষুদ্র গৃহে থাকি' কয় দিন
বিশাল বিশ্বেতে পুন হয়ে গেছে লীন!
যে দিন মিশা'ব প্রাণে সমস্ত সংসার
সে দিন আবার "খুকী" হইবে আমার।

শ্রীশরৎকুমার সেন গুপ্ত।

সুষুপ্তা।

বিশুভ্র শয়নে সুপ্ত ষোড়শী সুন্দরী,
নিমীলিত সুবিশাল আঁখি ইন্দীবর,
যুগল মৃণাল ভুজ ন্যস্ত বক্ষোপরি;
শ্বাসে হইছে স্ফীত পীন পয়োধর।
আধেক কপোল ঢাকি বিমুক্ত কুন্তল
দুইপাশে গুচ্ছে গুচ্ছে রহিয়াছে পড়ে,
কয়টী জ্যোছনা কণা স্নিগ্ধ সুবিমল
শোভিছে সুন্দর তা'র রক্তিম অধরে।
সারাদিন করি খেলা ক্লান্ত কলেবরে
মুরছি দামিনী যেন পড়েছে ধরায়,
তরুণ লাবণ্যরাশি দেহে নাহি ধরে
আলোকিত জীর্ণ গৃহ সৌন্দর্য্য-ছটায়।
বিনিদ্র নয়নে ব'সে রূপোন্মত্ত কবি
দেখিছে পরাণ ভরে সুষুপ্তার ছবি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বদেশীয় সুগন্ধি



এসেন্স দেলখোস

নিজের সৌরভ মাধুর্য্যে

এবং

সৌরভের দীর্ঘ স্থায়িত্বে

রুমালে

ব্যবহারের একমাত্র

এসেন্সরূপে

ভারতের সম্ভ্রান্তসমাজে

সমাদরে

ব্যবহৃত হইতেছে।

আপনি একবার রুমালে ব্যবহার করুন।

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা মাত্র।

এইচ বসু

পারফিউমার

বহুবাজার, কলিকাতা।

স্থানীয় এজেণ্ট—ট্রেডিং কোং, ময়মনসিংহ।

চক্রবর্ত্তী বসাক এণ্ড ব্রাদার্স

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

পঞ্চম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, শ্রাবণ ১৩১২। { সপ্তম সংখ্যা।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য।

(৩)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পুরাণে প্রাচীন নরপতিগণের বংশাবলীতে অনেকের নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম ব্রহ্মরাত, তাঁহার পিতার নাম রাজর্ষি বিশ্বামিত্র (১) কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র অপেক্ষা বহুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্র এবং তাঁহার কতিপয় বংশধর ঋগ্বেদের ঋষি। যাজ্ঞবল্ক্য ঋগ্বেদ রচনার বহুশতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাচীন বিবরণ অনুসারে ইহা নির্ণয় করা যাইতে পারে যে যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশধর। তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মধ্যে শুনঃশেফের উপাখ্যান আছে; তাহাতে শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রকে রাজপুত্র (২) এবং ভরতর্ষভ (৩) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র সুবিখ্যাত ভরতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভরত সুবিখ্যাত দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পুত্র। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা (ধর্ম্মশাস্ত্র) পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ধর্ম্মশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্ব্বেদের ঋষি।

> জ্ঞেয়ং চারণ্যকমহং যদাদিত্যাদবাপ্তবান্।
>
> যোগশাস্ত্রঞ্চ মৎপ্রোক্তং জ্ঞেয়ং যোগমভীপ্সতা॥ ৩।১১০

কিঞ্চ চিত্তবৃত্তের্বিষয়ান্তর তিরস্কারেণাত্মনি স্থৈর্য্যং যোগ তৎপ্রাপ্ত্যর্থং বৃহদারণ্যকাখ্যমাদিত্যাদহং ময়া প্রাপ্তং তচ্চ জ্ঞাতব্যং। তথা যন্ময়োক্তং যোগশাস্ত্রং তদপি জ্ঞাতব্যং। ইতি মিতাক্ষরা।

---

(১) যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্রের পৌত্র। হরিবংশ ২৭ অধ্যায় দেখ।

(২) 'সবৈ যথানোক্তপয়া রাজপুত্র তদাবদ'।

(৩) 'যথাহং ভরতর্ষভ উপেয়াং তব পুত্রতাং'।

চিত্তবৃত্তির নিরোধ পূর্ব্বক আত্মাতে স্থির হওয়া যোগ। তাহা প্রাপ্তির জন্য বৃহৎ আরণ্যক নামক গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমি তাহা আদিত্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে যোগশাস্ত্র বলিয়াছি, তাহা অবগত হওয়া উচিত।

ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হওয়ার সময়ে প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্ব বর্ণের প্রথমস্থান অধিকার করেন। পরিশেষে প্রাধান্য পাইবার জন্য ক্ষত্র এবং ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ঘোরতর কলহ হইয়াছে। তদনন্তর ব্রাহ্মণগণ প্রথমস্থান অধিকার করেন। ইহা অতি গুরুতর প্রশ্ন; এ সম্বন্ধে আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে ক্ষত্রিয়জাতির প্রাধান্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীদেকমেব। তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপম্ অত্যসৃজত ক্ষত্রং। যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণি ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয় মধস্তাদ্ উপাস্তে রাজসূয়ে। ক্ষত্র এব তদ্যশোদধাতি। সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্ ব্রহ্ম। তস্মাদ্ যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিং য উ এনং হিনস্তি স্বাং স যোনি মৃচ্ছতি স পাপীয়ান ভবতি॥

(বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদ্—শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪। ৪। ২)

পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। এজন্য কেহ উৎপন্ন হয় নাই। (পরে) তিনি স্বীয় ক্ষমতায় শ্রেয়রূপ ক্ষত্রিয় সৃজন করিলেন। দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু এবং ঈশান ইহারা ক্ষত্রিয়। অতএব ক্ষত্রিয় হইতে (আর) প্রধান নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অধস্থ; এজন্য ব্রাহ্মণ রাজসূয় যজ্ঞে উপাসনা করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় তাঁহার যশঃ প্রদান করেন। ব্রহ্মই ক্ষত্রিয়ের জন্মস্থান। ক্ষত্রিয় স্বীয় জন্মস্থান ব্রহ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যিনি তাঁহাকে হিংসা করেন, তিনি স্বীয় যোনি নষ্ট করেন। শ্রেয়কে হিংসা করিলে যে পাপ হয় তাঁহার সেই পাপ হয়।

আর্য্যগণ সরস্বতী নদীর তীরস্থ প্রদেশ হইতে ক্রমে ভারতে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া কোশল বিদেহ প্রভৃতি প্রদেশে আবাস স্থাপন করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে তৎসম্বন্ধে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়।

বিদেঘো হ মাথবো গ্নিং বৈশ্বানরং মুখে বভার। তস্য গোতম রাহূগণ ঋষিঃ পুরোহিত আস। তস্মৈহ স্মামন্ত্র্যমাণোন প্রতিশৃণোতি নে ন্মেগ্নি বৈশ্বানরো মুখান্নিষ্পদ্যাতা। ইতি তম্ ঋগ্ভি র্হ্বয়িতুং দগ্ধে। বীতিহোত্রং ত্বা কবে

দ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে বিদেঘেতি (১)। সন প্রতি শুশ্রাব। উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রাভ্রাজন্তইরতে। তব জ্যোতীংষ্যর্চয়ো বিদেঘা ইতি (২)। সহ নৈব প্রতি শুশ্রাব। তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহ (৩) ইত্যেবাভিব্যাহরদথাস্য ঘৃতকীর্ত্তা বেবাগ্নি বৈশ্বানরো মুখাদুজ্জ্বাল। তং ন শশাক ধারয়িতুং সোঽস্যমুখান্নিষ্পেদে স ইমাং পৃথিবীং প্রাপাদঃ। তর্হি বিদেঘো মাথব আস সরস্বত্যাং। সতত এব প্রাঙ্ দহন্নভীয়ায়েমাং পৃথিবীং। তং গোতমশ্চ রাহুগণো বিদেঘশ্চ মাথবো পশ্চাৎ দহন্তমন্বীয়তুঃ। স ইমাঃ সর্ব্বা নদীরতিদদাহ। সদানীরেত্যুত্তরাদ্ গিরে র্নির্ধাবতি তাং হৈব নাতিদদাহ। তাং হ স্ম তাং পুরা ব্রাহ্মণান তরন্তি অনতিদগ্ধা অগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তত এতর্হি প্রাচীনং বহবো ব্রাহ্মণাঃ। তদ্ হ অক্ষেত্রতর মিবাস স্রাবিতরমিব অস্বদিতমগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তদু হৈতর্হি ক্ষেত্রতরমিব ব্রাহ্মণা উহি নূন মেনদ্ যজ্ঞৈ রসিষ্বদন্। সাপি জঘন্যে নৈদাঘে সমিবৈব কোপয়তি তাবৎ শীতা নতিদগ্ধা হ্যগ্নিনা বৈশ্বানরেণ। স হোবাচ বিদেঘো মাথবঃ "ক্বাহং ভবানি" ইতি। অত এব তে প্রাচীনং ভুবনমিতি হোবাচ। সৈষাপি এতর্হি কোশল বিদেহানাং মর্য্যাদা তেহি মাথবাঃ। শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।৪।১।১০।

(একদা) বিদেহ মাথব মুখে অগ্নি বৈশ্বানর ধারণ করেন। গোতম রাহুগণ ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে আহ্বান করাতে মাথব কোন উত্তর দিলেন না। কারণ কথা বলিলে অগ্নি বৈশ্বানর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে। পরে ঋষি বীতিহোত্র ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্রদ্বারা অগ্নিকে আহ্বান করেন; অগ্নি কোন উত্তর দিলেন না। পরে ঋষি উদগ্নে ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্রদ্বারা অগ্নিকে আহ্বান করেন; তথাপি অগ্নি কোন উত্তর দিলেন না। পরিশেষে ঋষি ঘৃতস্নবী ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা অগ্নিকে আহ্বান করেন। ঘৃত শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র অগ্নি বৈশ্বানর মাথবের মুখ হইতে প্রজ্বলিত হইলেন। মাথব অগ্নিকে ধারণ করিতে পারিলেন না। অগ্নি মাথবের মুখ হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। এই সময়ে বিদেহ মাথব সরস্বতী তীরে ছিলেন। অগ্নি পূর্ব্বদিক দহন করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন। অগ্নি ক্রমশঃ দহন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা দেখিয়া গোতম রাহুগণ এবং বিদেহ মাথব অগ্নির পশ্চাৎগামী হন। অগ্নি সমস্ত নদী দহন করিতে আরম্ভ করেন।

(১) ঋগ্বেদ ৫।২৬।৩ (২) ঋগ্বেদ ৮।৪৪।১৬ (৩) ঋগ্বেদ ৫।২৬।২।

কিন্তু তিনি উত্তর পর্ব্বত (হিমালয়) হইতে প্রবাহিত সদানীর পার হইলেন না। অগ্নি বৈশ্বানর সদানীর পার হন নাই, এজন্য ব্রাহ্মণগণ পুরাকালে সদানীর পার হইতেন না। তৎপর বহু ব্রাহ্মণ তথায় আবাস স্থাপন করেন। পূর্ব্বে এই প্রদেশ জলপ্লাবিত থাকায় আবাসের অযোগ্য ছিল। এজন্য অগ্নি বৈশ্বানর তথায় গমন করেন নাই। এক্ষণ এই প্রদেশ বাসের যোগ্য, তথায় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিয়াছেন। জবন্ত নিদাঘ অন্তে এই স্থান শীতল হয়, কারণ অগ্নি বৈশ্বানর এই স্থান দহন করেন নাই। বিদেহ মাধব জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

ক্বাহং ভবানি ? কোথায় বাস করিব ?

অগ্নি বলিলেন, নদীর পূর্ব্বপ্রদেশে। সদানীর এক্ষণ কোশল এবং বিদেহ প্রদেশের সীমা। বিদেহগণ মাধবের বংশধর।

প্রাচীন সময়ে অনেক ঋষি রাজর্ষি বিদেহ জনক নিকট যোগ শিক্ষা করেন।

"জনকো জনক ইতি বৈ জনাধাবন্তীতি।"

যাজ্ঞবল্ক্য জনক নিকট উপস্থিত হন।

তদ্ হ এতজ্জনকো বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যং পপ্রচ্ছ বেৎথ অগ্নি হোত্রম্ যাজ্ঞবল্ক্য ইতি বেদ সম্রাড়িতি। শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৩।১।২।

বৈদেহ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'অগ্নিহোত্র অবগত আছ ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'সম্রাট আমি তাহা অবগত আছি।'

শুক্ল এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদের শাখকগণ মধ্যে পরস্পর কলহ হয়। এক দল অন্য দলকে ঘৃণা করেন। কৃষ্ণ যজুর্বেদী অধ্বর্য্যুগণ চরক বা চরকাধ্বর্য্যু বলিয়া কথিত হন।

বৈশম্পায়ন শিষ্যাস্তে চরকাসমুদাহৃতাঃ। বায়ুপুরাণ

তাঁহাদের পরস্পর কলহ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে বাজসনেয়ী সংহিতাতে (৩০।১৮) পুরুষমেধ যজ্ঞে চরকাচার্য্য উৎকৃষ্ট বলির পশু বলিয়া কথিত হইয়াছেন। দুষ্কৃতায় চরকাচার্য্যম্।

শতপথ ব্রাহ্মণের স্থানে স্থানে চরকাধ্বর্য্যুগণের নিন্দা লিখিত আছে। যথাঃ—

তদু হ চরকা নানাএব মন্ত্রাভ্যাং জুহ্বতি। "প্রাণোদানৌ বৈ অস্য এতৌ। নানা বীর্য্যৌ প্রাণোদানৌ কুর্মঃ" ইতি বদন্তঃ। তদু তথা ন কুর্য্যাৎ মোহয়ন্তি হ তে যজমানস্য প্রাণোদানৌ। অপি ইদ্ বৈ এনম্ তুষ্ণীং জুহুয়াৎ।

৪।১।২।১৯।

চরকগণ "প্রাণোদানৌ বৈ অস্ত এতৌ।
নানা বীর্য্যৌ প্রাণোদানৌ কুর্য্যঃ।"

এই দুই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিয়া থাকে। কাহারও পক্ষে এরূপ করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে যজমানের মোহ হইবে। অতএব তুষ্ণী হইয়া হোম করিবে।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

জানকু পাথরের বিদ্রোহ।

ডানবার সাহেব যখন সেরপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট তখন গুমানু সরকার ও উজির সরকার নামক দুই ব্যক্তি বিদ্রোহী প্রজাদিগের দলপতি থাকিয়া প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিতেছিল। এবং কলিকাতা, ঢাকা ও নসিরাবাদে গমন করিয়া আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক জমিদারদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। মিঃ ডানবার গুমানু সরকার ও উজির সরকারের ষড়যন্ত্র বিষয় অবগত হইয়া গুমানু সরকারকে কারারুদ্ধ করেন। গুমানু ঢাকার কমিশনারের নিকট আপীল করে। কমিশনার গুমানুকে মুক্তি প্রদান করেন। গুমানু মুক্তিলাভ করিয়া প্রবাপ্ত উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। বিদ্রোহিগণও তাহার ক্ষমতা ও কার্য্যকারিতা শক্তির প্রতি আস্থাবান হইয়া উঠে। অবসর বুঝিয়া গুমানু নিজ ক্ষমতা ও ডানবারের অক্ষমতা সাধারণকে বুঝাইয়া দেয়। মিঃ ডানবার পুনরায় গুমানুকে ধরিতে চেষ্টা করেন। গুমানু ডানবারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উপযুক্ত পরামর্শ জন্য কলিকাতা চলিয়া গেল। পরগণা কয়েক দিনের জন্য শান্তভাব ধারণ করিল। ডানবার প্রজাসাধারণকে বিদ্রোহভাব পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশ কতক পরিমাণে কার্য্যকরী হইল। সেরপুর নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের বহু প্রজার সহিত জমিদারের কবুলিয়ত ও পাট্টার আদান প্রদান হইয়া গেল। কিন্তু কোন কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণ লইয়াও পলাইয়া আসিতে হইল।

এইরূপে পরগণায় কিয়ৎপরিমাণ শান্তি বিধান করিয়া মিঃ ডানবার ১৮৩২ সনে সেরপুর হইতে চলিয়া আসেন। এবং সেরপুরের কাছারি উঠিয়া যায়।

সেরপুরের কাছারি উঠিয়া গেলে গুমাস্থ ও উজির সরকার তাহাদের উদ্দেশ্য সফলের উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হয় ও পরগণায় পুনরায় বিদ্রোহ-বহ্নি প্রধূমিত করিয়া দেয়।

বিদ্রোহী প্রজাগণ জমিদারের কাছারি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করে; জমিদারের আশ্রিত প্রজাদিগকে উৎপীড়ণ ও তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, এবং জমিদারের বরকন্দাজ, গবর্ণমেণ্টের পিয়ন ও পুলিশকে প্রহার করে। জমিদার বিদ্রোহী প্রজাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। গুমাস্থ সরকার কলিকাতা হইতে একজন আইন ব্যবসায়ীকে লইয়া আসিয়া নসিরাবাদ সহরে থাকিয়া জমিদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালন করিতে থাকে।

গুমাস্থ ও উজির সরকার যখন সেরপুর ত্যাগ করিয়া নসিরাবাদ বাস করিতেছিল, বিদ্রোহীদল তখন জানকু পাথর ও দোবরাজ পাথর নামক দুইজন অধিকতর ভয়ানক লোককে নেতৃত্বে বরণ করিল।

জানকু ও দোবরাজ উভয়ই অসভ্য পার্ব্বত্য ও ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিল। ১৮৩৩ সনের প্রথমভাগে জানকু দোবরাজ বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হয়। এবং বিদ্রোহীদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুইজন দুই দলের পরিচালক হয়। সেরপুরের পশ্চিম কোণে করৈবাড়ী পাহাড়ের পাদদেশে বাটাজুর নামক স্থানে জানকু এবং পূর্ব্বদিকে নালিতাবাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে দোবরাজ আশ্রয় স্থান নির্দ্দেশ করে।

জানকু ও দোবরাজ একযোগে সেরপুর আক্রমণ করে। এবং জমিদারদিগকে উৎখাৎ করিয়া তাহাদিগের গৃহ ও কাছারিবাড়ী লুণ্ঠন করে। জমিদারগণ পরিবার লইয়া স্থানান্তরে যাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। দেখিতে দেখিতে পুলিশ থানা অগ্নিমুখে পতিত হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়া যায়। জমিদারের আশ্রিত প্রজার আর্ত্তনাদে সেরপুর প্রকম্পিত হইয়া উঠে। সেরপুর পুনরায় শ্মশানে পরিণত হয়।

এই সময় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডানবার সাহেব ময়মনসিংহের জেলা মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন। যথাসময়ে সেরপুরের এই ভীষণ কাহিনী ডানবারের কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিলম্বে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিঃ গারেটকে সেরপুরে প্রেরণ করেন। ১লা এপ্রিল গারেট সাহেব সেরপুর পঁহুছিয়া অভয় প্রদানে সকলকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সকলি বৃথা হইল।

বিদ্রোহিগণ গেরেট সাহেবের গৃহ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিল। তাহাকে প্রাণরক্ষার পথ খুঁজিতে হইল। গেরেট নিজ জীবন রক্ষা করিয়া প্রজার জীবন রক্ষার সঙ্কল্পে জমিদারদিগের বরকন্দাজ ও পুলিশের সমবায়ে এক দৃঢ়শক্তি রচনা করিলেন; এবং বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন।

দোবরাজ পাথরের অনুসরণ করিয়া নালিতাবাড়ীর দিকে একদল বরকন্দাজ ও পুলিশ সৈন্য প্রেরিত হইল। দোবরাজ কোম্পানির লোক দেখিয়া গা-ঢাকা দিয়া পাহাড়ে লুক্কায়িত হইয়া পড়িল। পুলিশ ও বরকন্দাজেরা মাসকেটের ফাঁকা আওয়াজেই লড়াই ফতে করিলেন। সে শব্দে পাহাড় ও বনপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইল।

পুলিশ সৈন্য ফাঁকা আওয়াজে রণ জয় করিয়া নালিতাবাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেরপুরে রণজয়বার্ত্তা সমীরণ-বেগে প্রচারিত হইল। মিঃ গেরেট আশ্বস্ত হইলেন। জমিদারদিগের আনন্দের সীমা রহিল না।

জমিদারেরা অবিলম্বে নালিতাবাড়ীতে কাছারি স্থাপন করিতে আদেশ করিয়া লোকজন প্রেরণ করিলেন। কাছারি স্থাপিত হইল এবং বরকন্দাজে কাছারি বাড়ী পরিপূর্ণ রহিল।

কোম্পানির লোকজনের আগমনে কয়েকদিন দোবরাজ লুকায়িত ছিল। অবসর বুঝিয়া হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল। এবার পুলিশ সৈন্য ফাঁকা আওয়াজ করিতেও অবকাশ পাইলেন না। যাহারা পলাইতে পারিলেন তাহারা রক্ষা পাইলেন, আর যাহারা পারিলেন না তাহাদিগকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। একজন পুলিশ জমাদার, একজন বরকন্দাজ, একজন মোহরের ও একজন পিয়নকে দোবরাজ পাথর ধরিয়া লইয়া গেল। সেরপুর জুড়িয়া আতঙ্কের ছায়া পতিত হইল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মিঃ গেরেট জেলা মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিলেন। ২৯শে এপ্রিল মিঃ ডানবার ঢাকার কমিশনার মিঃ মিড্লটনকে সমস্ত বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন; এবং অপরাহ্নে সেরপুর প্রস্থান করিলেন। ডানবার সেরপুরের অবস্থা বিপদসঙ্কুল বোধ করিয়া সেরপুরের সন্নিকটবর্ত্তী আমুদগঞ্জ নামক স্থানে অবস্থান করিয়া রজনীযোগেই সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন ও সকল দিক পর্য্যালোচনা ও বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ জামালপুরের সেনানায়ক মেজর মনডেট নিকট ১৫০ শত সেনা-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পরদিন কাপ্তেন সিল মিঃ ডানবারের সাহায্যার্থে সসৈন্যে

সেরপুরে পঁহুছেন। উভয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বহু পরামর্শ করেন। পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। কাপ্তেন সিল সৈন্যগণকে দুই অংশে বিভক্ত করিলেন। এক অংশ তাহার নিজের অধীনে ও অপর অংশ লেপ্টেনেন্ট ইয়ং হ্যাজবেণ্ডের অধীনে সজ্জিত হইল। কাপ্তেন সিল সদৈন্যে পশ্চিম প্রান্তে জানকু পাথরকে ও লেপ্টেনেন্ট ইয়ং হ্যাজবেণ্ড পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত দোবরাজ পাথরকে আক্রমণ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। অভিযানের ঘটা পড়িয়া গেল।

এ দিকে ইংরেজসৈন্যের আগমনবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। জানকু পাথরের শিবির হইতে ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সমস্ত দিবা-রজনী বন্দুকের অবিরাম ধ্বনিতে জানকু স্বীয় অনুচরবৃন্দের উদ্দেশে সাঙ্কেতিক আহ্বান ঘোষণা করিল। দেখিতে দেখিতে তীর-ধনুকধারী সহস্র সহস্র লোক আসিয়া জানকুর শিবিরে সমবেত হইল।

যথা সময়ে কাপ্তেন সিল অবগত হইলেন যে প্রায় চারি সহস্র সশস্ত্র অনুচর সহ জানকু পাথর ইংরেজ সৈন্যের প্রতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কাপ্তেন সিল অভিযান প্রারম্ভেই ভীত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব পরামর্শ ত্যাগ করিয়া লেপ্টেনেন্ট ইয়ং হ্যাজবেণ্ডকে সৈন্যসহ তাহার সহিত মিলিত হইবার আদেশ করিলেন।

৩রা মে উভয় দলে মিলিত হইয়া আক্রমণের উপায় স্থির করিলেন ও রজনী-যোগে সৈন্য পরিচালনা করিয়া পাহাড়ের নিম্নে মধুপুর নামকস্থানে সৈন্য স্থাপন করিলেন। প্রত্যূষে ব্রিটিশের রণভেরী বাজিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে জানকুর থানস্থান অলঙ্গী আক্রমিত হইল। ইংরেজ সৈন্যের হঠাৎ আক্রমণে বিদ্রোহীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ও পলায়ন করিয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কাপ্তেন সিল প্রথম উদ্যমে কৃতকার্য্য হইয়া লেপ্টেনেন্ট ইয়ং হ্যাজবেণ্ডকে পূর্ব্ব সংকল্প অনুসারে পূর্ব্বাভিমুখে প্রেরণ করিলেন।

৫ই মে কাপ্তেন সিল পাঁহাড়ের অন্তর্গত টোগলা পোড়া নামক স্থান আক্রমণ করেন। ছয় জন বিদ্রোহী ইংরেজ-সৈন্যের হস্তে ধৃত হয়। অবশিষ্ট লোক পলায়ন করে। ৬ই মেঃ রজনীযোগে জানকু পাথরের উদ্দেশে তাহারা আরও অগ্রসর হন কিন্তু জানকুর কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না।

কাপ্তেন সিল অতঃপর তাঁহার সৈন্যদলকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। একদল জমাদারের অধীনে পাহাড়ের দিকে পশ্চিমাভিমুখে, আর একদল, একজন দারোগার অধীনে পূর্ব্ব দিকে অভিযান করিতে আদিষ্ট হইল। সিল্ স্বয়ং তৃতীয়

দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জমাদার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়াই দুইশত বিপক্ষীয় সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। শত্রুপক্ষীয়েরা সত্বর তাহাদের দল পুষ্ট করিয়া লোকসংখ্যা ছয় সাত শতে পরিণত করিল; কিন্তু তাহাদের দলপতি সঙ্গে না থাকায় তাহারা কেবল আত্মরক্ষায়ই যত্নবান রহিল। এ দিকে জমাদারও তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয় করিতে না পারিয়া সৈন্যদিগকে অভিযান বন্ধ রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন। দারোগার অনুসন্ধানে লোক প্রেরিত হইল। অচিরাৎ দারোগা সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহীদল হতাশ হইয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

৮ই মে সিল পুনরায় জলঙ্গীর বিদোহীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু তাহারা বিপক্ষের দুরভিসন্ধি পূর্ব্বাহ্ণেই অবগত হইতে পারিয়া গা-ঢাকা দেয়। যখন ইংরেজ-সেনা শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল তখন প্রায় শতাধিক বিদ্রোহী একযোগে ইংরেজ সৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল কিন্তু সহসা অতিরিক্ত ইংরেজসৈন্য উপস্থিত হওয়ায় বিদ্রোহীদল প্রস্থান করিল।

ইংরেজসৈন্য এইরূপে বিদ্রোহ-দমনে অকৃতকার্য্য হইলে, কাপ্তেন সিল এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন; জানকু পাথর ও অন্যান্য প্রধান সর্দ্দার-দিগের আবাসস্থানে অগ্নি প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। যাহারা জানকুর পক্ষ সমর্থন করিবে তাহাদিগকেও ঐ প্রকার দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইল। কাপ্তেন সিলের চেষ্টা ফলবতী হইল। ১০ই মে পাঁচ জন বিখ্যাত সর্দ্দার সহ বহুসংখ্যক বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিল। ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ১৩ই মে আরও বহুসংখ্যক বিদ্রোহী বশ্যতা স্বীকার করিল এবং জানকু পাথরকে ধরিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। ঐ তারিখে কালভদ্র ও পণ্ডিত মণ্ডল নামক দুইজন সর্দ্দার তাহাদের অনুচরগণ সহ ধৃত হইল। এইরূপে দল ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে দেখিয়া জানকু দোবরাজের সহিত মিলিত হইবার জন্য পূর্ব্বদিকে ধাবিত হইল। কাপ্তেন সিল জানকুকে পরাভূত করিয়া ১৯শে এপ্রিল সসৈন্যে সেরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

৭ই মে লেপ্টেনেণ্ট ইয়ং হাজবেও সসৈন্যে নালিতাবাড়ী আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। পথিমধ্যে তিনি প্রায় ৬০০।৭০০ বিদ্রোহীদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উভয় দল নিকটবর্ত্তী হইলে বিদ্রোহিগণ ভীত হইয়া পলায়ন

কয়ে। ইয়ং হ্যাজবেণ্ড নালিতাবাড়ী পঁহুছিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, পাহাড়-অভ্যন্তরে তাহাদের অতি সুদৃঢ় এক দুর্গ আছে। তিনি পরদিন রাত্রিযোগে ঐ দুর্গ আক্রমণ করিতে অভিযান করিলেন। অভিযান বিফল হইল; তিনি বহু অনুসন্ধানেও সেই দুর্গের অবস্থান নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইলেন। প্রত্যাগমনকালে বহুসংখ্যক বিদ্রোহী ইয়ং হ্যাজবেণ্ডকে আক্রমণ করিল এইস্থানে বিদ্রোহিগণের সহিত ইয়ং হ্যাজবেণ্ডের শক্তি পরীক্ষা হইল। ইংরেজের বন্দুকের মুখে বিদ্রোহিগণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা পশ্চাৎ হটিয়া পড়িল; ইয়ং হ্যাজবেণ্ড তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে করিতে দোবরাজের দুর্ভেদ্য বাসস্থান আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন। দোবরাজের গৃহে জমাদার, বরকন্দাজ, মোহরের ও পিয়ন প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হইয়াও ইয়ং হ্যাজবেণ্ড জমাদার ব্যতীত অন্য কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহিগণ নিমিষ মধ্যে বন্দীদিগকে লইয়া স্থানান্তরে সরিয়া পড়িল। অনন্যোপায় হইয়া ইয়ং হাজবেণ্ড দোবরাজের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। গৃহ ভস্মে পরিণত হইল।

লেপ্টেনেণ্ট ইয়ং হ্যাজবেণ্ড প্রত্যহ নালিতাবাড়ী ও হালোয়াঘাটের চতুর্দ্দিকে প্রায় ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া বিদ্রোহীদিগকে উৎখাত করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহীদল কোথাও সমবেত হইলেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন। এইরূপ অবিশ্রান্ত আক্রমণে বিদ্রোহীদল ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ১৩ই মে অনেকেই আত্মসমর্পণ করিল; এবং দোবরাজকে ধরিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

এইরূপে পুর্ব্বদিগের দলপতিগণ বশ্যতা স্বীকার করিলে ইয়ং হ্যাজবেণ্ড ২৫ জন সৈন্য নালিতাবাড়ীতে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সহ সেরপুর পঁহুছিলেন।

২০শে মে কাপ্তেন সিল অধিকাংশ সৈন্যসহ জামালপুর পঁহুছিলেন। ইয়ং হ্যাজবেণ্ড কতক সৈন্য সহ কিছুদিনের জন্য সেরপুর রহিলেন। ৩১শে মে ইয়ং হ্যাজবেণ্ডও অবশিষ্ট সৈন্য সহ জামালপুর চলিয়া গেলেন। জুন মাসের প্রারম্ভে প্রায় সমস্ত সর্দ্দারগণই অধীনতা স্বীকার করিয়া শান্তির প্রয়াসী হইল। সেরপুরে শান্তি স্থাপিত হইল।

জানকু ও দোবরাজের আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

"হিন্দুসমাজের" প্রতিবাদ।

বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠমাসের "আরতি"তে পূজ্যপাদ দুর্গাদাস ঠাকুর মহাশয়ের "হিন্দু-সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা অতীব মুগ্ধ হইয়াছি। প্রবন্ধের ভাষা মার্জ্জিত এবং প্রসাদ গুণোপেত ও প্রাঞ্জল। এরূপ বিশুদ্ধ পদ-কদম্বক সুশ্লিষ্ট প্রবন্ধ প্রণয়ন অনল্প প্রশংসার বিষয়। যুক্তি প্রদর্শন পদ্ধতিও সরল এবং অতীব মনোহর। কিন্তু—

ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ

সকলের রুচি এক নয়, কেহ স্বাদু মিষ্ট প্রিয়, কেহ বা তিক্ত প্রণয়ী। তজ্জন্য আমরা প্রবন্ধের সর্ব্বত্র ঠাকুর মহাশয়ের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারিলাম না। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি জগতে প্রাচীনতম। হিন্দুই জগতের সমুদায় সভ্যজাতির শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু, একদিন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের মানববৃন্দ আমাদের এই অধঃপতিত ভারতে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট জ্ঞানশিক্ষা করিয়া গিয়াছেন। মনু বলিতেছেন :—

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্র-জন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্ব মানবাঃ॥ ২০—২ অঃ

একদিন সমুদায় জগৎ বিশেষতঃ ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার অধিকাংশ ভূমি ভারতীয় হিন্দুসন্তানদ্বারা সমাক্রান্ত ও অধ্যুষিত হইয়াছিল। হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম যাইয়া তত্তদ্দেশে প্রসর গ্রহণ করে। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহাও বিশ্বাস করি যে, সেই পবিত্রাদপি পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুর সদাচার ও হিন্দুর বিনয়সৌজন্য আবার সমগ্র ভূমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িবে। হিন্দুধর্ম্মের জয় বৈজয়ন্তী সর্ব্বত্র সমুড্ডীন হইয়া উৎপথগামীদিগকে সুপথে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবে, জগৎ হইতে পরস্বাপহরণ, দস্যুতা, নরহত্যাদি চলিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগকে অতীব সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুত্ব ও বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম অদোষসন্দুষ্ট নহে। ইহার এখন সম্যক্ সংস্কার ও পরিমার্জ্জন, পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"দেশ কাল পাত্র ও প্রয়োজনানুসারে হিন্দুসমাজের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া থাকিলেও যাহাতে মূলধর্ম্মের কোন হানি না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধীরভাবে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।"

বেশ বুঝা গেল, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের কতকগুলি বিষয়ের সংস্কার সর্ব্ববাদি-

সম্মত। যদি এ বিষয়ে পূজনীয় ঠাকুর মহাশয়ের মত আমাদিগের মতের পরিপন্থী না হয়, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এখন যে বর্ব্বরতামূলক বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে তাহার উচ্ছেদ সাধন করা কর্ত্তব্য কি না ? বাল্য-বিবাহের ফলে হিন্দুসমাজে অসংখ্য বালবিধবার সঞ্চার ঘটিয়া সমাজকে এক ভীষণ অগ্নিকুণ্ড ও মহানরকে পরিণত করিতেছে। কৃতদার ছাত্রগণের পরকালের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মহা সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। দেশের কল্যাণার্থিগণের ইহার প্রতিবিধানে যত্নপরায়ণ হওয়া উচিত কি না? শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—

অজ্ঞাত পতি মর্য্যাদাং অজ্ঞাত পতিসেবনাং।
নো দ্বাহয়েৎ পিতা বালাং অজ্ঞাত ধর্ম্মশাসনাং॥

পিতা কখন অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদা, অজ্ঞাতপতিসেবা ও অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনা বালিকার বিবাহ দিবেন না। অবশ্য তর্ক হইতে পারে, তাহাতে হানি কি ? হানি—অনন্ত। "আমার বিবাহ হইয়াছে" এ কথা যার মনে জাগে, তাহার বিদ্যাভ্যাস হয় না। এবং অসময়ে অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে অপক্ক বীজ উপ্ত হইয়া মন্দ ফল প্রসব করিয়া থাকে। মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—

উন ষোড়শ বর্ষীয়া মপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥ শারীরস্থান।

যদি ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীতে পঞ্চবিংশতি বর্ষের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ গর্ভাধান করে, তবে সে সন্তান গর্ভেই মারা যায়। অথবা জন্মিলেও অধিক দিন জীবিত থাকে না, জীবিত থাকিলেও অতি দুর্ব্বল হইয়া সকল কর্ম্মের অযোগ্য হয়, তাহার জন্ম বিফল হইয়া যায়। অতএব মানুষ কখনই অল্প বয়সে অল্পবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান করিবে না। মানুষ কি জন্যে বিবাহ করে ?

"প্রজায়ৈ গৃহ মেধিনাং"

বিবাহ হইলে সন্তান হইবে, সেই সন্তান বংশ রক্ষা করিবে। কিন্তু যে সময়ে কন্যাগণ অনাগতরজস্কা থাকে, তখন তাহাতে গর্ভাধান করা যায় না, সুতরাং নারী যত দিন প্রাপ্তবয়স্কা না হয়, ততদিন তাহাদের বিবাহ হওয়া অনুচিত। "মানুষ বালিকা বিবাহ করুক কিন্তু ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে যেন স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর মিলিত না হয়", অনেকে এই কথা বলিয়া থাকেন কিন্তু আমরা জানি

কার্য্যতঃ এ কথা প্রতিপালিত হয় না। যে দিন বিবাহ হয় সেই মুহূর্ত্ত হইতে অনৈসর্গিক উপগতিদ্বারা নবদম্পতি যৌবন সমাগমের পূর্ব্বেই জরসাধিনা বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যের বাহির হইয়া যায়। সুতরাং যে বাল্যবিবাহ সমাজের সর্ব্বনাশকর ও অতি বর্ব্বরতামূলক, সমাজের কল্যাণার্থে উহার উচ্ছেদ সাধন করা কর্ত্তব্য কি না? যাঁহারা এই বৈধ নির্দ্দেশে উপেক্ষা করিয়া সমাজে বাল্য-বিবাহের প্রচলন হইতে দেন তাঁহারা ঈশ্বর, রাজা ও সমাজের নিকট প্রত্যবায়ী বটেন কি না? বাল্য-বিবাহের দোষ কেবল ইহাই নহে, ঠাকুর মহাশয় এ হেন নিঘৃণ বাল্য-বিবাহ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া, যৌবন-বিবাহের পক্ষপাতী হইতে প্রস্তুত আছেন কি না?

ঠাকুর মহাশয় দেশের কুপ্রথা প্রভৃতির যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছেন, তন্মধ্যে আমরা বাল-বিধবার পুনর্বিবাহও একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করি। এ বিষয়ে ঠাকুর মহাশয়ের অভিমত কি? বিধবা বিবাহ না দেওয়াতে সমাজে যে ঘোরতর বিপ্লব ঘটিতেছে, ঠাকুর মহাশয় তাহা স্বীকার করেন কি না? শাস্ত্রকারেরাই বলিয়াছেন—এই ঘোর কলিকালে পাপ বার আনা, পুণ্য চারি আনা। নরনারী সকলেই পাপকর্ম্মরত হইবে। সত্য, ত্রেতাদিযুগে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনীয় হইলেও এ পাপ কলিযুগে কখনই উহা অবলম্ব্য হইতে পারে না। কৃতদার, অকৃতদার পুরুষ ও সধবা নারীগণ পর্য্যন্ত এ ঘোর কলিকালে পবিত্র থাকিতে পারিবে না, আর বাল-বিধবাগণ-ই একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য লইয়া বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, আমার বোধ হয়, এ দুরাশা কাহার মনে না জাগাই কর্ত্তব্য। ভূষণ্ডী কাককে জিজ্ঞাসা করিলেও সে সত্য ত্রেতাদিযুগেও ব্যভিচার থাকার অনুকূলে সাক্ষ্যদান করিবে। সেই সকল পুণ্যের যুগে পর্য্যন্ত বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, অথচ যে যুগে পাপের ভাগ-ই বেশী সেই ঘোর কলিযুগে বিধবাগণ পবিত্র থাকিবে, ইহা দুরাশাবিশেষ নহে কি? আমরাও কি দেখিতেছি না যে দেশের বিধবাগণের মধ্যে শতকরা ২০ জনও প্রকৃত সাধ্বী আছেন কি না। ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য যে সকল মহাপাপ, সমাজকে নিয়ত ক্ষত বিক্ষত করিতেছে উহার নিবারণ জন্য মন্দের ভাল বিধবা বিবাহ দেওয়া নিতান্তই কর্ত্তব্য নয় কি? কোন গৃহের একটী বিধবার চরিত্র কলুষিত হইলে, সেই বাটীর অন্যান্য নরনারী ও প্রতিবেশিগণ যে উহার বিষময় ফল ভোগ করিয়া থাকেন উহার প্রশমন জন্যও বিধবা-বিবাহ-প্রথার পুনঃ প্রচলন অতীব কর্ত্তব্য। আমার দৃঢ়তর

বিশ্বাস যখন বেদাদিতে যৌবন-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহের সম্পূর্ণ বিধি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে, তখন বিদ্যাপারদৃশ্বা ঠাকুর মহাশয় কখনই বাল্য-বিবাহের প্রতিষেধ ও বিধবা-বিবাহের প্রচলন বিষয়ে প্রতিকূলাচরণ করিবেন না। আমরা কি আশা করিতে অধিকারী হইব যে, পূজনীয় ঠাকুর মহাশয় আমাদের বৈধ মতের সমর্থন করিবেন? বেদ যৌবন-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহের অনুকূল; মনু প্রভৃতি জগন্মান্য ঋষিগণও যৌবন-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহের সম্পূর্ণ অপরিপন্থী। সুতরাং যাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বেদ ও মনু মান্য করিয়া চলাই উচিত, কি তাঁহারা বর্ব্বর দেশাচারের দাস হইয়া বেদ ও মন্বাদির পবিত্র বিধি পদ-বিদলিত করিবেন, ইহাই কর্ত্তব্য।

আমরা ভূয়োদর্শন বলে ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, আমাদের পক্ষে এখন আর গৃহকোণে কূপ-মণ্ডূক হইয়া বসিয়া থাকিয়া পরের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নহে। আমাদের আর কি আছে? আমরা অন্ন, বস্ত্র, লাঙ্গল, কোদাল, কাঁস্তে, কাঁচি, ছুঁচ, দেশলাই যত কিছু বস্তুর নিমিত্তই পরানুগ্রহ-প্রত্যাশী? তজ্জন্যই আমাদের দরিদ্রতা, তজ্জন্যই আমাদের সর্ব্বশূন্যতা এবং তজ্জন্যই আমাদের এ সর্ব্ববিষয়ক অভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খল ও দুরবস্থা। বিদেশীয়গণ না দিলে আমাদের না চলে আহার, না চলে বিহার, না চলে শয়ন ও না চলে উপবেশন! সুতরাং আমাদিগের এখন কর্ত্তব্য কি? আমাদের এখন কর্ত্তব্য—আমরা জাপানী প্রভৃতির ন্যায় দেশদেশান্তরে যাইয়া শিল্প শিক্ষা করি। শিল্প শিক্ষা করিয়া তৎসাহায্যে বাণিজ্যের প্রচলন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করি ও সর্ব্বপ্রকার অভাবকে দূরে নির্ব্বাসন করিয়া সুখী হই।

আমাদের বিদেশগমনের ইহা অপেক্ষাও আর একটী মহোদ্দেশ্য—জ্ঞান শিক্ষা। পূর্ব্বে আমরা ভারতাগত বৈদেশিকগণের শিক্ষাগুরু ছিলাম কিন্তু চক্রনেমির পরিবর্ত্তনে এইক্ষণ আমাদিগকে সেই ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদিগের দেশে যাইয়া ছাত্রত্ব স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্যগণ, এমন কি সে দিনের অসভ্য জাপান পর্য্যন্ত এখন আমাদের গুরুর আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। সুতরাং যাহাতে আমরা বিদেশ গমন পূর্ব্বক আবার আধুনিক শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্যাদি শিক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইয়া আত্মসন্মান রক্ষা ও সামাজিক সর্ব্ববিধ দুর্গতি দূর করিতে পারি সে চেষ্টা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অবশ্য মহামতি ঠাকুর মহাশয় বলিবেন ইহাতে আমাদের মূল ধর্ম্মের ভিত্তি বিশ্লিষ্ট হইবে। কিন্তু আমরা তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে করি না। কেন না

পৌরাণিকগণ সমুদ্রগামীদিগকে বিপন্ন হইতে দেখিয়া সমুদ্রযাত্রার প্রতিষেধ করিলেও মনু উহার প্রতিষেধ করেন নাই। মনু বলিয়াছেন—

সমুদ্র যান কুশলা দেশকার্য্যার্থ দর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥ ১৫৭—৮ অ

শকটের অধিকারী কিরূপ ভাড়া পাইবে? তজ্জন্য মনু বলিতেছেন সমুদ্রগমন-কুশল ও দেশকার্য্যার্থিদর্শী বণিগ্‌গণ, শকটের যে ভাড়া ঠিক করিয়া দিবেন শকটাধিকারী তাহাই পাইবে।

তবেই বুঝা গেল পূর্ব্বে বণিকেরা সমুদ্রপথে দেশ দেশান্তরে যাইয়া বাণিজ্য করিতেন। সুতরাং এ কালের বিদ্যার্থিগণ ও শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ী জন সমূহ সমুদ্রপথে বিদেশে যাইয়া বিদ্যাশিক্ষা ও বাণিজ্যাদি করিবেন, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য নহে। অবশ্য তর্ক হইবে, বিদেশগামী যুবকগণ বিদেশে যাইয়া ম্লেচ্ছ যবনাদির অন্ন ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা বলিব—

সর্ব্ব মদৃষ্টং শুচি

যখন ইহার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী নাই, অনুমানই যখন ইহার একমাত্র নিয়ামক তখন কি আমাদের দেশের উন্নতির পদে কুঠারাঘাত করিয়া এই বাতাসের গলায় দড়ি দিয়া আমাদের ঝগড়া করা কর্ত্তব্য? এই যে শত শত যুবক, বিদেশ হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ভারতে আসিয়া বড় বড় উচ্চপদে সমাসীন হইয়া আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন আমরা কি প্রশান্ত মনে উহার অনুমোদন না করিয়া তাহার পরিপন্থী হইব? ঠাকুর মহাশয় মনে করিবেন এখন দেশের রাজা হিন্দু নন্, দেশে থাকিয়া এখন আর ব্রহ্মচর্য্য করার কাল নাই। এখন বিলাতী চতুষ্পাঠীতে ব্রহ্মচারী না হইলে আমরা কিছুতেই আর অত্যুন্নত বৈদেশিক-গণের সমকক্ষ হইতে পারিব না। অবশ্য আমরা ঘরে বসিয়া ঈশ্বরের নাম জপ করিতে পারি বটে, কিন্তু জপমালা, অন্ন বস্ত্র প্রসব করে না দেশের অভাব মোচনের পথও উন্মুক্ত করিয়া দেয় না। ফলতঃ কি বিদ্যাশিক্ষা, কি শিল্প, কি বাণিজ্য সর্ব্ব বিষয়েই আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী সুতরাং বিদেশগমন ভিন্ন আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। সুতরাং আমাদিগের স্বদেশবাসী মনীষিগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশবাসীদিগের ন্যায় উদারতা অবলম্বন পূর্ব্বক দেশের কল্যাণের নিমিত্ত সমুদ্রপথে বিদেশগামীদিগকে সমাজে স্থান দান করেন।

দেশের দুরবস্থার অপনয়ন ও কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত আমাদিগের এই উদারতার আশ্রয় গ্রহণ করা অতি কর্ত্তব্য। ইহাতে হিন্দুর ধর্ম্মে কোন আঘাত

লাগিবে না, হিন্দুর সমাজ ও বিশ্লিষ্ট হইবে না। কত শত শত হিন্দু সন্তান লঙ্কা, অষ্ট্রেলিয়া, মরিসস্ ও সুমাত্রা দ্বীপে যাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছেন তাঁহারা কি স্ব স্ব দেশীয় হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন? মানিয়া লইলাম বিদেশগামীগণ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ কি কালের এই চলৎ স্রোতকে ক্ষুদ্র বালির বন্ধনে বান্ধিয়া রাখিতে পারিবেন? দেশে থাকিয়া ও গৃহে বসিয়াও কি শত শত ধনী দরিদ্র সকলের জীবন্ত চক্ষের উপর এই সকল ব্যভিচার করিতেছেন না? যাঁহারা দেশে থাকিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই কুকার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের উদরপূর্ত্তি ও রসনার তৃপ্তি ভিন্ন বাহ্যজগৎ বা স্বদেশের কোন মঙ্গলই সাধিত হইতেছে না। পক্ষান্তরে যাঁহারা বিলাত যাইয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেছেন তাঁহারা দেশের জন্য বহু অমূল্য বস্তু লইয়া আসিতেছেন। বিলাতগামীগণ দেশের মহারত্ন বিশেষ, কালে ইঁহাদের দ্বারাই ভারতের এক মুখ্য সম্প্রদায়ের গঠন হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং আমাদিগের অতি কর্ত্তব্য যে আমরা তাঁহাদিগকে সমাজে স্থান দান করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করি ও দেশের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখি। কিন্তু আমরা কি করিতেছি, যাঁহারা কেবল পেটের জন্য অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া জাতি দিতেছেন তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া আপন জাতির বিধ্বংস ঘটাইতেছি আর যাঁহারা দেশের প্রকৃত মুখপাত্র ও মঙ্গলভূমি তাঁহাদিগকে সমাজ-নিষ্কাশিত করিয়া দেশের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছি। দেশে বসিয়া বহুলোকে যে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেছেন ইহা কি পরিজ্ঞাত সত্য নহে? আমরা কি জানিয়া শুনিয়াই সেই সকল লোকদিগকে সমাজে রাখিয়া দিতেছি না? যদি তাহাতে সেই পরম্পরাগত যবনান্ন ভক্ষণ পাপে আমাদের হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি বিশ্লিষ্ট না হয় তাহা হইলে বিলাতগামীদিগের সংশ্রব দ্বারা কেন ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিবে? যদি কেহ বলেন যে, আমরা দেশের কোন ধনী দরিদ্রকে অভক্ষ্য ভক্ষণকারী বলিয়া জানি না তাহা হইলে সামাজিকগণ কি তাঁহাদিগকে সত্যাপলাপী বলিয়া ঘৃণা করিবেন না? যদি কেহ বলেন যে, আমরা অভক্ষ্য ভক্ষণকারী আমাদের পুত্র পৌত্র জামাই বেহাই ও ভাই ভাগিনেয়দিগকে লইয়া ভোজ্যান্নতা করি না, তবে কি তিনি অন্তর্য্যামী ভগবানের নিকট অনৃতভাষী বলিয়া দণ্ডিত হইবেন না? আমরা তাই বলি যখন আমরা কাল মাহাত্ম্যে পড়িয়া এতদূর উদারই হইয়াছি তখন আমরা কেন বিলাতগামী দেশের সুসন্তানদিগকে প্রেমালিঙ্গন দানে বৈমুখ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি? ভারতজাত অভক্ষ্য

বস্তু অনবদ্য আর বিলাতী অভক্ষ্য বস্তু ম্লকারজনক? আমরা মনে করি যখন সংস্কার ও পরিবর্ত্তন এখন দরকারী হইয়া পড়িয়াছে ঠাকুর মহাশয়ও যখন তাহার অপক্ষপাতী নহেন তখন আমাদের বাল্য-বিবাহ প্রতিষেধ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বিলাত গমনের অনুমোদন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার একটী কার্য্যও ধর্ম্মভ্রংশকর নহে।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত

কেন এত দ্বেষ ?

কেন এত দ্বন্দ্ব নাথ ভক্তের সভায় ?
হিন্দুর মন্দিরে অই,　পূজা করে "ব্রহ্মময়ী"
"ব্রহ্ম" বলে ব্রাহ্ম ভাসে নয়ন ধারায় ;
তোমারি চরণ তরে　উভয়েই আশ করে,
তবে কেন এত দ্বেষ হ'য়ে দেখা যায় ?
একের শঙ্খটী হেরি,　অপরে ভ্রুকুটি করি
তোমার প্রীতির তরে হারমোনি বাজায়।
হায় রে বোঝে না তারা　ভ্রান্তি মদে দিশাহারা
শঙ্খধ্বনি হারমোনি তোমারে (ই) শুনায়।

গোপাল ও মেষপালে　নাহি ভেদ কোন কালে,
উভয়ে রাখালরাজ দীপ্ত প্রতিভায়।
এ রহস্য বুঝা ভার,　তবু দোষে অনিবার—
খৃষ্ট-শিষ্য কৃষ্ট-শিষ্য-পৌত্তলিকতায়।
"আল্লা" "আল্লা" "যীশু"ধ্বনি　মজিদে গির্জ্জায় শুনি,
আমি জানি হ'য়ে ডাকে এক দেবতায়।
তারা কিন্তু দেখা হলে'　একে অন্যে ভ্রান্ত বলে,
মল্লযুদ্ধে রত হয় পাদ্রি ও মোল্লায়।

মাটীতে তিলক কাটি,　নামছাপা গায়ে আঁটি
আমি ভাবি পরিপাটী আমারে দেখায়,

দেখিলে তাঁ'দিগেভাই, ঘৃণার অবধি নাই,
বোঝে না মাটীর দেহ মাটীতে মিশায়।
নিত্য আমি উষাকালে সন্ত ফোটা পুষ্পদলে
তুলে আনি কুতূহলে প্রাণ যত চায়—
(সন্ত ফুলে তব হাসি তাইত না তুলি বাসি)
আকুল অঞ্জলি দিতে যদি হই হায়!
দেখিলে যীশুর চেলা, করে কত অবহেলা,
দিবা নিশি নিন্দে কত অকথ্য ভাষায়।
তারা বলে ফুল ছাড়, মন দিয়া পূজা কর,
ফুল দূর্ব্বা নাহি লাগে তোমার পূজায়।
আমি যে কুসুম থরে, নাহি গাঁথি মন-তারে,
না দেই ভক্তির গন্ধ, কিসে বুঝা যায়?
মনটী সৃজন যাঁর, ফুলও ত গড়া তাঁর,
তাঁরি যদি, কেন বাধা অর্পিতে তাঁহায়?
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে কি ধন তোদের আছে
নিজস্ব বলিয়ে যাহা দিতে চাস্ পায়?

শতধারে শতনদী, বয়ে যায় নিরবধি
অবশেষে সবে এক সাগরে মিশায়।
শতনামে শতভাষা, একেরি করে সম্ভাষা.
শতনামে প্রাণারাম গীত বসুধায়।
অভেদ হরি ও হর বিদিত এ চরাচর
রাম শ্যাম একজন কি সন্দেহ তায়?
এক মেঘ শতরূপে, সরিৎ সাগরে কূপে
শিশিরে তুষারে রাজে নিখিল ধরায়।
যে তেজ রবির করে বিশ্ব জ্যোতির্ম্ময় করে,
সে তেজ নিশিতে হের চারু চন্দ্রিকায়।
সে তেজে তারকা জ্বলে অনন্ত গগন তলে,
সে তেজ বিরাজে ক্ষুদ্র প্রদীপ শিখায়।
যেই খোদা সেই গড়, যেই গির্জ্জা সেই মঠ

দু'য়ে এক, একে দুই পূর্ণ মহিমায়।
অনর্থক ভক্তগণে, দ্বন্দ্ব করে প্রাণপণে
বহুরূপী-রূপ লয়ে বিবাদ বাধায়।

শ্রীমনোমোহন সেন গুপ্ত।

গো-দুগ্ধ।

৪

নানা প্রকার খোল (খৈল) এবং সিদ্ধকরা শস্যদ্বারা প্রস্তুত খাদ্য গো-দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণবৃদ্ধিকারক। মটর এবং বীনের (একপ্রকার বিলাতী সীম্) সারভাগ অত্যন্ত অধিক; ইহাও দুগ্ধের গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মাকু খাইলেও গাভীর দুগ্ধের গুণ এবং পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। তিসি দুগ্ধ বৃদ্ধিকর। তুলার বীজ এবং তালশাসে প্রস্তুত খাদ্য (Palm neet meal) দুগ্ধ ও নবনীত বৃদ্ধিকারক। এ গুলি সেবনে নবনীতে সুগন্ধও হয়।

গম, যব প্রভৃতি শস্যের ভূষি ও ভূষা এবং তিসি প্রভৃতি স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত) পদার্থের খোল গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক। যে কোনও শস্যের খোলই হউক তাহা বেশ বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র হওয়া চাই, নতুবা অনিষ্টকারক হয়।

সাধারণ মন্তব্য:—গাভীর খাদ্যাদি হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইলে এবং গাভীকে স্থানান্তরিত করিলে তাহার দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং দুগ্ধেরও গুণহানি হয়।

লবণ গাভীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ; ইহাতে তাহার স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণবৃদ্ধি হয়। পরিষ্কৃত জল গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে, অতএব গাভীকে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য; অপরিষ্কৃত জলপানে গাভীর স্বাস্থ্যহানি এবং দুগ্ধের গুণহীনতা ঘটে।

অধুনা দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক আয়ুর্ব্বেদোক্ত দ্রব্যগুলির বিষয় কথিত হইতেছে যদিও ঐ সমস্ত নারী-দুগ্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের কতকগুলি উপযুক্ত মাত্রায়, অবস্থা বিবেচনা করতঃ ব্যবহার করাইলে গবাদিরও দুগ্ধ বৃদ্ধি হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে :—

সীধু ব্যতীত অন্য সমস্ত মদ্য, গ্রাম্য, আনূপ (জলযুক্ত স্থান) ও জলজ যাবতীয় শাক, ধান্য ও মাংস (গবাদির পক্ষে মাংস নিষিদ্ধ) এবং মধুরাম্লরস-যুক্ত সমস্ত আহার্য্য পদার্থ, বট ও উডুম্বারাদি (ডুমুর), ক্ষীরিনী ঔষধি সকল (বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, আকন্দ, শসা (সোমলতা প্রভৃতি), দুগ্ধপান, শ্রমরাহিত্য এবং বেণা (বিন্না,) ষষ্টিকধান্য, শালি (শালিধান্য অথবা কালজীরা), ইক্ষু বালিকমূল (খাগড়ামূল ও পত্রাদি বুঝিতে হইবে) দর্ভ (উলুবন), কুশ, কাশ (কেশেন) গুন্দ্রা (শর তৃণ বা মুথা) ইৎকট (ইকড়া বন,) ও ইহাদের মূলের কাথ (নারীর পক্ষে) দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক। ইক্ষু ও মাষপর্ণী (মাষানী বা মাষ কলায়ের গাছ) দুগ্ধ বৃদ্ধিকর, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

দুগ্ধ বৃদ্ধি করার উপায় ভাবপ্রকাশে নিম্ন লিখিত মত কথিত হইয়াছে :—

স্তন্য বৃদ্ধির উপায় কথিত হইতেছে—শালি, (শালিধান্য) ষষ্টিক ধান্য (ষটে ধান), গোধুম, মাংস ও ক্ষুদ্র মৎস্য (গবাদির পক্ষে মৎস্য মাংসাদি নিষিদ্ধ), কলশাক, অলাবু, নারিকেল, কেশুর, পানিফল ; শতাবরী (শতমূলী) ভুঁইকুমড়া ও রসুন, এই সকল ভক্ষণ করিলে স্ত্রীদিগের স্তন্য অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কলমধান্যের চা'ল চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে স্ত্রী তরুণী হয়, এবং দুগ্ধভরে তাহার স্তনযুগল উচ্চ হয়। কলমধান্য "কলি" নামে বিখ্যাত ; ইহা বৃহৎ হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়ে জন্মিয়া থাকে। কাশ্মীর দেশে ইহা "মহাতণ্ডুল" নামে কথিত হইয়া থাকে। ভুঁইকুমড়া চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলেও অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

সুশ্রুত সংহিতায় কথিত হইয়াছে :—

ক্রোধ, শোক ও বাৎসল্যাভাব হেতুও স্ত্রীদিগের স্তন্য নাশ হয় ; তাহা বৃদ্ধি করার জন্য স্ত্রীদিগের মনের স্বাস্থ্য উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে, যব, গোধুম শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, মাংস রস (গবাদির পক্ষে নিষিদ্ধ), সুরা, সৌবীরক (কাঞ্জি), পিণ্যাক (তিল পিষ্ট) রসুন, মৎস্য (গবাদির জন্য অব্যবস্থা), কেশুর, শৃঙ্গাটক (পানিফল), নালিকা (মাফলা, কলমিশাক) অলাবু, কালশাক প্রভৃতি ভক্ষণ করাইবে।

গব্যদুগ্ধ বৃদ্ধি করার উপায় সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে কথিত হইয়াছে :—

অশ্বগন্ধা ও তিলের সহিত নবনীত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করাইলে গাভী সকল দুগ্ধবতী হয়।

মসূরের (মসূরির দাইল) সহিত শালিবীজ (কালজীরা) মিশ্রিত করিয়া দধি বা ঘোলের সহিত পান করাইলে গো ও মহিষের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় এবং ষণ্ডাদিরও উপকার হয়।

গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি করার আরও কয়েকটী উপায় কথিত হইতেছে। ভাতের ফেন, যবচূর্ণ, কচিঘাস গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক। চাল ও অলাবু একত্র সিদ্ধ করিয়া গাভীকে খাইতে দিলে তাহার দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু প্রত্যহ ব্যবহার করান উচিত নহে। অর্দ্ধসের মাষ কলাই, অর্দ্ধসের ভাতের মাড়, এক ছটাক লবণ, একপোয়া লালী গুড় এবং একতোলা পিপুল চূর্ণ একত্র মিলাইয়া খাইতে দিলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। গাভীর অবস্থা ও বয়স ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপরোক্ত দ্রব্যাদির মাত্রার ইতর বিশেষ করিতে হইবে। বাঁশের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে অর্দ্ধ ছটাক জোয়ান (যমানী) চূর্ণ এবং অর্দ্ধ পোয়া আঁকের গুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। ২।৪টী এরণ্ড পত্র সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে সে গুলি গাভীর ওলানে একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা জড়াইয়া রাখিলে এবং অল্পক্ষণ পরে সে গুলি ফেলিয়া দিয়া গাভীকে দোহন করিলে অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে।

বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে দুগ্ধাভাবের কারণ ও তাহার বিষম পরিণাম।

যে ভারতবর্ষ এক সময়ে লক্ষ্মীর লীলা-নিকেতন বলিয়া ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিল এবং যে দেশে দুগ্ধ ও তজ্জাত নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী সহজলভ্য ও অপর্য্যাপ্ত ছিল, সে খানে অধুনা দুগ্ধাদি এত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইল কেন? আমাদের বিবেচনায় গো-জাতির লোপাপত্তি ও অবনতিই এই শোচনীয় অবস্থার একমাত্র কারণ।

ভারতবর্ষে গবাদির কি প্রকার অল্পতা হইয়াছে, তাহা পশ্চাল্লিখিত বিবরণ হইতে সবিশেষ উপলব্ধ হইবে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া দেশে ১১ কোটি, ৩৫ লক্ষ, ৫০ হাজার, ৮শত ১১টী গো, মহিষ, মেষ, ছাগ প্রভৃতি দুগ্ধদাত্রী প্রাণী বর্ত্তমান ছিল, এবং সেই বৎসরে ভারতবর্ষে,—এই আসমুদ্র হিমাচল মহাদেশে—৯ কোটি, ৭৫ লক্ষ, ৬৫টী মাত্র উক্তবিধ পশ্বাদি বিদ্যমান ছিল। অথচ অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের আয়তন তুলনা করিলে এখানে ২৬২ কোটি, ৮০ লক্ষ গবাদি বর্ত্তমান থাকা উচিত ছিল। নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে

অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

এখন একবার ইংলণ্ড ও স্কট্লণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। সে সকল স্থানে দেখিতে পাইবে কিছুকাল পূর্ব্বে তথায় ২২৫০০০০টী গাভী, বৎস ও বকন প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল এবং তখন বাৎসরিক দুগ্ধের পরিমাণ ১০০০০০০০০০ গ্যালন (Gallon এক গ্যালন—৮০ তোলার সেরের ৩ তিন সেরের তুল্য)। এই অপরিমিত দুগ্ধ তত্রত্য বালক, বালিকা এবং অন্যান্য অধিবাসীবর্গের ব্যবহারে এবং নবনীত ও পনীর প্রভৃতি প্রস্তুত করণে ব্যয়িত হইয়াছিল। Mr. Morton (মেঃ মর্টন) এর গণনানুসারে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড ও আয়ারলণ্ড (United Kingdom) এ ৩৬৮২৩১৭টী দুগ্ধদাত্রী গাভী এবং বৎসাদি বর্ত্তমান ছিল ও তখন বার্ষিক দুগ্ধের পরিমাণ ১৬২০২১৯৪৮০ গ্যালন ছিল, এখন ভাবিয়া দেখুন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সে খানে গবাদি ও দুগ্ধের পরিমাণ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি বলেন যে তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ অনাবশ্যক, কেন না ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এখন লক্ষ্মী ও সরস্বতী চির প্রচলিত কলহ পরিত্যাগ করত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছেন, অতএব সে খানে অবনতি কল্পনাতীত বা অসম্ভব।

এখন একবার দেখা যাউক আমেরিকার কি অবস্থা; সে খানেও দেখিতে পাইবে, বিগত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কেবল মাত্র United States (ইউনাইটেড ষ্টেট) এ ১৫০০০০০০টী গো, বৎস প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল, সেখানে বাৎসরিক দুগ্ধের পরিমাণ ১৬২০২১৯৪৮০ গ্যালন ছিল। প্রত্যেক গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ ৪০৭ গ্যালন ধরিয়া এই হিসাব করা গেল। এখন সমগ্র আমেরিকা মহাদেশে গাভী এবং দুগ্ধের পরিমাণ কত হয়, তাহা বর্ণনীয় নহে। অনুমেয় মাত্র।

আমরা গো-রক্ষক জাতি বলিয়া চির প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা-বাসী গো-ভক্ষক জাতি, তথাপি তাঁহারা গো রক্ষা ও তাহাদের উন্নতিকল্পে যাদৃশ মনোযোগী এবং যত্নশীল আমরা তাহার শতাংশের একাংশও নহি, ইহা আমাদের পক্ষে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। আমাদের মনে হয় ইউরোপ ও আমেরিকার দৈনিক গো-দুগ্ধে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় পূর্ণ হইয়া যায়। ব্রহ্মণ্য দেব! তুমি না "গো ব্রাহ্মণ হিতায়" ছিলে, এখন কি ভারতের পক্ষে "তত্তদ্বধায়" হইয়াছ?

আমাদের দেশে গো-জাতির ক্রম বিলুপ্তির সহিত দুগ্ধের কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কীদৃশ ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখা যাউক।

বিগত ১৯০১ সনের সেন্সসে (আদমশুমারীতে) জানা যায় যে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অধীনে প্রতি সহস্রে গড়ে ৩৩০ জন নিরীহ শিশু অকালে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে এবং গত ১০ বৎসরে প্রতি সহস্রে গড়ে ৪০০ জন অপোগণ্ড বালক, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। চিকিৎসকগণ, গবেষণা-দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে Infantine Liver (শৈশব যকৃতের পীড়া) এই অকাল মৃত্যুর কারণ এবং অপরিষ্কৃত জল মিশ্রিত কৃত্রিম গো-দুগ্ধ পানই এতাদৃশ পীড়ার কারণ। যদি একমাত্র কলিকাতা মহানগরীতেই এই অবস্থা হইয়া থাকে, তবে ভারতের অন্যান্য নগরীতে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বড় বড় সহরেই এতাদৃশ মৃত্যুসংখ্যা অধিক, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু আজকাল পল্লীগ্রাম সমূহেও যে প্রকার দুগ্ধাভাব ঘটিতেছে, তাহাতে অচিরেই সে সকল স্থানে ও নগরাদির ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হইবে। অতএব সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দেশহিতৈষী ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় গোজাতির প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের রক্ষা ও উন্নতির উপায় বিধান না করিলে আর রক্ষা নাই। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা ব্যতীত গোবংশ ভারতবক্ষ হইতে চিরতরে লুপ্ত হইবে এবং তৎসহ আমরাও বিলয় দশা প্রাপ্ত হইব। এ বিষয় সদাশয় গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা কতকটা মঙ্গলের চিহ্ন বটে।

সত্য বটে—আর্য্য মহর্ষিগণ গো-দুগ্ধ ও অন্যান্য গব্য পদার্থের মহৎ উপকারিতা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই এই নশ্বর গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি কামনায় নানাবিধ বিধিব্যবস্থা শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা হেলায় সে গুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া গোবংশের ধ্বংশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং আমরাও ক্রমে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইতেছি। ইউরোপীয়গণ পক্ষান্তরে ইহার উন্নতি পক্ষে অপরিসীম যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের অসদ্‌দৃষ্টান্তের অযথা অনুকরণ করিতেছি, কিন্তু তাঁহাদের সদ্‌গুণের অনুসরণ করিতেছি না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

গো-দুগ্ধ ও তজ্জাত পদার্থ নিচয়ের অপরিসীম উপাদেয়তা এবং উপকারিতা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই আমাদের শাস্ত্রকার ঋষিগণ প্রত্যেক মাঙ্গলিক ব্যাপারে ও শ্রাদ্ধাদিতে নানা প্রকার গব্য পদার্থের ভূরি ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং গোবৎসের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া ব্রাহ্মণের গো-দোহন করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে

গো-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গো-বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ, গাভীর গাত্রে যত লোম আছে তত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত গো-গোষ্ঠে কৃমি হইয়া বাস করে।

যে সকল পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দুগ্ধ লিপ্সায় গো-দোহন করেন তাঁহাদের পক্ষে সেই দুগ্ধজাত দধি বিষ্ঠা তুল্য, দুগ্ধ মূত্রসম এবং ঘৃত মদ্য তুল্য হয়"। ব্রাহ্মণ লৌহ, লাক্ষা ও লবণ বিক্রয়ে সদ্য পতিত হন এবং দুগ্ধ বিক্রয়দ্বারা তিন দিবসে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

দুগ্ধাদি বিক্রয় করিলে, ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার আশায় মানুষ বৎসের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবে এবং গো-বিক্রয়ের প্রশ্রয় দিলে তাহার প্রতিও নির্দ্দয়তা হইবে, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ গো ও দুগ্ধ বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন এখন গো এবং দুগ্ধ বিক্রয় ব্যতীতও ব্রাহ্মণ সন্তান ততোঽধিক গুরুতর নিষিদ্ধ কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতেছেন; ইহা কতদূর সঙ্গত একটু চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

প্রসঙ্গাধীন ইহাও বক্তব্য, এই ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ এবং বলদই কার্য্যের প্রধান সহায়, অতএব গো জাতির অভাবে কৃষকের কত অসুবিধা অনিষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না। কৃষকের অনিষ্টে ভারতবর্ষের অমঙ্গল। ভারতবর্ষে শতকরা ৬৯.৯২ জন কৃষিজীবী, এ কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

গবাদি বিলোপের প্রধান প্রধান কয়েকটী কারণ নিম্নে কথিত হইতেছে,—

১। গোজাতির প্রতি অযত্ন ও তাহার অপালন।

২। গোচারণ ভূমির অভাব।

৩। গোমড়ক ও অন্যান্য সংক্রামক পীড়াজনিত অকাল মৃত্যু।

৪। যদৃচ্ছা গোবধ।

৫। লাভের আশায় অতিরিক্ত গো-দোহন এবং তজ্জনিত বৎসের দুর্ব্বলতা এবং অকালমৃত্যু।

৬। চর্ম্মকার ও অন্যান্য চর্ম্ম ব্যবসায়িগণদ্বারা বিষ প্রয়োগে গোবধ।

উপরোক্ত কারণগুলির মধ্যে কতকগুলির প্রতীকার আমাদের আয়ত্তাধীন এবং কতকগুলির নহে; এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় পরিত্যক্ত হইল। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে কেবল মাত্র গোমড়কে ভারতবর্ষে প্রতিবর্ষে গড়ে প্রায় ৯০০০০০০০ টাকা ক্ষতি হইতেছে। অন্যান্য কারণে গবাদির মৃত্যুসংখ্যা গণনা করিলে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী হইবে।

দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ করুণাপরবশ ও যত্নশীল হইয়া গোজাতির রক্ষা ও উন্নতির পথ প্রসারিত করিতে অগ্রসর হইলেই, দেশে দুগ্ধাদির প্রাচুর্য্য ঘটিবে এবং আমাদেরও বল, বীর্য্য, উৎসাহ ও আয়ুবৃদ্ধি হওয়ার পথ উন্মুক্ত হইবে; নতুবা আমাদের অধঃপাতের গতি কিছুতেই অবরুদ্ধ হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

পিতামাতা।

রঘুবংশের প্রথম শ্লোকে কালিদাস লিখিয়াছেন জগতের মাতা ও পিতা বাক্য ও অর্থের ন্যায় সম্পৃক্ত। সেণ্টজন তাঁহার সুসমাচারে লিখিয়াছেন, আদিতে বাক্য ছিলেন, ঐ বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। পিতা এবং মাতা এই দুইটী শব্দ পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব জ্ঞাপক, এতদ্ব্যতীত যে সকল ভাব লইয়া এই দুইটী শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। শব্দ ও অর্থ লইয়া বিচার করা অনর্থক কেন না শব্দ সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র এবং অর্থ ব্যক্তিগত। কিন্তু ভাব প্রকাশ করিতে শব্দ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শব্দ সমষ্টির নাম মন্ত্র। যে শব্দ দেবতাকে প্রকাশ করে তাহা "রুধিরাক্তানি স্বরূপানি" বিদ্যুৎ অপেক্ষাও তেজোময়, অগ্নি অপেক্ষাও উষ্ণ। সুকবির কাব্য পড়িতে চক্ষে জল আসে, শরীর গরম হয়; বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে লোক আত্মহারা হইয়া যায়।

শব্দের অনুভূতি ও মন্ত্রের সাধন একই কথা। মন্ত্র বার বার উচ্চারণ করিলে আপনা হইতে তাহার স্ফুরণ হয়। ভগবান চৈতন্যদেব নামের প্রভাব বিশ্বাস করিয়াছেন ও তাহা প্রচার করিয়াছেন। হিন্দু-শাস্ত্র-সমুদ্রে ওঁ ও বাইবেলে "I am that I am" ইহাতে নাম রূপের পরিসমাপ্তি। ঈশ্বরানুগৃহীত মহাজন ব্যতীত ইহা অন্যের বোধগম্য নহে।

পিতৃরূপ ও মাতৃরূপে জগৎ প্রতিষ্ঠিত। বৃক্ষ, পশু ও মানবে ইহা সর্ব্বত্র প্রকাশিত। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে স্থায়ীভাব কথনে ১১০ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন "এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ হর্ম্ম্য মধ্যে কন্দর্পশিল্পকার তোমার ও শ্রীরাধিকার চিত্তজতু দুইটী, উভয়ের নবানুরাগরূপ হিঙ্গুলবর্ণে বিলেপন করতঃ প্রেমাগ্নিদ্বারা ক্রমে অভিন্নরূপে সংমিশ্রণ করিয়া কেমন সুন্দররূপে অনুরঞ্জিত

করিয়া রাখিয়াছেন।" ইহাকেই রায় রামানন্দ "সাধ্য বস্তুর অবধি" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু সাধ্যবস্তু সাধনা বিনা কেহ পায় না। জীবনের যে মুহূর্ত্তে পিতৃরূপ ও মাতৃরূপের একত্ব প্রতিপাদিত হয় তাহা অতি শুভ মুহূর্ত্ত। এই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলে কি? জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আনন্দের যাহা একমাত্র প্রস্রবণ, সর্ব্ব শক্তির যাহা মূলাধার তাহা হইতে দূরে থাকিলে চলে কি? কার্য্যের অবসরে সাধনা, মন্দিরে যাইয়া উপাসনা অলসের কথা। প্রতি মুহূর্ত্তে সাধনা প্রতি মুহূর্ত্তে উপাসনা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "যাহা কিছু কার্য্য কর তাহা আমাতে সমর্পণ কর," মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে "গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে এবং যে কার্য্য করিবে তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে।" যীশু বলিয়াছেন "আমার ইচ্ছা নহে, হে পরমেশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মাধীনে সম্পূর্ণরূপে নিজকে আনয়ন করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। বুদ্ধদেব যখন বোধিবৃক্ষতলে যোগাসনে বসিয়াছিলেন তখন সংসারের প্রলোভন তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। সংসার যৎসামান্য পরীক্ষাস্থল নহে। শতবার সত্যকথা বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও মানুষ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। কেন এ প্রলোভন এবং কেন এত বিড়ম্বনা! কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যাঁহার লক্ষ্য স্থির থাকে তিনি অমৃতময় রাজ্য প্রবেশের অধিকার লাভ করেন।

প্রেম ব্যতীত কখনও স্পৃহা জন্মে না। আনন্দই প্রেম। অতি উচ্চস্তরে এইটুকই মানুষের স্বার্থ। বৈজ্ঞানিক অর্থলোভে প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট নহেন। প্রকৃতি তাঁহার আরাধ্য দেবতা। প্রকৃতির ধ্যানে তিনি আত্মহারা। বাহিরের লোকে তাঁহাকে পাগল আখ্যা প্রদান করে। প্রকৃতির প্রতি এই প্রেম যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি বুদ্ধিমান জীবের গন্তব্য স্থান হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহেন।

যাঁহাকে ভাবিবার তাহাকে না ভাবিলে যখন থাকা যায় না, সংসারের ঘৃণা উপেক্ষায় যখন তাঁহাকে পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হয়, তখনই প্রার্থনার উন্মেষ। সংসার-সাগরে বাত্যা-বিতাড়িত হইয়া মানুষ পরম আশ্রয়কে স্মরণ করে। প্রতি মুহূর্ত্তে যখন ইহার আবশ্যকতা অনুভূত হয় তখনই "নামে রুচি" জন্মে। নাম শব্দমাত্র, তাহাতে মাধুর্য্য কোথায়। মা এই শব্দটাতে জগতের সমস্ত স্নেহ জড়িত রহিয়াছে। পিতা এই শব্দটাতে কি নির্ভর-ভাব রহিয়াছে। যীশু মৃত্যুর

প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন "পিতঃ তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে।" জগতের পিতা এবং মাতা, শব্দ এবং অর্থের ন্যায় সংযুক্ত। পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের ব্যবধান তিরোহিত হইলে জীবের সাধনা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

আমাদের কর্ত্তব্য কি?

মানুষ যখন নিজের অবস্থার হেয়ত্ব পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, বুঝিতে হইবে তখনই তাহার হৃদয়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে; যখন সে কর্ত্তব্য চিন্তায় নিয়োজিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার জীবনে নবযুগের নব-পঞ্জিকার নবীন সূত্র রচিত হইতেছে; আর যখন সে প্রকৃত পন্থা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করে তখন বুঝিয়া লইতে হইবে তাহার সম্মুখে নবীন প্রভাতের নূতন আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটী মানুষের পক্ষে যাহা সত্য, একটী জাতির পক্ষেও তাহা ধ্রুব সত্য।

অধুনা বঙ্গের সর্ব্বত্র—সভামঞ্চে বক্তার বক্তৃতায়, রেল-গাড়ীতে, ষ্টিমারে, হাটে-বাজারে, পথেঘাটে সহস্র জিহ্বায়, সংবাদপত্রে বিরাট প্রবন্ধে "আমাদের কর্ত্তব্য কি" এ প্রশ্ন উত্থাপিত ও মীমাংসিত হইতেছে; বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি সে আন্দোলনে যোগদান করিতেছেন; সহজ দৃষ্টিতে উহা দ্বারা আমাদের উন্নতির সূচনা প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে, কিন্তু প্রশ্নটী যেরূপ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভাবে মীমাংসিত হইতেছে, তৎপ্রতি সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, আমরা আজিও আমাদের অবস্থা ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, এবং অবস্থানুরূপ ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং আমাদের উন্নতির আশাও সুদূরপরাহত। আমাদের দেশের নেতাগণ উপরোক্ত প্রশ্নটীর মীমাংসা করিতে যাইয়া কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কলিকতা টাউনহল-সভার লিপিবদ্ধ অভিমতের কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

"This meeting fully sympathises with the Resolution adopted at many meetings held in the moffusil, to abstain from the purchase of British Manufactures so long as the partition Resolution is not withdrawn * * * * * *"

বঙ্গানুবাদ—বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বিলাতী জিনিসের খরিদ বন্ধ রাখা সম্বন্ধে মফস্বলের বহু সভাতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,

আন্দোলনের সহিত এই সভার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

মীমাংসাটী দুর্ব্বলচিত্ত বাঙ্গালীর উপযুক্তই বটে। বিলাতী জিনিসের মনোমোহন মাধুর্য্যে আমাদের হৃদয় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং আমরা ইহার বেশী ত্যাগ স্বীকার করিব কি প্রকারে!

গভীর নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করিলে, সে যেমন বেদনায় ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকে, এবং বেদনার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় নিদ্রাসুখ লাভের আশায় ব্যাকুল হইয়া পড়ে, আমরাও সেইরূপ একটা সাময়িক বেদনায় অধীর হইয়া জাগরিত হইয়াছি এবং বেদনা দূরীভূত হইলে পুনরায় দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হওয়ার সংকল্প লইয়া বসিয়া আছি। ইহারই নাম জাগরণ, এবং এরূপ জাগরণেই এ জাতি উন্নত হইবে! হায়রে অদৃষ্ট!

আমাদের কর্ত্তব্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলিব, আমরা যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমাদের কর্ত্তব্য তাহা অপেক্ষা গুরুতর। লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ-বিভাগে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালীর দেহে এক গভীর বেদনার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন; বাঙ্গালী জাগিয়া বসিয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে, সে চীৎকারে সমস্ত ভারতবাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। এই শুভ সময়ে সকলের হৃদয়ে শুভ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিতে হইবে। দেশের দুরবস্থা এবং তাহার প্রতিকারের পন্থা শুধু বাঙ্গালীকে নয়—সমস্ত ভারতবাসীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। বুঝাইয়া দিতে হইবে—স্বদেশ-প্রেমিক না হইলে দেশের কল্যাণ নাই। কেবল বাঙ্গালীতে কাজ হইবে না—দেশের মিলিত শক্তি ব্যতীত কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, জগতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে; সমস্ত ভারতবাসী মিলিয়া, যাবতীয় বিদেশী জিনিস—শুধু জিনিস বলিলে কথাটা ঠিক হয় না—বিদেশী আচার-ব্যবহার, হাবভাব, আদব-কায়দা এবং বিদেশীভাবের আহার বিহার সমস্ত চির-বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রয়োজনীয় জিনিস যাহাতে দেশে অর্জ্জিত হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—দেশের জিনিস দুর্ম্মূল্য হউক, কুৎসিত হউক, তিক্ত হউক উহাই সাদরে গ্রহণ করিব। ঘরের জিনিসেই সন্তুষ্ট রহিব; পরের জিনিসের দিকে ফিরিয়াও চাহিব না। যদি এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হই তবে আমাদের কালনিশির প্রভাত হইবে। অদূর ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য পুনর্জ্জন্ম লাভ

করিয়া নূতন আলোদানের ব্যবস্থা করিবেন। তদন্যথায় আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিব।

এস্থলে একটী বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিয়া লওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিদেশী জিনিস পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার আরম্ভ করিলে উহা দ্বারা জাতীয় ধনবৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু বিদেশী আচার ব্যবহার, হাবভাব, আদব-কায়দা এবং বিদেশীভাবের আহার-বিহার পরিত্যাগের প্রয়োজন কি আছে? উহাদ্বারা আমাদের কি লাভ হইবে? আমরা বলি, ক্ষতিই বা কি? পরন্তু, লাভ যথেষ্ট। কাহাকেও ভালবাসিতে হইলে তাহার যত কিছু আছে সবই প্রীতির চক্ষে দেখিতে অভ্যাস করিতে হয়, ইহাই ভালবাসা শাস্ত্রের মূল মন্ত্র। দেশের ইহা ভালবাসিব, উহা ভালবাসিব না ইহা স্বদেশ-প্রেমিকের কথা নহে। আরও ক্ষতি আছে, যদি তুমি একটী বিদেশীকে কাছে ঘেঁষিতে দেও তবে দেখিবে তাহার আত্মীয়, সহচর এবং পার্শ্বচররূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিদেশী তোমার সংসার জুড়িয়া বসিয়াছে—ইহাই পৃথিবীর ধর্ম্ম।

আমাদের সংকল্পের কথা বলিয়াছি; সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, এখন তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে স্বদেশী জিনিস ইত্যাদির প্রতি দেশবাসীকে অনুরক্ত করা। মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, স্বার্থান্বেষণই যেন তাহার জীবনের প্রধান ধর্ম্ম। যে স্থানে লাভের অঙ্ক বিদ্যমান নাই শত সাদর আহ্বানেও মানুষকে সে স্থলে উপস্থিত করা যায় না; আর যেখানে লাভের মহোৎসব উপস্থিত, দেখিবে অনাহুত মানুষ সে স্থানে পাতপিড়ী নিয়া বসিয়া গিয়াছে। সুতরাং স্বদেশী জিনিস ইত্যাদির প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ সঞ্চার করিতে হইলে, উহাদের মধ্যে যে আমাদের লাভের বিরাট অঙ্ক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা তাহাদিগকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। শুধু সভা সমিতিতে কাজ হইবে না, উহার সহিত সাধারণ লোকের সম্বন্ধ অতি অল্প। নগর ছাড়িয়া সুদূর পল্লীগ্রামে পর্যন্ত আমাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইবে। ভদ্র-ইতর নির্ব্বিশেষে সকলের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া উপদেশ প্রদানে স্বদেশী জিনিসের প্রতি লোকের অনুরাগ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বলে কার্য্য হইবে না, কলে হইবে। লোকের হাত হইতে বিদেশী জিনিস ছিনাইয়া নেওয়া অপেক্ষা তাহাদের মন হইতে ছিনাইয়া নেওয়ার মূল্য অধিক। বিদেশী সিগারেট অথবা বস্ত্রের চিতাভস্ম প্রদর্শন অপেক্ষা জননী জন্মভূমির দগ্ধবক্ষ

প্রদর্শনে অধিকতর ফল হইবে। অধীর কিংবা উত্তেজিত হইলে চলিবে না; অধীরতা কর্ত্তব্য জ্ঞানকে নষ্ট করে; অত্যধিক উত্তেজনা দুর্ব্বল হৃদয়ে দারুণ অবসাদ আনিয়া উপস্থিত করে। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ কোন মহৎকার্য্যই দু'দশ দিনে সম্পন্ন হয় নাই। বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে, বহু পরিশ্রম ও বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। একটা নূতন মত সংস্থাপন সহজ কথা নয়।

আয় !

১

ওগো
কে যাইবি মোর সাথে
আয় তোরা, আয় আয়।
অনন্ত প্রকৃতি রাজ্যে
বেড়াইবি যদি আয়।
যথায় কুসুম হাসে
বহে মৃদু মৃদু বায়,
শ্যামল তরুর শাখে
বিহগ মধুর গায়;
যেথায় তটিনী-নীর
নীরনিধি পানে ধায়;
সে শোভা দেখিবি যদি
আয় তবে ত্বরা আয়।

২

যেখানে কানন মাঝে
বিকচ কুসুম হাসে;
কপোত-কপোতী উড়ে
সুন্দর সুনীলাকাশে।
বল্লরী-বেষ্টিত যেথা
শ্যামল তরুর ছায়
বিভলা প্রকৃতি দেবী
আপনা লুকাতে চায়;
যেখানে সরসী নীর
খেলে নিয়ে মৃদু বায়;
সেখানে যাব গো আমি
তোরা আয়, তোরা আয়।

৩

যেখানে তুলেছে শির
অভ্রভেদী গিরিবর,
নিয়ত গৈরিক ধারা
ঝরিতেছে ঝর ঝর;
পত্রের মর্ম্মর তীরে
নীরে কুলু কুলু গান—
শ্রবণে ঢালিয়া যায়
কি যে কি মধুর তান;
সরল স্বভাব-শিশু
মগ্ন নিজ মহিমায়;
কে যাইবি মোর সাথে
আয় তোরা ত্বরা আয়।

৪

ওগো
যখন পূরব দ্বার
খুলিবেন উষারাণী;
ছড়াবেন ধরা মাঝে
সোণার আঁচল খানি;

ছুটিবে মধুপদল
গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে,
শিশিরে মুকুতারাজি
হাসিবে অরুণ-করে;
কত-কি ললিত গীত
প্রবেশিবে প্রাণে প্রাণে;
আয় তোরা, আয় তোরা
কে বেড়াবি সেই খানে।

৫

যখন সাঁঝের বায়ু
আকুল করিয়া প্রাণ
বহিবে মৃদুলতর,
গাহিবে বিদায় গান
বিহগ, হাসিবে নভে
সোণালী মেঘের ঘটা
হাসিবে সুন্দরতর
মধুর গোধূলি ছটা।
যখন প্রকৃতিরাণী
সরসী আরশি মাঝে
হেরিবে আপন মুখ
মধুর মোহিনী সাঁঝে;
প্রফুল্ল কুসুম দল
লতায় ফুটিবে যবে;
ধরণী আপনা মাঝে
আপনা লুকাতে চাবে;
হাসিবে হিমাংশু যবে
সুনীল আকাশ গায়;
দেখিতে সে চারু শোভা
কে যাইবি আয় আয়।

কুমারী আশালতা গুপ্তা।

অনুরোধ।

রূপের কথা কেহ বল না মোর কাছে
ক্ষণিক স্বপনের সুখ সে,
শিরীষসুকোমল বিমল দেহলতা
কেবল নয়নের মোহ রে।
সুনীল শতদল জিনিয়া আঁখি দুটী
মদন-ধনু-নিভ ভ্রূযুগ;
বাসর নিশিসম যাবে যে যৌবন
এরা-ত তারি শুধু অনুগ!
সুগোল রক্তিম কপোল নিরমল
দু'দিনে কালাতপে শুকাবে;
লুকানো মৃদুহাসি—শীতের কমলিনী
বিরহ-হিমে কোথা লুকাবে।
মিলন-সরোবরে রাঙা অধর যুগ
কমল-পাতা সম শুধু রে,
তাহার বহুদূরে প্রণয় অভিরাম
অমল সরসিজ মধু রে।
বল না মোর কাছে রূপের কথা শুধু
চাহিনে চম্পক বরণী,
লালসা-পারাবারে সে শুধু ডুবাবার
সুচারু ভঙ্গুর তরণী।
আমারে দাও বিধি সরল শ্যাম হৃদি
জানে না কভু যাহা শুকাতে,
ভ্রমর সম হায় দারুণ দুখ-গীতি
পারি যাহার মাঝে লুকাতে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

স্বাস্থ্য-সহায়—শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন প্রণীত, মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। কবিরত্ন মহাশয় ময়মনসিংহের একজন বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। গিরিশচন্দ্র চিকিৎসকরূপে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন, গ্রন্থকাররূপেও তাঁহাকে যশস্বান হইতে দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি।

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন:—"ভগবৎ প্রণীত নানাবিধ মনোহর কুসুম গ্রহণ করিয়া মালাকার যেরূপ মালা রচনা করে, আমিও সেইরূপ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিদিগের প্রণীত চরক, সুশ্রুত ও হারীতাদি গ্রন্থ হইতে বাক্য-কুসুম গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্য-সহায়রূপ মালা রচনা করিলাম।"

তা' হউক, কিন্তু সুচতুর মালাকারের হস্ত-কৌশলে ভগবৎ প্রণীত কুসুমের মাধুর্য্য যেমন শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কবিরাজ গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থন-নৈপুণ্যে এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে স্বাস্থ্যকামী মহর্ষিগণের উপদেশাবলী ও সেইরূপ অতুল শোভায় শোভান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

"স্বাস্থ্য-সহায়"এ শুধু স্বাস্থ্য-তত্ত্ব স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই, উহাতে ধাত্রীবিদ্যা এবং বিবিধ রোগের লক্ষণ ও ঔষধ ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেও সবিশেষ আলোচনা দেখিতে পাইলাম। গ্রন্থখানার পত্রে পত্রে গিরিশচন্দ্রের শাস্ত্রজ্ঞান ও সংগ্রহ-নৈপুণ্য পরিস্ফুট। তাঁহার ভাষা মাধুর্য্যমণ্ডিত ও আবেগময়ী। ভাষা-গুণে এবং বর্ণনাচাতুর্য্যে নীরস স্বাস্থ্য-তত্ত্বও রসমধুর আখ্যায়িকার ন্যায় প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের চিন্তা ও মীমাংসা-শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া দিন দিন আয়ু, স্বাস্থ্য, বল হারাইতেছি, এই সময়ে গিরিশচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক "স্বাস্থ্য-সহায়"রূপ অমূল্যরত্ন উপহার দিয়া বাঙ্গালা দেশের যে কি উপকার সাধন করিয়াছেন, আমরা ভাষায় ব্যক্ত করিতে অসমর্থ।

শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগী না হইলে, বাঙ্গালীর আর কল্যাণ নাই। আমরা আশা করি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গিরিশচন্দ্রের "স্বাস্থ্য-সহায়" সমাদরে গৃহীত ও পঠিত হইবে।

৫ম বর্ষ । ৮ম ও ৯ম সংখ্যা ।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত ।

লেখকগণের নাম ।

শ্রীমন্মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি. এ, শ্রী[illegible]প্রাণ গুপ্ত, শ্রী[illegible] গুহ এম. এ বি এল, শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল, শ্রীকেদারনাথ মজুমদার শ্রী[illegible]ীন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ, শ্রীমনোমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার ও সম্পাদক প্রভৃতি ।

ময়মনসিংহ সুহৃদ্ যন্ত্রালয় হইতে
শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দেড় টাকা। এই সংখ্যার মূল্য আট আনা।

সূচী।

ভাদ্র।

আশ্বিন।

মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪৯০	শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ মোক্তার	জামালপুর	১৷৹
৩৬৮	„ কালীকৃষ্ণ ঘোষ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার	ঐ	১৷৹
৪৯৭	„ রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী জমিদার	সেরপুর	১৷৹
৫৭৩	„ কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী	যশোদল, কিশোরগঞ্জ	১৷৹
৫২৯	„ ঈশানচন্দ্র শীল	ড্রইংমাষ্টার কলেজিয়েটস্কুল, ঢাকা	১৷৹
৫৪০	„ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	সেরপুর	১৷৹
৫১১	„ ধরণীধর দত্ত	সেরপুর	১৷৹
৩৪৪	„ এ, কে, খাতুন	ফেমেলী লাইব্রেরী, সদর	১৲
৭১৭	„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	বান্ধব-সমিতি, সদর	১৲
৫৪১	„ দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্ উকিল, হাইকোর্ট		১৷৹
৫৬৫	„ রামনাথ পাল	মুক্তাগাছা	১৷৹
৫৫১	„ জগদানন্দ ভৌমিক	দিঘপাইত	১৷৹
৫৫৩	„ নলিনীমোহন ভৌমিক	ঐ	১৷৹
৫৫৪	„ শরচ্চন্দ্র ভৌমিক	ঐ	১৷৹
৫৪৪	„ তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্ উকিল, হাইকোর্ট		১৷৹
১৮৪	„ সতীশচন্দ্রচক্রবর্ত্তী	সদর	১৷৹
৭১৮	„ শচীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	সারস্বত লাইব্রেরী মহুয়া	১৲
৫৬৭	„ ডাক্তার এ, সি, মুখার্জ্জি	ঢাকা, ঠাঠারীবাজার	১৷৹

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

পঞ্চম বর্ষ। ময়মনসিংহ, ভাদ্র ১৩১২। অষ্টম সংখ্যা।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য প্রসঙ্গ।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও অন্তর্বাণিজ্যের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, তাহার আভাস প্রদান করিতেছি। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বর্ণভেদ বিদ্যমান ছিল না। তার পর কালক্রমে কার্য্যভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণগণ অধ্যাপন ও ধর্ম্ম যাজন, ক্ষত্রিয়গণ দেশের শাসন ও সংরক্ষণ এবং বৈশ্যগণ শিল্প ও কৃষিকার্য্যে নিরত থাকিতেন। আর্য্যজাতির বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপন ও ধর্ম্মযাজন, দেশের শাসন ও সংরক্ষণ এবং শিল্প ও কৃষি এরূপ বহুব্যায়তন হইয়া উঠে যে, প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য সম্পাদন জন্য বহু সংখ্যক ব্যক্তির অনন্যকর্ম্মা হইয়া তৎতৎকার্য্যে নিরত হওয়া আবশ্যক হয়। যিনি যে কার্য্য করিতেন, তাঁহার পুত্রগণও পিতৃপন্থা অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি নিবন্ধন তাহাতেই নিযুক্ত হইতেন। এইরূপেই বর্ণভেদ প্রথার সূত্রপাত হয়। আর্য্যগণ এক এক বিষয়ে বংশানুক্রমে লিপ্ত হওয়ায় স্ব স্ব গৃহীত কার্য্যে অচিরে পারদর্শী হইয়া উঠেন। ফলতঃ বর্ণভেদের ফলে আর্য্যসমাজে ধর্ম্ম, যুদ্ধ-বিদ্যা এবং শিল্প ও কৃষি উৎকর্ষ লাভ করে।

কোন্ সময় বর্ণভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে বর্ণভেদ বিদ্যমান ছিল না। বৈদিক যুগের পর অত্যল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কল্পসূত্রে চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ দেখা যায়। কল্পসূত্র সমূহ ন্যূনাধিক সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয় (১)। সুতরাং অতি প্রাচীনকালেই যে কৃষি ও শিল্প নিরতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত।

তিন শতাধিক তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ দশরথ অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে বহুবিধ সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত হইত। এই সময় বস্ত্রবয়ন ও কারুকার্য্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ দশরথের চারি পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন মিথিলার রাজনন্দিনীদের পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহারা অযোধ্যানগরীতে প্রতিগমন করিতে উদ্যত হইলে মিথিলাধিপতি জনক কন্যাদিগকে অনেক মুখ্য কম্বল, (১) ক্ষৌমবস্ত্র ও সুরঞ্জিত পরিচ্ছদ ও রাজযোগ্য বিবিধ অলঙ্কার, বহু মুক্তা, প্রবাল এবং সম্যক্-অলঙ্কৃত যান যৌতুক প্রদান করেন। অতঃপর রাজা দশরথ পুত্রগণের সহিত মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় উপনীত হন; এবং কৌশল্যা সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজপত্নীরা ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া হোমচিহ্নে ভূষিতা হইয়া মহাভাগা যশস্বিনী সীতা, উর্ম্মিলা এবং সেই দুই কুশধ্বজ তনয়াকে মঙ্গল আলাপন পূর্ব্বক গ্রহণ করেন।" ইহার পর মহারাজ দশরথ সর্ব্বগুণান্বিত নরসিংহ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তদর্থ মন্ত্রণার জন্য তাঁহাকে স্বীয় সকাশে আহ্বান করেন। রঘুনন্দন রাম "ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পিতৃচরণ বন্দনা পূর্ব্বক" তাঁহার আজ্ঞায় "যথা ন্যায়ে মণি ও কাঞ্চনে ভূষিত মনোহর স্বচ্ছ আসনে উপবেশন করেন।" মহারাজ দশরথ ধীমান রামের অভিষেকার্থ সমস্ত মন্ত্রণা শেষ করিয়া কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে গমন করেন। কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে অনেক লতানির্ম্মিত গৃহ এবং অশোক ও চম্পক বৃক্ষে শোভিত বিচিত্র সৌধ ছিল, তাহাতে অনেক গজদন্ত নির্ম্মিত ও সুবর্ণ রচিত উৎকৃষ্ট আসন ছিল। সেই অন্তঃপুর বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে পূর্ণ ছিল। মহারাজ দশরথ সেই অন্তঃপুরে উপনীত হইয়া অসূয়ারূপিণী কৈকেয়ীর চক্রান্তে রিপুদমন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া বনবাসে প্রেরণ করেন। রামপ্রাণ দশরথ সর্ব্বলোক প্রিয় পুত্রের অদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। অনন্তর নিঃস্বার্থ ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যা

(১) রামায়ণের সময় ভারবাহী শকটের আচ্ছাদন জন্য স্থূল কম্বল ব্যবহৃত হইত। যে সময় শকটের জন্যই কম্বল ব্যবহৃত হইত, তখন রাজকুমারীদিগকে শাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট পশমীবস্ত্র উপহার প্রদান করিলে তাহা কখনও শোভমান হইত না। এজন্য শ্রীযুক্ত হিরেণ অনুমান করিয়াছেন যে, মুখ্য কম্বল কাশ্মীর জাত উৎকৃষ্ট শাল ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু টীকাকার রামানুজ অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার মতে বৈদেহীদুহিতাদিগকে প্রদত্ত মুখ্য কম্বল নেপালজাত ছিল।

নগরীতে প্রতিগমন করিয়া "ভ্রাতৃশোকে সম্যক-তাপিত" হইলেন। এবং "উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া রাম দর্শনাভিলাষে" যাত্রা করিলেন। "মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, সূত্র-নির্ম্মাণ-দক্ষ, তন্তুবায়, শস্ত্রনির্ম্মাণোপজীবী কর্ম্মকার, ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত ব্যজনাদি ব্যবসায়ী, * * মুক্তাদি বেধক, কূপাদি কারক, গন্ধদ্রব্য বিক্রেতা, স্বর্ণকার, তুন্নবায় (দর্জ্জি) কম্বলসার" ভরতের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল। আমরা রামায়ণের এই বর্ণনা হইতে আভাস প্রাপ্ত হই যে, তৎকালে শিল্পকার্য্য ও ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্প নিরতিশয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

রামায়ণোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্র কোন্ কোন্ স্থানে প্রস্তুত হইত, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার সুযোগ নাই। কিন্তু মহাভারতের সময় ভারতবর্ষের যে সকল স্থান বস্ত্রশিল্পের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তৎসমুদায়ের নাম আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলে ভারতের রাজন্যবৃন্দ তথায় সমবেত হন; এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ মহার্ঘ উপহার প্রদান করেন। এই সকল উপহার সামগ্রীর তালিকায় আমরা একপ্রকার স্বর্ণ খচিত ও বুটাদার পশমী বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেব এই সকল পশমী বস্ত্রকে স্বর্ণ খচিত শাটী ও শাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুজরাটের আভীরগণ কর্ত্তৃক নানারকম কম্বল প্রদত্ত হইয়াছিল। ছাগলোমে নির্ম্মিত বস্ত্র, কীট সূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্র, উদ্ভিদজাত সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র, এই তিন প্রকার বস্ত্র ও প্রাগুক্ত তালিকা ভুক্ত। এই সকল বস্ত্র শক, তুখরাজ ও কঙ্ক জাতির অধিকৃত দেশ হইতে আগত হইয়াছিল। নিম্ন বঙ্গ, মেদিনীপুর ও গঞ্জামের রাজন্যগণ হস্তীর পৃষ্ঠাচ্ছাদন প্রদান করেন। আমরা কর্ণাট ও মহীশূর জাত মসলিনের নাম ও উপহার সামগ্রীর তালিকায় দেখিতে পাই।

কৃষি ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশ মধ্যে বাণিজ্যের বিস্তৃতি ও অবশ্যম্ভাবী। ভারতবর্ষেও ইহার অন্যথা হয় নাই। বণিকগণ সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্ত্র এবং শিল্প জাত অন্যান্য দ্রব্য লইয়া বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত। রামায়ণের সময়েই বাণিজ্য স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ দেশমধ্যে প্রশস্ত রাজপথের প্রয়োজন। রামায়ণের সময় রাজপথের অভাব ছিল না। ভরত রাম দর্শন-জন্য বনে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলে "যাহারা পরীক্ষা দ্বারা, ভূতলের অবস্থান বুঝিতে অবগত হইতে পারে, এবং যাহাদিগের সূত্র দ্বারা

পরিমাণ করিতে দক্ষতা আছে, সেই খননদক্ষ শৌর্য্য সম্পন্ন খনক, যন্ত্র পরিচালক, বৈতনিক স্থপতি, যন্ত্র-নির্ম্মাণ-দক্ষ বর্দ্ধকি, বৃক্ষাচ্ছেদক, মার্গরক্ষক, সূপকার, সুধাকার, বংশকার ও চর্ম্মকারেরা মার্গনির্ম্মাণার্থ প্রস্থিত হইল।" ইহাদের পরিশ্রমে অচিরে "সেনা গমনাগমনের পথ নির্ম্মিত হইয়া সম্যক শোভান্বিত দেব পথের সাদৃশ্য ধারণ করিল।" আমরা এই বর্ণনা পাঠ করিয়া দুইটী বিষয় জানিতে পারি। প্রথম, তৎকালে রাজপথ নির্ম্মাণ জন্য বিবিধশ্রেণীর কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবী নিযুক্ত ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, সেই প্রাচীন কালেও পূর্ত্ত বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। দ্বিতীয়, পথ রক্ষার জন্য কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত থাকিতেন। পূর্ত্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণ দেশ মধ্যে রাজপথ নির্ম্মাণের জন্য ব্যাপৃত থাকিতেন। ফলতঃ যে সকল স্থান দিয়া লোকে যাতায়াত করিত, এবং পণ্যদ্রব্য সমূহ নীত হইত তত্তৎস্থলে রাজপথ বিদ্যমান ছিল। রাজন্যবৃন্দ রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; পথিক ও বণিকদিগকে দস্যু তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থানে পথ রক্ষকদিগকে নিযুক্ত রাখিতেন। রামায়ণের পরবর্ত্তী কালে, মহাভারত-যুগে রাজপথাদির এতদপেক্ষাও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীনকালেই ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা আর একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। বশিষ্ট-সূত্রের একস্থানে রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, যাহাতে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাপের কোন প্রকার ব্যতিক্রম না হয় তদুপায় রাজাকে অবলম্বন করিতে হইবে। সূত্রকার গৌতম বিবিধ শ্রেণীর রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিবার সময় বাণিজ্য-শুল্ক ও শিল্প-করের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা তাঁহার ব্যবস্থার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। বিক্রেতা পণ্যদ্রব্যের বিশভাগের একভাগ অবশ্য শুল্কস্বরূপ প্রদান করিবে।

২। ফল, মূল, পুষ্প, ভেষজ-বৃক্ষলতা, মধু, মাংস, তৃণ এবং কাষ্ঠের ষাটভাগের একভাগ রাজপ্রাপ্য।

৩। প্রত্যেক শিল্পী সপ্তাহে একদিন করিয়া রাজার কাজ করিবেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শিল্প-বাণিজ্যের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, আমরা তাহার আভাস প্রদান করিলাম। প্রাচীন ভারতের শিল্পৈশ্বর্য্যের সংবাদ দেশে বিদেশে প্রচারিত হওয়াতে বিদেশীয়গণ অর্থলোভে

ভারতবর্ষে আগমন করিতেন। পুরাকালে ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য কতদূর বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করিয়াছিল, আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

রামায়ণের একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহামুনি বশিষ্ঠ উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশবাসী এবং দ্বীপবাসী বণিকদের নিকট হইতে রাজোপহার গ্রহণ জন্য ভরতের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। রামায়ণের এই অংশ (অযোধ্যা-কাণ্ড, দ্ব্যশীতিতম সর্গ) পাঠ করিলে রামায়ণের সময়ে ভারতবর্ষে বৈদেশিক বণিকগণ অবস্থিতি করিতেন বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

অধ্যাপক উইলসন সাহেব সভাপর্বোক্ত উপহার সামগ্রীর তালিকা বিশেষ প্রণিধান সহ পাঠ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ কালে সুদূর চীনদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এই দুই দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্যের বিনিময় হইত, তৎসমুদয়ের নাম নিশ্চয়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু অতি প্রাচীনকালেই চীনদেশ উৎকৃষ্ট রেশমের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তদ্দেশজাত রেশম ভারতবর্ষে আনীত হইত। পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যেও চীনদেশজাত বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা শকুন্তলার ১ম অঙ্ক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"চীনাংশুমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।"

পুরাতন বাইবেল পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, অফির দেশ হইতে বহুবিধ দ্রব্য প্যালেষ্টাইনে নীত হইত। আচার্য্য ম্যাক্সমুলর এই সকল দ্রব্যের বিবরণ পাঠ করিয়া অফির দেশকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত সৌবির প্রদেশের অপভ্রংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাতত্বজ্ঞ বিনসেণ্ট সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে যে সকল বিদেশজাত দ্রব্য লইয়া প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য ছিল, তাহা ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্ত্তী নগরসমূহে প্রস্তুত হইত। কিন্তু সে সকল স্থানের অধিবাসীরা তদ্রূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপযোগী শিল্পকৌশল পরিজ্ঞাত ছিল কি না, তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ। তবে এরূপ হইতে পারে যে, ভারতজাত দ্রব্যাদি প্রথমে ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে নীত হইত, তারপর তথা হইতে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িত। পুরাতন বাইবেলের অন্তর্গত যিহিস্কেল অধ্যায়ে টায়ার রাজ্যের অধিবাসী ফিনিসিয়ান জাতির বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "হারণ, কাণা, এদন, সেন, অসুর এবং চিলমদে তোমাদের বাণিজ্য ছিল। এই সকল

স্থানের লোক তোমাদের ব্যবসায়ী ছিল; ইহারা সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য, নীলবস্ত্র বুটাদার প্রাবরণ ও রজ্জুবদ্ধ এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাক্সপূর্ণ মূল্যবান পরিচ্ছদ তোমাদের বিক্রয় স্থানে আনয়ন করিত।” অস্মদ্দেশের মুখোজ্জ্বলকারী রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এই উদ্ধৃত অংশ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে অধিক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়া বিদেশেও উহা প্রেরিত হইতে পারিত। পুরাতত্ত্বজ্ঞ হিরেণ সাহেবও প্রদর্শন করিয়াছেন যে, টায়ার নগরে পুরাকালে যে সকল রঙ্গিন বস্ত্র ও মূল্যবান পরিচ্ছদ আমদানী হইত, তাহার অধিকাংশই ভারতজাত ছিল। ফিনিসিয়ান ও ব্যাবিলোনিয়ানদের বাণিজ্য নিরতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, সুতরাং হিরেণ সাহেবের এই নির্দ্ধারণ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ফিনিসিয়ান জাতিরই হস্তগত ছিল। ফিনিসিয়ান জাতির বাসস্থান লিবান্টের উপকূলবর্ত্তী টায়ার রাজ্যে ছিল। টায়ররাজ্য অতি প্রাচীন। খৃষ্টের ১৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে নোয়ার প্রপৌত্র সাইডান এই রাজ্যের সূত্রপাত করেন। বণিগ্বৃত্তিই ফিনিসিয়ান জাতির প্রধান অবলম্বন ছিল। ফিনিসিয়ানগণ প্রধানতঃ ভারতজাত দ্রব্য লইয়াই বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতেন। তাঁহারা বাণিজ্যক্ষেত্রে সাতিশয় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন, এবং অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। কিন্তু এই শ্রীবৃদ্ধির সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সমাজে নানা প্রকার পাপ প্রবেশলাভ করে; এবং তজ্জন্য তাঁহাদের অধঃপতনের দিন উপস্থিত হয়।

ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক টায়ার-রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করেন। এই আক্রমণকালে ফিনিসিয়ানগণ পারস্যরাজের পক্ষাবলম্বন করেন। পারস্য জয় সম্পূর্ণ হইলে আলেকজেণ্ডার ফিনিসিয়ানদের কৃতকার্য্যের প্রতিফল দিবার উদ্দেশ্যে টায়ার আক্রমণ করেন। টায়ার দুর্ভেদ্য ছিল। আলেকজাণ্ডার কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ বৎসরব্যাপী অবরোধের পর টায়ার জয় করেন। তাঁহার আদেশে সমস্তদেশ ভস্মীভূত এবং অধিবাসিগণ তরবারিমুখে নিহত অথবা দাস-বিপণিতে বিক্রীত হয়। ফলতঃ তিনি টায়ারকে একবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন।

আলেকজাণ্ডার ফিনিসিয়ানদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াই বিরত হন নাই; পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত ছিল তাহাও

অভিনব খাতে প্রবাহিত করিয়া তাঁহাদের পুনরুত্থানের উপায় বিনষ্ট করিতে যত্নশীল হয়েন। ফিনিসিয়ানগণ জল ও স্থল উভয় পথেই বাণিজ্য করিতেন। বণিকগণ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকট্রিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতেন। এ পথে বাল্ক তাঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। তাঁহারা ব্যাকট্রিয়া উত্তীর্ণ হইয়া ব্যাবিলিয়নের অভিমুখে অগ্রসর হইতেন। এ পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই কাস্পিয়ান সাগর পাওয়া যাইত। তাঁহারা এখানে পৌঁছিয়া অর্ণবযানে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তরতীরে উপনীত হইতেন। তারপর তথা হইতে স্থলপথে কৃষ্ণসাগরের তীরে গমন করিতেন; এখান হইতে তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে এবং ডারডিনেলাস প্রণালী দিয়া ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দর সকলে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেন। বণিকগণ কৃষ্ণসাগর পরিত্যাগ করিয়া ব্যাবিলিয়নে গমন করিতেন। ব্যাবিলিয়ন হইতে তাঁহারা পশ্চিমমুখে পালমিরায় উপনীত হইতেন। পালমিরা পরিত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী লিভান্টের উপকূলে পৌঁছিতেন। উষ্ট্রই এ পথের প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু এ পথ অতি দুর্গম বলিয়া ফিনিসিয়ানগণ অধিকাংশ সময় জলপথেই গমনাগমন করিতেন। এ পথে মিশরদেশ দিয়া ঘুরিয়া ভারতবর্ষে যাইতে হইত। কিন্তু মিশরদেশে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্রও প্রভুত্ব ছিল না, সুতরাং এ পথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে মিশরবাসীদের অঙ্গুলি সঙ্কেতেই তাঁহাদের বাণিজ্যস্রোত রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল। এজন্য তাঁহারা কৌশলে অথবা বলে আরবদেশের উপকূলে লোহিত সমুদ্রমুখে কয়েকটী বন্দরে আধিপত্য স্থাপন করেন। ফিনিসিয়ান বণিকগণ এই সকল বন্দরকে জলপথের প্রবেশদ্বাররূপে পরিণত করিয়া টায়ার হইতে আরবের উপকূল পর্য্যন্ত এক অভিনব স্থলপথের উদ্ঘাটন করেন। কিন্তু এই পথ সুদীর্ঘ ছিল বলিয়া ফিনিসিয়ানগণ সত্বরেই অন্য পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহারা ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ রিণকুলরা নামক বন্দর অধিকার করিয়া তথায় জলপথের প্রবেশদ্বার স্থাপন করেন। এ পথ অপেক্ষাকৃত অল্প দীর্ঘ ছিল। এই পথে পণ্যদ্রব্য সকল টায়ার রাজ্যে নীত হইবার পূর্ব্বে অর্ণবযান হইতে দুইবার অবতরণের আবশ্যক হইত। কিন্তু এই অসুবিধা সত্বেও পণ্যদ্রব্য বহন ব্যয় অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এ কারণ ফিনিসিয়ান বণিকগণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্যে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যাদি ইউরোপের দেশ সমূহে বিক্রয় করিতে পারিতেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ফিনিসিয়ান্ বণিকগণের হস্তগত হইয়া পড়ে।

আলেকজাণ্ডার ফিনিসিয়ানদের গৃহীত পথাপেক্ষাও সুগম পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য তাঁহাদের হস্তচ্যুত করিবার জন্য যত্নবান্ হন, এবং মিশরদেশ জয়ের পর স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। তিনি বাহুবলে মিশরদেশে প্রবেশলাভ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে পিরামিড পর্য্যন্ত গমন করেন এবং তারপর নীল নদের পশ্চিম শাখা অবলম্বন করিয়া মেরিওটিসহ্রদের উপকূলে উপনীত হন। তীক্ষ্ণদর্শী আলেকজাণ্ডার মেরিওটিসের উপকূলের অদূরেই সমুদ্রে অবস্থান জন্য তত্রত্য যোজকস্থলকে বাণিজ্যের পক্ষে একান্ত উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। এজন্য তিনি তথায় এক নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরকালে এই নগরী আলেকজাণ্ড্রিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, এবং ইউরোপ ও এসিয়া সম্পর্কিত বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত হয়। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য প্রথমতঃ আলেকজাণ্ড্রিয়ায় প্রেরিত হইত, তারপর তথা হইতে ইওরোপের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িত।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি টলেমিলাগাস মিশরদেশের অধিপতি হন। তিনি আলেকজাণ্ড্রিয়ায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। টলেমিলাগাসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী টলেমিফিলাডেলফাস সুয়েজ যোজকের মধ্য কৃত্রিম নদী খনন করিয়া ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে লোহিত সমুদ্রের সংযোগ বিধান করিতে যত্ন করেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত যত্ন নিষ্ফল হয়। তিনি এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া লোহিত সমুদ্রের পশ্চিমকূলে বেরিনিস নামক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। বেরিনিস নগর প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আলেকজাণ্ড্রিয়ার বাণিজ্যপথ অত্যন্ত সুগম হয়।

ফিলাডেলফাসের পরবর্ত্তী অধিপতিগণ আলেকজাণ্ড্রিয়ার বহির্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনজন্য তৎপর ছিলেন। অপরিমিত অর্থাগমের উপায় স্বরূপ বহিঃ-বাণিজ্য রক্ষার জন্য তাঁহাদের বিপুল নৌবল ছিল। নৌ-সৈন্যগণ জলদস্যুর আক্রমণ হইতে বাণিজ্যপোত সমূহ রক্ষা করিত, এবং যাহাতে অন্য কোন জাতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উত্থিত হইতে না পারে সে দিকেও দৃষ্টি রাখিত। বাণিজ্য-ক্ষেত্রে মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সামর্থ্য একমাত্র পারস্যদেশের ছিল। পারস্য ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী জলপথের দূরত্ব মিশরের পথের তুলনায় সামান্য ছিল। মিশর হইতে ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হইতে যত সময় অতিবাহিত হইত, তাহার অর্দ্ধ সময়েই পারসীকগণ পৌঁছিতে পারিতেন। এইরূপ সুবিধা সত্ত্বেও আরামপ্রিয় পারসীকগণ ভারতবর্ষের সঙ্গে নৌবাণিজ্যে বিমুখ ছিলেন। তাঁহারা

স্থলপথে ভারতীয় কার্পাস ও ক্ষৌমবস্ত্র, রং, উষ্ট্র, মশলা এবং নানাপ্রকার মণিমুক্তা প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতেন। এ সকল দ্রব্য তাঁহারা নিজেরাই ব্যবহার করিতেন, বিক্রয়ের জন্য অন্যস্থানে প্রেরণ করিতেন না। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনে পারসিকগণও ভারতবাণিজ্যে সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। রোমান জাতি ১৯০ খৃঃ পূঃ অব্দে সিরিয়া বিজয় সম্পন্ন করিয়া ইউপ্রেটিসের তীরদেশ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। রোমান জাতির আগমনে পারস্য উপসাগরে বিপুল নৌ-বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। পারস্য উপসাগর হইতে বিপুল পরিমাণে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ইউপ্রেটিস নদী দিয়া পালমিরায় নীত হইত। এই বাণিজ্যের সংস্পর্শে পালমিরা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। কিন্তু পালমিরার তাদৃশ সমৃদ্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। অপরিমিত ধন সমাগমে পালমিরাবাসীদের বিলাস-তরঙ্গ উত্থিত হয় এবং সে তরঙ্গের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা নিমজ্জনোন্মুখ হয়েন; পারসীক জাতি তাঁহাদের হস্তস্খলিত বাণিজ্য তুলিয়া নেন।

এই সময় কনষ্টাণ্টিনোপলে গ্রীক-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পারসীক বণিকগণ কনষ্টাণ্টিনোপলে ভারতজাত রেশমবস্ত্র প্রেরণ করিতেন। কনষ্টাণ্টি-নোপলবাসিগণ সাতিশয় সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও বিলাসপটু ছিলেন। তাঁহারা বহুমূল্যে এই সকল বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিচিত্র পরিচ্ছদে অঙ্গ-শোভাবর্দ্ধন করিতেন। (১)

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যস্রোত হঠাৎ মন্দগতি হইয়া পড়ে। এই সময় এসলামধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। এসলাম-ধর্ম্ম অগ্নিশিখার ন্যায় দেখিতে দেখিতে আরবদেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তারপর মোহাম্মদ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলে, তদীয় শিষ্যগণ দেশজয় ও ধর্ম্ম-বিস্তার করিতে নিরত হয়েন। তাঁহারা অসাধারণ পরাক্রমে অচিরে পারস্য ও মিশরে এসলামের বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন। পারস্য ও মিশরের

(১) খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপে রেশম উৎপন্ন হইত না। ভারত-জাত রেশমীবস্ত্রের ব্যবসায় পারসীক বণিকগণের একচেটিয়া হওয়াতে উহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে। ইউরোপিয়ানগণ স্বদেশে রেশম উৎপন্ন করিয়া বিদেশাগত রেশমীবস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিতে উদ্যোগী হন। রোম-সম্রাটের অর্থসাহায্যে কতিপয় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক রেশম উৎপন্ন করিবার প্রণালী শিক্ষার্থ চীনদেশে গমন করেন। তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রমে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া ইউরোপে প্রতিগমন করেন। ইহার পর ক্রমশঃ গ্রীস, ইটালী ও সিসিলিতে রেশম উৎপন্ন হইতে থাকে।

মধ্যবর্ত্তিতাতেই ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত ছিল। কিন্তু আকস্মিক রাজ্য-বিপ্লব নিবন্ধন সে স্রোত মন্দগতি হইয়া পড়ে। ইউরোপের ধনিগণ চীনদেশের পশ্চিম সীমান্ত অক্সাস নদী, আরল হ্রদ এবং কাস্পিয়ান সাগরের পথে ভারতজাত বিলাসদ্রব্য সমূহ আনয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এ পথ অতি দুর্গম ছিল। এ জন্য এ পথে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যস্রোত পূর্ব্ববৎ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে পারে নাই।

কিন্তু তাদৃশ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল না। এসলামধর্ম্মের অভ্যুদয়ের প্রথম কম্পন দূর হইলেই মোসলমান অধিকৃত দেশসমূহ পুনর্ব্বার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। মোসলমান অধিপতিগণ পারস্য ও মিশরের বহির্বাণিজ্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তাহার পুনরুদ্ধার জন্য যত্নশীল হন। তাঁহাদের যত্নে পারস্য ও মিশরের বহির্বাণিজ্য পুনর্ব্বার শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

কিন্তু এই উন্নতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। সাধু পিটারের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সমগ্র ইউরোপ উন্মত্ত হইয়া খৃষ্টানের পবিত্রতীর্থ জেরুজিলাম মোসলমানের কবল (এসলামধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর এইস্থান মোসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়) হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করে। ইহার নাম Crusade বা ধর্ম্মযুদ্ধ। Crusade আরম্ভ হইলে সমগ্র ইউরোপ ও এসলাম সাম্রাজ্য আন্দোলিত হইয়া উঠে, এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানের সহিত ক্রিশ্চানের বাণিজ্যসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়।

এই সুযোগে ইউরোপের অন্তর্গত ভেনিস প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য হস্তগত করেন। কালক্রমে সমস্ত বাণিজ্য একমাত্র ভেনিসের বণিকদের হস্তেই পতিত হয়। তাঁহাদের উৎকট সাধনার ফলে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক পূর্ণ মাত্রায় সংস্থাপিত হয়। অতঃপর ইউরোপের অন্যান্য সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই ভাবে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য পারস্য ও মিশর হইতে বিক্ষিপ্ত হয়। এবং ইউরোপের খৃষ্টানগণ তাহা হস্তগত করেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভেনিস, গ্রীস ও জেনওয়ার অধিবাসিগণ ভারতবর্ষের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে দিল্লীর দুর্গ-প্রাচীরে মোসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা উড্ডীন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল বৈদেশিক বণিক্ ভারতবর্ষের বাণিজ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। এই সকল বণিক্ স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে উপনীত

হইয়া ভারতজাত দ্রব্য সমূহ পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করিতেন। আর্য্যগণ তৎকালে স্বদেশজাত দ্রব্যাদি লইয়া বিদেশে গমন করিতেন কি না এবং তদ্বিক্রয় লব্ধ অর্থদ্বারা বৈদেশিক দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া স্বদেশে আনয়ন করিতেন কি না, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পুরাকালে আর্য্যগণ ম্লেচ্ছদেশে গমন ও সমুদ্রযাত্রা করিতেন কি না তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসঙ্গত কি না তন্নির্ণয় জন্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা জেনারল এসেমব্লিজ কলেজগৃহে একটী সভা হয়। এই সভায় বেদাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামাশ্রমী মহাশয় বলেন, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে; আর্য্যসমাজে সমুদ্রযাত্রা চিরকাল প্রচলিত ছিল। চারি বেদেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যিনি এ মতের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক, আমি তাঁহার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইব। আমরা এ স্থানে ঋগ্বেদের একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। ঋগ্বেদের ঋষি বশিষ্ঠ বলিতেছেন, যখন বরুণের সঙ্গে আমি নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপর গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন সেই শোভনীয় নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম। (ঋগ্বেদ, সপ্তম মণ্ডল, ৮৮ সূক্ত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ) ঋগ্বেদের আর একজন ঋষি (কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব) উষা দেবতার স্তুতি করিয়া বলিতেছেন, উষা পুরাকালে বাস করিতেন, অদ্যও প্রভাত করিতেছেন। ধনলুব্ধ লোক যেমন সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে, উষার আগমনে যে রথ সমূহ সজ্জীকৃত হয়, উষা তাহা সেইরূপে প্রেরণ করেন। (ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, ৪৮ সূক্ত)।

অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় রাজন্যগণ দিগ্বিজয় কল্পে ম্লেচ্ছ দেশে গমন করিতেন, ইহাও প্রমাণসিদ্ধ। মহাভারতের সভাপর্ব্বে সহদেবের দিগ্বিজয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "অনন্তর সহদেব সাগর দ্বীপবাসী ম্লেচ্ছযোনিসম্ভূত ভূপতি নিষাদ, রাক্ষস, কর্ণ, প্রাবরণ, নররাক্ষসযোনিসম্ভব কালমুখ, কোলগিরি, সুরভীপট্টন, তাম্রাখ্য দ্বীপ, রামক পর্ব্বত ও তিমিঙ্গল বশীভূত করিলেন।" মহাভারতের বহু পরবর্ত্তী রঘুবংশেও দেখা যায় যে, রঘু দিগ্বিজয় জন্য পারস্যে গমন করিয়াছিলেন। কালিদাসের সময়ে ম্লেচ্ছ দেশে গমন নিষিদ্ধ হইলে তিনি কখনও তাঁহার নায়ককে ম্লেচ্ছদেশগামী বলিয়া বর্ণনা করিতেন না। (১)

অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষের সহিত যব দ্বীপের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সুগ্রীব সীতাদেবীর অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিবার সময় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমরা সপ্তরাজ্যে পরিবেষ্টিত যবদ্বীপ অন্বেষণ করিবে (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, চত্বারিংশ সর্গ) রামায়ণের পরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষের সহিত যবদ্বীপের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব উড়িষ্যার ইতিহাস নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বৌদ্ধযুগে ভারতবাসী পূর্ব্ব ও পশ্চিমে রণ-তরী প্রেরণ করিতেন এবং ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সন্ধিস্থলবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করেন। আমাদের ঐতিহাসিকের এই নির্দ্দেশ অমূলক নহে। যব ও বালী প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে অদ্যাপি হিন্দুর আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল এবং তাহাদের দেশ হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। যবদ্বীপে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুরূপ দুইখানি কাব্যের অস্তিত্বও দেখা যায়। বালীদ্বীপে শালিবাহনের শকাব্দা অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। এ জন্য ঐতিহাসিকগণের অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধ যুগেই এই দ্বীপপুঞ্জে ভারতবাসীর উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়।

আমরা এতৎসম্বন্ধে আর একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি। রাজতরঙ্গিনীর একস্থানে লিখিত আছে যে, কাশ্মীরের একজন রাজদূত অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া গমন করিবার সময় হঠাৎ সমুদ্রগর্ভে পতিত হন, এবং একটী তিমি মৎস্য তাহাকে উদরসাৎ করে; কিন্তু তিনি তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হন। বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তীকালে সমুদ্রযাত্রা অপ্রচলিত হইয়াছিল। মনুসংহিতা পাঠ করিলে উপলব্ধি হয় যে, তাঁহার সময়েও ভারতবাসী সমুদ্রযাত্রা করিতেন। কিন্তু সমুদ্র গমন তখন প্রশংসিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল না।

ভারতবাসী আর্য্যগণ কি উদ্দেশ্যে ম্লেচ্ছদেশে গমন অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন? বাণিজ্য দ্বারা অর্থ সঞ্চয় তাঁহাদের এ কার্য্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ইহা প্রমাণ সিদ্ধ। আমরা সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের দুইটী স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার প্রথমটীতে ধন আহরণ অর্থাৎ বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রা সূচিত

(১) যেমন সংযমী পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে ইন্দ্রিয় জয় করেন, তিনিও সেইরূপ পারস্য দেশবাসীদিগকে জয় করিতে স্থলপথে যাত্রা করিলেন।

হইয়াছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যেও বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে, এজন্য পৌরাণিকযুগের প্রথমভাগেও যে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিবার প্রথা বিদ্যমান ছিল, কেবল তাহাই প্রদর্শন করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"তিনি বহুমূল্য মুক্তাসংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে রত্নাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি-গণের সমভিব্যাহারে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া বণিকবেশে সে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে বহু বণিকের সমভিব্যাহারে সমুদ্রযাত্রাকুশল লোকের সাহায্যে গমন করিলেন।" (বরাহপুরাণ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

জনমেজয়।

প্রাচীন ভারতে যে সমস্ত নরপতিগণ রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহ করা সুকঠিন। আর্য্যগণ কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কাশ্মীর প্রদেশীয় পণ্ডিত কহ্লণ রাজতরঙ্গিনী রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণী ঐতিহাসিক গ্রন্থ; কিন্তু ইহারও স্থানে স্থানে নানাপ্রকার অলৌকিক বৃত্তান্ত লিখিত আছে। রাজতরঙ্গিনী কেবল কাশ্মীর প্রদেশের ইতিহাস। কাশ্মীর প্রদেশীয় নরপতিগণের সংশ্রবে কখন কখন অন্য প্রদেশের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। রাজতরঙ্গিনী ব্যতীত সংস্কৃত ভাষায় অন্য কোন ঐতিহাসিক প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না।

রামায়ণ, মহাভারত এবং কতিপয় পুরাণ প্রাচীন ভারতের নরপতিগণের বিবরণ সংগ্রহের একমাত্র উপাদান। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ নানাপ্রকার অলৌকিক বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ; ইহার কতক অতিরঞ্জিত, কতক রূপক, কতক কিংবদন্তীমূলক। পুরাণ রচনা সময়ে সমাজে যে কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল তাহা হইতে বহু বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। পৌরাণিক কোন২ বৃত্তান্ত একদা কাল্পনিক। পুরাণ হইতে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করা সহজ নহে।

পুরাণ হইতে অব্দ নির্ণয় করা আরও কঠিন। পুরাণ প্রণেতাগণ এ সম্বন্ধে অনেক সময়ে নানাপ্রকার অলৌকিক কথা বলিয়াছেন। অব্দ নির্ণয় করিতে হইলে অনেক সময়ে বিদেশীয় ইতিহাসের প্রতি নির্ভর করিতে হয়। সিংহল

দেশীয় ইতিহাস "মহাবংশ" হইতে ভগবান বুদ্ধ দেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির কাল নির্ণয় করা হইয়াছে। সম্রাট সেকেন্দর এবং তাঁহার পরবর্ত্তিগণের ইতিহাস দ্বারা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে যুনানী দূত মিগাস্থিনিস পাটলিপুত্রনগরে আগমন করেন তিনি ভারতের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সে গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ মিগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে যে সমস্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই সকল উদ্ধৃত অংশ একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পাটনা কলেজের অধ্যাপক মেক্রেণ্ডল সাহেব তাহা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু অতি প্রাচীনকালের কোন নরপতির বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হইলে কেবল ভারতীয় গ্রন্থের প্রতি নির্ভর করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

প্রাচীনকালে যে সমস্ত আর্য্যবীরগণ ভারতবর্ষে আর্য্যপ্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন তন্মধ্যে জনমেজয় এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ঐতরেয় মহীদাসের গ্রন্থে জনমেজয়ের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুরুকুলের কবি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতে জনমেজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় কবি কাশীরামের প্রসাদে জনমেজয় বঙ্গদেশে চির স্মরণীয় হইয়াছেন। বঙ্গের আবালবৃদ্ধ সকলেই জনমেজয়ের নাম অবগত আছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের স্থানে স্থানে জনমেজয়ের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে পারীক্ষিৎ জনমেজয় বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহাদ্বারা জনমেজয়ের পিতার নাম পরীক্ষিৎ মাত্র ইহা অবগত হওয়া যায় কিন্তু জনমেজয় কোন্ কুলসম্ভূত, কোন্ দেশে তিনি রাজত্ব করেন, ইহা ঋগ্বেদ হইতে অবগত হওয়া যায় না।

যে যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম বৈদিক কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পাণ্ডবগণের পিতামহ দেবব্রত ভীষ্ম, পাণ্ডবগণের আচার্য্য দ্রোণ, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ইহাদের নাম মহাভারতের পূর্ব্ব সাময়িক কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

কুরুক্ষেত্র মহাসমর হইতে ৩৬ বৎসর অতীত হইলে বসুদেব-তনয় কৃষ্ণ মানবলীলা সম্বরণ করেন (১)। ইহার অতি অল্পকাল পরে পাণ্ডবগণ পত্নী দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থান করেন।

এই সময়ে পাণ্ডবগণের একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং মধ্যমপাণ্ডব ধনঞ্জয়ের পৌত্র পরীক্ষিৎ হস্তীনার সিংহাসন আরোহণ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরের সময়ে

(১) মহাভারত স্ত্রী পর্ব্ব ২৫ অধ্যায়।

পরীক্ষিতের মাতা উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। পরীক্ষিৎ ৩৬ বর্ষ বয়সে পৈতামহিক রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে পরীক্ষিৎ পরলোক গমন করেন (১)। পরীক্ষিতের পিতা বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পবয়সে অভিমন্যু কুরুক্ষেত্র সমরে পরলোক গমন করেন। পরীক্ষিৎ পৈতামহিক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া মাত্র ২৪ বৎসর জীবিত ছিলেন।

পরীক্ষিৎ তদীয় মাতুল উত্তরের ইরাবতী নাম্নী দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন (২)। ইরাবতীর গর্ভে পরীক্ষিতের জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন নামক চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ জনমেজয় পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনারোহণ করেন।

জনমেজয় কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মার তনয়া বপুষ্টমার পাণিগ্রহণ করেন (৩)। বপুষ্টমার গর্ভে শতানীক জন্মগ্রহণ করেন। শতানীক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে বেদ, শৌনক হইতে আত্মজ্ঞান, এবং কৃপাচার্য্য হইতে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন (৪)।

জনমেজয় অন্যান্য নরপতিগণ অপেক্ষা প্রাধান্যলাভ করেন। তিনি মহাভিষেক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মহাভিষেক যজ্ঞের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভিষেক যজ্ঞই রাজসূয় যজ্ঞ। যে নরপতি অন্যান্য নরপতিগণের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ, সম্রাট হইবার যোগ্য, তিনি মহাভিষেক যজ্ঞ করিতে ক্ষমবান্। প্রাচীনকালে যে যে নরপতি মহাভিষেক যজ্ঞ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে (৫)। এই নামের তালিকায় জনমেজয়ের নাম প্রথম। যে যে ঋষি যে যে নরপতির মহাভিষেক যজ্ঞ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ঐ তালিকায় লিখিত আছে। কিন্তু অন্য কোন নরপতি যে তৎপূর্ব্বে মহাভিষেক যজ্ঞ করেন নাই এমত বোধ হয় না। সমষ্টিতে মাত্র দশজন নরপতির নাম দৃষ্ট হয়।

১। কবষ-পুত্র তুর (পারীক্ষিৎ) জনমেজয়ের মহাভিষেক যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

---

(১) মহাভারত আদিপর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়।
(২) ভাগবত প্রথম স্কন্ধ ১৬ অধ্যায়।
(৩) মহাভারত আদিপর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।
(৪) ভাগবত নবমস্কন্ধ ২২ অধ্যায়।
(৫) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অষ্টম পংক্তি

২। ভৃগু-পুত্র চ্যবন মনু-পুত্র শার্য্যাত নরপতির মহাভিষেক যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

৩। বাজরত্ন-পুত্র সোমশুষ্ম সত্রাজিত-তনয় শতানীকের মহাভিষেক সম্পাদন করেন।

৪। পর্ব্বত এবং নারদ ঋষিগণ আংবাষ্ঠ নরপতির যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

৫। পর্ব্বত এবং নারদ ঋষিগণ যুধাংশ্রৌষ্টি নরপতির যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

৬। কাশ্যপ ভুবনপুত্র বিশ্বকর্ম্মা নরপতির যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

৭। বশিষ্ঠ পিজবন-পুত্র সুদাস নরপতির যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

৮। অঙ্গিরা-পুত্র সংবর্ত্ত অবিক্ষিত-পুত্র মরুত্তের যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

৯। অত্রিপুত্র উদময় অঙ্গ নরপতির যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

১০। মমতার পুত্র দীর্ঘতমা দুষ্মন্ত-তনয় ভরতের যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

ভাগবতে লিখিত আছে যে, কলষ-তনয় তুর জনমেজয়ের যজ্ঞ সম্পাদন করেন (১)। বৈদিক কবষ এবং পৌরাণিক কলষ অভিন্ন ব্যক্তি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২) কবষ ঋষির সম্বন্ধে এক উপাখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায়। একদা ঋষিগণ সরস্বতী নদীতীরে এক যজ্ঞ করিতেছেন, ঐস্থানে ইলুষপুত্র কবষ উপস্থিত ছিলেন ; ঋষিগণ কহিলেন :—

"দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবোঽব্রাহ্মণঃ কথং নো মধ্যে দীক্ষিষ্টেতি ?"

দাসীর পুত্র প্রতারক অব্রাহ্মণ কিরূপে আমাদের মধ্যে দীক্ষিত ?

এই কথা বলিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে এক বিজন স্থানে তাড়াইয়া দেন। কবষ তথায় বেদমন্ত্র প্রাপ্ত হন, সরস্বতী তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ঋষিগণ কবষকে আক্রমণ করার জন্য অনুসন্ধান করিলে সরস্বতী তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রক্ষা করেন। ইহাতে ঋষিগণ বিবেচনা করিলেন কবষ দেবগণের পরিচিত। এজন্য তাঁহারা কবষকে পুনঃ যজ্ঞস্থানে আহ্বান করেন। অনন্তর কবষ তথায় গমন করেন।

কৌষিতকী ব্রাহ্মণেও কবষ ঋষির উপাখ্যান আছে (৩)। একদা কতিপয় ঋষি সরস্বতী তীরে যজ্ঞ করিতেছেন, তথায় কবষ বসিয়াছিলেন। ঋষিগণ বলিলেন :—

---

(১) ভাগবত নবম স্কন্ধ ২২ অধ্যায়। (২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৩

(৩) কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ১২।৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হগ সাহেবের অনুবাদের টীকা দেখ।

"দাস্যা বৈ ত্ব পুত্রো সি ন বয়ং ত্বয়াসহ ভক্ষয়িষ্যাম ইতি।"

তুমি দাসীর পুত্র ; আমরা তোমার সহিত একত্র আহার করিব না।

ঋষিগণের এই কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কবষ ক্রোধে সত্বরে সরস্বতীর নিকট গমন করেন, এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সরস্বতীকে সন্তুষ্ট করেন। সরস্বতী কবষের অনুগমন করিলেন। ঋষিগণ দেখিলেন সরস্বতী কবষের অনুগমন করিয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন কবষ নির্দ্দোষ। অনন্তর ঋষিগণ কহিলেন :—

"নমস্তে অস্তু মা নো হিংসোস্ত্বংবৈ নঃ শ্রেষ্ঠোসি যং ত্বেয়ম ম্বেতীতি।"

তোমাকে নমস্কার, আমাদিগকে তুমি হিংসা করিও না, তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ, কারণ সরস্বতী তোমার অনুগমন করিতেছেন।

অনন্তর ঋষিগণ কবষকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। কবষের ক্রোধ প্রশমিত হইল।

কথিত আছে জনমেজয় এক সর্পসত্র সম্পাদন করেন। মহাভারতে এই সর্পসত্রের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একদা রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থ গমন করেন। এক শরবিদ্ধ মৃগ দ্রুতবেগে বনমধ্যে প্রবেশ করাতে পরীক্ষিৎ তাহার অনুসরণ করেন। বনমধ্যে দ্রুতপদে গমন করাতে রাজা অতি পরিশ্রান্ত এবং পিপাসার্ত্ত হন, এই সময়ে রাজা অরণ্য মধ্যে শমীক ঋষিকে দেখিতে পান, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি শরবিদ্ধ মৃগ দেখিয়াছেন কি না? ঋষি মৌনব্রত ছিলেন, এ জন্য রাজার বাক্যের কোন উত্তর দিলেন না এবং রাজাকে কোন প্রকার আদর করিলেন না। রাজা তাহাতে রাগান্বিত হইয়া ঋষির গলদেশে এক মৃত সর্প দিয়া চলিয়া গেলেন। ঋষিকুমার শৃঙ্গী পিতার এই অবস্থা দর্শন করিয়া এই অভিশাপ করিলেন যে অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন করিবে। ঋষিকুমারের অভিশাপে তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন করেন ; তাহাতে নরপতি পরলোক গমন করেন।

জনমেজয় এ জন্য সর্পসত্র করেন। এই যজ্ঞে বহু সর্প বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে যখন তক্ষকের অগ্নিতে পতনের সময় উপস্থিত হয় তখন তক্ষকের ভাগিনেয় আস্তীক ঋষির অনুরোধে জনমেজয় সর্পসত্র হইতে নিবৃত্ত হন।

ঋষিগণ অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন, আর নানাদিক হইতে সর্পগণ আসিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল। এ কথা বিংশতি শতাব্দীতে বিশ্বাস্য হইবে না। কিন্তু জনমেজয়ের সর্পসত্র মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য আছে। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করিতেছি।

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করার পরে ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বান মতে হস্তীনাপুরে আগমন করেন। পরে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ অনুসারে পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থে আবাস স্থাপন করেন (১)। এই প্রদেশে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থনগর স্থাপন করেন। ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটেই খাণ্ডব নামক মহারণ্য ছিল। কথিত আছে ইন্দ্রের সখা তক্ষক নামে ভুজঙ্গ অনুচরবর্গের সহিত নিরন্তর এই অরণ্যে বাস করেন (২)। অগ্নির অনুরোধে অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দাহন করেন। খাণ্ডব বনে যে সমস্ত জীবজন্তু ছিল তাহারা সকলেই খাণ্ডবদাহে জীবন ত্যাগ করিল, কেবল ময়দানব মাত্র জীবিত ছিলেন (৩) ময়দানব তজ্জন্য যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের সভা নির্ম্মাণ করেন।

প্রাচীনকালে আর্য্যগণ অনেক সময়ে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য দস্যুদিগের আবাসস্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতেন। বেদে এই নিয়মের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সনাদগ্নে মৃণসিয়াতুধানান্ নত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
অনুদহ সহমূরান্ কয়াদমা—তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ॥

সামবেদ ১।৮।৮০

হে অগ্নি তুমি চিরকাল হইতেই যাতুধন (রাক্ষস) দিগকে এবং ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক) দিগকে মারিয়া আসিতেছ। সংগ্রামে রাক্ষসেরা কখনও তোমাকে জয় করে নাই। অতএব তোমার সপত্নভূত সেই মুর্খগণকে তুমি আপন তেজোদ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেল। এবং তদীয় হেতি হইতে যেন তাহারা মুক্ত না হয়। (৪)

প্রত্যগ্নে হরসাহরঃ শৃণাহি বিশ্বতস্পরি।
যাতুধানস্য রক্ষসো বলং ন্যুব্জবীর্য্যম॥ সামবেদ ১।৫।৯৫

অগ্নি তুমি আপন তেজোদ্বারা বা আপন ক্রোধদ্বারা যাতুধানের (রাক্ষসের) যজ্ঞ ভাগাপহারক বলটী সর্ব্বতোভাবে নষ্ট করিয়া দাও। এমন কি রাক্ষসের সামর্থ্য একেবারে নিঃশেষ রূপে ভগ্ন করিয়া দাও।

পাণ্ডবগণ এই প্রাচীন রীতি অনুসারে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটবর্ত্তী খাণ্ডব বনের

---

(১) আদিপর্ব্ব অধ্যায় ২৮০
(২) আদিপর্ব্ব ২২৪ অধ্যায়
(৩) আদিপর্ব্ব ২৩৫ অধ্যায়
(৪) ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়বীর অনুবাদ

চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেন। এই সময়ে খাণ্ডব বন তক্ষক এবং অন্যান্য অনার্য্য জাতির আবাস স্থান ছিল। তাহারা কোন প্রকারে স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে উৎপাত করিতে না পারে এজন্য কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন সশস্ত্র উপস্থিত ছিলেন। ময়দানব এই সময়ে খাণ্ডব বনে বাস করিত। সে হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, এ জন্য পাণ্ডবগণ তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। এই উপায়ে পাণ্ডবেরা খাণ্ডব প্রস্থের সমস্ত স্থান অধিকার করেন। খাণ্ডবদাহ বৃত্তান্ত হইতে এই সত্য উদ্ধার করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বকালে একদল অনার্য্যগণ তক্ষক বলিয়া কথিত হইত। সেকেন্দর ভারতবর্ষে আগমন করার সময়ে একদল তক্ষক জাতীয় লোক ককেসস পর্ব্বতের নিকট বাস করিত। অদ্যাপি রাজস্থানে তক্ষকবংশীয়গণ বাস করেন। মগধাধিপতি শিশুপাল বোধ হয় তক্ষক বংশসম্ভূত।

তক্ষকগণ পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে বাস করিত। কুরুক্ষেত্র হইতে তাহারা খাণ্ডব প্রস্থে গমন করিয়া (১) তথায় আবাস স্থাপন করিয়াছিল। এই সময়ে খাণ্ডবদাহ হয়। হতাবশিষ্ট তক্ষকগণ সিন্ধুনদ এবং বিতস্তা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে গমন করিয়া তথায় তক্ষশীলা নগরী স্থাপন করেন। সম্রাট সেকেন্দর এই তক্ষশীলা নগরীতে আগমন করেন। তক্ষশীলাতে পশ্চাৎ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভারতবর্ষ বীরহীন হইয়াছিল। এই সমরের পরে অনার্য্যগণ পুনঃ আর্য্য দিগের প্রতি নানাপ্রকার উপদ্রব করে। খাণ্ডববনবাসী জাতিসমূহের বংশধর বা তাহাদের আত্মীয়গণ কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনের খাণ্ডবদাহ সময় হইতে আর্য্যদিগের উপর রাগান্বিত ছিল। কৃষ্ণের মৃত্যুর পরে তাহাদের বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। কৃষ্ণের মৃত্যুর পরে ধনঞ্জয় বৃষ্ণি রমণীগণ সহ দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক দিবস তাঁহারা পঞ্চনদের সমীপবর্ত্তী এক সমৃদ্ধিশালী প্রদেশে অবস্থান করেন। সেই স্থানে বহুসংখ্যক দস্যু বাস করিত (২)। তাহারা ধনঞ্জয়কে একাকী হতনাথা রমণীগণকে লইয়া যাইতে দেখিয়া লোভপরবশ হইল। ধনঞ্জয় এবং তাঁহার অনুচরগণ রমণীগণকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দস্যুগণ ধনঞ্জয়ের

(১) মহাভারতের আদিপর্ব্ব ৩ অধ্যায়।

(২) ইহারা তক্ষশীলাবাসী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে

সমক্ষেই বৃষ্ণি রমণীদিগকে অপহরণ করিয়া চলিয়া গেল (১)। অর্জ্জুন বহু চেষ্টা করিয়া ও গাণ্ডীবদ্বারা দস্যুগণের আক্রমণ হইতে যাদবরমণীদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

রাজা পরীক্ষিৎ একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তক্ষকগণ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত সমরে অগ্রসর হইতে সাহসী না হইয়া গোপনে তাহাকে হত্যা করেন। সম্ভবতঃ এই বৃত্তান্ত তক্ষক দংশন বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।

জনমেজয় তক্ষশীলা প্রদেশ জয় করেন; (২) তদন্তর তিনি প্রাচীন নিয়মানুসারে তক্ষকদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করেন। পরিশেষে আর্য্যঋষি জরৎকারুর ঔরসজাত তক্ষকের ভগিনী জরৎকারুর গর্ভজাত আস্তীক ঋষির অনুরোধে জনমেজয় এই নৃশংস কার্য্য হইতে বিরত হন্। আমাদের বিবেচনায় ইহাই জনমেজয়ের সর্পসত্র। তক্ষশীলাতে সর্পসত্র হইয়াছিল তাহা মহাভারতপাঠে অবগত হওয়া যায় (৩)।

জনমেজয়ের মহাভিষেক যজ্ঞ কোন্ স্থানে সম্পাদিত হইয়াছিল; তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাভারতে লিখিত আছে যে জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে এক দীর্ঘসত্র সম্পাদন করেন। কিন্তু ইহা কোন্ যজ্ঞ তাহা নির্ণয় করা যায় না। সম্ভবত মহাভারতে ইহাই জনমেজয়ের মহাভিষেক যজ্ঞের উল্লেখ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে একদা জনমেজয় তাঁহার কুলপুরোহিত কাশ্যপগণ ব্যতীত ভূতবীরগণ দ্বারা যজ্ঞ করিতে ছিলেন; কাশ্যপ অসিত মৃগগণ ভূতবীরগণকে তাড়াইয়া দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন (৪)। মহাভারতে লিখিত আছে যে জনমেজয় শ্রুতশ্রবা ঋষির পুত্র সোমশ্রবাকে পুরোহিত পদে বরণ করেন (৫)।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সমস্ত নরপতিগণ মাহাভিষেক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া লিখিত আছে তন্মধ্যে পুরাণে অনেক নরপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুরাণে লিখিত আছে যে মহর্ষি চ্যবন মনু পুত্র শর্য্যাতির তনয়া সুকন্যার পাণি গ্রহণ করেন। চ্যবন শর্য্যাতির যজ্ঞ সম্পাদন করেন, এই যজ্ঞে

---

(১) মহাভারত মৌষলপর্ব্ব ৭ অধ্যায়
(২) মহাভারত আদিপর্ব্ব ৩ অধ্যায়
(৩) মহাভারত স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৫ অধ্যায়।
(৪) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সপ্তম পংক্তিকা পঞ্চম অধ্যায়
(৫) আদিপর্ব্ব ৩য় অধ্যায়।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রথম সোমপাত্র প্রাপ্ত হন্ (১)। এই তালিকায় দুষ্মন্তপুত্র ভরত হইতে এই দেশ ভারতবর্ষ বলিয়া কথিত হয়। মহাভারতে লিখিত আছে ভরত সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী হইয়া ছিলেন; মহর্ষি কণ্ব তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন করেন (২)। কিন্তু বৈদিক প্রমাণ মহাভারতের উপাখ্যান হইতে আদরণীয়। মহর্ষি সংবর্ত্ত, অবিক্ষিত পুত্র মরুত্তের যজ্ঞ সম্পাদন করা মহাভারতে উল্লেখ আছে (৩)।

অমরা যাজ্ঞবল্ক্য শীর্ষক প্রবন্ধে দর্শাইয়াছি যে খৃষ্টাব্দের অনূন ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র-মহাসমর হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের ৬০ বৎসর পরে জনমেজয় হস্তিনার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন।

যে সমস্ত নরপতি মহাভিষেক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকায় যুধিষ্ঠিরের নাম নাই, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর পাণি-গ্রহণ করা আর্য্য-শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচার, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ যুধিষ্ঠিরের অস্তিত্ব সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন কৌরব এবং পাঞ্চালগণের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল; কৌরবগণ পাঞ্চালগণের আবাস স্থানের কিয়দংশ অধিকার করেন (৪)। পাঞ্চালদিগের প্রদেশের উত্তরার্দ্ধ অর্জ্জুন অধিকার করেন এবং তথায় অহিচ্ছত্র নগর সংস্থাপন করেন। কৌরব এবং পঞ্চালদিগের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে সমর হইয়াছিল। পাঞ্চালবীর শিখণ্ডীর নিকট কৌরববীর ভীষ্ম পরাজিত হন্ কিন্তু কৌরব কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিয়াছেন যে:—

অর্জ্জুনস্য ইমে বাণাঃ নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিণঃ।

পাঞ্চালবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরববীর দ্রোণকে হত্যা করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। মহাভারতের আদি পর্ব্বের ৯৪ অধ্যায়ে যে কৌরবগণের বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার শেষ ভাগের কতিপয় শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। এই সমস্ত কারণ বশতঃ কতিপয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ যুধিষ্ঠিরের অস্তিত্বে সন্দেহ করেন। ইহা অতি গুরুতর প্রশ্ন, আমরা এই বৃত্তান্তে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

---

(১) ভাগবত ৯। ৩

(২) মহাভারত আদিপর্ব্ব ৭৪ অধ্যায়।

(৩) দ্রোণপর্ব্ব ৫ম অধ্যায়।

(৪) আদিপর্ব্ব ১৬৯ অধ্যায়।

কথিত আছে সর্পসত্র সম্পাদন সময় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য বৈশম্পায়ন হইতে জনমেজয় মহাভারত শ্রবণ করেন। কিন্তু কালক্রমে জনমেজয় এবং বৈশম্পায়ন মধ্যে কলহ হয়। জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন; তাহাতে তিনি বৈশম্পায়নের মতাবলম্বী অধ্বর্য্যু নিযুক্ত না করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের মতাবলম্বী শুক্ল যজুর্বেদীয় অধ্বর্য্যু নিযুক্ত করেন।

পরিশেষে জনমেজয় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তদীয় পুত্র শতানীক হস্তীনাপুরের সিংহাসনারোহণ করেন। শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদাধ্যায়ন করেন।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

চল্ সখি চল্!

চল্ সখি চল্!
লইতে এসেছি তোরে চল্ সখি চল্
সে ত লো দাঁড়ায়ে দূরে তোমারি অপেক্ষা করে,
চলিতে পারে না আর চরণ বিকল।
আমারে পাঠায়ে দিছে, সত্যি সই, নহে মিছে;
তোমার আশায় সে যে পাগল-পাগল।
ও নয়ন পানে চাহি, নিমেষেতে অবগাহি
সে নাকি দেখেছে তোর হৃদয়ের তল!
নীরব মধুর ভাষ, কতই আশ্বাস আশ,
মাখা ছিল নাকি তোর অধর যুগল!

চল্ সখি চল!
এমন সঙ্গতি আর পাওয়া সখি হবে ভার,
দোঁহারি সুহৃদ, চাহি দোঁহার মঙ্গল।
বহে অনুকূল বায়, আয় দেবি ত্বরা আয়,
অনুকূল স্রোতোধার বহিছে প্রবল!
কি লাভ সঙ্কোচ করি খুলেদে খুলেদে তরী,
মিলন বাসনা লও পথের সম্বল।

চল্ সখি চল্!

তপন উদিল নভে, তবু কি রহিবি ডুবে,
খোল্‌লো কমল-আঁখি, কনক-কমল!
হৃদয়েতে এত সাধ, ভেঙ্গে ফেল্ লাজ-বাঁধ,
কি লাভ করিলে ভয় কলঙ্ক কোঁদল?
প্রাণের সুরভিকণা, বারেক ছড়ায়ে দে না?
উপবাস উপহার কত দিবি বল্?
হায় লো কৃপণমেয়ে একরাশি রত্ন লয়ে
নিশিদিন কত আর কসিবি আঁচল।
সে যে লো কিরণ-করে চাহিছে ধরিতে তোরে
অনুমতি অপেক্ষায় বিলম্ব কেবল।

চল্ সখি চল্!

পর্ব্বত কন্দর কোলে, ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী খেলে,
আবেগ হৃদয়ে যবে হয়লো প্রবল,—
সে কি কোন বাঁধা মানে, যেতে দূর সিন্ধুপানে,
তরঙ্গ প্রহারে করে অচল চঞ্চল;
কত মত্ত ঐরাবত ভাসে লো পতঙ্গবৎ
থামে না যাবত পায় প্রেমিক-অতল;
সংসারের বাঁধা ভয় তুচ্ছ তার অতিশয়
অগম্য অবাধ-গতি প্রণয়-পাগল।

চল্ সখি চল্!

চির পরিচিত সেই, ইহাতে সংশয় নেই
জানি আমি, জানে তোর সুহৃদ্ সকল।
নিখিল দেখিতে জেনে, চাহিতে তাহার পানে,
কেন মুদে আসে তো'র আঁখি ঢল ঢল!
কত যত্ন চেষ্টা করে বারেক হেরিতে তোরে
কেন তার দৃষ্টি খানি ছোঁয়লো ভূতল?
যতেক সাপের হাঁচি, আমি বেদে ভাল বুঝি,

এ পথে প্রাচীনা বৃন্দা, বিজ্ঞাত-কৌশল।
তুক্ তাক্ যত আর, সব জানা আছে তার,
প্রেম-অভিধান খানি মুখস্থ সকল!
চল্ সখি চল্!

শ্রীমনোমোহন সেন গুপ্ত।

সমাজ-সংস্কার।

লক্ষ লক্ষ মানবের সুখশান্তির গুরুতর দায়িত্ব লইয়া সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ সমাজের সহিত এতদূর সংসৃষ্ট যে সমাজ হইতে তাহার পৃথক্ সত্তা উপলব্ধি করা যায় না। সমাজকে অনেকে বিধি-নির্দ্দিষ্ট মিলনক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন; অপূর্ণ মানুষের পূর্ণতা সাধন নিমিত্তই ঈশ্বর এই মিলন-বিধির প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। সমাজ যে মানবজাতির সার্ব্বভৌম মঙ্গলের কেন্দ্র তৎসম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না।

সময়ের অভিজ্ঞতা চয়ন করিয়া সমাজের অঙ্গপুষ্টি করিলে সমাজ সহসা বিকলাঙ্গ হইতে পারে না; শিক্ষা ও সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অভাব ও অপূর্ণতা স্পষ্টীভূত হয়; জ্ঞান ও ধর্ম্মের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নূতন পরিচ্ছদ আবশ্যক হইয়া পড়ে; সুতরাং সমাজ-সংস্কারের যে প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে?

সংস্কার যেমন সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার সহায়, সংরক্ষণও তেমনি উহার প্রাণ। যেখানে অকারণে বা অল্প কারণে নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে সেখানে সমাজ সহসা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনাবশ্যক পরিবর্ত্তন সমাজের উন্নতির প্রবল অন্তরায়। একখানি গৃহ প্রত্যহ স্থানান্তর করিতে হইলে সত্বরই উহার চালাখানি পর্য্যন্ত খসিয়া পড়ে। সমাজেও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ঘটাইতে গেলে উহার তন্ত্রীগুলি অচিরে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সমাজকে যতদূর সম্ভব অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রক্ষা করিতে হইবে। যাহা পুরাতন তাহাই ফেলিয়া দিতে হইবে, যাহা নূতন তাহাকেই আহ্বান করিতে হইবে, ইহা সংস্কার নহে; পরন্তু সংহারেরই ভিন্ন মূর্ত্তি। আকস্মিক ও অস্বাভাবিক বিপ্লব অপেক্ষা সমাজের ঘোরতর শত্রু আর নাই। যাহা এ পর্য্যন্ত সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া আছে অথবা যাহা

সমাজদেহে একরূপ সহিয়া গিয়াছে আবশ্যক হইলেও তাহাতে পরিবর্ত্তন ঘটাইবার পূর্ব্বে বহু চিন্তার প্রয়োজন। এই জন্য যাঁহারা Radical পরিবর্ত্তনই সংস্কারের ধর্ম্ম মনে করেন, তাঁহাদের সমাজ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নহে। যিনি সমাজের প্রকৃত নেতা বা সংস্কারক হইতে চাহেন, তাহাকে সর্ব্বাগ্রে সমাজের কোন্ অঙ্গে ক্ষত রহিয়াছে তাহা নিরূপণ করিতে হইবে; এবং উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিতে হইবে। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইলে তাহার ফল সর্ব্বদা কল্যাণপ্রদ হয় না; একটী স্ফোটককে অসময়ে কাটিয়া দিলে উহাতে প্রাণ নাশ অবশ্যম্ভাবী।

দেশ, কাল ও পাত্রের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। সমাজ-সৃষ্টির অন্তরালে এক গভীর জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। পৃথিবীর সুবিশাল সমাজগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, উহাতে ভূত ও বর্ত্তমানের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য এবং কালের অসীম প্রভাব বর্ত্তমান। ঐ সামঞ্জস্য সমাজের গ্রন্থি-সূত্র; উহার সঙ্গে যুগানুযায়ী সংস্কার গ্রথিত করিয়া দিতে হইবে; এই সূত্র ছিন্ন হইলে সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। সমাজের উপর দেশের প্রভাবও সামান্য নহে। অন্য সমাজে যাহা উৎকৃষ্ট তোমার সমাজে আসিলে তাহা অপকার করিতে পারে। আবার অন্য সমাজ, যাহা তোমার সমাজের দোষ বলিয়া মনে করে, সেগুলি বর্জ্জন করিতে যাও তোমার সমাজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না। এই বিশেষত্বগুলি সমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে; ইহাদের প্রতি সসম্ভ্রম দৃষ্টিপাত না করিলে সমাজের মেরুদণ্ডে আঘাত লাগিবে, সমাজ-সংস্কারের সকল প্রকার প্রয়াস নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

জনসাধারণকে নীতিমার্গে পরিচালিত করা সমাজের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। বহু সময়ে আমরা সংস্কারব্যপদেশে কতকগুলি চির প্রচলিত কল্যাণকর নিয়মের শিথিলতা ঘটাইয়া দিয়া সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত আনিয়া ফেলি। সমাজের বন্ধন একবার ছিন্ন হইলে সহস্র দুর্নীতি সমাজকে যুগপৎ আক্রমণ করে; তখন প্রবর্ত্তিত সংস্কারের ফল শুভ হওয়া দূরে থাকুক সমাজের যাহা উৎকৃষ্ট তাহাও ঐ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যায়। সুতরাং সমাজ-সংস্কারের পূর্ব্বে সমাজে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যাহা এ পর্য্যন্ত শুভফল প্রসব করিয়াছে, সমাজে ধর্ম্ম ও নীতি রক্ষার সহায় হইয়াছে, হইতে পারে তাহা কুসংস্কার বর্জ্জিত নহে; তথাপি উন্নততর প্রণালীতে ঐ সুফলগুলি প্রাপ্ত হইবার কোন বিধান না করিয়া

প্রচলিত প্রথাগুলির উচ্ছেদ সাধন করিলে, কি তৎপ্রতি লোকের শ্রদ্ধা সঙ্কুচিত করিয়া দিলে বহু সময়েই উহার ফল শুভ হয় না।

ধর্ম্মের বন্ধনের সহিত সমাজনীতিগুলি একীভূত হইয়া পড়িলেই সমাজের ভিত্তি দৃঢ় ও সমাজ সদাচারসম্পন্ন হয়। যে সমাজে ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি হইতে পৃথক্, তাহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা অল্প এবং সে সমাজ পশুভাবের প্রাবল্য বিরল নহে। অতএব লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। নচেৎ সংস্কারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। নিম্ন শ্রেণীকে সমাজ হইতে বর্জ্জন করিলে চলে না। যাহা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সহসা প্রচলিত হইলে নিম্নশ্রেণী ধর্ম্মহীনতা বলিয়া মনে করিতে পারে তাহাতে একটু ধীরতা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। কারণ উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের প্রতি নিম্নশ্রেণীর অগাধ বিশ্বাস না থাকিলে নিম্নশ্রেণী উচ্চশ্রেণীর আদর্শে গঠিত হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে, যেখানে কোন প্রয়োজনীয় সংস্কার জনসাধারণের বিশ্বাসের প্রতিকূলে দাঁড়ায় সেখানে কি করা কর্ত্তব্য? তখন কর্ত্তব্য এই,—সর্ব্বসাধারণকে সংস্কারটীর উপযোগিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে; উহাতে যে ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা নাই সর্ব্বসাধারণের মনে এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে; এবং সাধারণের মনে অভিনব মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে হইবে। যাঁহারা জনসাধারণের মতামত উপেক্ষা করিয়া সংস্কারের প্রয়াসী তাঁহারা সাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় সমাজের পংক্তি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িবেন। বলা বাহুল্য এই অবস্থায় সমাজ-সংস্কার সাধিত হইতে পারে না।

সমাজের সহিত যাঁহার সহানুভূতি নাই, কিংবা সমাজে প্রচলিত প্রথাগুলি যিনি অনুকূলনেত্রে নিরীক্ষণ না করেন, তাঁহার সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। সমাজের সংস্কার সাধন করিতে হইলে সমাজকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে হইবে, সমাজের সমস্ত অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে। সমাজের বিধি ব্যবস্থায় যিনি অনুরাগহীন, আচার ব্যবহারে যিনি নিষ্ঠাবান্ নহেন, সমাজের উপর কার্য্য করিবার শক্তি তাহার অতি সামান্য। কেবল যুক্তি তর্কের আশ্রয় লইয়া সমাজ-সংস্কার সাধিত হইতে পারে না। অনুরাগ চাই, ভালবাসা চাই, প্রীতির আকর্ষণ চাই এবং সর্ব্বোপরি নৈতিক বল ও আত্মসংযম চাই।

জাতীয়ত্বের গৌরব জাতীয় উন্নতির মূলমন্ত্র। যে জাতিতে জাতীয়ত্বের সম্মান

নাই সে জাতি চিরদিন পরপদাবলেহন করিবে বিচিত্র নহে। জাত্য অভিমান যতদিন হৃদয়ে প্রবল থাকিবে ততদিন শত অধীনতা শত অত্যাচারেও কোন জাতির সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন হবে না। জাতীয় অভিমানের মূল ভিত্তি সমাজ ও ধর্ম্ম। এই দুইটী সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়াই হিন্দুজাতি সহস্র বৎসরের অধীনতার মধ্যেও স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। এক এক জাতির মধ্যে এই জাতীয়ত্বের প্রবল তরঙ্গ এক এক ভাবে নৃত্য করিতেছে; উহাকে সর্ব্বাগ্রে সযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহার বিনাশ হইলে সমগ্র জাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। হিন্দুজাতি শত অত্যাচার শত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের জাতীয়ত্বের প্রবল অভিমান ছিল বলিয়াই আজও তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশিয়া যায় নাই। জ্ঞান ও ধর্ম্ম মূলে অবস্থিত না থাকিলে জাতীয়ত্বের ভিত্তি দৃঢ় হয় না। অজ্ঞান ও অন্ধ বিশ্বাস লইয়া কোন জাতি আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারে না। হিন্দুজাতি যে এতদিন অটলভাবে দণ্ডায়মান আছে তাহার কারণ তাঁহাদের সমাজ-ধর্ম্মের মূলে গভীর জ্ঞান ও সত্য নিহিত আছে। যাঁহারা এই প্রাচীন জাতির সংস্কার করিতে চাহেন, তাঁহারা সেই জ্ঞান ও সত্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কি না একবার ভাবিয়া দেখিবেন। যে জাতি একদিন সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মজগতে চিরদিন প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সমাজ, তাঁহাদের আচার ব্যবহার এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে। সত্য বটে প্রাচীনত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশাল সমাজে অনেক আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু তৎসমুদায় দূরীকরণের এমন কি তাহা নিরূপণের ও উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই। কেবল বিদেশীয় আদর্শানুরূপ গঠনের প্রয়াসই দেখা যাইতেছে।

হিন্দুসমাজের উপর দিয়া বহু বিপ্লবের তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে; পরাধীনতার সময়ে কত বিরুদ্ধ শক্তির সহিত ইহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর, এই কারণ হিন্দুর সামাজিক বন্ধন একটু কঠোর করিতে হইয়াছিল। তাহার পর এদেশে আর স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় নাই; সে কঠোর বন্ধনগুলি তেমনই ভাবে রহিয়া গিয়াছে। এখন যুগধর্ম্মের নূতন শিক্ষায় লোকের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; সময়ের প্রবর্ত্তনায় নূতন অভাব অভিযোগের সৃষ্টি হইয়াছে; কাজেই প্রাচীন সমাজবন্ধনের সহিত এখন প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাঁহারা এ দেশে সমাজ-সংস্কারের কোলাহল তুলিয়াছেন তাঁহারা উপযুক্ত বা প্রকৃত পন্থার অনুসরণ করিতে পারেন নাই। সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যে যে বিষয়ে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য, এ দেশে পদে পদে তাহা লঙ্ঘিত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ চিরদিন ভারতীয় সমাজের কর্ণধার ছিলেন আজ আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিতেছি ; তাঁহাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাইলে এ দেশের প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলি বহু পূর্ব্বে সংসাধিত হইত। কিন্তু তাঁহারা উপেক্ষা ও অবজ্ঞা মাত্র পুরস্কার লইয়া সমাজের একপ্রান্তে মলিন বেশে অবস্থান করিতেছেন। একদিকে শিক্ষিত (পাশ্চাত্যালোকপ্রাপ্ত) সমাজ স্বচ্ছন্দ মনে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া সমাজশক্তি দুর্ব্বল করিতেছেন, অন্যদিকে জীর্ণ শীর্ণ পণ্ডিত সমাজ আপনাদের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সমাজগণ্ডী দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক সংস্কারের পথ রুদ্ধ করিতেছেন। আমরা পণ্ডিত সমাজের শক্তি খর্ব্ব করিয়াছি বটে কিন্তু তাঁহাদের স্থান পূরণ করিবার কোনও প্রকার সুব্যবস্থা করি নাই। সমাজস্থিত পরিচালকগণকে দূর করিয়াছি কিন্তু সমাজের ভার উপযুক্ত হস্তে অর্পণ করিবার কোনও চেষ্টাই করি নাই। এ অবস্থায় পরিচালকহীন হইয়া সমাজ দুরবস্থার নিম্নতম স্তরে নিমজ্জিত হইবে বিচিত্র কি? বস্তুতঃ হিন্দুসমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবল স্রোত বহিয়াছে উহা ভবিষ্যতের সমস্ত আশাকে মলিন করিয়া দিতেছে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। দেশীয় শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ তাহাদের ঘটে নাই। বিজাতীয় শিক্ষার মোহে দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি তাঁহাদের একটা বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। হিন্দুর কঠোর নীতিকে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করিয়া চলিতে চাহেন ; পাশ্চাত্য আদর্শে পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-কেই তাঁহারা একমাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। হিন্দুসমাজের কঠোরতার মধ্যে সংযমের যে একটা পবিত্র ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে তৎপ্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই ; তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সংযম জাতীয় শক্তিকে অব্যাহত রাখে, উহার অভাবে জাতীয় প্রকৃতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনাবশ্যক ভাবে সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শিক্ষিত সমাজ যে পাপ-সঞ্চয় করিয়াছেন তাহার ফলেই হিন্দুজাতি আজ মস্তকোত্তলন করিতে পারিতেছে না—হিন্দুর জাতীয় প্রকৃতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, জাতীয়ত্বের অভিমান ধীরে ধীরে বিসর্জ্জিত হইতেছে, তাঁহারা ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন ও বিশ্বাসহীন হইয়া উঠিতেছেন ; দুর্নীতির

পশ্চিম স্রোতে পবিত্র হিন্দু সমাজের অঙ্গ মলিন হইতেছে ; দরিদ্র জাতির পরম শত্রু বিলাসিতা হিন্দুসমাজে অবাধ প্রবেশাধিকার পাইয়া উহাকে অন্তঃসারশূন্য করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজে একটী প্রবল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এক পক্ষের মত এই "বিদেশে গমন ব্যতীত আমাদের বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার অন্য সুবিধা নাই; জাতীয় উন্নতি বহু পরিমাণে ইহার উপর নির্ভর করিতেছে।" তঁহারা আরও বলেন, জাতিভেদ বা খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব নাই। ইঁহাদের যুক্তি অনুসারে চলিতে গেলে হিন্দু সমাজের ভিত্তি উৎপাটন করিতে হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হিন্দুর অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে উহাকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে গেলে সমাজে বিদ্রোহ ঘটিবে, সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। এদিকে যাঁহারা প্রাচীন মতাবলম্বী, তাঁহাদের মতে বিদেশগমন মহাপাপ। ইঁহাদের মত বহু স্থলে উপেক্ষিত হইতেছে; যাঁহার সুযোগ ও সুবিধা ঘটিতেছে তিনিই সমাজের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিদেশে গমন করিতেছেন। দেশে স্বেচ্ছাচারের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতেছে। এ অবস্থায়ও সমাজের রক্ষা পাওয়া দুষ্কর।

এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি তাহা প্রত্যেক স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তির ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সমাজ ও ধর্ম্ম বাদ দিয়া দেশ উদ্ধার করিতে চাহেন তাঁহাদের দূরদর্শিতায় আমরা আস্থাবান্ নহি। ইহার ভীষণ কুফল তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই যে, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না পাইলে জাতি রক্ষা পায় না। বস্তুতঃ জাতীয় স্বাতন্ত্র্যই প্রবল শত্রুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র বল।

এই স্থানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। সমাজে বিপ্লব ঘটাইতে আমরা যতখানি শক্তি ব্যয় করিয়াছি, সামাজিক বন্ধন রক্ষা করিয়াও আমরা ঐ শক্তিতে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতাম। যাঁহারা বেদ বেদাঙ্গ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে এবং আর্য্যসমাজে সমুদ্রযাত্রা চিরকাল প্রচলিত ছিল; তাঁহারা এ কথা প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে, আর্য্যগণ বিধর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত জলযানে সমুদ্রযাত্রা করিতেন। সুতরাং প্রাচীন প্রথার দোহাই দিয়াই গোল মিটিতেছে কই ? আমরা যেখানে যাই, ধর্ম্ম ও জাতীয় আচার ব্যবহার ইত্যাদি যাহাতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে

বৈদেশিকের নিকট যেমন আমাদের একটা মূল্য প্রতিষ্ঠিত হইত, আমাদের সমাজ ও তেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এ কথায় যাহারা উপহাস করিয়া উঠিবেন তাহাদিগকে আমরা পণ্ডিত শ্যামাজি কৃষ্ণ বর্ম্মার ইণ্ডিয়া হাউসের (India House) প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি। এক জনের চেষ্টায় একটা হইলে দেশের শতজনের চেষ্টায় শত উপায় অবলম্বিত হইতে পারে।

যাহা হউক আমাদের ধারণা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে আবার সজাগ করিতে হইবে; তাঁহাদের অধিকার আবার তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ আমাদের সমাজ আর আপন পদে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না। সামাজিক অবসাদ জাতীয় অবসাদের পূর্ব্ব লক্ষণ ইহা প্রত্যেকের মনে করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এদেশে থাকিয়া Liberal Hindoo আখ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক সমাজকে স্বেচ্ছাচারের অতল জলে ডুবাইতেছেন তাহাদিগকে আমরা কি বলিব ভাবিয়া পাই না। তাঁহারা বিজাতীয় আচার ব্যবহারে আত্মবিক্রয় করিয়া যেমন স্বদেশের অকল্যাণ ঘটাইতেছেন তেমনি ভবিষ্যতের সমস্ত সংস্কারের আশা নষ্ট করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা একবার নিজেদের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। উদারনৈতিক হওয়া দূষণীয় নহে; কিন্তু তাই বলিয়া কেহ স্বীয় গৃহদ্বার শত্রুর নিকট মুক্ত করিয়া দেয় না।

প্রাচীন ও নূতনের মিলন ঘটাইতে হইবে। এ দেশের শাস্ত্রকে অব্যাহত রাখিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল তাহাতে যোগ করিতে হইবে; এরূপ না হইলে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হইবে না। সমাজের দুর্ব্বলতা চিরদিন থাকিয়া যাইবে।

সান্ত্বনা।

আমি যদি মরি আগে সত্য বলি প্রিয়ে
রহিব দিবস নিশি নিকটে তোমার,
সমীরণ হ'য়ে যাব কাণে কাণে গেয়ে
গভীর আবেগপূর্ণ সঙ্গীত হিয়ার।
কোমল কুসুম হ'য়ে প্রভাত কিরণে
তোমারি সম্মুখে প্রিয়ে রহিব ফুটিয়া,

অনিমিষে চাহি তব ম্লান মুখ পানে
এক বিন্দু শিশিরাশ্রু যাইব ফেলিয়া।
নিশীথে জাগ্রত তুমি রবে যতক্ষণ
তারকা হইয়া আমি চেয়ে রবো সখি,
পশিব মরমে হয়ে মধুর স্বপন
নিদ্রাবেশে হবে যবে নিমীলিত আঁখি।
মরণেও নাহি হবে বিচ্ছেদ কখন
তোমারি নিকটে আমি রবো অনুক্ষণ।

শ্রীসতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

বিদায়।

মা! মা! জননী জন্মভূমি! বিদায় দাও। মা! তোর ভূমিত ভূমিষ্ঠ হইয়াছি; তোর স্তন্য পানে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছি; তোর মাটি ধরিয়া উঠিতে শিখিয়াছি; তোর জল-বায়ু, আয়ু-স্বাস্থ্য-বল বিধান করিয়াছে; তোর রবিকরদীপ্ত পবন-শীতল সমতল ভূমিতে ভাই ভাই হাতে হাতে ধরিয়া ছুটাছুটি করিয়াছি; তোর কোলে বসিয়া হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি, খেলিয়াছি; আজ সে সব অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলাম, আর তোকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিব না, তোর সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদানের অধিকার রহিল না। তাই বলিতেছিলাম জননী জন্মভূমি হতভাগ্য সন্তানদিগকে বিদায় দাও।

জননি! হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, বিদায় চাহিতে আজ হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এ নিষ্ঠুর বাণী উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে দেবতার নিকট শতবার মৃত্যুকামনা করিয়াছিলাম, কই মরণ-ত ঘটিল না। বুঝিয়াছি—বাসবের বজ্র অসুর-নিপাতনে হীনবীর্য্য হইয়াছে; শিবের ত্রিশূল শবদেহ ব্যবচ্ছেদে বিভগ্ন হইয়াছে; দ্বাপরের অতি ঘূর্ণনে নারায়ণের চক্র বক্র হইয়া গিয়াছে এবং বরুণ অরুণতাপে স্বীয় পাশ অস্ত্র দগ্ধ করিয়া কলিতে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন; অথবা বুঝিয়াছি, হতভাগ্যের দীর্ঘজীবন বিধাতার বাঞ্ছনীয়। ব্যথিতের জীবনকাহিনী বিবৃত করিতে যাইয়া কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তা'য়
চিরজীবি করিল গোঁসাই।"

মা! জননীর কোল ছাড়িয়া সন্তান কি সহজে অন্যত্র যাইতে চাহে।

বহু কাঁদিয়াছি, বহু অভাব-অসুবিধা ও ভয়-ভাবনার কথা রাজ-সিংহাসন সমীপে উপস্থিত করিয়াছি; আবেদন-নিবেদনে, ক্রন্দন-কোলাহলে রাজার সিদ্ধান্ত টলাইতে অথবা মন গলাইতে পারি নাই। সুতরাং তোমার কোল ছাড়িয়া অকূলে ভাসিতেই হইল। ডুবিব কি ভাসিব, মরিব কি বাঁচিব জানি না। জননি! আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দাও।

মা! পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে চলিয়াছি; লোকালয় ছাড়িয়া বনে চলিয়াছি, মনে বড় ভয়—বড় ভাবনা; জানি না, সে দেশের রীতিনীতি কেমন—শরীরের রক্ত জল করিয়া যাহা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহা রক্ষা করিতে পারিব কি অপহৃত হইবে—সে দেশের জলবায়ু আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল কি প্রতিকূল হইবে; জানি না, সে দেশের তপন কেমন তাপ প্রদান করে—চন্দ্রে অমৃত কি গরল ক্ষরিত হয়—সে দেশের পাখী কি রাগিনীতে গান গায়। মা! অপরিচিতের কোলে নূতন সংসার পাতিতে চলিয়াছি; ভরসা মা জগদম্বা। মা! মস্তকে পদধূলি দিয়া বিদায় দাও।

মা! অই আসিতেছে, ভয়ঙ্কর কালভৈরবের মত ১৬ই অক্টোবর অই আসিতেছে, আর নিস্তার নাই—যাইতেই হইবে। মা! হতভাগ্য সন্তানদিগকে ভুলিও না। জননি! যেখানে যে ভাবেই থাকি না কেন তোমাকেই মা বলিয়া ডাকিব, তোর সন্তান বলিয়াই লোকের কাছে পরিচয় দিব; ত্রিসন্ধ্যা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মধুর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোর পদেই প্রণিপাত করিব। মা! হাস্যমুখে বিদায় দাও।

ভাই পশ্চিম বঙ্গবাসি! তোমরাও বিদায় দাও। তোমাদের সহবাসে বড় সুখে কাল কাটাইয়াছি। একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সকলে একই কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছি। একের দুঃখে অপরে অশ্রুপাত করিয়াছি, একের সুখ-সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া অপরে উৎফুল্ল হইয়াছি,—পরস্পরের মধ্যে এমনই একটা প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হইয়াছিল। আজ গ্রহবৈগুণ্যে ভাইয়ের নিকট ভাইকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। যাই ভাই—যাই; ভাই বলিয়া মনে রাখিও, বিপদে পড়িয়া চীৎকার করিলে অগ্রসর হইয়া অভয়দান করিও, নয়নের অশ্রু মুছাইয়া দিও।

জননী বঙ্গভূমি! ভাই বঙ্গবাসি! আর সময় নাই। তোমরা সকলে প্রসন্ন বদনে শুভ কামনা করিয়া এ হতভাগ্যদিগকে বিদায় দাও।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, আশ্বিন ১৩১২। } নবম সংখ্যা।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

(সম্রাট হুমায়নের বঙ্গ-বিজয়।)

সম্রাট হুমায়ন চুণারের শক্তিশালী দুর্গ অধিকার করতঃ বঙ্গদেশাভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। বেণারসে পঁহুছিয়া তিনি শের খাঁর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। বেণারসের রাজা বুঙ্গ তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন যে, শের খাঁ এখন বঙ্গরাজ্যের রাজধানী গৌড়নগর আক্রমণে ব্যস্ত। যে কোনও সময়ে তাহা অধিকার করিবার সম্ভাবনা আছে এবং বোধ হয় এতদিন তিনি সমগ্র প্রদেশ স্বাধিকারে আনয়ন করিয়াছেন। সম্রাট বলিলেন যে, আফগানেরা যাহাতে একত্র সম্মিলিত হইতে না পারে, তজ্জন্য তিনি রোটাসের * দুর্গ তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন। সম্রাট তৎপর ভারখণ্ড (ঝারখণ্ড) জেলা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন কিন্তু শোণনদী তীরে উপনীত হইয়া সংবাদ পাইলেন যে, শের খাঁ গৌড়নগর অধিকার করিয়াছেন এবং তথাকার সমস্ত ধনরত্ন রোটাস দুর্গে স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন করিতেছেন।

এই সংবাদে সম্রাট, যুবরাজ হিন্দল এবং যোদগার মীর্জ্জাকে দিল্লী ও আগ্রা রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া নিজে বঙ্গ-অভিমুখে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। যুবরাজ ও মীর্জ্জা সম্রাটকে আশ্বাস দিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, সম্রাট ভারখণ্ড উদ্দেশ্যে যাত্রা করতঃ শের খাঁকে, হোসেন (Turkuman) নামক দূতের মারফত লিখিয়া পাঠাইলেন,—"তুমি অবিলম্বে সম্রাটের নিকট রাজছত্র, সিংহাসন এবং বঙ্গের ধনরত্ন পাঠাইবে, রোটাস দুর্গ পরিত্যাগ

* See Edinburgh Gagetteer, or History of Bengal.

করিবে এবং যে সকল রাজ্য অধিকার করিয়াছ তাহা ছাড়িয়া দিবে। এতদ্বিনিময়ে তুমি চুণার দুর্গ, জোয়ানপুর নগর এবং তোমার ইচ্ছামত অন্য কোনও স্থান লইতে পার।"

শের খাঁ সমাদরের সহিত দূতের অভ্যর্থনা করিয়া উত্তর দিলেন,—"বঙ্গ বিজয় করিতে আমার ৫।৬ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, আমার প্রভূত পরিমাণ সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় সেই বিজয়লব্ধ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" দূত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাটকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন যে, শের খাঁ বিপুলবাহিনী সহ পার্ব্বত্য পথে ধনরত্নাদি লইয়া রোটাস অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন।

সম্রাট-সৈন্য মুনিয়া (শোণ ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত) পঁহুছিলে বঙ্গের সিংহাসনচ্যুত নরপতি সৈয়দ মামুদ আসিয়া মিলিত হইলেন *। তিনি যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের সময় গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। মামুদ বলিলেন যে, বঙ্গে এখনও তাঁহার শস্যাগার ও রসদাদি আছে, তদ্দ্বারা বিপুলবাহিনীর বহু দিবস চলিয়া যাইবে। সম্রাট তদভিমুখে অগ্রসর হইলেই ভাল হয়। হুমায়ন রাজ্যচ্যুত নরপতিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তিনি তাঁহাকেই পুনরায় বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

মুনিয়া হইতে সম্রাট, প্রথমে একদল সামর্থ্যশালী সৈন্যসহ জাহাঙ্গীর কুলীকে তেলিয়াঘরি ও শাকরিগলির গিরিবর্ত্ম অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। জাহাঙ্গীর দ্রুত অগ্রসর হইয়া গিরিবর্ত্মের সন্নিকট পৌছিয়া দেখিলেন, শের খাঁর পুত্র জেলাল খাঁ উহার ঘাঁটিবন্দ ও শিবিরে বিপুল সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া বসিয়া আছে। সম্রাট-সৈন্যকে বাধ্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হইল। ইত্যবসরে তাহারা পর্ব্বতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় জেলাল খাঁ অতর্কিত অবস্থায় তাহাদের শিবির আক্রমণ করতঃ কতিপয় সাহসী যোদ্ধার প্রাণ বিনাশ করে। এই ঘটনায় অগ্রবর্ত্তী দলকে প্রত্যাবৃত্ত এবং ফলগং এ আসিয়া সম্রাটের সহিত মিলিত হইতে হইল। মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকায় কয়েকদিন হইতে সম্রাট এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। হাজী মহাম্মদ বেগ পুনরায় পথ আবিষ্কার এবং অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরিত হন।

* See History of Bengal, Page 121.

হাজী গিরিবর্ত্মের নিকট উপনীত হইয়া জানিলেন, শের খাঁ তাঁহার পুত্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বঙ্গের সমস্ত ধনরত্ন নিরাপদে রক্ষিত হইয়াছে, এখন মোগলদিগের প্রবেশ জন্য পথ ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে বিব্রত করিবার জন্য কোনও উপায় করিতে হইবে। এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জেলাল পুনঃ প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই অভাবনীয় সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র হাজী আনন্দ প্রকাশ করিয়া সম্রাটের নিকট দুইজন কর্ম্মচারীদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমাদের পক্ষের জয় হইয়াছে, আমরা গিরিবর্ত্ম অধিকার করিয়াছি। সম্রাট এই সমাচার জ্ঞাত হইবা মাত্র সমগ্র বাহিনীসহ অগ্রসর হইলেন এবং চারিদিনে অনায়াসে সমস্ত আফগান-দিগকে বিতাড়িত করিয়া বঙ্গের রাজধানী গৌড়নগর অধিকার করিলেন *।

গৌড় নগরের পুনঃ সংস্কার করিয়া সম্রাট প্রথমতঃ ঐ প্রদেশকে জায়গীর স্বরূপে তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। তৎপর হারামে প্রবেশ করিয়া আমোদ আহ্লাদ ও বিলাস-তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া দিলেন। সম্রাট যখন এই ভাবে আমোদ আহ্লাদ দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করিতেছিলেন, তখন সংবাদ আসিল যে, শের খাঁ সাত হাজার মোগলকে হত্যা করিয়া চুণার দুর্গ ও বেণারস সহর অধিকার করিয়াছেন এবং কণোজ অধিকারের নিমিত্ত গঙ্গার তীর দিয়া একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আরও সংবাদ আসে যে, শের খাঁ মোগল কর্ম্মচারীদিগের পরিবারবর্গকে ধৃত করতঃ বন্দী করিয়া রোটাসে পাঠাইয়াছেন।

এই অশুভ সংবাদ শ্রবণে সম্রাট প্রথমে তাহা বিশ্বাস করিতে চান না। তিনি বলিলেন,—"এইরূপ অসীমসাহসিক কার্য্য করা শের খাঁর পক্ষে অসম্ভব।" তৎপর বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া কি করা কর্ত্তব্য এবং বঙ্গদেশ কাহার অধীনে রাখা যায়, তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ম্মচারিগণ উত্তর করিলেন,—"সম্রাট যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই উক্ত পদে উন্নীত করিয়া সম্মানিত করিতে পারেন।" সম্রাট বলিলেন,—"জাহিদ বেগ সদাসর্ব্বদা উন্নতির জন্য প্রার্থনা করে, আমি আপাততঃ তাহাকেই বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম, অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও স্ব স্ব সৈন্যাদি সহ তাঁহার নিকট থাকিবে।" জাহিদ বেগ সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বঙ্গদেশ লইতে অসম্মত হইয়া বলিলেন,—"আমার বঙ্গদেশে

* See History of Bengal, Page 123.

মাটী করা ভিন্ন কি আর কোনও স্থান পাইলেন না।" তাহার বাক্য শ্রবণে সম্রাট অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন,—"আমি এই পাপিষ্ঠকে নিশ্চয়ই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিব।" জাহিদ বেগ তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

জাহিদ বেগের এইরূপ স্পর্দ্ধার কারণ এই যে, সম্রাটের এক উপপত্নীর বাইক বেগম নাম্নী এক ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। জাহিদ তৎক্ষণাৎ বেগমের নিকট উপনীত হইয়া সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিলেন। বেগম তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিতে সম্রাটকে বিশেষ অনুরোধ এমন কি পীড়াপীড়িও করেন; কিন্তু সম্রাটের সেই একই উত্তর—"আমি উহাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিব।" বেগম বিফল মনোরথ হইয়া জাহিদকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার কার্য্যোদ্ধার হয় নাই, সুতরাং নিজের উদ্ধারের পথ নিজে দেখুন। এই সংবাদ পাইয়া জাহিদ অপর দুইজন কর্ম্মচারীর সহিত পলায়নপর হন এবং নিরাপদে আগরায় উপনীত হইয়া যুবরাজ হিন্দালের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দরবার ভঙ্গ হইলে সম্রাট অগ্রগামী সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া খাঁ খাঁন লোডীকে মুঙ্গের যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। লোডী তদনুসারে মুঙ্গের উপনীত হইয়া প্রধান সৈন্যদলের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সম্রাট ইত্যবসরে বঙ্গদেশের বিষয়-বন্দোবস্ত স্থির করতঃ জাহাঙ্গীর কুলীকে তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। গন্তব্যস্থানে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সম্রাট শুনিতে পাইলেন, শের খাঁর প্রেরিত একদল সৈন্য হঠাৎ মুঙ্গের আক্রমণ করিয়া সহরের সিংহদ্বার ভস্মসাৎ করিয়াছে এবং খাঁ খানকে বন্দী করিয়া শের খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়াছে *।

এই ঘটনায় সম্রাট অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহার প্রধান সেনাপতি যুবরাজ আসকারীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তবে তিনি যাহা চাহিবেন সম্রাট তাহাই তাঁহাকে প্রদান করিবেন। যুবরাজ বলেন যে, তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার উত্তর দিবেন। কর্ম্মচারীবৃন্দকে একত্রিত করিয়া যুবরাজ ইতিকর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহারা বলিলেন,—"জাহাপনার

---

* লোডী আফগান ছিলেন। ষ্টুয়ার্ট অনুমান করেন যে, ইনি সম্ভবতঃ শের খাঁর সহিত গোপনে বিদ্রোহিতার পরামর্শ করিতেন।

কি অভিপ্রায়?" যুবরাজ বলিলেন,—"আমি কিছু টাকা, বঙ্গদেশের কতিপয় মূল্যবান শিল্প দ্রব্য, গুটিকতক হস্তী এবং কতিপয় খোজা-প্রহরী চাই *।" কর্ম্মচারীবৃন্দ এই উত্তরে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যুবরাজ তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট হইতে দেখিয়া, তাহাদের অভিমত সরলভাবে ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। অবশেষে কর্ম্মচারীবৃন্দ প্রকাশ করিলেন,—"সম্রাট এখন শের খাঁর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপদাপন্ন হইয়াছেন; আমাদের সাহস ও সাহায্য ব্যতীত তাঁহার আর উদ্ধারের আশা নাই। এই সময়ে আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু চাওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ আমাদের ফৌজের সংখ্যা ও বেতন বৃদ্ধি করিবেন। দ্বিতীয়তঃ প্রচুর পরিমাণে নগদ টাকা দিবেন। তিনি যদি ইহাতে সম্মত হন, তবে শের খাঁ যাহাতে তাঁহার আর কোনও ক্ষতি করিতে না পারেন আমরা তাহার উপায় করিব।" আসকারী এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সম্রাটকে উক্ত বিষয় বলিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া কিছু নগদ টাকা এবং কয়েকটী সামগ্রী উপহার পাঠান। তৎসঙ্গে একদল সাহসী যোদ্ধা এবং প্রধান কর্ম্মচারীও প্রেরিত হয়। তৎপর সম্রাট যুবরাজকে শত্রুর বিপক্ষে অগ্রসর হইতে এবং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া প্রধান সেনাদলের উপস্থিত পর্য্যন্ত কলগং এ অপেক্ষা করিতে এবং ইতিমধ্যে শের খাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারেন তাহাও তাহাকে জ্ঞাপন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে আসকারী কলগং হইতে সংবাদ পাঠান যে, শের খাঁ এখন চুণার এবং জোয়ানপুর আক্রমণ করিতেছে এবং সত্যই শের খাঁ কণোজ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছে। তিনি রোটাসের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে আরও সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং পশ্চিম প্রদেশে অগ্রসর হইবার পন্থা সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিয়াছেন।

এই অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সম্রাট মুঙ্গের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া নদীর উত্তর তীরে উপনীত হইলেন এবং যুবরাজ আসকারী ও অগ্রবর্ত্তী সেনাদলের আগমন জন্য তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সম্রাট এই সময় আমীর ওমরাহদিগকে আহ্বান করিয়া এক দরবারে বসিলেন। সম্রাট পারিষদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা এখন গঙ্গা পার হইবেন কি উত্তর তীর দিয়াই অগ্রসর হইবেন। কোনও কোনও সরদার

---

* আইন আকবরীতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে বিশেষতঃ শ্রীহট্টে খোজা বিক্রয়ের বিপণি ছিল। See Vol. 1, Page 10.

নদীর উত্তর তীর দিয়া অগ্রসর হইয়া জোয়ানপুর যাইতে পরামর্শ দেয়। পরে তথায় বিশ্রাম করিয়া গন্তব্যস্থানে অগ্রসর হইবার পক্ষে যাহা সঙ্গত বিবেচিত হয় তাহা করা যাইবে, এরূপ স্থিরীকৃত হইল।

মুভিদ বেগকে সম্রাট অতিরিক্ত বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, আমরা যদি গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া অগ্রসর না হই, তবে শের খাঁ মনে করিবে যে, সম্রাট তাহার ভয়ে ভীত। এবং তিনি—"যখন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় তখন জ্ঞানী ব্যক্তিরও চক্ষু অন্ধ হয় ;" এই প্রবাদ বাক্যটী আবৃত্তি করিলেন। অতঃপর মুভিদ বেগের পরামর্শই গৃহীত হইল *।

মোগলসৈন্য গঙ্গা পার হইয়া শোণনদীর মুখে মুনিয়াতে উপনীত হইল। এখানে প্রসিদ্ধ সাধু জেহীর সমাধি-মন্দির অবস্থিত ছিল। এখানে সৈন্যগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল যে, বিপক্ষগণ যে কোনও মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইতে পারে, সুতরাং তাহারা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। প্রকৃতই পরদিবস একদল বিপক্ষ সেনার অভ্যুদয় হওয়ায় উভয়পক্ষে একটী খণ্ড যুদ্ধের অভিনয় হইয়া গেল।

পরদিবস সংবাদ আসিল, চুণার যুদ্ধে ব্যবহৃত বৃহৎ কামানগুলি যে নৌকায় ছিল, বিপক্ষীয়েরা তাহা হস্তগত করিয়াছে। এই সংবাদে সম্রাট অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া সৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। চতুর্থ দিবস যখন চৌসারের † সন্নিকটে শিবির সংস্থাপিত হইল তখন শের শাহের সৈন্যদল দ্রুত অগ্রসর হইয়া দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। শত্রুসৈন্য দর্শনে সম্রাট সরদারগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে কাসিম হোসেন বলিল,—"যেহেতু বিপক্ষদল অদ্য ৩৬ মাইল অগ্রসর হইয়াছে, ইহাতে তাহারা ও তাহাদের অশ্বসমূহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে আমরা বেশ সুস্থ আছি। সুতরাং অবিলম্বে তাহাদিগকে আক্রমণ করা উচিত। তারপর দেখা যাক্, ভগবান

* ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন,—"It appears extraordinary why the high road between Benaras and Gour should have been conducted on the south side of the Ganges. The king certainly owed his misfortune to having made use of it, instead of passing by Hajighur."

† এখানে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ও সুজাদ্দৌলার সঙ্গে একটী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহা সাধারণতঃ বক্সারের যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়।

কাহাকে জয়মাল্যে বিভূষিত করেন।" সম্রাট এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু মুভিদ বেগ পুনরায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, তাড়াতাড়ি করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। অবশেষে সম্রাট শেষোক্ত প্রস্তাবেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন কিন্তু সৈন্যদল নিরুৎসাহ হইয়া গেল।

শের খাঁও শিবিরের চতুঃপার্শ্বে পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে প্রায় দুইমাস অতিবাহিত হইল কিন্তু প্রত্যহই উভয়পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল, ইহাতে উভয় পক্ষেরই অনেকগুলি রণকুশল-যোদ্ধা অনন্ত নিদ্রাভিভূত হয়। এই সময় প্রবল বেগে বর্ষা নামিল। শের খাঁর শিবির জলাশয়ের অতি নিকট ছিল, কাজেই তাহাকে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া ৫।৬ মাইল পশ্চিমে একটী পর্ব্বতের সানুদেশে শিবির সন্নিবেশ করিতে হইল। কিন্তু খণ্ড যুদ্ধের বিরাম নাই, শেষে মোগল সম্রাট বিপক্ষের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের অবসান করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। তদনুসারে প্রসিদ্ধ সাধু ফেরিদ শেখেরগঞ্জের বংশধর সুবিখ্যাত সেখ খেলিল সন্ধি-সর্ত্ত সুস্থির করিতে শের খাঁর সমীপে প্রেরিত হইলেন। শের খাঁ বলিলেন যে, চুণার ও উহার অন্যান্য জেলা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, তিনি সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন। সম্রাট প্রথমতঃ এই সর্ত্তে রাজি হন নাই কিন্তু অনুপায় বুঝিয়া শেষে এই অবৈধ সর্ত্তেই সম্মত হইলে উভয়পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। *

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

ময়মনসিংহে ইংরেজ শাসনকাল।

১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। সরকারী রাজস্ব বাকীর জন্য মালিকের পরিবর্ত্তে মহাল দায়ী হয়। পূর্ব্বে কোন মালিককে কালেক্টর ইচ্ছা করিলেই বাকী রাজস্বের জন্য কয়েদ করিতে পারিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইলে

---

* সম্রাট হুমায়নের আফ্তাবচি জোহর প্রণীত 'হুমায়ন-শাহী' বা 'তারিখি-ই-হুমায়ন' অবলম্বনে লিখিত। জোহর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 'জাহ্নবী' পত্রে দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের আরও অনেক ঘটনা 'আরতি'র পাঠকগণকে উপহার দিবার বাসনা থাকিল। লেখক।

বোর্ড আদেশ করিলেন কালেক্টর যদি কোন জমিদার বা তালুকদারকে বাকী রাজস্বের জন্য দায়ী করিতে চান তবে তাহাকে জজের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। জজ দায়িককে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখিতে পারিবেন। দায়িক ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত জামিনে মুক্ত হইয়া কালেক্টরের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা আনিতে পারিবেন (১)।

১৭৯৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সেরপুর পরগণার তিন আনির জমিদারীর বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য মহালে পৃথক্ আমিন নিযুক্ত করা হয় ও জমিদারকে উপস্থিত হইবার জন্য দস্তক প্রেরিত হয়। ঐ সনের মার্চ্চ মাসে বোর্ড উপরোক্ত আদেশ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর বোর্ড আদেশ করেন যে রাজস্ব দায়াবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা দাবীর মুদ্রা পরিশোধ হইলে কোন মালিক কারারুদ্ধ হইবেন না (২)।

দেশের শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সুরার ও আমদানি হইয়াছিল। ১৭৯৩ সনে বোর্ড মদ বিক্রয়ের জন্য পাশের প্রচলন করেন (৩)।

১৭৯৪ সনে এ জেলা হইতে ৩৪টী মহাল সহ তপে রণভাওয়ালের অংশ ঢাকার কালেক্টরীর (৪) ও পরগণা দর্জ্জিবাজু ও তপে সিংধা ঢাকার কালেক্টরী হইতে এ জেলার কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত হয় (৫)।

এই সনে এ জেলায় তামার পয়সার প্রচলন আরম্ভ হয় (৬)। ইহার পূর্ব্বে কড়ি ও দামড়ির প্রচলন ছিল।

(১) Board's letter to the Collector of Mymensingh, Dated 29/5/1793.

(২) "That no proprietor of land shall be inprisoned for arrears of public Revenue who has landed property which of sold will be sufficent to make good the dificiency." Board's letter dated 14/3/1794 to the Collector.

(৩) রেবিনিউ বোর্ড তাঁহার ১৮।১০।৯৩ সনের চিঠিতে ময়মনসিংহের কালেকক্টরকে লিখেন।

"মদ বিক্রেতা যদি বিনাপাশে মদ বিক্রয় করে তবে বিক্রেতা দরিদ্র হইলে ও জরিমানার অর্থ আদায় না হওয়ার সম্ভাবনা হইলে কালেক্টর তাহাকে জজের হস্তে সমর্পণ করিবেন জজ এক মাসের কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।"

(৪) Collector's letter Dated 26/2/1794.

(৫) Collector's letter to R. B. Dated 12/6/1794.

(৬) Board's letter to Collector Dated 5/5/1794.

মফস্বলের সরকারী কার্য্যের জন্য পূর্ব্বে সিপাহি সৈন্য রক্ষিত হইত। ১৭৯৫ সনে রঙ্গপুর কেণ্টন্‌মেণ্ট স্থাপন জন্য এ জেলার সিপাহি সৈন্য উঠাইয়া নেওয়া হয় ও তৎকার্য্যে সাধারণ বরকন্দাজ নিযুক্ত করা হয়।

১৭৯৬ সনে বেলুহা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য মহাল এ জেলা হইতে পৃথক্ হইয়া ত্রিপুরা জিলাভুক্ত হয়।

১৭৯৭ সনে সদর কাননগুর কার্য্যালয় উঠিয়া যায়।

১৭৯৯ সনে ২৭ শে ডিসেম্বরের চিঠি দ্বারা বোর্ড এ জেলা হইতে প্রাচীন মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেন। ১৮০০ সন হইতে এ জেলায় কোম্পানীর মুদ্রা প্রচলিত হয়।

১৮০২ সনের শেষভাগে সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত শঙ্করপুর নিবাসী ছফাতি পাগলা সুসঙ্গের উত্তর পাহাড় অঞ্চলে একটী অভিনব রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পায়। ছফাতি রাজ্যলাভের পিপাসায় উত্তেজিত হইয়া সুসঙ্গ পাহাড়ের গারো, হাজঙ্গ, কোচ ও অন্যান্য বন্য অধিবাসীদিগকে বশীভূত করে।

এই সময় সুসঙ্গ রাজ্যে রাজা রাজসিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজা রাজসিংহের রাজ্যের উত্তর সীমা ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ সীমা ছিল। রাজসিংহ গারো, হাজঙ্গ, কোচ, মেচ প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতীর অধিপতি ছিলেন বটে কিন্তু ইহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার কর পাইতেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও এই কারণে সুসঙ্গের বিস্তৃত ভূমির আশানুরূপ রাজস্ব প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত ছিলেন।

ছফাতি সেরপুর ও সুসঙ্গের পাহাড় প্রদেশে প্রবেশ করিয়া শম্ভু, ভোগর, কাঞ্চি, গেহুয়া, মেওয়া, ফাকাগঞ্জ, বুধুগিরি, হিলাল, দুলালপাড়া মচিবোরবড়ি ও কালালরা প্রভৃতি মৌজার আবির গারোগণকে হস্তগত করিতে ও তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ প্রথমতঃ তাহার কৌশল জাল ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার ফাঁদে পতিত হইয়াছিল অবশেষে যখন দেখিল যে তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে যাইতেছে তখন তাহারা তাহাদের স্বাধীনতা অপহারক ছফাতিকে বিতাড়িত করিয়া দিল। ছফাতি তাহার কল্পনার রাজ্য ছারখার হইয়া যায় দেখিয়া গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইল। ১৮০২ সনের নবেম্বর মাসে জেলা কালেক্টর এফ্, .লি, গ্রোস্ সাহেবের সহিত ছফাতি নসিরাবাদ আসিয়া সাক্ষাৎ করিল।

ছফাতির প্রগাঢ় বুদ্ধিকৌশল ও অভিনব রাজ্য বিস্তার কল্পনার আলোচনা করিয়া গ্রোস্ সাহেব বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। এবং ছফাতির উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া

৩০ শে নবেম্বর বিস্তৃত চিঠি দ্বারা বোর্ড অব রেভিনিউকে তাহা জ্ঞাপন করেন। ছফাতির একখানা দরখাস্ত ও তৎসঙ্গে প্রেরিত হয় (১)।

মিঃ গ্রোস্ বোর্ড অব রেভিনিউর তৎকালীন সেক্রেটারী চারলস্ বুলার মহোদয়কে লিখিলেন "জমিদারী সনন্দপ্রার্থী ছফাতি মিয়া একজন চরিত্রবান্ ও অভিনব ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তক ফকির। এতদ্দেশে ইনি পাগলা ফকির নামে অভিহিত। গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ ইহার চেলা। ইহা দ্বারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ৫০। ৬০ হাজার টাকা বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ভূমি লাভ হইতে পারে। ছফাতি সেরপুর এবং সুসঙ্গের চৌধুরী দিগের নিকট ও সুপরিচিত, সুতরাং ইহার প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ন্যস্ত করিবার কারণ আছে। বিশেষ গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগকে শাসনে আনিতে পারিলে পরিণামে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট লাভবান হইতে পারেন। গারোগণ ও নাকি তাহাই ইচ্ছা করে। যদি গভর্ণমেণ্ট ছফাতিকে সনন্দ দান করেন ও সৈন্য সাহায্য করেন তাহা হইলে সে সৈন্য সমভিব্যাহারে যাইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ শাসন করিতে প্রস্তুত হইতে পারে।"

ছফাতি কালেক্টরকে হস্তগত করিয়া তাহার রাজ্য প্রাপ্তির পথ নিষ্কণ্টক করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহার এই অভিনব মতের পোষকতা করিতে পারিলেন না। গভর্ণমেণ্ট ছফাতির দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন ও কালেক্টরকে এই বিবরণ প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করিতে আদেশ করিলেন (২)। ছফাতির কল্পনার রাজ্য ছারখার হইয়া গেল।

১৮০৩ সনের গবর্ণর জেনারেলের প্রসিডিং অনুসারে ঢাকায় প্রাদেশিক

---

(১) কালেক্টর লি, গ্রোস কৃত দরখাস্তের ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।—

"Petition of Safati Mia of Sankerpur Pargana Susung: The north east beyond the boundaries of pargana Sherpur upon the hills there is an extensive tract of land belonging to the Abir Garows viz:—Mozas Sambhu, Bhugoy, Cauchy, Gedua, Mewah, Phaphaganj, Bodhugiri, Helal, Dulal parah, Machiborbari and Calallcra all which mozas are inhabited by the Abir Garows who never have paid any revenue to Govt. In order to bring these lands under the protection of Government, I request a parawana may be granted me with a guard of sephoys that in the part of Govt, I may take possession of the above land and after deducting the mosahera and saranjami from the jama there of Tahood may be taken from me for the Revenue."

(২) Bengal M. S. S. No. 11248 Dated 10/12/1802.

সৈন্য বিভাগ স্থাপিত হয় এবং এই জেলার সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্য ঢাকার প্রধান সেনাপতির অধীন হয়। ঢাকার প্রধান সেনাপতি কাপ্তেন জন লেথারেল ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমানের সেনা বিভাগের অধিনায়ক হন। এই জেলার জেলাকোর্ট ও রেভিনিউ কার্য্যের জন্য ঢাকা সৈন্য বিভাগ হইতে একজন সুবাদার, একজন জমাদার, চারিজন হাবিলদার, চারিজন নায়েক, দুইজন বাদ্যকর ও ৯৬ জন সিপাই নিযুক্ত হইয়া আসে (১)।

ইতঃপূর্ব্বে এ জেলার সদর ষ্টেশন সেহড়ায় ডিপুটীপোষ্ট মাষ্টারের কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ডিপুটীপোষ্টমাষ্টারই পোষ্টাফিসের কার্য্য করিতেন। ১৮০৫ সনে বোর্ড গভর্ণমেণ্টের মন্তব্যানুসারে ডিপুটিপোষ্টমাষ্টারের পদ রহিত করিয়া এ জেলার কালেক্টারের উপর ডাক ঘরের ভার অর্পণ করেন। ডাক আফিস কালেক্টারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কালেক্টারই পোষ্টমাষ্টার নামে অভিহিত হন (২)।

১৮০৬ সনে জেলা কালেক্টার মিঃ লি, গ্রোস্ তহবিল তছরূপ অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হন (৩)। লি, গ্রোসের বিচার জন্য বিশেষ বিচারক নিযুক্ত হয়। জে, রট্রী, (J. Rattray) ও জে, ল (J. Law) নামক বিশেষ কমিশনার দ্বয়ের বিচারে লি, গ্রোস্ সদর দেওয়ানীতে বিচারার্থ অর্পিত হন। তাঁহার সহায়তাকারক ও ৩ জন তহশীলদার সেসনে প্রেরিত হন। ১৮০৬ সনের ২৭ ডিসেম্বর সদর দেওয়ানী আদালত মিঃ লি, গ্রোস্কে পুনরায় ফৌজদারীতে বিচারের জন্য ময়মনসিংহ প্রেরণ করেন।

---

(১) এই সময় ৭টী প্রাদেশিক সেনানিবাস স্থাপিত হয়। এই ৭টী সেনানিবাস ৩ জন অধীনায়কের অধীন থাকে। লেপ্টেনেণ্ট গেডলোর অধীন বেনারস, কাপ্তেন জন লেথারেলের অধীন ঢাকা চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমান এবং কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট এর অধীন মুর্শিদাবাদ পূর্ণিয়া ও পাটনার সেনাবিভাগের অধ্যক্ষতার ভার অর্পিত হয়। ঢাকায় ৮ জন সুবাদার ৮ জন জমাদার ৩২ জন হাবিলদার ৩২ জন নায়েক ১৬ জন বাদ্যকর ও ৭৬৮ জন সিপাই ছিল। এই সৈন্যদলের তিন ভাগ ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও বাখরগঞ্জের জন্য ছিল। অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ ঢাকায় থাকিত (Governor General's proceeding Dated 25/8/1803.

(২) "The Collector and the Magistrate who may be vested with the charge of the *Daks* are to be denominated Post master" (Government's resolution Dated 10/1/18 05 sent with Board's No. 10/1/05 to the Collector of Mymensingh.

(৩) Board's resolution Dated 9/1/ 1807.

১৮০৭ সনে সেরপুরের অন্তর্গত পাহাড় অঞ্চলে বন্য অধিবাসিগণের মধ্যে অরাজকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও জেলা শাসন বন্দোবস্তের জন্য ময়মনসিংহের শাসনকার্য্য দুইভাগে বিভাগ করিবার প্রস্তাব হয়। ইতিমধ্যে সেরপুরের জমিদারগণ জমিদারী বাটোয়ারার প্রার্থনা করিলে সেরপুরের অন্তর্গত কালীগঞ্জ নামক স্থানে পৃথক্ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। মেক্সুন্ সাহেব কালীগঞ্জের প্রথম জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন (১)।

১৮০৯ সনে পাতিলাদহ পরগণার কতক অংশ রঙ্গপুর হইতে এ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮১২ সনে আটিয়ার অন্তর্গত কাপাকি প্রভৃতি স্থানে প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত হয় (২)।

১৮১৩ সনে তহশীল কাছারী প্রথা রহিত হইয়া যায়। ঐ সনের শেষভাগে এ জেলায় "খোলাভাটী" স্থাপিত হয় (৩)।

১৮১৬ সনে আফিং এর আমদানী আরম্ভ হয়।

১৮১৯ সনে পরগণায় পরগণায় কাননগুর ও পাটুয়ারির কার্য্যালয় স্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিলে কালেক্টর জমিদারদিগকে তাহার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। তদনুসারে পরগণায় পরগণায় কাননগুর কার্য্যালয় পুনঃ স্থাপিত হয়।

১৮২০ সনে এ জেলায় রেজিষ্ট্রারের পদ সৃষ্টি হয়। রেজিষ্ট্রার প্রথম কাগজ-পত্রের তত্ত্বাবধান করিতেন। অতঃপর ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় বিচার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। রেজিষ্ট্রারের বেতন ১৫০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

১৮২৩ সনে রঙ্গপুরের সেনানিবাস জামালপুরে উঠাইয়া আনিবার প্রস্তাব হয়। (৪) তদনুসারে জামালপুর কেণ্টনমেণ্ট প্রস্তুত হইতে থাকে; এবং ১৮২৬ সনের শেষভাগে ত্রয়োদশ সংখ্যক দেশীয় সৈন্য জামালপুরে পঁহুছে। ইতিমধ্যে সেরপুর "পাগলাই" বিদ্রোহের ভীষণ অত্যাচারে ছারখার হইয়া যায়।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

---

(১) Collector's report Dated 31/1/1816.

(২) Revenue Board's Resolutions 24/4/1812.

(৩) Board's letter Dated 29/10/1813.

(৪) Government having determined on the recommendation of the Commender-in-Chief to adopt his Excellency's suggestions of posting the new Rangpur (light infantry) local bottalion at Jamalpur near Sanyasiganja.
Board's letter to Collector No, 1068 Dated 15/4/1823.

দুগ্ধ।

গো-দুগ্ধ সম্বন্ধে আমরা "আকৃতি"তে বিস্তৃতরূপ আলোচনা করিয়াছি; বর্ত্তমান প্রবন্ধে অন্যান্য প্রাণিজ দুগ্ধ সম্বন্ধে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের দুই একটী মত উদ্ধৃত করিব।

মাহিষ-দুগ্ধ।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"মহিষাণাং গুরুতরং গব্যা চ্ছীততরং পয়ঃ।
স্নেহান্যূনমনিদ্রায় হিতমত্যগ্নয়ে চ তৎ॥"

মহিষদুগ্ধ গব্যাপেক্ষা অধিক গুরু ও শীতল এবং অধিক স্নেহযুক্ত (নবনীত বিশিষ্ট); অনিদ্রা এবং অত্যগ্নিতে ইহা হিতজনক।

ভাবপ্রকাশে আছে—

"মাহিষ্যং মধুরং গব্যাৎ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
নিদ্রাকর মভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যকরং হিমম্॥

মাহিষ-দুগ্ধ গো-দুগ্ধাপেক্ষা মধুর, স্নিগ্ধ, শুক্রকর এবং গুরুপাক, ইহা নিদ্রাজনক, অভিষ্যন্দী (কফবর্দ্ধক), ক্ষুধাধিক্যজনক এবং শীতল।

সুশ্রুতসংহিতা বলেন—

মহাভিষ্যন্দি মধুরং মাহিষং বহ্নিনাশনং।
নিদ্রাকরং শীতকরং গব্যাৎ স্নিগ্ধতরং পয়ঃ॥

অর্থাৎ—মাহিষ দুগ্ধ অত্যন্ত অভিষ্যন্দী (কফবৃদ্ধিকারক), মধুর, অগ্নিনাশক (ক্ষুধানিবারক), নিদ্রাকর, শীতল এবং গোদুগ্ধ হইতে অধিক স্নেহযুক্ত।

নির্ঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে—

"গৌল্যন্তু মাহিষং ক্ষীরং বিপাকে শীতলং গুরু।
বলপুষ্টিপ্রদং বৃষ্যং পিত্তদাহাস্র নাশনং॥
শীতং স্নিগ্ধং গুরু গৌল্যং বৃষ্য পিত্তাপহংপরং।
জ্ঞেয়া শৈচবম্বিধাস্তস্য কিলাটস্য পয়শ্ছদঃ॥"

মাহিষ-দুগ্ধ গৌল্য (মধুর); ইহা বিপাকে (পরিপাক হইলে) শীতল, গুরু, বল ও পুষ্টিকারক, বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক), পিত্ত, দাহ, ও রক্তনাশক এবং ইহা শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু এবং অত্যন্ত পিত্তনাশক। মাহিষ দুগ্ধজাত কিলাট ও পয়শ্ছদঃ (সর) তদ্‌গুণ বিশিষ্ট বলিয়া জানিবে।

মন্তব্য—মাহিষ-দুগ্ধ গো-দুগ্ধাপেক্ষা অধিক স্নেহযুক্ত তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে—উৎকৃষ্ট ও খাঁটি গোদুগ্ধে /এক হইতে /১০ দেড় ছটাকের অধিক নবনীত (মাখন) হয় না; কিন্তু মাহিষদুগ্ধে /১০ হইতে ./ অর্দ্ধপোয়া পর্য্যন্ত মাখন উঠিয়া থাকে। কথিত আছে বিলাতী গাভীর দুগ্ধে প্রায় এক পাউণ্ড (অর্দ্ধসের) মাখন হয়, ইহা কতদূর প্রকৃত বলা যায় না।

এতদ্দেশে দুই প্রকার মহিষ দেখা যায়; একজাতীয় "বাঙ্গর" ও অপরটী "কাছড়" নামে কথিত হয়। এতদুভয়ের মধ্যে কাছড়ের দুগ্ধেই অধিক নবনীত হইয়া থাকে। কাছড় মহিষগুলি অতি বৃহৎকায়, উগ্র-প্রকৃতি এবং প্রায় আরণ্য বলিলেও বলা যায়; ইহাদিগকে জঙ্গলাকীর্ণ জলা ভূমিতে ভিন্ন রাখা দুষ্কর। এতজ্জাতীয় মহিষ সুসঙ্গ, সেরপুর, শ্রীহট্ট ও আসামপ্রদেশের কোনও কোনও স্থানে প্রাপ্য; অন্যত্র কোথাও আছে কি না তাহা আমাদের জানা নাই। বাঙ্গর সর্ব্বত্রই সুলভ। এতদ্ব্যতীত হিসারী পঞ্জাবদেশীয়। এই মহিষগুলি দুগ্ধের জন্য বিখ্যাত। ইহারা ২০।২৫ সের কি তদপেক্ষা ও অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে। বাহুল্য বিবেচনায় মহিষ সম্বন্ধে আর কিছু বলা গেল না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মাহিষ দুগ্ধের বর্ণ ও তজ্জাত নবনীত ও সরের বর্ণ গোদুগ্ধ ও তজ্জাত নবনীত ইত্যাদি হইতে অধিক শুভ্র এবং ইহার সর অতি পুরু হয়।

ছাগী-দুগ্ধ।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"ছাগং কাষায়ং মধুরং শীতং গ্রাহিপয়োলঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাশ জ্বরাপহম্॥"

ছাগদুগ্ধ কষায়রসবিশিষ্ট, মধুর, শীতল, গ্রাহী (মলরোধক), লঘু, রক্তপিত্ত ও অতিসারনাশক এবং ক্ষয়কাশ ও জ্বরনাশক।

ভাবপ্রকাশে আছে—

"ছাগং কষায় মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাশ জ্বরাপহং॥"

এই অংশের অনুবাদ দেওয়া অনাবশ্যক, কারণ ইহা অবিকল চরকোক্ত মতের ন্যায়।

অপিচ—— অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটু তিক্তাদি সেবনাৎ।
স্তোকাম্বু পানাদ্ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগ হরং পয়ঃ॥

ছাগ স্বভাবতঃ অল্পকায় (ক্ষুদ্রদেহ বিশিষ্ট), তদ্ধেতু এবং কটু তিক্তাদি দ্রব্য ভক্ষণ জন্য ও অল্প পরিমাণ জল পান হেতু ছাগদুগ্ধ সর্ব্বরোগ নিবারক।

ছাগী দুগ্ধ সম্বন্ধে নির্ঘণ্টুক্ত মত অবিকল পূর্ব্বোক্তবৎ; অতএব তাহা উদ্ধৃত হইল না।

সুশ্রুত সংহিতা বলেন—

"গব্যতুল্যং গুণস্বাজং বিশেষাচ্ছোষিণাং হিতং।
দীপনং লঘু সংগ্রাহি শ্বাস কাশাস্র পিত্তনুৎ॥"

ছাগদুগ্ধ গোদুগ্ধের তুল্যগুণ বিশিষ্ট; বিশেষতঃ ইহা শোষরোগে অত্যন্ত হিতজনক, ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, সংগ্রাহী (মলরোধক), শ্বাস, কাশ ও রক্তপিত্তনাশক।

অষ্টাঙ্গ-হৃদয় বলেন—

"অল্পাম্বু পান ব্যায়াম কটু তিক্তাশনৈর্লঘু।
আজং শোষ জ্বর শ্বাস রক্তপিত্তাতিসারজিৎ॥"

অর্থাৎ—অল্প জলপান হেতু এবং ব্যায়ামশীলতা ও কটু তিক্তাদি দ্রব্য ভক্ষণ জন্য ছাগদুগ্ধ শোষ, জ্বর, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও অতিসার নাশক।

অত্রি সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"*　*　*　*　*　*
*　*　*　*　*　ত্রিদোষঘ্নঞ্চ।
ক্ষীণাজ দুগ্ধং গোদুগ্ধ বীর্য্যাদধিক গুণং, ক্ষীণদেহেষু
পথ্যতমঞ্চ; স্থূলকায়াজদুগ্ধং গুণৈঃ কিঞ্চিদূনম্।"

ছাগদুগ্ধ ত্রিদোষ নাশক; ক্ষীণকায় ছাগদুগ্ধ—গোদুগ্ধ বীর্য্য (দ্রব্যশক্তিকে বীর্য্য বলা যায়) অপেক্ষা অধিক গুণ বিশিষ্ট এবং ইহা ক্ষীণকায় ব্যক্তির পক্ষে পথ্যতম (হিতজনক)। স্থূলকায় ছাগদুগ্ধ কিঞ্চিৎ কম গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মন্তব্য—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, গোদুগ্ধাপেক্ষা ছাগদুগ্ধে লবণাক্ত পদার্থ ও ছানার ভাগ অধিক; তথাপি হৃষ্টপুষ্ট, সুস্থ এবং যাহাদের পরিপাক শক্তি প্রবল, এবম্বিধ বালকের পক্ষে উহা বিশেষ হিতজনক। যে ছাগীর দুগ্ধ ব্যবহার করাইতে হইবে তাহাকে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে দিলে তাহার দুগ্ধ দুর্গুণ বিশিষ্ট হয়, কারণ ছাগ অতিশয় যথেচ্ছভোজী। অতএব তাহাকে বাঁধিয়া খাওয়ানই উচিত।

নারীদুগ্ধ।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"জীবনং বৃংহণং সাত্ম্যং স্নেহনং মানুষং পয়ঃ।
নাবনং রক্তপিত্তেচ তর্পণং চক্ষুঃশূলিনাম্ ॥"

নারীদুগ্ধ জীবনহিত, বৃংহণ (বলকারক), সাত্ম্য (দেহানুকূল) ও স্নিগ্ধতাকারক। রক্তপিত্তে ইহা নস্য এবং চক্ষুঃশূলে ইহার তর্পণ (অঞ্জন) হিতজনক। ভাবপ্রকাশে লিখা আছে—

"নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ।
চক্ষুঃ শূলাভি ঘাতঘ্নং নস্যাশ্চোতনয়ো র্বরম্ ॥"

নারী দুগ্ধ লঘু, শীতল, অগ্নি বর্দ্ধক, বাতপিত্ত বিনাশক। ইহা চক্ষুঃ শূল ও অভিঘাত নাশক এবং নস্য ও আশ্চোতনে (নেত্রাঞ্জনে) শ্রেষ্ঠ।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে ঃ—

মানুষং বাত পিত্তাসৃগভি ঘাতাক্ষিরোগনুৎ।
তর্পণাশ্চোতনৈর্নস্যৈঃ * * * ॥"

নারী দুগ্ধের তর্পণ (নেত্র পূরণ), আশ্চোতন (অঞ্জন) ও নস্যদ্বারা বাতপিত্ত, রক্তবিকার, অভিঘাত এবং চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

নির্ঘণ্টুক্ত ঃ—

"স্নিগ্ধং স্থৈর্য্যকরং চাপি চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্।
জীবনং বৃংহণং সাত্ম্যং স্নেহনং মানুষী পয়ঃ ॥
নাশনং রক্ত পিত্তেচ তর্পণং চাক্ষি শূল হৃৎ।
মধুরং মানুষী ক্ষীরং কষায়ঞ্চ হিমং লঘু।
চক্ষুষ্যং দীপনং পথ্যং পাচনং রোচনঞ্চতৎ ॥"

অর্থাৎ—নারী দুগ্ধ স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকর (দেহের দৃঢ়তা সম্পাদক), চক্ষুষ্য (চক্ষের হিতকর), বলকারক, জীবন হিত, বৃংহণ (শুক্র বর্দ্ধক), সাত্ম্য, স্নেহন (চাকচিক্যকারক), রক্তপিত্ত নাশক, এবং ইহার তর্পণে চক্ষুঃশূল নাশ করে। নারী দুগ্ধ কষায়, হিম, লঘু, চক্ষুষ্য, দীপন (অগ্নি বর্দ্ধক), পথ্য (হিতকর), পাচন (পরিপাক কারক) ও রুচিজনক।

যে সকল প্রাণিজ দুগ্ধ মানবের ব্যবহার্য্য তৎসমস্তের বিষয়ই বলা হইল, অধুনা ঘোটকী, গর্দ্দভী প্রভৃতি একক্ষুর বিশিষ্ট (অখণ্ডিত ক্ষুরযুক্ত) প্রাণী, উষ্ট্রী, মেষী ও হস্তিনী দুগ্ধের আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণাদি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইল।।

অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি একক্ষুরযুক্ত প্রাণিজ দুগ্ধ।

হৃদয় বলেন :—

"বাঢ় মুষ্ণং স্বৈক শফং লঘু
শাখাবাত-হরং সাম্ললবণং জড়তাকরং
পয়োহভিষ্যন্দি গুর্ব্বামং যুক্ত্যাশৃতমজেহন্যথা ॥"

অশ্বাদি একক্ষুরযুক্ত প্রাণিজ দুগ্ধ অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, লঘু, শাখাবাত (বাহু প্রভৃতির বাত) নাশক, অম্ল লবণাক্ত স্বাদ বিশিষ্ট, জড়তাকারক ও অভিষ্যন্দী (কফকারক)। এ সমুদয় অপক্কাবস্থায় (কাঁচা অবস্থায়) গুরু, কিন্তু উপযুক্ত রূপে জ্বাল দিয়া লিলে তাহার অন্যথা হয় (লঘু হয়)।

ভাবপ্রকাশে আছে—

"রুক্ষোষ্ণং বড়বা ক্ষীরং বল্যং শোষানিলাপহং।
অম্লং কটু লঘু স্বাদু সর্ব্বমৈকশফং তথা ॥"

অশ্বদুগ্ধ বলকারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, শোষ ও বায়ুনাশক, অম্ল ও কটুস্বাদ বিশিষ্ট, লঘু ও স্বাদু; অন্যান্য একক্ষুর বিশিষ্ট সমস্ত প্রাণিজ দুগ্ধ ঐ প্রকার জানিবে।

নির্ঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে—

অশ্বক্ষীরং বৃষ্যাম্লং দীপনং লঘু।
দেহ স্থৈর্য্যকরং বল্যং গৌরবং কান্তিকৃৎপয়ঃ।
শাখাবাতহরং সাম্লঞ্চ রুচি দীপ্তিকৃৎ ॥"

অশ্বক্ষীর বৃষ্য (বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক) অম্লস্বাদযুক্ত, দীপন (অগ্নিবর্দ্ধক), লঘু, দেহের স্থৈর্য্যকারক, বল্য (বলকারক) গৌরব ও কান্তিবৃদ্ধিকর, শাখাবাত নাশক এবং রুচি ও দেহের দীপ্তিকারক।

নির্ঘণ্টুতে গর্দ্দভী দুগ্ধ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

কাস শ্বাস হরং ক্ষীরং গার্দ্দভং বালরোগনুৎ।
মধুরাম্লরসং রুক্ষং লবণানুরসং লঘু ॥
বলকৃদ্ গর্দ্দভী ক্ষীরং বাতশ্বাস হরং পরং
মধুরাম্লরসং রুক্ষং দীপনং পথ্যদং স্মৃতম্ ॥"

গর্দ্দভ দুগ্ধ, কাস ও শ্বাস নাশক; ইহা বালরোগনাশক; মধুরাম্লরস, রুক্ষ, লবণানুরস, গুরু, বলকারক, বায়ু ও শ্বাসনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং পথ্যদ (হিতজনক) বলিয়া জানিবে।

সুশ্রুত সংহিতা বলেন—

"উষ্ণমৈকশফং বল্যং শাখাবাত হরং পয়ঃ।
মধুরাম্লরসং রুক্ষং লবণানুরসং লঘু॥

একক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণিজ (অশ্বাদির) দুগ্ধ বলকারক, শাখাবাতনাশক, মধুরাম্ল ও লবণানুরস, রুক্ষ এবং লঘু।

উষ্ট্রী-দুগ্ধ।

ভাবপ্রকাশে আছে—

"ঔষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা।
কৃমি কুষ্ঠ কফানাহ শোথোহদর হরং পয়ঃ॥"

ঔষ্ট্রদুগ্ধ লঘু, স্বাদু, লবণরস, অগ্নিবৃদ্ধিকর, এবং ইহা কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ (কোষ্ঠবদ্ধরোগ), শোথ, ও উদরীরোগ নিবারক।

চরক সংহিতা বলেন—

"রুক্ষোষ্ণং ক্ষীরমুষ্ট্রীনামীষৎ সলবণং লঘু।
শস্তং বাত কফানাহ কৃমিশোথোদরার্শসাম্॥"

উষ্ট্রীদুগ্ধ—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ লবণস্বাদযুক্ত, লঘু, বাত, কফ, আনাহ, কৃমি, শোথ, উদর ও অর্শরোগে প্রশস্ত।

নির্ঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে—

"উষ্ট্রী ক্ষীরং কুষ্ঠ শোথহরং, তৎপিত্তার্শোঘ্নং তৎকফাটোপহারি: আনাহার্ত্তি জন্তু গুল্মোদরাদ্যং। শ্বাসোল্লাসং নাশয়ত্যাশু পীতম্।"

উষ্ট্রীদুগ্ধ কুষ্ঠ ও শোথনাশক। ইহা কফ, আটোপ (বাতজন্য) উদর স্ফীতি) আনাহ (কোষ্টবদ্ধ) গুল্ম ও উদর নাশক।

মেষী-দুগ্ধ।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে আছে—

"অহৃদ্যং তূষ্ণমাবিকম্।
বাতব্যাধি হরং হিক্কাশ্বাস পিত্তকফপ্রদম্॥"

মেষ-দুগ্ধ অহৃদ্য (মুখরুচিকারক নহে) ও উষ্ণবীর্য্য, ইহা বাতব্যাধি নাশক, হিক্কা, শ্বাস, পিত্ত ও কফপ্রদ।

নির্ঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে :—

"আবিকন্তু পয়ঃ স্নিগ্ধং কফ পিত্ত হরং পরং।
স্থৌল্য মেহহরং পথ্যং লোমশং গুরু বৃদ্ধিদং॥

উষ্ণং মধুরং স্নিগ্ধমোষ্ণং তিক্তং কফাপহং।

গুরু শুদ্ধানিলে পথ্যং শোফে চানিল শোণিতে॥"

অর্থাৎ—মেষ-দুগ্ধ স্নিগ্ধ, অত্যন্ত কফ ও পিত্ত নাশক, মেহনাশক, পথ্য (হিতজনক), লোমশ (রোম বৃদ্ধিকর), গুরু এবং বৃদ্ধিদ (স্থূলতাকারক)। ইহা (মেষদুগ্ধ) মধুর, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য তিক্ত ও কফনাশক, গুরু এবং ইহা কেবল বায়ুরোগে ও বায়ু-রক্তজনিত শোফে হিতজনক।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে:—

"আবিকং লবণং লঘু স্নিগ্ধোষ্ণঅশ্মরী প্রণুৎ।

অহৃদ্যং তর্পণং কেশ্যং শুক্র পিত্ত কফ প্রদম্॥

গুরু কাসেঽনিলোদ্ভূতে কেবলে চানিলে বরম্॥"

মেষদুগ্ধ লবণ স্বাদযুক্ত, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং অশ্মরী রোগ (পাথরী, Stone) নাশক, ইহা অহৃদ্য (রুচিকর নহে), তর্পণ (তৃপ্তিদায়ক), কেশবৃদ্ধিকারক, শুক্র, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক এবং গুরু ও বায়ুজাত কাসরোগে এবং কেবল বায়ুরোগে শ্রেষ্ঠ।

হস্তিনী-দুগ্ধ।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে:—

"হস্তিনীনাং পয়ো বল্যং গুরু স্থৈর্য্যকরং পরম্।"

হস্তিনী দুগ্ধ বলকারক, গুরু, ও অত্যন্ত স্থৈর্য্যকর (শরীরের দৃঢ়তাকারক)।

নির্ঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে:—

"হস্তিন্যা মধুরং বৃষ্যং কষায়ানু রসং গুরু।

স্নিগ্ধং শীতকরঞ্চাপি চক্ষুষ্যং বল বর্দ্ধনম্॥"

অর্থাৎ— হস্তিনী দুগ্ধ মধুর, বৃষ্য (শুক্র বর্দ্ধক) কষায়ানুরস, গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, চক্ষুষ্য ও বল বর্দ্ধক।

সুশ্রুত ও ভাবপ্রকাশোক্ত হস্তিনী-দুগ্ধ গুণও উক্ত প্রকার কথিত হইয়াছে অতএব তাহা উদ্ধৃত হইল না।

আরণ্য মৃগী দুগ্ধ।

ভাবপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে:—

"মৃগীনাং জঙ্গলোত্থানাম ছাগক্ষীর সমংপয়ঃ।"

সমস্ত আরণ্য মৃগী দুগ্ধের গুণ ছাগ দুগ্ধের তুল্য। (ছাগদুগ্ধের গুণ দ্রষ্টব্য)।

মন্তব্য—আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতোক্ত দুগ্ধের গুণাদি নাতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল। অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে

হৃদয়ঙ্গম হয় যে, অবস্থা, কাল, দেশ ও পাত্রাদিভেদে নানাপ্রকার প্রাণিজ দুগ্ধ মানবের পক্ষে হিতজনক হইলেও সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা গো-দুগ্ধই শ্রেষ্ঠ ও হিতজনক। বলা বাহুল্য যে, শিশুর পক্ষে মাতৃ দুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তদভাবে গো, ছাগ ও গর্দ্দভী দুগ্ধই তাহার পক্ষে পথ্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতাতে কথিত হইয়াছে যে—

"আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনা।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়া॥"

আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক এবং রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থিরতা-সম্পাদক, হৃদ্য (রুচিকর) আহারাদিই সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়।

অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, দুগ্ধ বিশেষতঃ (গো-দুগ্ধ) এবং তজ্জাত পদার্থ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকপ্রিয় আহার। গো-জাতির অপরিসীম উপকারিতা সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিয়াই, আর্য্য মহর্ষিগণ তাহার রক্ষা, পালন ও উন্নতিকল্পে বিবিধ সুনিয়ম প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন, অধুনা সে গুলির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আমরা ক্রমশঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছি।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

দস্যুর মহত্ত্ব।

১

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একদা আষাঢ় মাসে হঠাৎ ক্ষুদ্র তোয়া জনাই প্রবল উচ্ছ্বাসে কুলত্যাগিনী হইয়া ছুটিল। নদ-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্রের বিপুল প্রবাহ জনাইর দু'কূল আপ্লুত করিয়া প্রবলবেগে বহুদেশ ভাসাইয়া চলিল। দেশে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। পশ্চিম বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের গৃহে গৃহে যুগব্যাপী দুর্ভিক্ষ পূর্ব্ব হইতে বিরাজ করিতেছিল, দেখিতে দেখিতে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের গৃহ-কোণে আসিয়া সে করাল ছায়া পতিত হইল। জনাইর অপ্রতিহত প্রবাহে ঘোড়াঘাট ও বাজুহার বহু জনাকীর্ণ স্থান ভাসিয়া চলিল। বহু লোক গৃহহীন ধনহীন ও সম্পদহীন হইয়া মৃত্যু ও দারিদ্র্যের করাল ছায়া অবলোকন করিতে লাগিল।

পর বৎসর বৃষ্টিপাত একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া মাথা তুলিয়া বসিল। অনোন্যপায় হইয়া বহুলোক আত্মবিক্রয় দ্বারা জীবন

রক্ষা করিতে লাগিল। দুই তিন টাকা করিয়া গোটা মানুষ বিক্রয় হইতে লাগিল। ভদ্রাভদ্র বহুলোক অনাহারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল।

সেই দুর্ব্বৎসরের এক অতি প্রবল শীত রজনীতে মালঞ্চা গ্রামের পথে দুইটী প্রাণী চলিতেছিল। একটী যুবক, অপরা বর্ষীয়সী। উভয়েই কঙ্কালসার। যুবক সম্মুখের বৃহৎ আটচালা দেখাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, মুখ হইতে কথা সরিল না। দাঁড়াইল, খানিক উভয়ে দাঁড়াইয়া আবার চলিল। অদূরে হাটিয়া পুনরায় বসিল, এইরূপে বহু আয়াসে আসিয়া সম্মুখস্থ আটচালা ঘরে উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী কৃষ্ণকান্ত রায় আহারে যাইবেন, এমন সময় সম্মুখে একটী স্ত্রীলোক দেখিয়া দাঁড়াইলেন। যুবকটী ক্ষুধায় কাতর হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছে, স্ত্রীলোকটী উদরে হাত রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। রায় মহাশয়কে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া চরণ তলে লুটাইয়া পড়িল। রায় মহাশয় সহজেই অবস্থা বুঝিলেন। করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি চাও? বৃদ্ধার মুখে কথা আসিল না। আজ চারি দিন ধরিয়া যে মাতা পুত্রের উদরে অন্ন নাই। উদরে হাত বুলাইয়া বৃদ্ধা মাতা নীরবে সে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল। দয়ার্দ্র হৃদয় কৃষ্ণকান্তের চক্ষে জল ঝরিল। মাতা পুত্র আশ্রয় পাইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর ক্রমে দুই বৎসর গত হইয়াছে। জয়সিং এখন কৃষ্ণকান্ত রায়ের দক্ষিণ হস্ত। জয়সিংহের রণ-বিক্রমে ও বুদ্ধি কৌশলে কৃষ্ণকান্ত রায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল শত্রু পক্ষকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার বুদ্ধিবল অপেক্ষা বাহুবল প্রশংসনীয়; বাহুবল অপেক্ষা কার্য্যকরীশক্তি অদ্ভুত। কৃষ্ণকান্ত রায় জয়সিংহকে আরও বিশেষরূপে আপনার করিয়া লইবার জন্য তাহার সংসার বন্ধনের প্রস্তাব করিতেছিলেন। জয়সিংও বিনম্রভাবে তাহাতে অসম্মতি জানাইয়া আসিতেছিল। রায় মহাশয় পুত্র বৎসল অতি সস্নেহে তাহাকে জানাইলেন তিনি অপুত্রক, তাহার ভবিষ্যতের জন্য তিনি যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিবেন। জয়সিং তথাপি সম্মত হইল না।

রায় মহাশয় বুঝিলেন জয়সিং কৃতদাসের ন্যায় পুত্র পৌত্রাদি বংশ পরম্পরা-গত দুর্নাম অর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক নহে। পৃথক্ বন্দোবস্ত করিলে বোধ হয় আর আপত্তি করিবে না। জয়সিংহের সম্বন্ধে একটা পৃথক্ বন্দোবস্তের বিষয় অপর দুই ভ্রাতার নিকট উপস্থিত করিলেন।

জয়সিংহের প্রতি কৃষ্ণকান্ত রায়ের অত্যধিক প্রীতি অপর দুই ভ্রাতার স্বার্থের কিছু অন্তরায় ছিল কি না জানা যায় না, কিন্তু অপর দুই ভ্রাতা ইহাতে প্রতিবাদ উত্থাপন করিলেন। দাদাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ছোট লোককে হাত ছাড়া করিয়া নেহাত স্বাধীনতা দেওয়া ভাল দেখায় না। যতদিন চলে চলুক। কৃষ্ণকান্ত রায় কি বুঝিলেন জানি না। এই সময়ে একটা বিশেষ দুর্ঘটনায় সে বিষয় চাপা পড়িয়া গেল।

৩

তরফ রায় ও তরফ চৌধুরীর দাঙ্গায় ব্রহ্মপুত্রের জল মনুষ্যরক্তে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। জয়সিংহের অসীম প্রতাপে তরফ রায়ের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। তরফ চৌধুরীর পক্ষে লাসের সংখ্যা অগণন। এখন লাসের অধিকার লইয়া পুনরায় বিবাদের সূচনা হইল। জয়সিং অসীম প্রতাপে সকল লাস অধিকার করিয়া হস্তীপৃষ্ঠে রওয়ানা করিল। কৃষ্ণকান্ত রায় হাতীর মিছিল সাজাইয়া নিজে লাস লইয়া প্রস্থান করিলেন। দাঙ্গা মিটিল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় উভয় পক্ষে সাজ সাজ ডাক পড়িয়া গেল। ব্রহ্মপুত্র তীর শ্মশানে পরিণত হইল। রাত্র দুই প্রহর সময় কিল্লা বোকাই নগর স্থিত বাসা বাড়ীতে বসিয়া তরফ রায়ের বড় কর্ত্তা কৃষ্ণকান্ত রায় সংবাদ পাইলেন জয়সিং নাই। তাহার লাসেরও খোজ পাওয়া যাইতেছে না। তিনি বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। তাহার বল ভরসা সকলই জয়সিংহের সহিত লয় পাইয়া গেল। এর পর আর অল্পদিন তিনি মাত্র জীবিত ছিলেন। ক্রমশঃ।

জন্মপল্লীর অঙ্কে

এই হেথা থাম প্রভু, কোথাও যা'ব না আর,
এই মম মহাস্বর্গ—তোমার সৃষ্টির সার!
সুরভি পবনশ্বাসে আবেশে আসিছে ঘুম,
মহাশান্তিনিকেতন এই মম জন্মভূম!
হোথা নদীনীলিমায় আকাশ আবেশে মিশে,
সমীরে লহর নাচে, সুমধুর গীতোচ্ছ্বাসে!
তীরে-তীরে তুলি-আঁকা প্রকৃতির সু-কানন
প্রেমার্দ্র নয়নে যেন অসুন্দর সুলেখন!

ধীরে-ধীরে কিসলয়-অঞ্চল দোলা'য়ে ওই
ডাকে মোরে কৃপাময়ী,—আর আমি কোথা রই!
কনক হিল্লোল হের তৃণ শস্যে খেলে যায়
আমারে আগলি' যেই মেচে উঠে মধুবায়!
শ্যাম বিটপীর কোলে ও কুটীর মনোহর
আমার শান্তির শয্যা রাখে বুকে কি সুন্দর!
ওই দূর বনভূমে উন্নত স্তূপের শিরে
বন-কুরঙ্গীরা ওই আসে হের ধীরে-ধীরে;
আমারে দেখিতে বুঝি আসিয়াছে তারা হায়!
দাও প্রভু দাও স্থান মোরে এই শান্তি ছায়!
হেথায় তপনকর মধুর আমার কাছে,
হেথার জ্যোৎস্নার আর কোথা কি তুলনা আছে?
কোথা বল স্বর্গ?—আমি তাহা কভু দেখি নাই,
যদি স্বর্গ থাকে, এই আমার এ জন্ম ঠাঁই।
এই তরু ছায়াতলে, বায়ু সুধাসিন্ধু মাঝ
ভু'লে যাব দুঃখ ভয়, ভু'লে যাব শোক লাজ!
মায়ের করুণ গান আজি যেন শোনা যায়,
পুলক পরশে তার শিহরি' উঠিছে কায়!
কোটি পারিজাত গন্ধ পবনে উঠিছে মাতি',
এই ছায়া সুশীতল স্বরগ শারদ রাতি!
প্রাসাদ?—হে প্রভো! কোথা' ও কুটীর হ'তে আর
মধুময় শান্তিময় নিকেতন অভাগার?
এ মৃত্তিকা মাতৃঅঙ্কে—কি সুখ কহিব আমি?
অনন্তশয়নে কভু ভুঞ্জনি' নিখিল স্বামি!
এই যে নয়নে বন্যা হেরিছ বহিছে মোর,
এ তো মা'র অঙ্কগত সন্তানের প্রেমলোর!
এত সুখ বুঝাইব আমার তা' সাধ্য নাই;
দয়াল! হেথায় রাখ, এ আমার জন্মঠাঁই!
হেথাকার প্রতিতৃণ প্রতি পত্র আন্দোলন
স্বরগের শান্তি বায়ু প্রাণে আনে অনুক্ষণ।

হেথায় বিহগভাষা মধুময় দেববাণী—
আদরে ডাকিছে যেন মোর সে জননীরাণী!
নিরাশ ভগন প্রাণে জাগে কোটি পরমায়ু—
এযে-গো লাগিছে গায়ে মায়ের আঁচল-বায়ু!
আজি আমি বহুদিনে পেয়েছি মায়ের কোল,
পেয়েছি নিশ্বাস মার, শুনেছি মধুর বোল!—
প্রভো-গো, থাম-গো নাথ!—একটু ঘুমাই হেথা।—
তুমি কি বুঝ না সুখ—তুমি কি বুঝ না ব্যথা?
এত দিন প্রভু যদি করিলে এতই দান
এই খানে এই সুখে হ'তে দাও অবসান।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

গ্রন্থ সমালোচনা।

মতীচুর—মিসেস্, আর, হোসেন প্রণীত। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। মতীচুর সুশোভন, মুখরোচকও বটে। মুসলমান সমাজের ক্ষত স্থানগুলি প্রদর্শন করাই এই পুস্তক খানির উদ্দেশ্য। লেখিকা তীব্র শ্লেষপূর্ণ ভাষায় আপন বক্তব্য বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সুন্দর, লিখন ভঙ্গীও উত্তম। লেখিকার তীব্র ভাষার জন্য অনেকে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া মতীচুরের নিন্দা করিতে পারেন; কিন্তু "হিতং মনোহারিচ দুর্লভং বচঃ।" লেখিকা স্থানে স্থানে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কোন কোন স্থানে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের আবরণে তাঁহার উদ্দিষ্ট মত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মতীচুর এই দুইটী দোষ হইতে মুক্ত থাকিলে সম্পূর্ণ চিত্তাকর্ষক হইত। লেখিকা সমাজের ক্ষত স্থানগুলি প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; ঔষধ প্রয়োগ জন্য ব্যবস্থার ভার সুধী নেতৃগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। লেখিকার সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্ত মত সমীচীন বলিয়া মুসলমান সমাজে পরিগৃহীত হইবে, এরূপ ভরসা করা যায় না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, মুসলমান সমাজের অবনতি দর্শনে লেখিকার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। মতীচুরের প্রবন্ধগুলি এই ব্যথার ফল। আমরা বহু স্থানেই লেখিকার অশ্রুধারা দেখিতে পাইয়াছি। যদি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠকগণের হৃদয়ে মুসলমান সমাজের অবনতি সম্বন্ধে সমবেদনার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলেই লেখিকার উদ্দেশ্য সফল হইবে। লেখিকার উদ্যম সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য।

৫ম বর্ষ। ১০ম সংখ্যা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন, শ্রীরেবতীমোহন গুহ এম. এ. বি. এল., শ্রীব
সান্যাল, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদার বি.এ., শ্রীকেদারনাথ মজুম
সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজি, শ্রীকুমুদরঞ্জন
মল্লিক বি. এ., শ্রীমনোমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন
মিত্র মজুমদার ও সম্পাদক প্রভৃতি।

ময়মনসিংহ সুহৃদ্ যন্ত্রালয় হইতে
শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত কর্তৃক
প্রকাশিত।

কার্ত্তিক

বার্ষিক মূল্য ১।০ দেড় টাকা। এই সংখ্যা ।০ চারি আনা।

সূচী।

নিবেদন।

"আরতি"র ৫ম বর্ষ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখনও অনেক গ্রাহকের নিকট "আরতি"র মূল্য বাকী। আমাদের বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা দয়া করিয়া স্ব স্ব মূল্য পাঠাইয়া এ সময় পরম উপকার করিবেন। মূল্য বাকী সত্ত্বেও যাঁহারা ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া আমাদিগের ক্ষতি করেন, তাঁহারা পূর্ব্বে জানাইলেই ভাল হয়; আমরা ভিঃ পিঃ করিয়া অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ হই না।

আমরা ক্রমে ক্রমে গ্রাহকগণের নিকট বাকী মূল্যের জন্য ভিঃ পিঃ করিতেছি। যাঁহাদের আপত্তি আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন, না লিখিলে মনে করিব আপত্তি নাই।

শ্রীবিশ্বেশ্বর পণ্ডিত
ম্যানেজার, "আরতি"।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক ১৩১২। দশম সংখ্যা।

ষড়রিপু।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টী মানসিক বৃত্তিকে আর্য্য ঋষিগণ "ষড়রিপু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কামাদি মনোবৃত্তিগুলি যে ধর্ম্ম সাধনের এবং মনুষ্যত্ব লাভের বিশেষ অন্তরায়, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। সুতরাং ইহাদের রিপু নাম অযথার্থ নহে।

এই প্রবন্ধে কামাদি রিপু মধ্যে কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী প্রধান রিপুর প্রকৃতি, তাহাদের দোষগুণ ও তাহা দমনের উপায় এবং প্রয়োজনীয়তাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ষড়রিপু মধ্যে কাম যে সর্ব্বপ্রধান এবং অধিকতর দুর্দ্দমনীয়, তাহা নামের পর্য্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করা দ্বারাই উপলব্ধি হয়।

কাম রিপুর প্রকৃতি অতি কুৎসিত। কাম রিপুর উত্তেজনায় মানবগণ নানা দুষ্কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। কামান্ধ ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। কামান্ধ ব্যক্তি পৈশাচিক ভাবে উন্মত্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। আমরা মনুষ্যকে কোন জঘন্য কার্য্যে ব্রতী দেখিলে তাহাকে পশু ভাবাপন্ন বলিয়া ঘৃণা করি; কিন্তু কামান্ধ মানব ইতরপ্রাণী পশু পক্ষী অপেক্ষাও বহু নিম্নে স্থান পাইবার উপযুক্ত। চৈতন্যময় প্রাণী মাত্রেই কাম রিপুর অধীন হইলেও পক্ষীজাতি এ বিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষা বহু উচ্চে আসন লাভ করিতে সক্ষম। পক্ষী জাতির নিঃস্বার্থ দাম্পত্যপ্রণয় ও কেবলমাত্র অপত্যোৎপাদনার্থ স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি মানব জাতির শিক্ষণীয়। পশু জাতিকে আমরা যতই কেন ঘৃণা না করি, এবং দুষ্কার্য্যের উপমাস্থলে "পশু" বলিয়া অভিহিত না করি, কিন্তু জ্ঞানাভিমানী মানব কাম-রিপুর সেবায় পশু অপেক্ষাও অনেকাংশে ঘৃণিত, এবং বহু নিম্নে স্থান লাভের যোগ্য। পশু মধ্যেও আমরা কামান্ধ নর-নারীকে ছাগ ছাগীর সহিত তুলনা

করিয়া থাকি ; কিন্তু এ তুলনাও সর্ব্বাংশে উপযুক্ত নহে। কারণ অপত্যোৎপাদনের উপযুক্ত সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে ছাগ ছাগীও পরস্পরে উপগত হয় না ; গর্ভিণী ছাগীর প্রতি (কামান্ধের উপমাস্থল) ছাগলের পাঠাও আক্রমণ করে না, এবং ছাগ ছাগী কখনও অস্বাভাবিক অভিগমন বা কুৎসিত উপায়ে শুক্রক্ষয় করে না।

দেবী ভাগবতের একস্থলে ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্ত দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় পাপভার গ্রহণের জন্য ক্রমে সকলকে অনুরোধ করায়, কেহই তাঁহার পাপ গ্রহণে সম্মত হইল না। পরিশেষে কতিপয় রমণী দেবরাজের পাপভার গ্রহণে সম্মতা হইয়া তাঁহার নিকট প্রত্যুপকারস্বরূপ এই বর প্রার্থনা করেন যে "গর্ভিণী রমণীর পক্ষে পুরুষ সংসর্গ পাপজনক বলিয়া যে বিধি আছে, অদ্যাবধি সেই নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া আপ্রসবকাল পর্য্যন্ত স্বেচ্ছানুসারে পুরুষ সংসর্গের বর প্রদত্ত হউক" দেবরাজ "তথাস্তু" বলিয়া স্বীয় ব্রহ্মহত্যা পাপ নারীজাতির প্রতি অর্পণ করিলেন। তদবধি ঐ ব্রহ্মহত্যা পাপের নিদর্শন স্বরূপ নারীজাতিকে প্রতি মাসে "স্ত্রীয়াশৌচ" ধারণ করিতে হয়। যদিও এই পৌরাণিক প্রবন্ধের মূলে সত্য না থাকুক, তথাপি গর্ভিণী গমনরূপ প্রকৃতি বিরুদ্ধ দুষ্কার্য্য পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীরাও করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না। অথচ শিক্ষাভিমানী নর-নারীগণ অহঃরহ সেই দুষ্কার্য্য সাধন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। কামেন্দ্রিয়ের সেবা সম্বন্ধে ইতর প্রাণিগণ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালন করায় তাহাদের স্ত্রী-সংসর্গ কখনও বৃথা হয় না। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ঋষিগণের ন্যায় ইতর প্রাণীর বীর্য্যও অব্যর্থ। কিন্তু শরীরতত্ত্ববিদ্ শিক্ষিত নর-নারীগণ ইন্দ্রিয় সংযমের অভাবে এতই নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন যে বহু চেষ্টা করিয়াও অনেকে অপত্যলাভে সমর্থ হন না। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন যে শোণিতের উৎকৃষ্টাংশ শুক্ররূপে পরিণত হয় ; যে ব্যক্তি কুচিন্তা বা কুকার্য্য দ্বারা কামরিপুর চরিতার্থ করে, তাহার সেই রক্তের পরমোৎকৃষ্টাংশ শুক্র নষ্ট হইয়া যায়। রক্তের সারভাগ অপব্যয়িত বা নষ্ট হওয়া অপেক্ষা শারীরিক বা মানসিক অধিকতর ক্ষতির কারণ আর কি হইতে পারে ? যিনি ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা বীর্য্য রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার শারীরিক ও মানসিকশক্তি বিশিষ্টরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ও শরীরবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শোণিতের চরমোৎকৃষ্টাংশ শুক্রই স্ত্রী পুরুষের জনয়িত্রী শক্তির মূল উপাদান। যাঁহার জীবন পবিত্র এবং মন সংযত, তাঁহার শরীরে এই পদার্থ লীন হইয়া পুনর্ব্বার

রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, এবং তাঁহার উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক ও দৃঢ় মাংশপেশী গঠিত হইয়া মানবের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং জিতেন্দ্রিয় নর-নারীগণ সমধিক বীর্য্যশালী, অধিকতর মনুষ্যত্ব সম্পন্ন, দৃঢ়কায়, সৎসাহসী, উদ্যমশীল এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকেন। আর ইহার অপব্যবহারে মনুষ্য বীর্য্যহীন, দুর্ব্বল ও অস্থিরচিত্ত হয়। অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবায় শারীরিক ও মানসিক শক্তির খর্ব্বতা এবং রিপুর পুনঃপুনঃ উত্তেজনা বশতঃ শরীরযন্ত্রের ক্রিয়াবিকার, স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদ ও শুক্রমেহাদি দুশ্চিকিৎস্য রোগোৎপন্ন হইয়া মানবকে একদা অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে।

কামান্ধ নর-নারী হইতে জগতে কত প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই, অগম্যাগমন, অসহায়া রমণীর প্রতি বল প্রয়োগ, অস্বাভাবিক অভিগমন প্রভৃতি কুৎসিত কার্য্য এবং তদ্ঘটিত বিরোধ, নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি নানাবিধ কুকার্য্য অহঃরহ সঙ্ঘটিত হইতেছে।

অনেক শিক্ষিত পুরুষ স্বীয় রূপগুণবতী ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া কুরূপা পরকীয়া নারীতে আসক্ত হইতেছে। আবার অনেক উচ্চ বংশীয়া রমণী রূপগুণযুক্ত পতি ত্যাগ করিয়া নীচ সংসর্গ করিতেছে।

* * * "পতিং রতিজ্ঞং সধনং যুবানং, বিহায় তুর্ণীগ্রং বনিতা পরং নরং প্রয়াতি হীনং গুণজাতি রূপৈঃ।"

লজ্জাশীলা দয়ার আধার রমণীমূর্ত্তি কামান্ধা হইলে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা হইয়া পতিহত্যা, পুত্রহত্যা প্রভৃতি নানাবিধ দুষ্ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকে। কামান্ধা নারী রাক্ষসী অপেক্ষাও অধম।

যাঁহারা নানাবিধ সদ্গুণের আধার, সমাজে যাঁহাদিগের অতুল যশ, যাঁহারা সাধুতায় ঋষিতুল্য, সেই সমস্ত মহাত্মাও কোন কোন সময় কামান্ধ হইয়া নানারূপ দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া থাকেন। সেই জন্য পৌরাণিকগণ কামের অখণ্ড প্রতাপ হইতে স্বয়ং বিধাতাকেও মুক্ত রাখেন নাই। অতএব কাম যে অতি দুর্দ্দমনীয় রিপু তাহা নিঃসন্দেহ।

এক্ষণে দেখা যাউক কি কি উপায়ে কাম দমন করা যাইতে পারে?

ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন (অষ্টবিধ মৈথুন ত্যাগ) কাম দমনের প্রধান উপায়। যিনি যতদূর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইবেন, তাহার মন তত প্রফুল্ল, দেহ বলশালী, হৃদয় উৎসাহপূর্ণ, মুখশ্রী তেজোব্যঞ্জক ও সুন্দর মস্তিষ্ক সুস্থ এবং সবল হইবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন গৃহস্থাশ্রমী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইবে কিরূপে? কিন্তু

ইহা নিতান্ত ভ্রম। আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ, জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহী হওয়া। শৈশব অতিক্রম করিলে প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া দ্বাদশ বর্ষ গুরুগৃহে বাস করিবে। এবং বেদাধ্যয়ন ও কঠোর সাধনা দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে পশ্চাৎ গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে। তীব্র তপস্যাদ্বারা অগ্রে বিষয় বাসনা দগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ নির্লিপ্ত চিত্তে বিষয় ভোগ করিবে। জিতেন্দ্রিয় হইয়া দার পরিগ্রহণ করিবে। কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য আর্য্য ঋষিগণ গার্হস্থ্যাশ্রমের নিয়ম করেন নাই। পূর্ব্বে অনেক গৃহস্থাশ্রমী সুসন্তান লাভের জন্য সংযমী হইয়া বিধিপূর্ব্বক অপত্যোৎপাদন করিতেন। সুতরাং গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিকূল নহে।

স্ত্রীলোকাদি প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকা কামদমনের একটী উপায়। সৎসংসর্গ, সৎপুস্তক পাঠ, কঠিন শয্যায় শয়ন কামদমনের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

কুচিন্তা নিতান্ত অনিষ্টকারী; সুতরাং বিশেষ চেষ্টাদ্বারা কুচিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় করিবে। কুচিন্তা মনে উদয় হওয়া মাত্র অন্য বিষয়ে দৃঢ়তর সহিত মনোনিবেশ করিবে; যদি কিছুতেই কুচিন্তা দূর করিতে না পার, তবে কোন শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।

অমুত্তেজক দ্রব্য ভোজন অর্থাৎ অত্যুষ্ণ, অতিলবণ, অত্যম্ল, রুক্ষ, বিদাহী প্রভৃতি রাজসিক আহার ত্যাগ করিবে। লঘু অথচ পুষ্টিকর সাত্বিক আহার দ্বারা কাম প্রবৃত্তি দমিত হয়। সেই জন্যই বিধবাদিগের পক্ষে হবিষ্যান্নের বিধান হইয়াছে।

কৌপীন ধারণ, যোগের অঙ্গ; আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম প্রভৃতিও কামদমনের উপায়।

দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা অন্যরূপ জ্ঞানালোচনায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকিলে কুচিন্তা প্রবেশের অবসর পায় না, সুতরাং জ্ঞানালোচনাও কামদমনের বিশেষ সহায়।

মাতৃ-চিন্তা কামদমনের বিশেষ সহায়। এ জগতে সমস্ত নারীই জগজ্জননীর অংশ, যথা—"বিদ্যাঃ সমতাস্তব দেবী ভেদাঃ স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" (চণ্ডী)। সুতরাং স্ত্রীলোক মাত্রেই মাতৃস্থানীয়া। মাতৃভাব অপেক্ষা মধুর ভাব জগতে আর নাই। স্ত্রী দর্শন মাত্র সেই মধুর মাতৃভাব হৃদয়ে জাগ্রত হইলে মনের কুপ্রবৃত্তি দূর হইয়া যায়। শোণিত, শ্লেষ্মা ও মূত্রপুরীষযুক্ত স্বভাব দুর্গন্ধী ক্লেদার্দ্র দেহের স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘৃণার উদয় হইলেও কাম

প্রশমিত হয়। কিন্তু ভাগ্যবশতঃই কাহারও ভাগ্যে এরূপ ঘৃণার উদয় হইয়া থাকে। নচেৎ বিষ্ঠাজাত কৃমির যেমন বিষ্ঠা ঘৃণার বিষয় নহে, তদ্রূপ মনুষ্যেরও শুক্র শোণিতের পরিণামভূত দেহে ঘৃণার উদয় হয় না।

ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ কাম দমনের সর্ব্বপ্রধান উপায়; যখনই মনে কুভাব উদিত হইবে, তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে আর কুচিন্তা হৃদয়ে স্থান পায় না। যিনি ঈশ্বরের দয়ার প্রতি নির্ভর না করিয়া কেবল আত্মবলে কুপ্রবৃত্তি দূর করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার চেষ্টা কখনও সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না।

এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই,—যে কাম, এত জুগুপ্সিত, যাহা মনুষ্যের সর্ব্বনাশ সাধনের মূল, মঙ্গলময় ঈশ্বর কেন মানব শরীরে এরূপ ভয়ঙ্কর রিপু সৃষ্টি করিলেন? মঙ্গলময় করুণা নিধান কি অমঙ্গলের স্রষ্টা? না তাহা কখনই নহে। জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা জীবের নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলজনক। বিধাতা সমস্ত পদার্থই জীবের মঙ্গলার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন; কেবল স্থান, কাল, পাত্র এবং ব্যবহারের দোষেই মহামঙ্গলকর পদার্থ অমঙ্গলজনক হইয়া থাকে। নচেৎ যে কামকে রিপু বলিয়া এত বীভৎসচিত্রে চিত্রিত করা হইল, তাহার তুল্য মঙ্গলজনক পবিত্র বিষয় জগতে আর কি আছে? যাহা প্রাণী সৃষ্টির একমাত্র উপায়, যাহা সংসার রচনার একমাত্র হেতু, ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত যে শুভ সংযোগে উৎপন্ন তাহা কি কখন অমঙ্গলজনক বা বীভৎস হইতে পারে?

হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে গর্ভাধান ক্রিয়া প্রধান দশ সংস্কারের অন্তর্গত একটী সংস্কার বিশেষ। আর্য্যঋষিগণ কেবল সুসন্তান লাভের জন্যই দার পরিগ্রহণ করিতেন। তাঁহারা সংযমী হইয়া অপত্যোৎপাদন করিতেন, সুতরাং তাঁহারা গৃহী হইলেও ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলিত হইতেন না।

এক্ষণ দেখিতে হইবে আমরা যাহাকে প্রধান রিপু বলিয়া মনে করি, যাহার আলোচনাও অশ্লীলতা বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করি, আর্য্যঋষিগণ সুসন্তান লাভের জন্য তাহাকে সরলভাবে বিধি বিহিত করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা ঋষি প্রদর্শিত নিয়মানুসারে বৈধ সংসর্গ করিলে সুসন্তান লাভ হইয়া থাকে. এবং সুসন্তান লাভ সংসারের সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলের কারণ।

ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন।

টিপু পাগলার বিদ্রোহ।

১৮২৫ সনে সেরপুর অঞ্চলে দেশপ্রসিদ্ধ টিপু পাগলের ভীষণ বিদ্রোহ সূচীত হয়। সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত লেটিয়াকান্দি গ্রামে টিপুর জন্মস্থান। টিপু গারো, প্রথমতঃ একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিল। ক্রমে ধর্ম্মমত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয় ও "পাগলপন্থী" প্রচারক হইয়া দাঁড়ায়। সুসঙ্গ ও সেরপুর পরগণায় তাহার শিষ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৮২০ সনে সেরপুরের জমিদারী বাটওয়ারা হইয়া পৃথক্ হইয়া গেলে পরগণার জমিদারগণ প্রজা হইতে বাটওয়ারা খরচ আদায় মানসে বৃদ্ধিহারে খাজানা ধার্য্য করেন। জমিদার প্রজা সাধারণের নিকট আবওয়াব খরচ, মাথট প্রভৃতি বহুবিধ ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া প্রজার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। এই উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বহু প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় (১)। তাহারা কুড় (২) প্রতি চারি আনা খাজানার অধিক দিতে পারিবে না বলিয়া স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করে। ধর্ম্ম প্রচারক টিপু সময় বুঝিয়া বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এবং স্বীয় অভিনব সাম্য মতের প্রচার দ্বারা সেরপুরে ভীষণ বিপ্লব জাগাইয়া তোলে। টিপুর ধর্ম্ম মতের মূলমন্ত্র—"সকল মনুষ্যই ঈশ্বর সৃষ্ট, সুতরাং কেহ কাহারও অধীন নহে।" সহস্র সহস্র উৎপীড়িত প্রজা এই সাম্য মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে ও জমিদারের প্রাপ্য খাজানা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। প্রজা খাজানা বন্ধ করিয়া ফেলিলে জমিদারগণ নিরুপায় হইয়া প্রজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। জমিদার ও প্রজার সঙ্ঘর্ষে সেরপুরে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। বিদ্রোহিগণ হাজারে হাজারে আসিয়া জমিদার গৃহ লুণ্ঠন করিল। জমিদারগণ পরিবার সহ কালীগঞ্জের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেম্পিয়ারের কাছারী বাড়ীতে গিয়া

(১) "It was admitted that appression and the leveying of illegal imposts denominated kharcha, mathots and Abwabs on the part of the zaminders were the original causes of the disturbances which occurred in 1825." History of disturbances submitted by J. Dunbar Magistrate of Mymensingh to the Commissioner dated 5/6/1833.

(২)। ১ হাত ৬ ইঞ্চি=১ গজ, ১২০ গজ দীর্ঘ × ১২০ গজ প্রস্থে=১ কুড়। সেরপুরের ১ কুড়=৩ বিঘা ১০ কাঠা।

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ডেম্পিয়ার প্রজার উন্মত্তভাব দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি নসিরাবাদের কালেক্টরকে বিহিত ব্যবস্থা ও আদেশ প্রদান করিতে চিঠি লিখিলেন।

এদিকে সেরপুরে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত হইল। বিদ্রোহিগণ সেরপুর অধিকার করিয়া বিচার ও শাসন বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিল।

সেরপুরের তৎকালীন পণ্ডিত স্বর্গীয় রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই অভিনব বিচার ও শাসন বিভাগের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন—

"বক্সু আদালত করে দ্বীপচান ফৌজদার।
কালেক্টরের সরবরাকার গুমানু সরকার॥" (১)

টিপু গরদরিপার প্রাচীর অভ্যন্তরে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া এই অভিনব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিল। টিপুর অধীনে বক্সু নামীয় কোন ব্যক্তি জজ ও দ্বীপচান মাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শাসন ও বিচার চলিতে লাগিল।

টিপুর এই রাজ্য শাসন দুই বৎসর অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। (২) অতঃপর ১৮২৬ সনের শেষভাগে জামালপুরের সেনানিবাস স্থাপিত হইলে তথা হইতে

(১)। পরম পূজনীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে আমি এই কবিতা অংশগুলি গ্রহণ করিয়াছি। যদি কেহ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত "পাগলাই ধুন" সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ কবিতাটী আমাকে দিতে পারেন তবে ময়মনসিংহের ইতিহাসের একটী মূল্যবান অধ্যায় রচনার সাহায্য হইবে। এবং এই দীন লেখক তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। কবিতাটীর আরম্ভ এইরূপ—

"সন ১২৩১ সনে পাগল হইল প্রজা।

(২)। এই দুই বৎসরের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গেল না। জামালপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডন্নু সাহেবের লিখিত Report এ অবগত হওয়া যায় এ বিদ্রোহ সিপাহী সৈন্যের সাহায্যে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। ১৮২৭ জামালপুরে সেনানিবাস পুনঃ স্থাপিত হয়। সুতরাং ১৮২৭ সনেই টিপুর তি নিবারিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রজ্ঞের ৯

সৈন্য সাহায্য পাইয়া ডেম্পিয়ার সাহেব টিপুর বিদ্রোহ দলকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। (৩)

১৮২৭ সনে রাধাচরণ দারোগা ১০ জন বরকন্দাজ সহ গরদরিপায় যাইয়া অশেষ কৌশল সহকারে টিপুকে ধৃত করেন। ময়মনসিংহের সেসন জজের বিচারে টিপুর যাবজ্জীবন কারাবাস আজ্ঞা হয়। ১২৫৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে টিপুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাহার পৌত্রও কারারুদ্ধ ছিল। টিপুর মৃত্যুর দিবসে ভীষণ তুর্ণড ময়মনসিংহের অনেক অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছিল। এরূপ তুর্ণড (Chyclone) ময়মনসিংহে এ পর্যান্ত হয় নাই।

টিপুর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জামালপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডস্নু সাহেব লিখিয়াছেন টিপুর মৃত্যুর পরও টিপুর গৃহ তাহার শিষ্যগণের পীঠস্থান ছিল। তাহার শিষ্যগণ বিশ্বাস করিত টিপুর গৃহে কার্য্য করিলে অসাধ্য সাধন হইবে। এ জীবনে যাহা অসম্ভব টিপুর প্রতি ভক্তি থাকিলে তাহা অনায়াসে সম্পাদিত হইবে। তাই প্রতি দিবস তাহার গৃহে ৪০।৫০ জন পুরুষ ও ১০।১২ জন স্ত্রীলোককে খাটিতে দেখা যাইত।

টিপুর শিষ্যেরা শ্মশ্রু, গোঁপ রক্ষা করে না ও গৃহপালিত পশু পক্ষী পালন করে না। তাহারা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি মস্তক অবনত করে না। তাহার গৃহের পবিত্র সীমানার ভিতর কেহ থুতু নিক্ষেপ করিতে পারে না। এখনও টিপু বিশ্বাসিগণের সংখ্যা ৪।৫ সহস্রের কম নহে।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

---

(৩)। প্রবাদ সেরপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেম্পিয়ার সাহেব টিপুর নিকট হইতে বহু পরিমাণে অর্থ পাইয়া কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইয়াছিলেন। এবং সেই কারণে টিপুর অরাজকতা সময় ও সুবিধা পাইয়া বিচার ও শাসন বিভাগের পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল। এই প্রবাদ সমর্থন জন্য সেই সময়ের suit বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অন্য একটী কবিতা-পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

Com "হাকিম হোকের এছা কিয়া,

(২) হাম বুলে তুম্ রিসৃফত খায়া,"

"সেরপুরের কালেক্টর কি তহুর্দ্ধ কর্ম্মচারির ভর্ৎসনা সূচক!

শকাব্দ।

বঙ্গদেশে এখন যে অব্দ প্রচলিত আছে, তাহা 'সন' বলিয়া কথিত হয়। কেহ বা তাহা বঙ্গাব্দ বলিয়াও লিখেন। বর্ত্তমানে ১৩১২ বঙ্গাব্দ চলিতেছে।

মুসলমানগণ প্রায়ই 'হিজরী' ব্যবহার করেন। আইন আকবরীতে লিখিত আছে সম্রাট আকবর 'হিজরী' ব্যবহার করা অসঙ্গত বিবেচনা করিতেন। 'হিজরী' ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞ মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইবেন, এজন্য তিনি প্রথমতঃ 'হিজরী' ব্যবহার করিতেন। ৯৯২ হিজরীতে সম্রাট এক নূতন অব্দ প্রচার করেন, কিন্তু তাহা প্রচলিত হয় নাই। 'হিজরী' চান্দ্র অব্দ, অথচ মুসলমানগণ মলমাস তত্ত্ব অবগত নহেন। এজন্য রাজস্বের বন্দোবস্তে 'হিজরী' ব্যবহার করা কঠিন। সম্রাট আকবরের বাঙ্গলার রাজস্বের বন্দোবস্ত সময়ে 'হিজরী'কে সৌর অব্দে পরিণত করা হয়, ইহা হইতেই বোধ হয় বাঙ্গালা 'সনের' উৎপত্তি।

এদেশে শাসন পত্রাদিতে 'সন' প্রচলিত, কিন্তু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে শকাব্দ প্রচলিত। শাস্ত্রীয় গ্রন্থে কখনও 'সন' ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান ১৩১২ বঙ্গাব্দে ১৮২৭ শকাব্দ এবং ৫০০৬ কল্যব্দ। শাকেষু নবশৈলেন্দু রামযোগে কলের্গতাঃ। শকাব্দে ৩১৭৯ যোগ করিলে কল্যব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এদেশে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে শালিবাহন নরপতি শকাব্দ প্রচলন করেন। অনেকে বলেন শালিবাহন মহারাষ্ট্র দেশের অধিপতি ছিলেন; তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরী ছিল। কেহ বলেন শকাব্দ প্রচারক শালিবাহন মগধাধিপতি ছিলেন। কোন কোন গ্রন্থে শালিবাহনের নাম সাতবাহন লিখিত আছে।

শালিবাহন সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। একদা নরপতি মহিষীসহ জলক্রীড়া করিতেছিলেন; অধিকক্ষণ জলক্রীড়া করাতে মহিষী ক্লান্ত হইলেন। মহিষী কহিলেন, "মোদকং দেহি দেব।" দেব! আর জল দিও না। নরপতি মোদকং মোদক বুঝিয়া মোদক আনিতে আদেশ করিলেন। নরপতিকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার জন্য তদীয় মন্ত্রী সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্রব্যাকরণ রচনা করেন। কাতন্ত্রব্যাকরণ বঙ্গদেশের চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত আছে।

দাক্ষিণাত্যে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি শালিবাহন অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। উভয় মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল। এই যুদ্ধে বিক্রমাদিত্য পরাজিত হন। পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে সম্বৎ প্রচলিত ছিল কিন্তু শালিবাহন স্বীয় কীর্ত্তি চির স্মরণীয় করিবার জন্য শকাব্দ প্রচলন করেন।

কিন্তু শালিবাহন কেন এই অব্দ 'শকাব্দ বলিয়া প্রচার করেন তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের জনৈক নরপতি আর্য্যাবর্ত্তের নরপতির কীর্ত্তি লোপ করার অভিপ্রায়ে কোন অব্দ প্রচলন করিলে আর্য্যাবর্ত্ত-বাসিগণ সে অব্দ ব্যবহার করিবেন কেন? ইহার কারণ বুঝা যায় না।

সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় বলেন যে বৃহৎ সংহিতার টীকাকার ভট্টউৎপল বিক্রমাদিত্যকে শকাব্দার প্রচারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা বিক্রমাদিত্যকে শকাব্দার প্রচারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে বিক্রমাদিত্য শকদিগকে বিনাশ করিয়া শকাব্দ প্রচলন করেন।

আলবিরুণি বলেন ঃ—

"বিক্রমাদিত্যের অব্দ (১) হইতে শকাব্দ ১৩৫ বৎসর পরবর্ত্তী। ভারতবর্ষীয় লোকে শকাব্দকে 'শককাল' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শক একজন নরপতির নাম। তিনি সিন্ধুনদ এবং সাগর এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার রাজধানী এই প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছিল। তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া কথিত হইত। ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিগণ বলেন যে তিনি শাক্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন, এবং মানস্থরা (২) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন তিনি বিদেশীয় এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমে কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন, প্রজাগণ তাঁহার রাজত্বে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছে। পরিশেষে তাহারা পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। বিক্রমাদিত্য তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। উভয়ের সৈন্য মধ্যে সংগ্রাম হয়; শক নরপতির সৈন্যগণ পলাইয়া যায়। করুর যুদ্ধক্ষেত্রে (৩) শক নরপতি নিহত হন। করুর মুলতান এবং লুনি দুর্গের মধ্যবর্ত্তী প্রজাগণ শক নরপতি নিহত হওয়াতে নিতান্ত উল্লাসিত হয়। এজন্য এই বৎসর হইতে এক নূতন অব্দ প্রচলিত হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই অব্দ ব্যবহার করেন। বিক্রমাদিত্য এই যুদ্ধের পরে 'শ্রী' উপাধি গ্রহণ করেন।"

(১) ২। (২) মানস্থরা সিন্ধু প্রদেশে।

(৩) ...লক্টর বোধ হয় কুরুক্ষেত্র।

আলবিরুণি বলেন যে এই বিক্রমাদিত্য মালব প্রদেশের অধিপতি বিক্রমাদিত্য নহেন। কারণ এই ঘটনার ১৩৫ বৎসর পূর্ব্বে মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান ছিলেন।

মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য এই যুদ্ধের জেতা হওয়া অসম্ভব। মালব দেশে হর্ষ বিক্রমাদিত্য নামে আর একজন নরপতি ছিলেন। তিনি কখন শ্রীহর্ষ নামে কথিত হন। বৌদ্ধ ইতিবৃত্ত লেখক তারানাথ বলেন যে শ্রীহর্ষ মুলতান নগরে বহু ম্লেচ্ছদিগকে বিনাশ করেন।

হর্ষ বিক্রমাদিত্য শকাব্দ প্রচলিত হইবার অনেক পরে বর্ত্তমান ছিলেন। আলবিরুণি যে বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষীয় কোন কোন গ্রন্থে শকাব্দ শালিবাহন নরপতির অব্দ বলিয়া লিখিত আছে। বোম্বাই নগরে যে "মুহূর্ত্ত গণপতি" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে—"শ্রীনৃপ শালিবাহন শকে।" মুহূর্ত্তমার্ত্তণ্ড গ্রন্থে লিখিত আছে—"ত্র্যঙ্কেন্দ্রপ্রমিতে বর্ষে শালিবাহন জন্মতঃ।" শালিবাহনের জন্ম হইতে ১৪৯৩ বর্ষে * * *। কিন্তু শালিবাহনের জন্ম হইতে কোন অব্দ প্রচলিত হওয়া অবগত হওয়া যায় না।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থেও শকাব্দ শালিবাহন নরপতির প্রচলিত অব্দ বলিয়া লিখিত আছে।

ডাক্তার ওল্‌ডেনবর্গ বলেন কাশ্মীরাধিপতি কনিষ্ক শকাব্দ প্রচলন করেন। বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রমেশচন্দ্র দত্ত এই মত অনুসরণ করিয়াছেন। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ এবং বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য ও দত্ত মহাশয়ের মত সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিলে দত্ত মহাশয়ের মত প্রকৃত বলিয়া অনুমান হয়।

কনিষ্ক একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি শক নরপতি। কনিষ্কের রাজত্ব সময়ে কাশ্মীর প্রদেশে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ মহাসভার অধিবেশন হয়। তিনি পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশবার) হইতে পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করেন। গার্গ্য-সংহিতা পাঠেও এই বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। গার্গ্য-সংহিতাতে লিখিত আছে—"মগধাধিপতি শালিশুকের রাজত্ব অবসানে পরাক্রান্ত ম্লেচ্ছগণ সাকেত (বর্ত্তমান অযোধ্যা) পঞ্চাল, মথুরা প্রদেশ অধিকার করিয়া কুসুমধ্বজ (পাটলীপুত্র) অধিকার [illegible] —[illegible]বাক্যস্বরূপে ইহা লিখিত হইয়াছে।

গার্গ্য-সংহিতার উল্লেখ বৃহৎ-সংহিতাতে আছে। বৃহৎ-সংহিতা বরাহমিহির কৃত। "নবাধিক পঞ্চশত সংখ্য শাকে বরাহমিহিরাচার্য্য দিবংগতঃ।" ৫০৯ শকাব্দে বরাহমিহির আচার্য্য স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব গার্গ্য-সংহিতা অতি প্রাচীন।

কনিষ্কের সাময়িক যে উৎকীর্ণলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে—"মহারাজস্ত কনিষ্কস্ত সম্বৎসরে নবমে।" বাদামির উৎকীর্ণলিপিতে লেখা আছে—"শকনৃপতি রাজ্যাভিষেক সম্বৎসরেষতিক্রান্তেষু পঞ্চসু শতেষু।" শক নরপতির রাজ্যাভিষেক বৎসর হইতে ৫০০ শত বৎসর অতীতে। ইহাদ্বারা শক নরপতির রাজ্যাভিষেক সময় হইতে এক অব্দ প্রচলিত হওয়া উপলব্ধি হয়।

বরাহমিহির 'শককাল' ও 'শকেন্দ্রকালের' ব্যবহার করিয়াছেন। শককাল, শকেন্দ্রকাল দ্বারা শক নরপতির প্রচলিত অব্দ বুঝা যায়; কিন্তু শক নরপতির নিহত কাল বুঝা যায় না। যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে যে বচন আছে তাহা বৃহৎ-সংহিতার বচন যথা—

আসন্মঘাসুমুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শককাল স্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥

যুধিষ্ঠির নরপতি পৃথিবী শাসন করার সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। শককালে ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রহ্মগুপ্তও শক নরপতির কালের উল্লেখ করিয়াছেন। এ দেশে পঞ্জিকাদিতে "শক নরপতেরতীতাব্দাঃ" বলিয়া লিখিত হয়। অতএব শকাব্দ শক নরপতি প্রচলিত অব্দ নির্দ্ধারণ করা অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না।

ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায়ে লিখিত আছে—"রসগুণ পূর্ণমহী সমশক নৃপ সময়ে ভবন্মমোৎপত্তিঃ।" শক নৃপ সময়ের ১০৩৬ সম্বৎসরে (১০৩৬ শকাব্দে) আমার জন্ম হইয়াছে। ইহাদ্বারা শক নরপতি অব্দ প্রচার করা উপলব্ধি হয়।

অতএব শকাব্দ যে একজন শক নরপতি কর্ত্তৃক প্রচলিত অব্দ তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করা অনুচিত। এ দেশে যে সমস্ত শক নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন তন্মধ্যে কনিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত; এবং শকাব্দ প্রচলনের সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন; এজন্য কনিষ্ক শকাব্দার প্রচারক বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে শক নরপতি কর্ত্তৃক শকাব্দ প্রচলিত হইলে কোন্ কোন্ গ্রন্থে তাহা শালিবাহনাব্দ বলিয়া কেন লিখিত হইয়াছে?

এবং কনিষ্ক যে এই অব্দ প্রচার করিয়াছেন ইহা কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না কেন ?

কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে যাহা ধার্য্য হয় তাহা ভারতের উত্তর দেশস্থ বৌদ্ধগণ মান্য করিয়া থাকেন; কিন্তু দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধগণ সম্রাট অশোকের সাময়িক তৃতীয় মহাসঙ্ঘের নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা মান্য করিয়া থাকেন। আর্য্যগণ কোন গ্রন্থে বৌদ্ধনরপতিগণের কীর্ত্তি বর্ণনা করেন নাই। কনিষ্কেরও কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ভুবন বিখ্যাত বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের কীর্ত্তি অতুলনীয়, আফগানিস্থান হইতে উড়িষ্যা, হিমালয় হইতে সৌরাষ্ট্র এই সমস্ত স্থান তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; তাঁহার সময়ে যদি কোন বাল্মীকি বা ব্যাস জন্মগ্রহণ করিত, তবে তিনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন এতাদৃশ বর্ণনা হইত। কিন্তু পুরাণে তাঁহার নাম মাত্র উল্লেখ আছে।

শালিবাহনের এই অব্দ প্রচার করার কথা, বোধ হয় দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইবার পরে কোন কোন গ্রন্থকার ইহা শালিবাহনাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক শালিবাহন এই অব্দ প্রচার করিলে ইহা কখনও শকাব্দ বলিয়া কথিত হইত না।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

হুমায়নের বঙ্গ-বিজয়।

(২)

সন্ধি-সর্ত্ত স্থিরীকৃত হইবার পর বিশ্বাসঘাতক শের খাঁ তাহার প্রধান কর্ম্মচারিবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের মধ্যে এমন সাহসী কে আছে যে, আজ মোগল শিবির আক্রমণ করিতে পারে।" প্রথমতঃ কোন আফগান সেনাপতিই এ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হন না, শেষে খোয়াজ খাঁ নামক এক ব্যক্তি বলিলেন,—"আপনি যদি একদল সুদক্ষ সমরকুশল যোদ্ধা ও কতিপয় যুদ্ধ-হস্তী আমায় প্রদান করেন, তবে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।" পরে তিনি বলেন,—"যদিও এ কার্য্য দৈব সাপেক্ষ, তথাচ আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। জয় পরাজয় পরমেশ্বরের হাতে।" শের খাঁ

এই প্রস্তাবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজ ইচ্ছামত সৈন্য ও হস্তী বাছিয়া লইতে খোয়াজকে অনুমতি করেন। খোয়াজ দিবা দশ ঘটিকার সময় সসৈন্যে যাত্রা করেন কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শত্রু-শিবির আক্রমণের কোন কার্য্যই করেন না। ইত্যবসরে সেখ খেলিল চর দ্বারা সম্রাটকে সাবধান হইতে বলিয়া পাঠান। কিন্তু অদৃষ্ট যখন মন্দ হইতে থাকে তখন সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হয়।

শের খাঁ যে এত শীঘ্র সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিবে, হুমায়নের এ ধারণাই ছিল না; সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ সংবাদ পাইয়াও তিনি তাহাতে আস্থা স্থাপন করিলেন না বা আত্মরক্ষার্থ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন না। পর দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আফগান সৈন্য মোগল শিবিরের সন্নিকট উপনীত হইয়া মহা কোলাহলে মোগল সৈন্য সমূহকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এতৎ শ্রবণে হুমায়ন তৎক্ষণাৎ রণ-ভেরী বাজাইতে আদেশ করিলেন, দেখিতে দেখিতে প্রায় তিনশত অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া সমবেত হইল। এমন সময় বিপক্ষের একটী রণ-হস্তী তথায় অগ্রসর হইল। হুমায়ন বীরবর মীর রেজাককে উহা বধের নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন। মীর সাহেব তাহার সাহসিকতা ও তেজস্বিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। শুর্কআলী ও টেটাবেগ নামে তাহার দুই পুত্র ছিল, প্রথমটী সম্রাটের দোনলা বন্দুক এবং দ্বিতীয়টী তাঁহার বর্ষা বহন করিত। ইহারাও তথায় উপস্থিত ছিল। কিন্তু কেহই সম্রাটের সে ইঙ্গিত অনুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর না হওয়ায়, সম্রাট নিজেই শুর্কআলীর হস্ত হইতে একখানি বর্ষা টানিয়া লইয়া নিজের অশ্বে চাপিয়া মহাবেগে হস্তীর কপালে এমন গুরুতর ভাবে বর্ষা বসাইয়া দিলেন যে পুনরায় তাহা আর বাহির করিতে পারিলেন না। এমন সময় হস্তীপৃষ্ঠস্থিত একজন তীরন্দাজের হস্ত নিঃসৃত তীর আসিয়া হুমায়নের বাহুতে বিদ্ধ হইল এবং বিপক্ষগণ তাঁহাকে ঘিরিবার আয়োজন করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সম্রাট তাঁহার সৈন্যদলকে অগ্রসর হইয়া শত্রু আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু কেহই সে আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল না। আফগানগণ সফলকাম হয় এমন সময় একজন সম্রাটানুচর আসিয়া তাঁহার অশ্বের লাগাম ধরিয়া বলিল, "এখন আর বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যখন আপনার বন্ধুবর্গ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছে তখন পলায়নই একমাত্র উপায়।" সম্রাট তারপর নদীর তীর অভিমুখে পলায়নপর হইলেন এবং যদিও তাঁহার পশ্চাতে স্বপক্ষের একটী হস্তী আসিতেছিল, তত্রাচ তিনি অশ্ব সহিত নদীর স্রোতে ঝাঁপিয়া পড়িলেন। কিয়ৎ দূর অগ্রসর হইয়াই অশ্বটী নিমগ্ন হইল এই

ঘটনা দর্শনে একজন ভিস্তিওয়ালা তাহার ভিস্তি বায়ুতে পূর্ণ করিয়া সম্রাটকে প্রদান করে। সম্রাট তাহারই সাহায্যে নদীর উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হন। তীরে উঠিয়া তিনি জানিলেন ভিস্তিওয়ালার নাম নিজাম। তিনি তখন তাহাকে বলেন, "আমি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ) ন্যায় তোমার নাম প্রসিদ্ধ করিব, তুমি আমার সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিবে।"

এই স্মরণীয় দিনে বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য মৃত্যু মুখে পতিত হয়, এবং গঙ্গা পার হইতে গিয়াও তৎতুল্যসংখ্যক প্রাণী ভাগীরথীর শীতল সলিলে সমাধিস্থ হয়। (১) সম্রাট হুমায়ুন কোন প্রকারে এই বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন।

অনতি বিলম্বে সম্রাট সংবাদ পান যে, মীর ফেরিদ গুর পূর্ব্ব দিক হইতে তাঁহার অনুধাবন করিতেছে এবং সাহা মহম্মদ আফগান তাঁহার সম্মুখের ঘাটী আটকাইয়া বসিয়াছে। এই অশুভ সংবাদ শ্রবণে তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যবৃন্দ নিরুৎসাহ হইয়া পলায়নে উদ্যত হইল। অবশেষে রাজা পারবেহান বলিলেন যে, সম্রাট অনুমতি করিলে তিনি তাহার নিজের সৈন্যদল লইয়া ফোরদ আফগানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন। ইত্যবসরে সম্রাটও শত্রুসৈন্য অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন। এই যুক্তি স্থির হইলে তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। ইহাতে আফগান নিজে নিজেই পথ ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

কতিপয় অভিযানের পর মোগল-সৈন্য কালপিতে পঁহুছিল। তথাকার শাসন কর্ত্তা—কাসিম কেরাচির পুত্র সম্রাটকে উপঢৌকন দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতার অবৈধ উপদেশানুযায়ী তিনি পরে কেবল কয়েকটী অকিঞ্চিতকর সামগ্রী সম্রাটকে উপহার দেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সম্রাট তাঁহার ভ্রাতা কামরাণের জন্য কেবল একটী কারুকার্য্যবিশিষ্ট জীন লাগাম গ্রহণ করতঃ অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি ফেরৎ দিলেন।

কাল্পি হইতে সম্রাট-সৈন্য আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিল। আগ্রার নিকটবর্ত্তী জের আফগান (বিক্ষিপ্ত স্বর্ণ) নামক উদ্যান বাটীকায় যুবরাজ কামরাণ তখন বাস করিতেছিলেন। হুমায়ুন তথায় আসিতেছেন সংবাদে যুবরাজ তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী হন। পথিমধ্যে ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইলে সম্রাট অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপর তিনি যুবরাজের শিবিরে গমন করেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর যুবরাজ বলিলেন—"সম্রাট

(১) হিন্দুস্থানের ইতিহাসে এই মৃতের সংখ্যা আট হাজার লিখিত হইয়াছে।

যখন নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং সিংহাসনও পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন আমার একটী কথা রাখিতে হইবে। আমার অনুরোধ যে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ হিন্দন যে সকল অন্যায় কার্য্য করিয়াছে তাহা মার্জ্জনা করুন।" সম্রাট উত্তর করিলেন—"আমি তোমার অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা করিলাম, নিশ্চিন্ত মনে দরবারে আসিতে তাহাকে লিখিয়া দাও।"

হুমায়ুন সিংহাসনে পুনঃ আরোহণ করিলে পর সেই ভিস্তিওয়ালা আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে। সম্রাট তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত স্মরণ করিয়া দুই ঘণ্টা কাল তাহাকে লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া থাকেন, পরে তাহার প্রার্থনা ব্যক্ত করিতে অনুমতি দেন।

ইহার কয়েকদিবস পর সম্রাট হুমায়ুন ভূতপূর্ব্ব সম্রাট বাবরের উদ্যানস্থিত প্রস্তর প্রাসাদে (Stone Palace) একটী দরবার আহুত করেন। এই দরবারে যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হন। এই প্রকাণ্ড দরবারে সম্রাট তাঁহার অনুজ কামরাণের দিকে ফিরিয়া বলেন,—"সত্য করিয়া বল, কেন হিন্দন আমার বিরুদ্ধাচরণ করিল?" কামরাণ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া হিন্দনকে বলিলেন,—"সম্রাটের এই সঙ্কটাবস্থায় তাঁহাকে সাহায্য না করিয়া কেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে?" হিন্দন অত্যন্ত লজ্জিত হন, সমস্ত দোষ তাঁহার কুপরামর্শ দাতাদিগের স্কন্ধে আরোপ করতঃ নিজের অপরিপক্কতার বিষয় উল্লেখ করিয়া দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে সম্রাট উত্তর দেন,—"বেশ, যখন তুমি অনুতপ্ত হইয়াছ তখন তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু জানিও ইহা কেবল তোমার ভ্রাতার অনুরোধে। কুলোকের পরামর্শ শ্রবণ করিলে কি ফল হয়, তাহা বোধ হয় এই ঘটনাতেই তোমার শিক্ষা হইল। তোমার কি মনে নাই, সেই মহাপুরুষের সঙ্গিগণ বিপক্ষের মন্ত্রণাক্রমে অবাধ্য হইয়া কি দশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন?" তৎপর সম্রাট বলেন,—"যাক্ যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, সে বিষয় আর চিন্তা করিয়া ফল নাই। এখন আমরা সকলে ঐক্য হইয়া কি প্রকারে শের সাহা ও আফগানগণকে দমন করিতে পারি তাহার উপায় স্থির করি। চৌসারে শের সাহা আমার সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক রজনীতে গোপনে আমাকে আক্রমণ করে। সে এখন কানোজ পর্য্যন্ত আমার রাজ্য অধিকার করিয়াছে।" এতৎশ্রবণে যুবরাজ ও আমীর ওমরাহান বলিলেন,—'ভগবানের অনুগ্রহে এবং সম্রাটের শুভাদৃষ্টক্রমে এখন হইতে আমরা আমাদের বীরত্ব ও কার্য্যকুশলতা এরূপভাবে প্রকাশ করিব যে,

তদ্দ্বারা সম্রাটের সমস্ত শত্রু দমিত ও দলিত হইবে।" এইরূপ কথোপকথনের পর ভাবি সাফল্যের নিমিত্ত উপাসনা করা হইল। সম্রাট আদেশ করিলেন, জিকাদ মাসের শেষে আমাদের অভিযানের পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ জের আফগান উদ্যানে আমরা শিবির সন্নিবেশিত করিব। যুবরাজ কামরাণ সম্রাটকে রাজধানীতে অবস্থান করিতে এবং তাহাকে এই অভিযানের সেনাপতিত্বে বরণ করিতে বিশেষ অনুনয় বিনয় করেন। যুবরাজ বলেন, তিনিই আফগানদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবেন। কিন্তু সম্রাট উত্তর করেন—"না, শের খাঁ আমাকে পরাজিত করিয়াছে, সুতরাং আমি নিজে তাহার প্রতিশোধ লইব। তুমি রাজধানীতে অবস্থান করিবে।" যাহা হউক স্থির হইল যে সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিবেন এবং যুবরাজ পূর্ব্বমত আগ্রা শাসন সংরক্ষণ করিতে থাকিবেন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

বিবাহের উৎপত্তি।

বিবাহের উৎপত্তি কিরূপে হইল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন অদম্য ভোগ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই আদিমকালে মানব সমাজে বিবাহ পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা বলেন "সমাজের উন্নতির সহিত বিবাহ প্রথাটীও ক্রমশঃ সংস্কৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান সুসভ্য সমাজে বিবাহ একটী পবিত্র যজ্ঞ, কিন্তু কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বলবতী ইচ্ছাই প্রথমাবস্থায় বিবাহের ভিত্তিস্বরূপ ছিল।" এই অনুমানটী নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক।

মানবের ভোগ-লালসা অত্যন্ত অধিক; সমস্ত প্রবৃত্তির মধ্যে এই প্রবৃত্তিটী অতিশয় দুর্দ্দমনীয়া। ইন্দ্রিয় সুখাকাঙ্ক্ষার নিকট অনেক সংযমীর পরাজয় হইয়াছে; অনেক সন্ন্যাসীর জীবন-ব্রত পণ্ড হইয়াছে; অতি বড় জ্ঞানীকেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা যতই দুরতিক্রম্য হউক না কেন, ইহা বিবাহোৎপত্তির মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমিত হয় না। প্রাণী মাত্রই উদ্দাম ভোগ-লালসায় অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে সন্দেহ নাই. এবং সময় বিশেষে এই প্রবল উত্তেজনা দমন করা সাধ্যাতীত হয়। কিন্তু কাম প্রবৃত্তি যতই বলবতী হউক না কেন ইহা অতিশয় ক্ষণস্থায়িনী, অতি অল্পকাল মধ্যেই ইহা চরিতার্থ হইয়া যায়। আবার ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার সঙ্গে

সঙ্গেই ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি ও অবসন্নতা আসিয়া প্রাণী মাত্রকেই অভিভূত করিয়া ফেলে। উত্তেজনা যত বৃদ্ধি পায় অবসাদও সেই পরিমাণে গুরুতর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সুতরাং ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রবৃত্তি বিবাহরূপ জীবনব্যাপী যজ্ঞের ভিত্তি হইতে পারে না।

আবার যে সকল সমাজে আদিম অবস্থায় যথেচ্ছা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির (Promiscuoas intercourse) পথ চিরমুক্ত ছিল, সকল রমণীর উপরই সকল পুরুষের সমান অধিকার ছিল, সেই সকল সমাজেও বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয় সুখই যদি বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত তবে শত শত রমণী-সহবাস-সুখ বিসর্জ্জন করিয়া এক স্ত্রীতে চিরকাল আশক্ত থাকিবার কারণ কি ?

If marriage were decided by sexual relations it would be difficult to understand for what reasons marriage were contracted in those communities in which an altogether licentious sexual life is permitted to the unmarried.—Starcke's Primitive Society. সুতরাং দেখা যাইতেছে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বলবতী স্পৃহা হইতে বিবাহের উৎপাত্ত হয় নাই।

কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং বিবাহোৎপত্তির ও একটা কারণ অবশ্যই আছে। গ্রীকৃদিগের মতে কেক্রফস্ (Kekrops) সর্ব্ব প্রথম বিবাহের সৃষ্টি করেন। গ্রীস দেশে পূর্ব্বে যথেচ্ছ সহবাস প্রথা প্রচলিত ছিল। এইরূপ সহবাসজাত সন্তানের পিতাকে নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য সুতরাং সন্তান রক্ষণের ভার মাতৃস্কন্ধে পড়িত। উপযুক্ত যত্নের ও আহারের অভাবে এই সকল সন্তান অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত। কেক্রফস্ (Kekrops) এই গুরুতর অনিষ্ট নিবারণ মানসে সমাজে বিবাহানুষ্ঠান প্রচলিত করেন। কথিত আছে 'ইজিপ্টে' 'মেনস্' (Menes) এবং চীনে সম্রাট 'ফৌহি' (Fouhi) সর্ব্ব প্রথম বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থে শ্বেতকেতুকে দাম্পত্য বিধির প্রণেতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

কল্পনাপ্রিয় মানব প্রকৃতির নিয়মকে কোন একটা বিশিষ্ট কার্য্যের কারণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে চির কুণ্ঠিত। দেবতা অথবা কোন শক্তিশালী মানবকে কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি এবং বিশ্বাস হয় না। তাই ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা আপন আপন সমাজের জ্ঞানী ব্যক্তিকে

বিবাহরূপ মহোপকারী বিধির প্রবর্ত্তক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকেরা চির প্রচলিত প্রবাদের উপর জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। বিবাহের উৎপত্তি নিরূপণকল্পে তাঁহারা বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সাহায্যে যে সত্যে উপনীত হইয়াছেন তাহাই এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে বলিব।

অতি নীচশ্রেণীর জন্তুগণ স্বীয় সন্তান রক্ষার জন্য যত্ন করে না; তাহারা সন্তানের জন্মদান করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়। ভবিষ্যদ্বংশের জীবন ধারণোপযোগী কোন বন্দোবস্ত তাহারা করিয়া রাখিতে দেখা যায় না। তাহাদের যৌন-সম্মিলনের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, সেই সময় স্ত্রী-পুরুষ একত্র সম্মিলিত হয় কিন্তু সহবাসান্তে পুনর্ব্বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মৎস্য, ভেক, সরীসৃপ ও নীচজাতীয় কীট পতঙ্গ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল জন্তুর শাবকেরা পিতা মাতা উভয়ের স্নেহ হইতে বঞ্চিত থাকে। কোন কোন মৎস্য স্বীয় সন্তানগণকে কিছুকাল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কতকগুলি বৃহৎ সর্প আপনার ডিম্বগুলিকে কুণ্ডলী আকারে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করে। কিন্তু ইহার অধিক কিছু করিতে দেখা যায় নাই। এই সকল প্রাণীর শাবকগুলিকে আপন চেষ্টায় জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। এই কারণে ইতর প্রাণীরা অসংখ্য সন্তান একেবারে প্রসব করিলেও অতি অল্পসংখ্যকই বাঁচিয়া থাকে। অতি নীচ শ্রেণীর প্রাণিগণ কেবল যৌন-সম্মিলনের জন্য একত্র হইয়া থাকে, সন্তান পালনের ভার তাহারা গ্রহণ করে না। সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন Marriage is nothing else than a more or less durable connection between male and female lasting beyond the mere act of propagation till after the birth of the offspring"–The Hisory of Human marriage. সন্তান হওয়ার পরও স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে সাধারণতঃ বিবাহের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। সুতরাং যে সকল প্রাণী যৌন-সম্মিলনের পরই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তাহাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা স্থান পায় নাই।

পক্ষী জাতীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী। তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে একত্র মিলিত হয় না। পরন্তু স্ত্রী-পুরুষ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আজীবন একত্র বাস করে, উভয়ে মিলিয়া বাসা প্রস্তুত করে, ডিমে তা' দেয়! একজন ডিম রক্ষা করে অন্যে আহার সংগ্রহ করিয়া আনে। সন্তান আপন শক্তিতে জীবন ধারণ করিতে-

সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা মাতাই লালন পালন করিয়া থাকে। ডাক্তার ব্রেম্ (Dr. Breham) বলিয়াছেন "Real marriage can only be found among birds." পক্ষীজাতির মধ্যে বিবাহের অস্তিত্ব সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতেছেন। এখন ক্রমশঃ উন্নত জীবের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে তাহাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা অধিকতর ব্যাপক এবং বিবাহ-বন্ধনও দৃঢ়তর। অতি নিম্ন শ্রেণীর বানরেরা স্ত্রী ও সন্তানাদি লইয়া একত্র বাস করে। মানব-সন্তানের ন্যায় স্তন্যপায়ী বানর সন্তানের শৈশবও দীর্ঘকাল স্থায়ী, যদি তাহারা পিতা মাতার সাহায্য না পাইত তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। বানরেরা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও সন্তানদিগকে লালন পালন করিয়া থাকে। এক স্থান হইতে তাড়িত হইলে জননী স্বীয় সন্তানদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে; প্রাণ থাকিতে সন্তান ত্যাগ করিয়া যায় না। অতি নীচ শ্রেণীর বানরজাতির স্ত্রী-পুরুষও সন্তান লইয়া দীর্ঘকাল একত্র বাস করে।

উচ্চস্তরের মনুষ্যাকৃতি বানরদিগের (Anthropomorphous apes) গার্হস্থ্য জীবন আরও কৌতূহল-উদ্দীপক। Lieutenant Creopigny বর্ণিয়ো দ্বীপের বন মানুষদিগের কথা বলিয়াছেন, "তাহারা স্ত্রী ও সন্তানাদি পরিবৃত হইয়া মনুষ্যের ন্যায় এক পরিবারে বাস করে। পুরুষগুলি বৃক্ষোপরি শুষ্ক পত্রদ্বারা বাসা প্রস্তুত করিয়া দেয়। সেই বাসায় কেবল তাহাদের স্ত্রী এবং সন্তানেরা রাত্রিতে বাস করে, তাহারা বৃক্ষমূলে বিনিদ্রনয়নে বসিয়া ব্যাঘ্রাদি মারাত্মক জন্তুর কবল হইতে স্ত্রী-পুত্রদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। "গরিলা" এবং "শিম্পাঞ্জীরা"ও মনুষ্যের ন্যায় পরিবারাবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা গিয়াছে। তাহাদের স্বার্থত্যাগ এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র গল্প শুনা যায়, বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃতকরা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম। উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বানরেরাও বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব এবং সন্তান পালনের গুরুভার গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সম্বৎসরে একবার কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য বানর-জাতির স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিত হয় না। তাহাদের পুং স্ত্রী দীর্ঘকাল একত্র বাস করে এবং সহবাসজাত সন্তানদিগকে উভয়ে মিলিয়া যত্নের সহিত লালন পালন করিয়া থাকে। পুরুষেরা মানুষের ন্যায় স্ত্রী এবং সন্তানের আহারাদি সংগ্রহ করিয়া আনে, বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে পরিবার রক্ষা করিবার জন্য প্রাণান্ত সময়ে অগ্রসর হয়।

কেবল মনুষ্য জাতির মধ্যেই বিবাহ আবদ্ধ নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কোন সূক্ষ্মদর্শী সংস্কারক সমাজের কল্যাণ সাধন মানসে বিবাহ বিধি প্রচলিত করেন নাই। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও বিবাহের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন দেখা যাক্ বিবাহের উৎপত্তির কারণ কি? আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা পরিতৃপ্তির জন্য স্ত্রী-পুরুষ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। ইতর প্রাণীদিগের বিষয় আলোচনা করিলে তাহা আরও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেই নিরন্তর কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, সর্ব্বদা স্বার্থ বিসর্জ্জনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াও ইতর প্রাণীরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় কি কেবল ইন্দ্রিয় সুখেচ্ছায়? তাহা কখনই হইতে পারে না। মনুষ্য ভিন্ন অপর প্রাণিদিগের সঙ্গমেচ্ছা কোন নির্দ্দিষ্ট কালে হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। সেই প্রবৃত্তি একবার চরিতার্থ হইলে সম্বৎসরের জন্য নিবৃত্ত থাকে। সুতরাং ঐ সকল প্রাণীর স্ত্রী পুরুষ যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও দীর্ঘকাল একত্র বাস করে তাহার কারণ সঙ্গমেচ্ছা কখনই হইতে পারে না। তবে বিবাহের আবশ্যকতা কি?

পৃথিবীর সকল প্রাণীকেই বাহ্য বস্তুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবিত থাকিতে হয়। অসহায় নব-প্রসূত সন্তানের মুখপানে তাকাইলেও নির্ম্মম হৃদয়া প্রকৃতির প্রাণে দয়ার সঞ্চার হয় না। প্রকৃতি সকলকেই সমভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। দুর্ব্বল তাহার আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করে। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনই (Survival of the fittest) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের (Natural selection) বিধি। শক্তিহীন দুর্ব্বল শিশু সন্তান পিতা মাতার সাহায্য না পাইলে জীবন-সংগ্রামে কিছুতেই বাঁচিতে পারে না। দেখা গিয়াছে যে সকল জন্তুর কেবল স্ত্রী জাতিই সন্তান পালন করিয়া থাকে তাহাদের অতি কম সংখ্যক সন্তান বাঁচে আর যাহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সন্তান পালন করে তাহাদের সন্তান অতি অল্পই মারা যায়। স্বাভাবিক সংস্কার সাহায্যে এই কঠোর সত্য ইতর প্রাণীরা প্রকৃতির নিকটই শিখিয়া লইয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই পরোক্ষভাবে বিবাহের উৎপত্তির কারণ।

এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন পৃথিবীতে ত এমন জন্তু অনেক আছে যাহাদের পিতা-মাতা উভয়েই সন্তান পালনে বিমুখ, তথাপি তাহাদের বংশ লোপ পায় নাই কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে সকল জন্তুর স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সন্তান পালনে উদাসীন তাহাদের সন্তান [illegible] ব্যতীতও বাঁ

নিজ চেষ্টায় যতগুলি সন্তান বাঁচে পিতা মাতার সাহায্য পাইলে যে আরও অধিক সংখ্যক সন্তান বাঁচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাখীর ডিমে তা' না দিলে ফুটে না কিন্তু সর্পের ডিমে তা' দিতে হয় না, রৌদ্রের উত্তাপেই ফুটিয়া উঠে। মৎস্য শাবকও ডিম্ব হইতে আপনি ফুটিয়া বাহির হয়। কতকগুলি কীট ডিম্ব প্রসব করিয়াই প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের সন্তান যথাসময়ে ডিম্ব হইতে বাহির হইয়া আসে। দেখা যায় যে সকল প্রাণীর সন্তান পিতা মাতার সাহায্য হইতে বঞ্চিত তাহাদের জন্য প্রকৃতি অন্যবিধ উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। অথবা সাহায্য আবশ্যক হয় না বলিয়াই বোধ হয় স্ত্রী-পুরুষ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ থাকে না। ঐ সকল প্রাণীর হৃদয়ে অপত্য স্নেহ আছে কি না তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রাণিগণ সন্তান রক্ষার জন্য যত্ন করে। এবং সন্তান রক্ষার জন্য দাম্পত্য বন্ধনের প্রয়োজন। আদিম অসভ্য জাতির প্রচলিত নিয়মাদি পর্য্যালোচনা করিলেও প্রতীয়মান হয় সন্তান পালনের জন্যই বিবাহের উৎপত্তি হইয়াছে। "ফিজি" এবং "গ্রীণলণ্ডে" সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ অসম্পূর্ণ থাকে। শ্যামদেশে সন্তান না জন্মিলে স্ত্রী, বিবাহের যৌতুক হইতে বঞ্চিত হয়। মধ্য আফ্রিকার 'মাধি'দিগের নিয়ম আছে যদি কোন যুবকের সহবাসে কোন যুবতী গর্ভবতী হয় তবে সেই যুবক যুবতীকে বিবাহ করিতে বাধ্য। "বোর্ণিয়ো" দ্বীপের স্ত্রী পুরুষেরা যদৃচ্ছা সহবাস করিতে পারে কিন্তু সন্তান জন্মিলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সন্তান পালন করিতে বাধ্য। ব্রহ্মদেশ এবং সাওতালপরগণায় কোন কোন জাতির ভিতর এই নিয়ম প্রচলিত আছে। "গ্রীক, ও কালিফর্ণিয়ায়" কোন যুবতী তাহার প্রণয়ীদ্বারা গর্ভবতী হইলে যদি সেই প্রণয়ী তাহার সহবাসজাত সন্তান পালন করিতে অস্বীকার করে তবে যুবতী সেই সন্তান বিনাশ করিতে পারে। এবম্বিধ সন্তান বিনাশ করিলে কোন দণ্ডের বিধান নাই। অসহায়া রমণী একাকিনী সন্তান পালনে অসমর্থা বিধায় এই প্রকার গর্হিতকার্য্যও করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। "কুক্" স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন টাহিটি দ্বীপের যদি পিতা সন্তান বিনষ্ট করিয়া ফেলে তবে আর বিবাহ-বন্ধন থাকে না। কিন্তু সন্তান জীবিত থাকিলে পিতা মাতার বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার থাকে না।

অসভ্য জাতিদের যে সকল প্রচলিত প্রথা উদ্ধৃত করা গেল তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় সন্তান রক্ষার জন্যই বিবাহের উৎপত্তি হইয়াছে। সন্তান জন্মিলেই বিবাহের দায়িত্বে আবদ্ধ হইতে হইবে নতুবা স্বাধীনভাবে উশৃঙ্খল [illegible] করিতে [illegible] বাধা নাই। সুতরাং অসভ্য জাতির স্ত্রী পুরুষেরা

যে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া বিবাহের কঠোর দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহা কেবলই সন্তান রক্ষার জন্য।

মনুষ্যের এমন কি প্রাণীর মধ্যেও দেখা গিয়াছে সন্তান পালনের জন্যই স্ত্রী, পুরুষ দীর্ঘকাল (কোন কোন স্থলে আজীবন) একত্র বাস করে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করতঃ স্ত্রী-পুরুষের একত্র বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যেহেতু বৎসরের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদের সঙ্গমেচ্ছা প্রাণে জাগরিত হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া যায়। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ইতর প্রাণীরাও কেবল সন্তান রক্ষার জন্যই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

দস্যুর মহত্ত্ব।

এরপর ক্রমে আরও কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তখন প্রজার শাসন-বিচার জমিদারগণ করিতেন, আর জমিদারে জমিদারে যে লড়াই হইত, প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে পারিলেই তাহার কিনারা হইত। ঢাকার কালেক্টর এতৎপ্রদেশের সরকারী রাজস্ব গ্রহণ করিতেন মাত্র। সুতরাং দেশে অবিচার ও অত্যাচারের স্রোত পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত হইতেছিল। এইরূপে অবিচার ও অত্যাচারে এবং কালব্যাপী দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপে দেশের নিরন্ন অধিবাসিগণ ক্রমে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জমিদার ও রাজপুরুষের বিরুদ্ধে এক অভিনব বিপ্লবের সূচনা করিল। ময়মনসিংহের অত্যাচারী জমিদারদিগের দমনের জন্য মধুপুরের নিবিড় অরণ্যে একদল সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল। সাহমগদাদ নজরদ এই দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিল।

সাহমগদাদের চর চারিদিকে নিযুক্ত থাকিয়া জমিদারের প্রেরিত সরকারী রাজস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ভুক্তভোগী জমিদারগণ অনোন্যপায় হইয়া ঢাকার কালেক্টরের নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইলেন। ঢাকার কালেক্টর জমিদারদিগের আবেদন রেভিনিউবোর্ডে প্রেরণ করিলেন ও এদিকে জমিদারদিগকে বিশেষ

সাবধানতা অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। সাহমগদাদের গুপ্তচর ঢাকার গুপ্তসংবাদ যথাসময়ে মধুপুরে লইয়া গেল। সাহমগদাদ গুপ্ত অনুসন্ধানে জানিলেন মমিনসাহী, আলেপসাহী ও দশকাহুণীয়ার জমিদারগণ তাহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে দলপতির গুপ্ত আদেশ প্রচারিত হইয়া গেল—বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া সন্ন্যাসীদিগের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল—"জয় বার তীর্থ কি জয়।"

যথাসময়ে দলপতির মঠে সংবাদ আসিল জমিদারদিগের কাছারী বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ ও শস্য সংগৃহীত হইয়াছে। আবার বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইল—"জয় বার তীর্থ কি জয়"।

৫

সন্ন্যাসী দমনের জন্য লেজ সাহেব বেগুনবাড়ীর কোম্পানীর কুঠিতে আসিয়া সদলবলে আশ্রয় লইয়াছেন। এবার নিরুপায় জমিদারদিগের আকুল ক্রন্দনে নিরাকার রেভিনিউবোর্ডের অদৃশ্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। লেজ সাহেব সৈন্য-সামন্ত সহ বেগুনবাড়ী প্রেরিত হইলেন।

লেজ বেগুনবাড়ীতে আসিয়া সন্ন্যাসী-সর্দ্দারকে ও জমিদারদিগকে নির্দ্দিষ্ট দিবসে আসিয়া হাজির হইতে আদেশ করিলেন। জমিদারগণ সকলে আসিলেন সন্ন্যাসীরা পীড়ার ভান করিয়া সময় চাহিল, লেজ সাহেব সময় দিলেন। দ্বিতীয় তারিখ অবধারিত হইল। ইতিমধ্যে জফরসাহীর জমিদারদিগের মালঞ্চা কাছারীস্থিত শস্যাগার লুঠ হইয়া গেল। লেজ সাহেবের নিকট নালিশ হইল। লেজ সন্ন্যাসীদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। সন্ন্যাসীরা বলিয়া পাঠাইল লুঠ তাহারা করে নাই, নিরন্ন প্রজারাই করিয়াছে। লেজ চটিয়া লাল হইলেন, সাহমগদাদ উপেক্ষার হাসি হাসিলেন। লেজ প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া সন্ন্যাসীদিগের বিরুদ্ধে রেভিনিউবোর্ডে লিখিলেন। সন্ন্যাসীরাও বেগুনবাড়ীর কুঠি আক্রমণ করিল।

আক্রমণের প্রথম উদ্যোগে সন্ন্যাসীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পশ্চাৎ হাটিয়া গেল। লেজ অনেক দূর পর্য্যন্ত সৈন্য চালনা করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সন্ন্যাসীরা তিন দিক্ হইতে কোম্পানীর সৈন্য আক্রমণ করিল। বে-গতিক দেখিয়া ইংরেজ-সৈন্য বনে আশ্রয় লইল। সন্ন্যাসীদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তাহারা মুক্তকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিল "জয় বার তীর্থ কি জয়।" গাবতলীর অরণ্যে কোম্পানী সৈন্যের বিষম দশা ঘটিল। নিবিড় অরণ্যে ঘোর কাল রজনীর অন্ধকারে

সন্ন্যাসীরা কোম্পানীর সৈন্যগণকে পিপীলিকার ন্যায় টিপিয়া মারিল। লেজ সাহেবও ফিরিলেন না।

মধুপুরের নিবিড় অরণ্য মধ্যে দুর্গ-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত সন্ন্যাসীদিগের গুপ্তগৃহের এক অতি নিভৃত কক্ষে পীড়িত লেজ শায়িত। সন্ন্যাসী-দলপতি সাহসগদাদ নিজ হস্তে সাহেবের ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতেছেন। সাহেব পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলেন পারিলেন না। সন্ন্যাসী অতি যত্নে সাহেবের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। দলপতি বলিলেন "সাহেব তোমরা কেন বৃথা আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতে চেষ্টা করিতেছ? জমিদারদিগের উৎকট অত্যাচারে প্রজাকুল আকুল, আমরা কোন দরিদ্র প্রজার তিল পরিমাণও অনিষ্ট করি না বরং অভ্যর্থনা করিয়া গৃহ হইতে আনিয়া দরিদ্রদিগকে ভরণপোষণ করি"।

সাহেব গর্ব্বের সহিত বলিলেন "তোমাদের এরূপ করিবার কি ন্যায্য অধিকার আছে? ইহা কোম্পানীর রাজ্য, ন্যায় অন্যায় বিচার কেবল কোম্পানীই করিতে অধিকারী। তোমরা কে?

সন্ন্যাসী। কোম্পানীর ন্যায় অন্যায় দেখিবার শক্তি থাকিলেও সময় অথবা ইচ্ছা নাই। কোম্পানী দেশের ইষ্টানিষ্ট দেখে না, দেখে কেবল আপন রাজস্ব। জমিদার প্রজার অবস্থা দেখে না, দেখে কেবল নিজ খাজানা। তাই দেশময় এই অরাজকতা।

সাহেব। সে অরাজকতার জন্য জমিদার কোম্পানীর নিকট হাতে কলমে দায়ী।

সন্ন্যাসী। জমিদার কোম্পানীর নিকট রাজস্বের জন্যই দায়ী। কোম্পানীও টাকা পাইলেই দেশ শান্তিময় মনে করিয়া সুখে নিদ্রা যাইয়া থাকেন।

সাহেব তর্কে চটিয়া উঠিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন "জমিদার প্রজা পালন করিয়া কোম্পানীর রাজস্ব সরবরাহ করিতে অসমর্থ কেবল সন্ন্যাসীদিগের জন্য। দেশময় ঘোর অশান্তি কেবল সন্ন্যাসীদিগের জন্য। বাধ্য প্রজাদিগকে দস্যু সন্ন্যাসিগণই উত্তেজিত করিয়া কোম্পানীর রাজ্যে অশান্তির ছায়াপাত করিয়াছে। কেবল এ অঞ্চলে নয়, বঙ্গের সর্ব্বত্র সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ আজ বিশ বৎসর কোম্পানীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।" সন্ন্যাসী ধীরভাবে বলিল "সাহেব চটিও না। এই যে সে দিন সেলবরষের ও আটিয়ার ভীষণ হাঙ্গামায় শত২ প্রাণীর রক্তে যমুনার তীর রঞ্জিত হইয়াছিল, কোম্পানী তাহার কোন খবর রাখিয়াছেন কি? এই শত শত আর্ত্ত-পরিবারের কাতর কণ্ঠ কোম্পানীর

দ্বারে পৌছিয়াছে কি ? কিম্বা বোকাইনগরের তরফ চৌধুরীর ও তরফ রায়ের হাঙ্গামায় যে কত নর-নারী পথের ভিকারী হইয়াছে, সর্ব্বদর্শী কোম্পানী বাহাদুর চক্ষু মেলিয়া দেখিয়াছিলেন কি ? সাহেব তোমরা জান কেবল টাকা। আর জমিদার জানে অত্যাচার।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন 'আর তোমরা—?"

সন্ন্যাসী। "তোমাদিগের বিপরীত।"

সাহেব। "প্রমাণ ?"

"মধুপুরে সন্ন্যাসী-মঠ স্থাপয়িতা সাহমগদার রূপগিরি সন্ন্যাসীর আমল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অন্যূন দশ হাজার নিরন্ন ব্যক্তিকে এই মঠে প্রতিপালন করিয়াছে ও করিতেছে।"

সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "তোমাদের দলে এত লোক ?"

"সাহেব এ আমাদের দলের লোক নয়। ইহারা গতর খাটাইয়া খায়, যাহারা অন্ধ আতুর তাহারা বসিয়া বসিয়াই খায়।"

"গতর খাটাইবার বিষয় দস্যুতা নহে কি ?"

"দেশের অবস্থা অনভিজ্ঞ কোম্পানীর লোকের পক্ষে এরূপ অনুমান আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।"

"এরূপ কি কার্য্য যাহাতে সহস্র সহস্র লোক গতর খাটাইয়া চলিতে পারে ?"

"আজ দুই বৎসর হইল বার তীর্থের সংস্কার হইয়াছে। ঐ তীর্থের মৃত্তিকা উত্তোলন কার্য্যে সহস্রাধিক লোক বৎসরব্যাপী খাটিয়াছে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত আর্ত্তদিগের দ্বারাই এ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে। ঐ তীর্থ-দীঘী ব্যতীত আরও বৃহৎ বৃহৎ সরোবর এই বনরাজ্যে খোদিত হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের ভিতর অনুমান লক্ষাধিক টাকা এইরূপে দীন দুঃখীকে বিতরণ করা হইয়াছে। টাকা জমিদারের, নিয়াছে ও জমিদারের লোকে ; আমরা দস্যু মাত্র।"

সাহেব। "তোমরা প্রজার হিতার্থী হইয়াও তাহাদিগের সর্ব্বনাশ কর কেন ?"

সন্ন্যাসী। কি প্রকারে ?

সাহেব। জমিদারের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, সরকারী রাজস্ব অপহরণ করিয়া, জমিদার রাজস্বের জন্য যে কোন অমানুষিক অত্যাচার প্রজার উপর করিতে পারে জানিয়াও জমিদারকে নির্য্যাতন করিয়া প্রজার দুঃখ দারিদ্র্য বৃদ্ধি কর কেন ?

"প্রজার উপর জমিদারের অত্যাচার নিয়তই হইতেছে, ও নীরবে যাইতেছে দেশে শাসন-সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবার অবকাশ পাইতেছে না। আমাদের

অত্যাচারে দীন দরিদ্র সমক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে তাহা হইতেই দেশে সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার আশা।” কথা শেষ হইতে না হইতেই দলপতি নির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিতে বাহির হইয়া গেলেন।

লেজ সাহেব পূর্ব্বে ইহাদিগকে যেমন ভাবিয়াছিলেন, এখন তাহার বিপরীত দেখিয়া মনে মনে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বিশেষ দলপতির আচার ব্যবহার তাহার নিকট বড়ই প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইল। তিনি নিজ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পূর্ব্বে শঙ্কিত হইয়াছিলেন এখন চিন্তাশূন্য হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

লেজ সাহেবকে রাখিয়া দলপতি বাহির হইয়া আসিলেন। তাহার আগমনে মিলিতকণ্ঠে ধ্বনিত হইল “জয় বারতীর্থ কি জয়।” উচ্চধ্বনিতে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইল। লেজ সাহেবের মনে নূতন চিন্তা জাগাইয়া দিল। দলপতি আসিয়া শুনিলেন * * * * * র জমিদারদিগের অনেককে ধরিয়া আনা হইয়াছে। দলপতি আদেশ করিলেন “বিনা অত্যাচারে প্রত্যেকের নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা আদায় করিয়া লও। তারপর যথাসময়ে বিচার হইবে। প্রকোষ্ঠমধ্য হইতে লেজ সাহেব দলপতির বিচিত্র আদেশ শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। হায়! হায়! এরপর না জানি ভাগ্যে কি আছে।

৬

বারতীর্থের তীরে ভগদত্ত রাজার ভিটা বলিয়া যে প্রাচীন ভগ্নস্তূপ বিরাজিত, সেই উচ্চ ভূমির উপর বিচার হইবে।

অদ্য ধৃত জমিদারগণের ও লেজ সাহেবের বিচারের দিন।

সন্ন্যাসী-দলপতি সাহমগদাদ জয়সিংগীর সেই বিস্তৃত উচ্চভূমির উপর অপেক্ষাকৃত উচ্চ একটী বেদীর উপর উপবেশন করিয়াছেন, অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রথমেই লেজ সাহেবের বিচার আরম্ভ হইল। লেজের পায়ের ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে। সাহেব আসিলেই দলপতি উঠিয়া তাহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিলেন। দলপতির আদেশ অনুসারে তথায় কয়েক খানা কেদারা রক্ষিত হইয়াছিল, লেজ এক খানায় উপবেশন করিলেন।

দলপতি লেজ সাহেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিল “আজ পাঁচ দিন তুমি আমাদিগের হস্তে বন্দী। এই পাঁচ দিনের ভিতর তোমার উদ্ধার চেষ্টা কেহ করিল না। বোধ হয় অতঃপর তোমাকে ইহা বলিয়া দিতে হইবে না যে, কোম্পানীর ঢাকাস্থিত শাসনকর্ত্তা এইরূপেই এই বিশাল প্রদেশের শান্তি স্থাপন

করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তোমার ন্যায় কোম্পানীর একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীকেও আমরা যখন যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি, তাহা কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেছে না, তখন জমিদার কর্ত্তৃক প্রজাগুলি যে এইরূপ অবস্থায় কিরূপভাবে উৎপীড়িত হইতেছে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।”

দলপতি থামিলেন। সাহেব কোন কথা বলিলেন না। দলপতি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

“সাহেব এই সম্মুখে পবিত্র “বারতীর্থ।” এই বারতীর্থের পুণ্যোদক স্পর্শে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি আমরা দস্যু নহি। আমরা দরিদ্র-প্রতিপালক। আমরা কোম্পানীর রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত জন্মাইতে উদ্যোগী নহি পরন্তু কোম্পানীর রাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী! এবং যাহাতে প্রদেশে প্রদেশে সুশাসক নিযুক্ত হইয়া দেশে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয় তাহাই ইচ্ছা করি। ঢাকা বা কলিকাতা বসিয়া ইঙ্গিতে টাকা আদায় চলিতে পারে বটে কিন্তু প্রজার সুখ শান্তির প্রতি দৃষ্টি চলে না।”

দলপতি থামিলেন সাহেব তথাপি কোন কথা বলিলেন না।

দলপতি বলিলেন “সাহেব তোমার প্রতি যদি কোন অসম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে তবে ক্ষমা করিও।”

এইবার সাহেব হাসিয়া বলিলেন “সে কি আমি ত কোন অসুখ বোধ করি নাই!” দলপতি—“যাই হউক, আমরা এখন তোমাকে পুনরায় বেগুনবাড়ীর কুঠিতে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ, সে জন্য তুমি আমাদের নিকট অপরাধী নহ। তুমি যাও, কিন্তু মনে রাখিও, কোম্পানীর শাসনে প্রজার সুখ না হইলে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না।”

সাহেব অতি সংক্ষেপে বলিলেন “তা' অবশ্য।”

দলপতি “তোমার জন্য পাল্কী প্রস্তুত, তুমি গন্তব্যস্থানে যাইতে পার!”

সাহেব দলপতির সহিত করমর্দ্দন করিয়া চলিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, “জমিদারদিগের কি অবস্থা হইবে?”

দলপতি হাসিয়া বলিল “সাহেব আমরা দস্যু নহি। দরিদ্র প্রতিপালনের জন্য যে অন্নসত্র স্থাপিত হইয়াছে তাহার ব্যয় অত্যধিক, জমিদারদিগ হইতে তাহার উপযুক্ত সাহায্য স্বীকার করাইয়া যথোপযুক্ত উপদেশ সহকারে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে।”

সাহেব চলিয়া গেল। ক্রমশঃ।

ভারত-সঙ্গীত।

অয়ি চির কল্যাণময়ী ভারত জননি!
তব বিশ্বভুবনে বাজে কি রাগিণী!
অয়ি কুসুমকুণ্ডলে শ্যামল অঞ্চলে
জগৎ মনোমোহিনী,
এথা মলয় সমীর বহে ঝির ঝির
কুলু কুলু রবে ধায় তটিনী।
তব কুসুমিত কুঞ্জে বিহগ পুঞ্জে
কূজনে সুধায় মাতায় অবনী।
তব নির্ম্মল আকাশে রবি শশী প্রকাশে
লক্ষ তারা হাসে ঝলে সৌদামিনী।
গোধূলি ঊষায় কি চারু ভূষায়
সাজায় প্রকৃতি তব বরাঙ্গখানি।
হে শ্যামা জন্মদা শুভদা সুখদা
সুজলা সুফলা জীবনদায়িনী,
হোক্ তব জয় দূরে যাক্ ভয়
বিলীন হউক বিষাদ যামিনী।

সৈয়দ সিরাজী।

বিষাদিনী

দিবা নিশি তার মুখে হাহাকার
ঝরে শতধার নয়নে।
দেহে শত ক্ষত উগারে শোণিত
লুণ্ঠিত ধূলি শয়নে।
ওরে নরাকার তোরা কারা যাস্
একবার তারে কররে সম্ভাষ—
যাস্‌নে চলিয়ে, চরণে দলিয়ে,
দেখ্ চেয়ে চির-মলিনে।
তারি স্তন্য তোরা পিয়েছিস্ সুখে
ঘুমায়ে থাকিতি স্নেহভরা বুকে
জননী তোদের কাঁদে অধোমুখে।
দেখে কি বাজে না পরাণে।
হারে রে কৃতঘ্ন! একি ব্যবহার,
এই দেহে তোর শোণিত যাহার
নিশ্বাস বায়ু, প্রাণ পরমায়ু
ধরে তোল্ তাঁরে যতনে।

শ্রীমনোমোহন সেন গুপ্ত।

স্বপন-স্মৃতি।

মা,

স্নেহের বাঁধন আজো অটুট,
আজো ক্ষরে ক্ষীরের ধারা ;
স্বপনে আজো চমকি' উঠি,
কাঁদিয়া উঠি শিশুর পারা !

কমল কর রাখিয়া মৃদু
ক্ষুদ্র বুকে সোহাগ-ভরে,
আনত মুখে চুমিয়া অমনি
হাসিয়া উঠি কলস্বরে !

দিব্য দু'টী নয়ন ভরি'
অগোচরে আসে জল.
সুপ্ত দু'টী আঁখির'পরে
পড়ে-গো আসি ছলছল্।—

তা'রি ধারা ধীরি-ধীরি
ওষ্ঠ ব'য়ে যায় ব'য়ে,
সুপ্তি পরে জাগিয়া উঠি
তা'রি মধু স্মৃতি ল'য়ে !

কুটিল জীবন-গতির মাঝে
ছোট-ছোট অবসর,—
তোমার সেই স্মৃতিটুকু
জে'গে উঠে হৃদয়'পর।

করুণ দুটী নয়ন ভরি'
বিন্দুর পর বিন্দু ছুটে,
তোমার চুম্ব সনে আবার
মিশে আসি' অধরপুটে !

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

স্বীকার।

সে ত আজ ভবে নাই।
তাহারে যে কত ভাল বেসেছিনু
তুমি কি বুঝিবে ভাই!
অপাঙ্গে তার যে কথা ভাসিত
আমি জানিতাম শুধু
আমি চিনেছিনু মাধবী মুকুল
হৃদি ভরা ছিল মধু।
সরম আড়ালে শত আশা তার
ছিল বুকখানি জুড়ি
সন্ধ্যার ছায়ে ঢাকা ছিল যেন
শুভ্র বেলার কুঁড়ি।
আজ সে গিয়াছে চলি
আমার সাধের প্রেম কিসলয়
দুইটী চরণে দলি।
রাঙা চরণের অলক্ত রাগ
লেগে আছে থরে থরে,
ভেঙ্গে গেছে বুক তবু স্মৃতিটুকু
যতনে রেখেছি ধরে।
উরে গেছে পাখী শূন্য পিঁজারে
রাখিয়া কনক পাখা,
ঝরেছে কুসুম শুকানো বৃন্ত
তাহারি সুরভি মাখা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি—(তৃতীয় খণ্ড) শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত। সমালোচ্য গ্রন্থখানায় দ্বাদশ জন প্রাচীন মুসলমান কবির পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। মৌলবী আবদুল করিম সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি-

সৈয়দ আলাওলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ব্রজসুন্দর বাবু উদারশীল পুরুষ। তাঁহার গবেষণাশক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। লুপ্তপ্রায় বস্তুর উদ্ধার সাধন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়; উহাতে যে ধীরতা, অনুসন্ধান নিপুণতা ও শ্রমপটুতার প্রয়োজন, ব্রজসুন্দর বাবুতে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। ব্রজসুন্দর বাবু হিন্দু, যে-সে হিন্দু নন হিন্দু-কুল-চূড়ামণি ব্রাহ্মণ কিন্তু তিনি মুসলমান কবির কীর্ত্তি রক্ষায় যত্নশীল এ কথা ভাবিতে গেলে প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয় এবং শতমুখে তাঁহার প্রশস্তচিত্ততার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বঙ্গের এই দুর্দ্দিনে এইরূপ উদারতায় নীরবে অনেক সুফল ফলিবে।

অপ্রীতিকর হইলেও সত্যের অনুরোধে বলিব যে, কোন কোন কবির কোন কোন কবিতার অংশ বিশেষ পাঠ করিয়া উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়। যাহা হউক সে দোষের জন্য ব্রজসুন্দর বাবুকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সঙ্গত কার্য্য হয় না, কারণ যাহা যে অবস্থায় সংগৃহীত হইয়াছে, সেই অবস্থায়ই তিনি তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন।

আশা করি ব্রজসুন্দর বাবু অন্যান্য মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের জীবন-চরিত ও পদাবলী শীঘ্র প্রকাশিত করিয়া আমাদের ঔৎসুক্য দূর করিবেন।

পূর্ণিমা—শ্রীকামিনীকুমার দে রায় প্রণীত। ইহা একখানা নাটক গ্রন্থ। গ্রন্থকার পুস্তক খানার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে যাইয়া "গীতি-নাট্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; নাট্য শব্দ নাটক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।

গ্রন্থকার পূর্ণিমার চরিত্র বেশ দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। জমিদার-পুত্র মন্মথের এপীঠ ও পীঠ দু'পীঠই বেশ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সরলতা, উদারতা ও সততার সংমিশ্রণে সুকুমার-চরিত্র উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সরলা সরলার ঐকান্তিকী প্রেম-সাধনা ও সতীত্ব-নিষ্ঠা গ্রন্থকার অতি শুভ্রোজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন।

রসিক গ্রন্থকার প্রেম-সঙ্গীত রচনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কোন কোন সঙ্গীত কবিত্ব-গন্ধে সুবাসিত। গ্রন্থখানা মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

"পূর্ণিমা"র চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের প্রথম সঙ্গীতটী বর্ত্তমান বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা "আরতি"তে প্রকাশিত "শুষ্কমালা" শীর্ষক কবিতার প্রতিধ্বনি বই আর কিছু নয়। ইহা প্রশংসার কথা নহে।

৫ম বর্ষ। ১১শ সংখ্যা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, শ্রীরেবতীমোহন গুহ এম. এ. বি এল.,
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ.,
সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্মাইল হোসেন সিরাজি,
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি. এ., মহাম্মদ সৈয়দ
নুরুল ওয়াসেক ও সম্পাদক প্রভৃতি।

ময়মনসিংহ সুহৃদ্‌ যন্ত্রালয় হইতে
শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩১

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। এই সংখ্যা ।০ আনা।

সূচী।

বর্ত্তমান

রাজনৈতিক এবং স্বদেশী আন্দোলনের

চিত্র ও চরিত্র অবলম্বনে

একখানি চিত্তাকর্ষক

উপন্যাস

'আরতি'র আগামী সংখ্যা হইতে

ক্রমশঃ প্রকাশিত

হইবে।

নিবেদন।

"আরতি"র ৫ম বর্ষ শেষ হইয়া আসিল। যাঁহারা এ পর্য্যন্তও "আরতি"র ৫ম বর্ষের মূল্য প্রদান করেন নাই তাহাদের নিকট ১২শ সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে প্রেরণ করিব। সহৃদয় গ্রাহকগণ কৃপা করিয়া ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিবেন।

আগামী মাঘ মাসে "আরতি" ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিবে। ৬ষ্ঠ বর্ষের জন্য

৩আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ ১৩১২। } একাদশ সংখ্যা।

রোমনগরে।

ভুবন বিখ্যাত রোমনগর স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বহুকালের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিবার জন্য আমি বাষ্পীয় শকটের সহায়তায় নেপালস্‌নগর হইতে রোমাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলাম। বিদ্যা, বিক্রম, বিভব, বিলাস, ধন, মান, সভ্যতা, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে এক সময়ে রোমরাজ্য পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল; এক সময়ে রোমকেরা বীরত্বে, প্রতাপে, আধিপত্যে এবং ঐশ্বর্য্যমদে জগদ্বাসী জনগণের অক্ষি সম্মুখে অভূতপূর্ব্ব দর্শনীয় পদার্থবৎ বিদ্যমান ছিল। সুশোভিত রোমনগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলেও সকল শ্রেণীর পরিব্রাজকের পক্ষে দর্শনযোগ্য। রোমে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমরা পম্পিনগরী এবং বিসুবিয়স নামক আগ্নেয়গিরি দর্শন করিয়া গিয়াছিলাম। রোমনগরের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, আমি এই দুইটী স্থানের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

ইতিহাস প্রসিদ্ধা প্রাচীনা পম্পিনগরী খৃষ্টীয় প্রথম সপ্তাব্দীতে বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। অনেকের অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে পম্পিনগরীর অনেক স্থান পরিষ্কৃত করা হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার পূর্ব্ব গৌরবের শতাংশের একাংশও সুস্পষ্টভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। বর্ত্তমানকালের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলে দর্শক মহাশয়েরা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারেন যে এক সময়ে এই নগরী সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধির ভাণ্ডারস্বরূপে পরিগণিতা ছিল। আমরা রেলওয়ে শকটদ্বারা নেপালস্‌ হইতে পম্পি গিয়াছিলাম। অষ্টাদশ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী অট্টালিকা, এই নগরীতে এখনও বর্ত্তমান আছে। এই অট্টালিকার প্রাচীরে বিবিধ প্রকার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি ও নানা বর্ণের চিত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বহু প্রাচীনকালের রুটির দোকান, গোধূম চূর্ণ

করিবার জাঁতা, সুরার বিপণি, স্নানাগার, মন্দির, জল পান করিবার পাত্র, মাটির বাসন এবং পাকশালা ও তাহার উপাদান সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্য অনুভব করিলাম। পণ্ডিতদিগের সভাগৃহ, বক্তাদিগের দাঁড়াইবার স্থান, রঙ্গভূমি, নৃত্যাগার, ভোজনালয়, দরবারের সুপ্রশস্ত প্রাসাদ প্রভৃতি এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। একস্থানে এত বড় একটা অট্টালিকা দেখিয়াছিলাম যাহার মধ্যে পঞ্চদশ সহস্র লোক অনায়াসে উপবেশন করিতে সক্ষম হইত। এই সুবৃহৎ অট্টালিকার অনতি দূরস্থ গৃহে ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটনের জনক বুল্‌ওয়ার লিটন সাহেব অনেক দিবস পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া, "The last Days of Pompeii" নামক উপন্যাস বিরচন পূর্ব্বক প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

নেপালস্ নগরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে বহুবিধ নগর ও মনোরম পদার্থ দেখিবার আছে। পম্পির ন্যায় হারকিউলিয়ম নগর দেখিয়া আমরা কিয়দংশ রেলওয়ে দ্বারা এবং কিয়দংশ অশ্ব শকটে বিসুবিয়স নামক জগদ্বিখ্যাত আগ্নেয় গিরির অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। এই পর্ব্বতে আরোহণ করা কঠিন ব্যাপার নহে, সহজেই ইহার উপরে উপনীত হইতে সক্ষম হওয়া যায়। গিরির পাদদেশে পৌঁছিয়া কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে একটী পথ দৃষ্ট হয়, এই পথ দিয়া অনায়াসে পর্ব্বতোপরে পৌঁছিতে পারেন। এই পথের দুইপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীর, এবং প্রাচীরের গাত্রে ও উপরে দ্রাক্ষালতার ঘন ঘন গুচ্ছ। এই পথ হইতে নিম্নে পতিত হইবার আশঙ্কা নাই; সুতরাং পথিকেরা নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারেন। অবস্থাপন্ন পরিব্রাজকেরা সুদক্ষ অশ্বতর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই পথ অতিক্রম করিয়া থাকেন। উপরে উঠিয়া চারিদিকে কেবল কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়, এই পাহাড় সমূহের কোথাও একটিও পাতা বা তৃণ নাই। উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া যখন চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক শোভা নয়নগোচর করা যায় তখন আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সম্মুখদিকে শ্যাম-সলিল-পরিপূর্ণা, মন্থরগতি সম্পন্না এবং গুরুগম্ভীর সলিল-কল্লোল উৎপাদিকা টিরেনাইনী নিধির সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম; যে সকল বহুসংখ্যক গ্রাম, নগর ও উপনগর দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে নেপল্‌স্ নগর সর্ব্বপ্রধান। পশ্চাদ্ভাগে আপিনাইন গিরিমালা দণ্ডায়মান থাকিয়া দুইদিকে দুইভাগে ও দুই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যেরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক অনন্ত আকাশের ক্রোড়ে মিলিয়াছে ও মিশিয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন "উজ্জ্বল

ও মধুরে মিশিয়া মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা” প্রদর্শন করিতেছে। দক্ষিণ ও বাম-পার্শ্বেরদিকে প্রকৃতিসুন্দরী আরও শোভাময়ী, আরও মনোমোহিনী, আরও যৌবনমদমত্তা।

ইতিহাসপ্রখ্যাত রোমনগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বহুসংখ্যক অত্যুচ্চ স্তম্ভ, অভ্রভেদী মন্দিরচূড়া এবং “সেণ্টপিটর” নামক পৃথিবীর বৃহত্তম খৃষ্টীয় গির্জ্জার শিরোভাগ নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। রোমে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা মুখে বা লেখনীদ্বারা বর্ণনা করা যায় না। প্রাচীন রোমনগর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, রোমরাজ্যের পতন হইয়াছে এবং রোমকদিগের প্রতাপ এক্ষণে অতীত ইতিহাসের কাহিনীতে মাত্র বর্ত্তমান, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান রোমে যাহা আছে তাহারই সবিশেষ বর্ণনায় বক্তার কণ্ঠ, লেখকের লেখনী এবং চিত্রকরের তুলিকা ক্লান্ত হইয়া যায়। আমি কয়েকটী স্থান ও কয়েকটী পদার্থমাত্রের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। সম্রাট টাইটসের স্তম্ভ ও খিলানগৃহ, রাজধানীর প্রধান স্তম্ভ, আপোলোদেবের উপাসনালয়, পোলক্স্ ও কাষ্টর দেবতাদিগের মন্দির, কলোশিয়ম, পান্থীয়ন ও প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ রোমান বাগ্মীদিগের বক্তৃতাগার এবং সম্রাট অগষ্টশের মর্ম্মর প্রাসাদাবলী, পথিক ও পরিব্রাজকেরা প্রায়ই সর্ব্বপ্রথমে দর্শন করিয়া থাকেন। নগরের প্রাচীন প্রাচীরের বহির্দ্দেশে মৃত্তিকা নিম্নে যে সকল মনোহর ও সুবৃহৎ গুহা আছে তাহার নাম “কাটাকুম্ব্” (Catacombs)। পুরাতনকালের খৃষ্টোপাসক রোমান-কাথলিক পাদ্রীদিগের ইহা আশ্রম ছিল। অনতিদূরে আর এক প্রকারের কাটাকুম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের আকার ক্ষুদ্র; পূর্ব্বকালে উৎপীড়িত, ভীত, পলায়িত এবং নিতান্ত দরিদ্র লোকেরা আসিয়া এই সকল ক্ষুদ্র গুহায় জীবনযাপন করিত, ইহা তাহাদের পক্ষে আশ্রয় স্বরূপ ছিল; কোনও কোনও সময়ে ইহাতে মৃতব্যক্তির সমাধিও হইত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা সেণ্ট ষ্টিফেন্স এবং সেণ্ট আনড্রু নামক দুইটী গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। অনন্তর “কলোশিয়ম” নামক গৃহের বিরাট ভগ্নস্তূপ দর্শন করিয়া আমরা অতীব আশ্চর্য্য সহকারে কপোলে হস্তরক্ষাপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলাম। আনুমানিক সপ্তশত বিঘা পরিমাণ ভূমি ব্যাপিয়া এই গৃহ বর্ত্তমান ছিল এবং অশিতি সহস্র লোক ইহার অভ্যন্তরে উপবেশন করিতে পারিত। এক্ষণে ইহা কীট, পতঙ্গ, সর্প ও ক্ষুদ্রকায় পশুদিগের আবাসস্থল মধ্যে গণ্য। রোমনগরে প্রায় চারিশত খৃষ্টীয় গির্জ্জা আছে, ইহার মধ্যে

সেণ্ট পিটরের গির্জ্জা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। সমগ্র পৃথিবীতে এতদপেক্ষা বৃহত্তর গির্জ্জা আর নাই। যে গৃহে জগতের রোমান কাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান গুরু শ্রীমৎ "পোপ" বিরাজ করেন, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অট্টালিকা। ইহার অসংখ্য দ্বার ও অগণ্য কুটির। ইহার ভিতরে পুস্তকালয়, পাঠাগার, উপাসনালয়, শিল্পাগার, প্রদর্শনী, ক্রীড়াস্থল, বিদ্যালয়, বক্তৃতাগার, প্রভৃতি কত যে কি আছে তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। এই সুরম্য বিরাট সৌধের নাম "ভেটিকান"। ভেটিকানের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে "সুধা" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ময়মনসিংহের ইতিহাস। *

ভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রণভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ সূচীত হয়। মঙ্গলসিংহ সিপাহী দলভুক্ত ছিল। কালে নামকাটা সিপাহী হইয়া ডাকাতের দল সৃষ্টি করে ও ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্য আপনার লীলা ভূমিতে পরিণত করে।

১৮৩৭ সনে ভাওয়ালের অন্তর্গত বর্ম্মী থানার বহু ভদ্র অধিবাসী মঙ্গলসিংহের অত্যাচারে ও লুণ্ঠনে জর্জ্জরিত হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হয়। বর্ম্মী সেই সময়ে এ জেলার অধীন ছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মঙ্গলসিংহের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া বর্ম্মী থানার পুলিশের উপর প্রতিকার পরায়ণ হইতে আদেশ প্রচার করেন। পুলিশ প্রতিবাদী হইলে মঙ্গলসিং খেপিয়া যায় ও অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া তোলে।

এই সময় রণভাওয়ালের তালুকদার আবদুল হাফিজের ঋণের জন্য তাহার সমস্ত সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। জন্মেজয় নিবাসী ভৃগুরাম চাকলাদার ঐ সমস্ত সম্পত্তি ডিক্রিপ্রাপ্ত হইয়া নীলাম খরিদ করেন। ভৃগুরাম নীলাম খরিদ সম্পত্তি দখল করিতে গেলে, ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দাঙ্গায় চাকলাদারেরা পরাজিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। আবদুল হাফেজের ভগ্নী কলিমন্নেছা

---

* ময়মনসিংহের ইতিহাস লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে ২৫০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আঃ সঃ।

সম্পত্তি রক্ষণে বর্ম্মীর তালুকদার মুর্শিদাবাদ নিবাসী লুৎফুল্লার আশ্রয় গ্রহণ করেন। লুৎফুল্লার অর্থে মঙ্গলসিংহ বশীভূত হইয়া পড়িল। উপযুক্ত ইন্ধন পাইয়া দস্যুর অত্যাচার-বহ্নি প্রদীপ্ততেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সে জলন্ত পাবকের নিকট গবর্ণমেণ্টের বিরাট শক্তি ধিকৃত হইতে লাগিল।

গফরগাঁও বা বর্ম্মী থানার পুলিশ ও মঙ্গলসিংহের সজ্ঘর্ষে ভাওয়ালের অরণ্য প্রদেশ নর-শোণিতে অনুরঞ্জিত হইল, মঙ্গলসিংহ জয়লাভ করিয়া প্রদীপ্ত উৎসাহে অত্যাচারের খরস্রোত প্রবাহিত করিল। তাহার দুর্দ্দমনীয় অত্যাচারে ভাওয়ালের ভদ্র পল্লীগুলি শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল। বহু ভদ্র অধিবাসী স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। মঙ্গলসিং তাহাদের পরিত্যক্ত ভিটা অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ করিল। দিবারাত্রি সমভাবে ভাওয়ালবাসী মঙ্গলসিংহের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতে লাগিল। প্রতিদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণে সে সংবাদ পঁহুছিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের পর পুলিশ প্রেরণ করিলেন, গফরগাঁও ও নাসিরাবাদের পুলিশের সমবেত শক্তি মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করিল,—মঙ্গলসিংহ ধৃত হইল না। পুলিশের এই সমবেত শক্তি মঙ্গলসিংহের চাতুরী-জাল ভেদ করিতে পারিল না। অনন্যোপায় হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট Irwrins মঙ্গলসিংহকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। (১)

পুরস্কারে ফলোদয় হইল না। এদিকে মঙ্গলসিংহের দল বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। অনেক ভদ্র ইতর মঙ্গলসিংহের দলভুক্ত হইল। পুলিশ নিরুপায় হইল। রাজপুরুষগণ নূতন উপায় উদ্ভাবনে মনোযোগী হইলেন।

১৮৩৭ সনের আগষ্ট মাসে গফরগাঁ থানার দারোগা মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ পল্টন সংগ্রহ করিলেন, নসিরাবাদ হইতে বহু সংখ্যক পাইক বরকন্দাজ যাইয়া তাহাতে মিলিত হইল। রণভাওয়ালের তালুকদারগণ আপন আপন

---

(১) ম্যাজিষ্ট্রেট Irwin সাহেব ৫০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই ৫০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণার পর বহু দিনের মধ্যেও মঙ্গলসিংহ ধৃত হইল না দেখিয়া, পরবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট Skinner সাহেব তাহার ২৬।১১।৩৮ তারিখে নিম্নলিখিত চিঠি নিম্নবঙ্গের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লিখিয়াছিলেন—

"Nothing under 500 Rs. will induce people to risk their lives on apprehending him (Mangal Singh.) The reward of Rs. 50 in my opinion was much too small taking into consideration the aggravated nature of the charges against Mangal Singh and has proved to be of no use whatever."

লাঠিয়াল দ্বারা পুলিশ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। অভিযানের উদ্যোগ হইল। প্রথমতঃ দারোগা পুলিশ সৈন্য সহ অগ্রসর হইলেন। অরণ্য মধ্যে মঙ্গলসিংহের দল চারিদিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করিল তিনি হস্তীপৃষ্ঠে বহু ভাগ্যে রক্ষা পাইয়া আসিলেন। হস্তীর পশ্চাৎ পদ দস্যু হস্তে ছিন্ন হইয়া রহিল।

দারোগা পুনরায় সমবেত শক্তিতে মঙ্গলসিংকে আক্রমণ করিলেন। মঙ্গলসিংও শতাধিক লোকসহ দারোগাকে আক্রমণ করিল। বন্দুকের বিপুল প্রতিধ্বনিতে অরণ্যপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইল। নররক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইল। পুলিশের বিরাটবাহিনী শতসংখ্যক দস্যুর হস্তে বিপন্ন হইয়া পড়িল ও বহুসংখ্যক পুলিশসৈন্য প্রাণ হারাইল। অনন্যোপায় দেখিয়া হত ও আহত সৈন্য ফেলিয়া দারোগা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। (১)

যথাসময় এই পরাজয়বার্ত্তা নসিরাবাদ পঁহুছিল। জেলা মাজিষ্ট্রেট ইরুইন্ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি, জজ চিফ্ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজেই ভাওয়ালে চলিয়া গেলেন। আবশ্যক হইলে জামালপুর হইতে সৈন্য-সাহায্য লইবারও পরামর্শ স্থির রহিল।

মাজিষ্ট্রেট ইরুইন্ যথোপযুক্ত শস্ত্র পাহাড়ায় পরিবেষ্টিত হইয়াই গফরগাঁও পঁহুছিলেন। তিনি তথায় পঁহুছিয়া মঙ্গল সিংহের অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন। মঙ্গলসিংকে কোথাও পাওয়া গেল না। ভাওয়াল হইতে মঙ্গল সিংহের দৌরাত্ম্য কতক দিনের জন্য তিরোহিত হইল। মাজিষ্ট্রেট বিপুল উৎসাহে গফরগাঁও থানায় কাছারী করিলেন ও মঙ্গলসিংহের সাহায্যকারী বহু জমিদার, তালুকদার ও দস্যুদিগকে ধৃত করিতে লাগিলেন। মঙ্গলসিংহের পরিচালক ও উৎসাহদাতা বন্ধু, আবদুল হাফেজ ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইল। মঙ্গলসিংহের ভ্রাতা ভৈরবসিং ও বহু গুপ্ত কাগজপত্র সহ ধৃত হইল। (২)

---

(১) "When the Daraga with the aid of his police and armed up country men paid by zamindars to assist them went to apprehend Mangal Singh he attacked them with a body of upward of 100 men chiefly up country people armed with muskets killed some wounded others repulsed the police and carried off the carpses and wounded bodies."

Magte's letter dated 26/11/38 to D. S. P. of L. Province.

(২) ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুসন্ধানে ভৈরবসিংহের নিকট বহু গুপ্ত চিঠিপত্র বাহির হইয়াছিল। এই সকল গুপ্ত চিঠি পত্রে বর্ম্মীর জমিদার লুৎফুন্নার

মঙ্গলসিংহ কিছু দিনের জন্য ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া যায়। এবং নিকলী থানার অন্তর্গত বেতাল প্রভৃতি স্থানে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। বেতালের গ্লাস সাহেবের নীলের কুঠি লুঠ হয়। গ্লাস সাহেব মঙ্গলসিংহের ধৃতকারীর একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠান। এদিকে ভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের সহযোগী গোলজারসিংহের সহিত মঙ্গলসিংহের ভ্রাতা ভৈরবসিংহের সহিত চিঠি পত্রের আদান প্রদান চলিতে থাকে।

গ্লাস সাহেবের চিঠি পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইরুইন্, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হে, কে, মঙ্গলসিংহের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিল। মিঃ হে উপযুক্ত রক্ষি পাহাড়া সমভিব্যাহারে কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি যখন যে স্থানে মঙ্গলসিংহের সন্ধান পাইতেন সেই স্থানেই অনুসন্ধান করিতেন এবং মঙ্গলসিংহ বলিয়া ক্রমে বহু ব্যক্তিকে ধৃত করিলেন। কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলসিংহ ধৃত হইল না।

১৮৩৮ সনের মধ্যভাগে নিকলী থানার দারোগা ফকিরসিংহের সহিত মঙ্গলসিংহের ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হয়। ফকিরসিংহ ভয়ে ভয়ে মঙ্গলসিংহের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া গ্লাস সাহেবকে এতদ্বিষয় লিখিয়া পাঠান। গ্লাস সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে অবগত করান, কিছুদিন পরে গোলাপসিংহ নামক এক ব্যক্তি নায়েব প্রেমসুক দিগচ্ছত জড়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয় ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে ক্রোক হয়। প্রেমসুক কারারুদ্ধ হইয়াও সসম্মানে রক্ষিত হইয়াছিলেন—তাঁহার গৃহ-পাচক কারাগারে যাইয়া প্রতিদিন তাহার খাদ্য রন্ধন করিয়া আহার করাইয়া আসিত। কারাবাসের এই নিয়ম প্রাচীন স্বর্ণযোগ স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা এস্থলে সাধারণের অবগতির জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের লিপির অংশ নিম্নে প্রদান করিলাম—

"In consideration Prem Sook being a man of some consequence, I did not confine him in the same room with the other Hazut prisoner, & allow his bundarry to come and prepare his food in the presence of Daraga but not to converse and correspond with any body."

১৮৪০ সনে Skinner সাহেব ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বর্ম্মীস্থ প্রাণসুকের ও অন্যান্যের গৃহ ভাঙ্গিয়া পুড়িয়া সমভূমি করিয়া ফেলেন (Dacca Magte's letter to Magistrate.) প্রাণসুক বর্ম্মীর বাড়ী ত্যাগ করিয়া নসিরাবাদ আসিয়া বাসাবাড়ী স্থাপন করেন। তাহার স্থাপিত পরিখা-পরিবেষ্টিত দেবালয় "দশ মহাবিদ্যার বাড়ী" নসিরাবাদ নগরের একটী দর্শনীয় দেবালয় ছিল। বিগত ১৮৯৭ সনের ভীষণ ভূ-কম্পনে সে বিশাল দেবালয়-চূড়া ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। তাহার বর্ম্মীর গৃহের প্রাচীন স্মৃতি এখনও ভাওয়ালের নিবিড় বনে নীরবে লয় পাইতেছে।

উমেদারের হস্তে মঙ্গলসিংহ ধৃত হয়। গোপালসিং গ্লাস সাহেবের কুঠির নিকটবর্ত্তী কোন তালুকদারের ভৃত্যের গৃহে নিদ্রিতবস্থায় মঙ্গলসিংহের হস্ত পদ বাঁধিয়া ফেলে। ৪ মঙ্গলসিং বন্দীকৃত অবস্থায় নসিরাবাদে প্রেরিত হয়।

মঙ্গলসিং ধৃত হইলে পর ভাওয়ালে গোলজার সিংহের দল প্রবল থাকে। ৫ তাহাকে ধরিবার জন্যও গবর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার ঘোষণা হয়। মঙ্গলসিংহের ন্যায় তাহাকে ধরিবার জন্যও পুলিশের পর পুলিশ প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮৩৮ সনের ২রা জুন গোলজারসিংহের অনুসরণে এক দল শক্তি সম্পন্ন পুলিশ সৈন্য প্রেরিত হয়। এইবার ভীষণ দস্যু গোলজারসিংহও ধৃত হয় এবং নসিরাবাদে নীত হয়। (ক)

যথা সময়ে মঙ্গলসিংহ, গোলজারসিংহ ও তাহার অন্যান্য অনুচরগণের বিচার শেষ হইয়া যায় নসিরাবাদের সেসন্স জজের বিচারে মঙ্গলসিংহের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের ও অন্যান্য দস্যুগণের মধ্যে গোলজারসিংহের ৯ বৎসর কারাবাসের অনুমতি হয়। (খ) ভাওয়ালবাসীরা শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে।

(৪) "Mangal Singh was effected by an umedar of the name of Golabsing who having received tidings of Mangal Sing's, living in the house of a Talukdar's servant near Mr. Glass's factory at Beitaul went on and bound his hands together"

Magte's letter to the D. S. Police L. P. dated 26/12/38.

মঙ্গলসিংহের ধৃতকারী উমেদার গোলাপ সিং নিকলী থানার দারোগা নিযুক্ত হয়। তাহার সাহায্যকারী ৩ জন (১ জন তাহার নাবালক পুত্র) বরকন্দাজ নিযুক্ত হয়।

(৫) I am given to understand that the Sirdar Gulzar Sing and others are collected to the numeer of from 35—40 persons who it is notorious have for years lived on plundering the inhabitants of all the neighbouring districts."

Magte's lester to S. Ponce L. P dated 3/6/38.

(ক) ধৃত গোলজার সিংহের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট Skinner সাহেব নিম্ন বঙ্গের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লিখিয়াছিলেন, (Magte's No 232 dated 8/6/1838.)

"He (Goljar Sing) is a very athlatic person and his very looks betray him in short his cauntinance would hang him in any other country but this."

(খ) Magte's letter to D. S. Police L. P. dated 31/5/39.

মঙ্গলসিংহের দলভুক্ত বলিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিল—

১৮৩৮ সনে পুনরায় ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ পৃথক হইয়া যায় এবং Skinner সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া কালেক্টর Irwin হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। *

এই সময় ঠগীর উপদ্রব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় জামালপুরে নূতন মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব হয় এবং ঐ সনের ১লা আগষ্ট জামালপুর কেণ্টনমেণ্টে মহকুমা স্থাপিত হয়। ঠগী দমনের জন্য জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট Lt. Sleeman জামালপুর গমন করেন। জামালপুরে ঠগী-জেল স্থাপিত হয়। ঠগদিগের বিচারের জন্য ঢাকায় এক বিশেষ জজের পদ সৃষ্টি হয়। J. Stainforth এই বিশেষ জজের পদে নিযুক্ত হন। এবং কাপ্তেন হলিংস (W. C. Hollings) ঢাকায় ঠগীকার্য্যালয়ের এসিষ্টাণ্ট জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন।

ঠগী।

১৮৩৮ সনে ভাগলপুরের দেওয়ান ইব্রাহিম খাঁর তালুক অধিকার করিতে গেলে মুক্তাগাছার ভবানীকিশোর আচার্য্যের সহিত সুরনগরের রঘুনাথ রায়ের ভীষণ দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। উলুকান্দি (ভৈরব-বাজার) নামক স্থানে এই দাঙ্গা সংগঠিত হইয়াছিল। প্রকাশ যে এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে এত লোকক্ষয় হইয়াছিল যে মনুষ্যরক্তে মেঘনা নদীর জল রক্তাকার হইয়াছিল।

উলুকান্দীর দাঙ্গা।

(১) কেহু, (২) আজমত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস, (৩) গৃধারীসিংহ গুপ্ত চিঠি পত্র ও অস্ত্র শস্ত্রসহ ধৃত হইয়াছিল—ম্যাদ ৬ বৎসর, (৪) বঙ্গু ও (৫) হিঙ্গু ম্যাদ ৭ বৎসর করিয়া, (৬) মৌলবী আবদুল আলী ম্যাদ ২ বৎসর ও ৫০০৲ টাকা জরিমানা, (৭) মদক সেখ, মির্জ্জা, মিস্থু, আসু, নেওয়াজ, মুনা, গুণা, রামজয় এবং ঢাকার মদন পোদ্দার—ইহারাও মঙ্গলসিংহের দলভুক্ত ছিল বলিয়া ধৃত হইয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মঙ্গলসিং যে গৃহে ধৃত হইয়াছিল ঐ গৃহস্থের এবং তাহার তালুকদারেরও শাস্তি হইয়াছিল। এমন কি তারামণি দেব্যা মঙ্গলসিংহের নিকট সম্পত্তি ইজারা দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতিও গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

* The offices of Collector & Magistrate in the District are since the 16th. February in the hands of seperate officers.

Magte's letter to the Supdt. of Police L. P. dated 19/3/38.

এই সময়ে নীলকরদিগের ভীষণ অত্যাচার এ জেলার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কৃষকগণ অনেক সময়ে অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়াও রাজদ্বারে অগ্রসর হইতে সাহস পাইত না। অগ্রসর হইলেও প্রতিকারের প্রত্যাশা অতি বিরল ছিল। সুবর্ণখালি, কাগমারির, যোলকাহনিয়া, তেঁতুলিয়া, দড়িনগর, রসিদপুর, ভবানীগঞ্জ, হুল্লাবাড়ী, নওয়াপাড়া, বাগুনবাড়ী, বেতাল প্রভৃতি স্থানে নীলকরদিগের কুঠি ছিল। এই সকল কুঠিতে প্রতি নিয়ত অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হইত।

নীলকরের অত্যাচার।

রাজপুরুষগণ অধিকাংশ স্থলেই নীলকরদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেন। নীলকরেরা কৃষকের অজ্ঞাতে তাহাদের নামে জাল কবুলিয়ত সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে নীলের চাষ করিতে বাধ্য করিত। কৃষক অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে নীলকর জাল দলিল দাখিল করিয়া বিচারকের অনুগ্রহে প্রজার উদ্যম বিফল করিয়া দিত। (১)

এইরূপ অত্যাচার ও অরাজকতায় অনেক স্থলে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর সমবেতশক্তি নীলকরের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। একপক্ষে রাজপুরুষ ও নীলকর অপরদিকে দেশীয় ভূম্যধিকারী ও প্রজাশক্তি দণ্ডায়মান হইয়া ঘোরতর বিরোধে প্রবৃত্ত হয়।

এইস্থলে নীলকরদিগের এইরূপ একটী অত্যাচার ও তাহার পরিণামের বিবরণ উল্লেখ করা গেল।

(১) ১০।৩।৩৮ সনের একখানা চিঠিতে ময়মনসিংহের তৎকালীন এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জে, এম্, হে, বেতালের নীলকর Glass সাহেবকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বর্ণিত বিষয়ের পরিমাণ বুঝা যাইবে। হে সাহেব লিখিয়াছেন—"I have ordered your Muktear to file the pattah of such land within 8 days and should he produce it within 8 days I intend to dismiss the case atonce. Which they generally allege it to be ofcourse your muktear fails to produce the pattah the case must be proceeded with in the regular manner. After much reflection I think the above the best mood of disposing of cases of the above nature. Ofcourse they are at liberty to prosecute you in a new suit for forgery should they persist in asserting the pattah to be a false one."

অত্যাচারের নমুনা।

১৮৪৩ সনে কাগমারীর নীলকুঠির অধ্যক্ষ কিং সাহেব কতকগুলি প্রজাকে আবদ্ধ করেন ও তাহাদিগকে নীল বুনিতে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন। নীল বুনিতে অস্বীকার করায় একজন প্রজার মাথা মুড়াইয়া তাহাতে কাদা মাখিয়া নীলের বীজ বুনিয়া দেওয়া হয় ও অপর একজনকে বৃহৎ সিন্ধুকে আবদ্ধ করিয়া রজনীযোগে বেলকুচির কুঠিতে পাঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়। কয়েকজন এই ভীষণ অত্যাচার ও অপমান প্রত্যক্ষ করিয়া নীলের দাদন লইয়া পরিত্রাণ লাভ করে। যথা সময়ে প্রজাগণ গোলকনাথ রায়ের নিকট কিং সাহেবের অমানুষিক অত্যাচারের কথা অবগত করাইলে গোলকনাথ সদলবলে কিং সাহেবের কুঠি আক্রমণ করেন ও কিং সাহেবকে ধরিয়া নিয়া গোপন করিয়া রাখেন। উভয় পক্ষই জেলা-মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার প্রার্থী হয়। এদিকে কিং সাহেব ও গোলকনাথ কাহারও তত্ত্ব পাওয়া যায় না। জেলা-মাজিষ্ট্রেট গোলকনাথকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট, রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও মালদহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠাইলেন *। গোলক নাথকে কোথাও পাওয়া গেল না। বহুদিন পরে পাকুল্যা থানার দারোগার সাহায্যে কিং সাহেব পরিত্রাণ লাভ করিলেন। (১)

অনেকস্থলেই প্রজা অত্যাচার সহ্য করিয়াও নীল বুনিতে স্বীকৃত না হইলে তাহাকে সিন্ধুকে বা বাক্সে পুরিয়া অন্য কুঠিতে স্থানান্তরিত করা হইত। (২) নীলকরের এইরূপ বীভৎস অত্যাচার এ জেলায় অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল।

হনুমান সিংহের বিদ্রোহ।

১৮৩৯ সনে মধুপুরে হনুমান সিংহের আবির্ভাব হয়। হনুমান জামালপুরের ৩৬ সংখ্যক দেশী পদাতিক সৈন্যদলের একজন পদাতিক সৈন্য ছিল। ১৮৩৯

---

* Magte's letter to Jt Magte. Pabna, Magte. Rajshahi & Jt. Magte of Maldah, dated 20/11/43.

(১) Magt's letter dated 1/7/44.

(২) "বোল হাসিয়া" কুঠির অধ্যক্ষ Wise দেবু মালীর বাড়ী লুট করেন ও তাহার ভাই লেভুকে ধরিয়া লইয়া ঢাকার অন্তর্গত একডালার কুঠিতে চালান করেন। Ram Sanker Sen's no. 2 dated 8/2/62 to the Magte.

হনুমানের বিদ্রোহ।

সনের এপ্রিল মাসের শেষভাগে হনুমান জামালপুরের সৈন্য-আবাস হইতে বিনা অনুমতিতে বাহির হইয়া যায়। * হনুমান সৈন্যদল হইতে বাহির হইয়া দস্যু-দল সৃষ্টি করে; গাবতলী ও মধুপুরের মধ্যে নিবিড় অরণ্যে বিচরণ করিতে থাকে। পুলিস তাহাকে ধরিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে তাহার প্রতাপ আরও বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়ায়। এই সময় একদা পুলিসের গুপ্তচরের হস্তে হনুমান ধৃত হয়। কথিত আছে হনুমান হস্তীর ন্যায় বলশালী ছিল। এবং ইতিপূর্ব্বেও শারীরিক শক্তিতে অনেকেই তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। পুলিস এই ভয়ে হনুমানকে হস্তীর পদের সহিত হস্তবদ্ধ করিয়া ধরিয়া আনে। শুনা যায় হনুমান যখন মুক্তপদে পথিমধ্যে বৃক্ষাদি টানিয়া ধরিত তখন হস্তীও হঠাৎ তাহার শক্তিতে পরাভূত হইয়া ক্ষণকাল থামিতে বাধ্য হইত। হনুমান রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলে অত্যাচার অনেক থামিয়া যায়।

১৮৩৯ সনে এ জেলায় ধরমচাঁদ ঘোষ প্রথম ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আসেন।

জেলা বিভাগ।

১৮৪৫ সনের ১লা মার্চ্চ জামালপুর হইতে সেনা-নিবাস উঠিয়া যায়। (১) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে ২টী মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সেরপুর, সিরাজগঞ্জ, হাজিপুর, পিংনা এই ৪ থানা লইয়া জামালপুর মহকুমা ও নিকলী বাজিতপুর, ফতেপুর ও মাদারগঞ্জ এই ৪ থানা লইয়া হুসেনপুর বা নিকলী মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব হয়। (২) এপ্রিল মাসে গবর্ণমেণ্ট সিরাজগঞ্জে ও জামালপুরে দুইটী মহকুমা স্থাপনের অনুমতি করেন। তদনুসারে পাবনার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সিরাজগঞ্জ (৩) ও ময়মনসিংহের জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট জামালপুর মহকুমার ভার গ্রহণ করেন।

---

* Magte's acknowledgement to Major C. Godley commending 36th. Reg. N. I. Jamalpur no. 187 dated 6/5/1839.

(১) Magte's letter to Captain Willium dated 3/3/45.

(২) Do. to under Secy to the Govt. of Bengal. dated 11/3/45.

(৩) সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন কেবলমাত্র সিরাজগঞ্জ থানা এ জেলার অধীন ছিল। সিরাজগঞ্জের দায়রার মোকদ্দমা জিলা ময়মনসিংহের দায়রার

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলায় শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হয় এবং সদর ষ্টেশন নসিরাবাদে হার্ডিঞ্জস্কুল নামক একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয়; গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপনের জন্য চেষ্টা হয় ও ক্রমে স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮৫৩ সনে জেলা স্কুল স্থাপিত হয়।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

ভারতের প্রাচীন কথা।

ভাষাতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, অস্থিতত্ত্ব দ্বারা পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ভারতের আদিমনিবাসী নহে। তাঁহারা মধ্য-আসিয়ার অন্তর্গত কোনস্থানে বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রাচীন বাসস্থান কোথায় ছিল এ বিষয়ে নানা পণ্ডিত নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রদেশে বাস করিতেন, তাঁহারা "প্রাচীন আর্য্যজাতি" বলিয়া কথিত হন। তাঁহাদের মধ্যে একদল মৃগয়ালব্ধ পশুমাংসদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মৃগয়াজীবগণের পক্ষে একস্থানে অধিক কাল বাস করা অসুবিধা জনক, এজন্য ইহারা প্রথমতঃ "প্রাচীন আর্য্যজাতির" প্রদেশ পরিত্যাগ করেন এবং আসিয়াখণ্ডের পশ্চিমভাগে আবাস স্থাপন করেন। পরিশেষে এই স্থান হইতে তাঁহাদের একদল কৃষ্ণসাগরের উত্তর দিয়া স্থলপথে ইয়োরোপে প্রবেশ করেন, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইজিয়ান সাগর পার হইয়া গ্রীস, ইটালী প্রভৃতি দেশে আবাস স্থাপন করেন। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয়গণ এই মৃগয়াজীব আর্য্যগণের বংশধর। ইহারা অদ্যাপি প্রাচীন আর্য্যগণের শ্বেতবর্ণ রক্ষা করিয়াছেন।

মৃগয়াজীবগণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগণ পশুপালন এবং কৃষিকর্ম্মদ্বারা

জজ করিতেন। এই অবস্থায় বিশাল যমুনা নদী পার হইয়া জেলায় গমনাগমন সাধারণের পক্ষে ভয়ানক অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া নিম্ন বঙ্গের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ১২।১২।৪৫ তারিখে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ২০।৮।১৮৪৬ সনের আদেশ অনুসারে সিরাজগঞ্জের দায়রা মোকদ্দমার বিচারভার রাজসাহীর দায়রা জজের উপর ন্যস্ত হয়।

(Vide Registrars no. 60 dated 13/1/47 to the Magte.

জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা পশুর দুগ্ধ পান, কৃষিকার্য্যদ্বারা উৎপন্ন ব্রীহি, যব ইত্যাদি এবং প্রয়োজনমতে পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেন। কালক্রমে ইঁহারা প্রত্নোক পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেন এবং অশ্বভক্ষণে সিন্ধুনদ পার হইয়া সপ্তসিন্ধু প্রদেশে আবাস স্থাপন করেন। এই স্থানে তাহাদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। এক দল উপাস্য দেবতাকে অসুর (জেন্দ ভাষায় অহুর) বলিতেন, অপর দল উপাস্য দেবতাকে সুর এবং দেবদ্বেষিগণকে অসুর বলিতেন। ঋগ্বেদে কোন কোন স্থানে অসুর শব্দ দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অসুর উপাসক দল পুনঃ সিন্ধুনদ পার হইয়া পারস্য দেশে গমন করেন এবং তথায় আবাস স্থাপন করেন।

নবধর্ম্মে দীক্ষিত আরবগণ হজরত মহম্মদের মৃত্যুর অল্প কাল পরেই ইসলাম পতাকা এক দিকে ইয়োরোপের অন্তর্গত ইব্রু নদীর তীরে, অপর দিকে সিন্ধু নদের তীরে উত্তোলন করেন। পারসিকগণ এই সময়ে আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। যাহারা ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বোম্বাই প্রদেশীয় পারসিকগণ ইহাদের বংশধর।

ভারতীয় আর্য্যগণ যে অন্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ বৈদিক গ্রন্থমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "শতপথব্রাহ্মণে" জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত উপলক্ষে লিখিত আছে :— "তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরে মনোরব সর্পণমিতি।" ইহাই উত্তর পর্ব্বত হইতে মনুর অবতরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন ইহা আর্য্যদিগের উত্তর দেশে বাস করার প্রবাদসম্ভূত।

আর্য্যজাতি কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তাহার কাল নিরূপণ করা অসম্ভব। ইয়োরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছেন। ইয়োরোপীয়গণের সভ্যতা অতি অল্পকালের, বিশেষতঃ য়িহুদিগণ বলেন মাত্র ছয় হাজার বৎসর হইল পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব অতি প্রাচীন ঘটনার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত অবলম্বন করা উচিত নহে। যদি এ সম্বন্ধে কোন অনুমান করা প্রয়োজন হয় তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে য়িহুদিগণের মতে যে সময়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পূর্ব্বেই আর্য্যগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন।

এই সময়ে ভারতবর্ষে নানাপ্রকার অনার্য্যগণ বাস করিতেন। ভারতের এই আদিম নিবাসীদিগকে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যাঁহারা

বিন্ধ্যাচলের উত্তরে বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে এক শ্রেণী, যাহারা বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে বাস করিতেন তাঁহারা অপর শ্রেণী ; এইরূপ দুইভাগ করা যাইতে পারে।

যাহারা বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে বাস করিতেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ সিংহল এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে জলপথে ভারতবর্ষে আগমন করেন। মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন যে রাবণের অনুচরগণ অনেক সময়ে দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে বাস করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে অনার্য্য জাতির ভারতে প্রবেশের সময়ে যে অনার্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন, তাঁহারা পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ প্রদেশে বাস করিতেন। কালক্রমে অন্যান্য অনার্য্য জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পরে প্রথমোক্ত অনার্য্যগণ বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং তাঁহারা তথায় আবাস স্থাপন করেন।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করার সময়ে যে অনার্য্যগণ বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ প্রদেশে বাস করিতেন, তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। তৎকালে যে সমস্ত অনার্য্যগণ বর্ত্তমান আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশে বাস করিতেন তাঁহাদিগকে সেই প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহারা তথায় আবাস স্থাপন করেন। বর্ত্তমান আর্য্যাবর্ত্তের প্রথম অধিবাসিগণ দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ঋষিগণ আর্য্যাবর্ত্তবাসী অনার্য্যদিগকে দস্যু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন (১)। কখন-বা যাতুধান রাক্ষস, অসুর ইত্যাদি ভূষণে ভূষিত করিয়াছে। আর্য্যগণ তৎকালে অনার্য্যদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং তাঁহারা অনার্য্যদিগকে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন।

ইংরেজেরা উত্তর ব্রহ্ম অধিকার করার পরে তত্রত্য অধিবাসীদিগকে অনেক সময়ে "ডাকাইত" আখ্যা প্রদান করেন।

এই সময়ে আর্য্যগণ শ্বেতবর্ণ ছিলেন (২)। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে শীতপ্রধান দেশে বাস করিতেন। ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পরে সময় সময় বহু অনার্য্যগণ আর্য্যজাতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপ এবং অনার্য্য-শোণিত মিশ্রণে এক্ষণ আর্য্যগণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। যাহাদের মধ্যে অনার্য্য-শোণিত মিশ্রিত হয় নাই, তাঁহারা বহু শতাব্দী ভারতবর্ষে বাস করাতেও সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হয় নাই। ভারতবর্ষীয় পারসিকগণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

(১) ঋগ্বেদ ১।৫১।৮ ; ১।১০৩।৩ ; ১।১১৭।২১ ; ৩।৩৪।৯ ; ৬।২৫।২-৩ ; ১০।৮৬।১৯। সামবেদ-১।১।১।৫ ইত্যাদি।

(২) ঋগ্বেদ ১।১০০।১৮।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পরে অনার্য্যাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ দস্যু (১) কৃষ্ণযোনি (২) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপীয় শ্বেতাঙ্গগণ আমাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ঘৃণা করেন। তাঁহারা পৃথিবীর অধিবাসিদিগকে শ্বেত, পীত এবং কৃষ্ণ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় প্রথা মতে তাহারা কোন শ্বেতাঙ্গ জাতীর সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলে কৃষ্ণবর্ণ সৈন্য নিযুক্ত করিতে অক্ষম। এই নিয়মের জন্য ভারতীয় সেনা বুয়ার-যুদ্ধে প্রেরিত হয় নাই।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ প্রদেশবাসী অনার্য্যগণ একপ্রকার সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ভাষা প্রচলিত ছিল (২ক); সংস্কৃতভাষার সহিত সংঘর্ষণে সে ভাষা বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার কঙ্কাল অদ্যাপি আর্য্যাবর্ত্তের ভাষায় দৃষ্ট হয়। বাপ, বেটা, চোকা, খিরকি, চুক, ঝগড়া, আটা, চাটাই, ঢেকী, কুলা, ইত্যাদি শব্দ অনার্য্যদিগের ভাষার কঙ্কাল। এই সময়ে আর্য্যজাতির মধ্যে কোনপ্রকার লিপি প্রণালী প্রচলিত ছিল না। অনার্য্যগণ মধ্যেও তাহা প্রচলিত ছিল না।

অনার্য্যগণ পুর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেন। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে অনার্য্যদিগের পুরের উল্লেখ আছে (৩)। এক স্থানে লৌহনির্ম্মিত পুরের (৪) এবং অন্য এক স্থানে প্রস্তরময় পুরের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় (৫)। কোন কোন স্থানে শারদীয় পুরের উল্লেখ আছে (৬)। কোন স্থানে পূর্ব্বী অর্থাৎ প্রাচীন সাময়িক পুর (৭) উল্লেখ আছে।

আর্য্যগণ ক্রমে ক্রমে অনার্য্যদিগের বাসস্থান অধিকার করেন, এবং তাহাদের অধিকৃত পুর ভগ্ন করিয়াছেন। প্রাচীনকালে অনার্য্যগণ, বোধ হয়,

---

(১) ঋগ্বেদ ১।১৩০।৮; ৯।৪১।১ ইত্যাদি।

(২) ঋগ্বেদ ২।২০।৭।

(২ক) অসুর্য্যা হ এষা বাক্। শতপথব্রাহ্মণ ৩।২।১।২৩।

(৩) ঋগ্বেদ ১।৫১।৫; ১।৬৩।৭; ১।১০৩।৩; ১।১৭৪।৮; ৩।১২।৬; ৪।২৬।৩; ৬।৬১।৪ ইত্যাদি।

(৪) পুর আয়সীর্নিতারীৎ। ঋগ্বেদ ২।২০।৪।

(৫) শতম অশ্মন্ময়ী নাং পুরামিন্দ্রো ব্যাসৎ। ঋগ্বেদ ৪।৩০।২০।

(৬) শারদীপুর। ঋগ্বেদ ১।১৩১।৪; ৬।২০।১০।

(৭) যঃ শতং শম্বরস্ত পুরো বিভেদাশ্মনেব পূর্ব্বীঃ।

ঋগ্বেদ ২।১৪।৬। ; ৮।১৭।১০ দেখ।

স্থাপত্য-বিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করেন। মহাভারতের আদি পর্ব্বের অন্তর্গত খাণ্ডবদাহ পর্ব্বে লিখিত আছে যে খাণ্ডবদাহ কালে অর্জ্জুন ময় নামক দানবের প্রাণরক্ষা করেন। সভাপর্ব্ব প্রারম্ভে অবগত হওয়া যায় যে ময়াসুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য কৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে যে; ময় চতুর্দ্দশ মাসে এই মহতী সভা নির্ম্মাণ করেন। এতাদৃশী সভা ভূমণ্ডলে আর বিদ্যমান ছিল না।

ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দস্যুদিগের ধন এবং ধনী দস্যু বলিয়া উল্লেখ আছে (ক)। কোন কোন স্থানে পণি, শম্বর, নমুচি প্রভৃতি অসুরগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথিত আছে নমুচি তাঁহার পত্নিগণ সহ সমরে উপস্থিত হন (খ)। কোন কোন স্থলে অসুরগণের অস্বাভাবিক বর্ণনা আছে। উরণ নামক এক অসুরের ৯৯ বাহু ছিল; একজন অসুরের ছয় চক্ষু ছিল (গ)। কোন কোন স্থানে অসুরদিগকে মনুষ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (ঘ)। ঋষিগণ দস্যুদিগকে আমমাংসখাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে "অতএব অদ্যাপী অদানশীল, অবিশ্বাসী, অযজ্ঞকারী ব্যক্তিকে অসুর বলা হয়। অসুরগণের ধর্ম্ম এই যে তাহারা মৃত ব্যক্তির শব ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা, বসন এবং অলঙ্কারদ্বারা সাজাইয়া থাকে, ইহাদ্বারা পরলোক প্রাপ্তি হইবে এই তাহাদের বিশ্বাস।" (ঙ)

আর্য্যগণের অত্যাচারে আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী অনার্য্যকুল প্রায় নির্ব্বংশ হইয়াছে। যাহারা এই সমস্ত অত্যাচার সহ্যকরিয়া আর্য্য জাতির দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল তাহারা আর্য্য-সমাজে শূদ্র নিষাদ ইত্যাদি জাতি বলিয়া পরিচিত হন। কতিপয় অনার্য্যকুল আর্য্যগণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ব্বতময় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এক্ষণ তাহাদের বংশধরগণ ভীল, কোল, গণ্ড, সাঁওতাল ইত্যাদি নামে পরিচিত।

আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের যেরূপ অত্যাচার করেন তাহা স্মরণ হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সে অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিয়া লেখনী কলুষিত করিতে

(ক) ১।৩৩।৪; ১।১৭৬।৪; ২।১৫।৪; ৪।৩০।১৩; ৮।৪০।৬।

(খ) ৫।৩০।৭—৯। (গ) ১০।৯৯।৬; ২।১৪।৪। (ঘ) ৫।৭।১০।

(ঙ) তস্মাদপি অদ্যেহ অবদানম্ অশ্রদ্দধানম্ অযজমানম্ আহুরাসুরো। বতেতি। অসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে।

ইচ্ছা করি না। আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াবাসী অনার্য্যগণ ও তাঁহাদের জেতাগণের প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

দক্ষিণাপথে যে সমস্ত অনার্য্যগণ বাস করিতেন, মহর্ষি বাল্মীকি তাহাদিগকে বানর, ঋক্ষ এবং রাক্ষস, কবন্ধ ইত্যাদি ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

বর্ত্তমানকালে দাক্ষিণাত্যে তামিল, তেলুগু ইত্যাদি ভাষা প্রচলিত আছে। ইহার কোন ভাষাই সংস্কৃত ভাষা বা কোন প্রাকৃত ভাষা হইতে উৎপত্তি হয় নাই। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষার সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। ভাষাতত্ত্ববিৎ-গণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সমস্ত ভাষায় কতক সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্য প্রবেশ করার পরে এই সমস্ত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে কতিপয় অনার্য্যগণ আর্য্যজাতি মধ্যে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং কতক আর্য্যজাতির আবাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমে পূর্ব্ব হইতে আরও অধিকতর অসভ্য হইয়াছে। বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যজাতিসম্ভূত লোকের সংখ্যা অধিক থাকাতে অনার্য্যদিগের ভাষা বিলুপ্ত হইয়া কেবল তাহার কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে। দাক্ষিণাত্যে অল্প পরিমাণ আর্য্যজাতিসম্ভূত লোক অনার্য্যগণ মধ্যে বাস করাতে তথায় আর্য্যজাতির ভাষা প্রচলিত হইতে পারে নাই। তথাকার আর্য্যগণ অনার্য্যজাতির ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, অনার্য্যজাতির বহু আচার আর্য্যজাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যদিগের সংখ্যা অধিক হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে; তাঁহারা আর্য্যজাতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

আর্য্য জাতির মধ্যে যে অনার্য্য-শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে, ঋষিদিগের গ্রন্থ সমালোচনা করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়। অনার্য্যগণ মধ্যে যাহারা আর্য্য জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহারা শূদ্র জাতি বলিয়া আর্য্য-সমাজে পরিচিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন জাতি শূদ্র জাতির কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন স্মৃতিশাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে; তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র-কন্যা বিবাহ অপ্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ আছে। আর্য্যগণ অনার্য্য রমণীর পাণিগ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত না হইলে ঋষিগণ এরূপ ব্যবস্থা করিতেন না। ভীমসেন অনার্য্য রমণী হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করেন। অর্জ্জুন নাগকন্যা (অনার্য্য রমণী) উলুপীর পাণিগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ জরৎকারু তক্ষক-সহোদরা (অনার্য্য রমণী) জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করেন। জরৎকারুর ঔরসে জরৎকারুর গর্ভে

আস্তীক জন্মগ্রহণ করেন। আর্য্য-সমাজে আস্তীক একজণ ঋষি বলিয়া পরিচিত। মহাভারতে আস্তীক ঋষি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অনার্য্যগণ মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় ক্ষমতায় ঋষিশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত ঐতরেয় এবং কৌষিতকীব্রাহ্মণে কবষ ঋষির উপাখ্যানে প্রাপ্ত হওয়া যায় *। রাজা যযাতি বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। বৃষপর্ব্বা অনার্য্য বংশীয় ছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি কৌরবগণ সকলেই শর্ম্মিষ্ঠার বংশধর। অতএব আর্য্য-সমাজে যে অনার্য্য-শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই।

শক, হূণ, পারদ পহ্লবজাতীয় অনার্য্যগণ সময় সময় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহারা কালক্রমে আর্য্য-সমাজে মিশ্রিত হইয়াছেন। পশ্চাৎ-কালীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে এ বিষয় অবগত হওয়া যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে—বাহীকদেশে ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নাপিত হয়। নাপিত হইয়া পুনঃ ব্রাহ্মণ হয়। †

দাক্ষিণাত্যের আর্য্যগণ মাতুলকন্যা, সহোদরার কন্যা বিবাহ করেন। এই প্রথা দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ মধ্যেও প্রচলিত আছে। ‡

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

* ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৬।১) সর্পঋষি কদ্রুর পুত্র অর্ব্বুদ নামক একজন ঋষির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারত আদিপর্ব্ব ৩য় অধ্যায়ে লিখিত আছে শ্রুতশ্রবা নামে এক ঋষির ঔরষে এক সর্পীর গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম সোমশ্রবা। তিনি জনমেজয়ের পুরোহিত হন।

† তত্রৈব ব্রাহ্মণো ভূত্বা ততো ভবতি ক্ষত্রিয়।
বৈশ্য শূদ্রশ্চ বাহীকস্ততো ভবতি নাপিতঃ॥
নাপিতশ্চ ততো ভূত্বা পুনর্ভবতি ব্রাহ্মণঃ।
দ্বিজোভূত্বা চ তত্রৈব পুনর্দাসো ভিজায়তে॥
(কর্ণপর্ব্ব ৪৫ অধ্যায়)।

‡ Mandlik's Hindu law.

বিবি অলি নেয়ামত।

হোসেন সাহার রাজত্ব সময়ে ১৪৯৪ হইতে ১৫২০ খৃঃ অব্দের মধ্যে অযোধ্যা নিবাসী কালিদাস গজদানী নামক একব্যক্তি বাণিজ্য উপলক্ষে বঙ্গদেশে আসিয়া আবাস স্থাপন করেন; এবং অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় প্রতিভাবলে রাজদরবারে পরিচিত হইয়া উঠেন। গৌড়ের শাসনকর্তা বাহাদুর সাহা কালিদাসের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাকে দেওয়ানী পদ প্রদান করেন। কতকদিন পর কালিদাস গজদানী ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া "সোলেমান খাঁ" নাম ধারণ এবং বাহাদুর সাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেলালুদ্দিনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন *। ইহারই পুত্র সুপ্রসিদ্ধ "দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদ আলি" একদিন পূর্ব্ববঙ্গের একচ্ছত্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়া পরগণে সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। খিজিরপুরে তাঁহার প্রধান রাজধানী স্থাপিত হয় †। তিনি দেওয়ান বাগ, হাজিগঞ্জ, এগারসিন্দুর,

---

* রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অযোধ্যাপ্রদেশবাসী কালিদাস গজদানী নামক রাজপুতযুবা হুসেন সাহের রাজত্বকালে তাঁহার এক যুবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তৎকালে কালিদাস "সুলেমান খাঁ" আখ্যা প্রাপ্ত হন। মসনদ আলী ইতিহাসে জেলালুদ্দিনের কন্যার পাণিগ্রহণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে হুসেন সাহা এবং জেলালুদ্দিন একই ব্যক্তি।

† মসনদ আলি ইতিহাসে লিখিত আছে যে ঈশা খাঁ, সাহাবাজ খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রথমতঃ চট্টগ্রাম তৎপরে জঙ্গলবাড়ী উপস্থিত হন। কিন্তু আমরা এ কথার সমর্থন করিতে পারি না। ঈশা খাঁ জঙ্গলবাড়ী আসিয়াছিলেন এ কথার কোন প্রমাণ নাই। সুবর্ণগ্রামের ইতিহাসের ১১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "ঈশা খাঁয়ের প্রপৌত্র লতিফ খাঁ হয়বৎনগরে, মাহাম্মদ খাঁ জঙ্গলবাড়ীতে এবং মনোয়ার খাঁ দেওয়ানবাগে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন।" অতএব ঈশা খাঁয়ের অনেক দিন পরে জঙ্গলবাড়ীতে দেওয়ান বংশের আবির্ভাব হইয়াছে। ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "১৫০৫ শকাব্দে সুবর্ণগ্রামের ভৌমিক ঈশা খাঁ, মসনদ আলি আকবরের সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ কর্ত্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়া চট্টলে গমন করেন। তথায় তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করতঃ সুবর্ণগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি মোগলসৈন্য ও কোচবিহারের রাজাকে জয় করিয়াছিলেন। আমাদের বোধ হয় রাজমালা গ্রন্থে অমর মাণিক্যের সেনাপতি ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক মোগলসৈন্য জয় (৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ও উল্লিখিত বর্ণনা একই ঘটনামূলক। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ইতিহাসে একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্নভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সময় সম্বন্ধীয় অসামঞ্জস্য এস্থলে গ্রহণযোগ্য নহে। রাজমালা

সেরপুর দশকাহনিয়া, রাঙ্গামাটী, ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী, কলাগাইছা, একডালা প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একডালা এবং এগারসিন্দুর দুর্গ দুরাক্রম্য ছিল। দেওয়ান ঈশা খাঁ নিজ বাহুবলে অল্পকাল মধ্যে উত্তরে ঘোড়াঘাট ও আসামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈশা খাঁ এমন প্রতাপশালী ছিলেন যে দিল্লীর সম্রাট আকবরের সেনানী সাহাবাজ খাঁ ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতি ক্ষত্রিয়বীর রাজা মানসিংহ ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েন। ঈশা খাঁ পারস্যভাষায় অগাধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন; ঈশা খাঁয়ের জংলা রাগিণীর সঙ্গীত শ্রবণে সম্রাট আকবর মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কৃত অপরাধ ক্ষমা করতঃ স্বর্ণমাল্য পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

একদা ঈশা খাঁ কোসায় * আরোহণ করিয়া জলপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বিক্রমপুরের অধিপতি চাঁদ রায়ের ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হন। ঘাটে

গ্রন্থের ৪২৩ পৃষ্ঠায়ও লিখিত আছে যে, বন্দাখাল খিজিরপুরের (সুবর্ণগ্রামের) সুবিখ্যাত ভৌমিক ঈশা খাঁ মসনদে আলির অধিকারভুক্ত ছিল। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ বণিক ও ভ্রমনকারী রলফ্‌ফিচ ঈশা খাঁয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "এই সকল দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশা খাঁ; তিনি অন্যান্য নরপতিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মেঘনা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে রাজাবাড়ীর নিকটস্থিত শ্রীপুর হইতে ছয় লিগ্‌ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৮ মাইল দূরস্থ সোণারগাঁর তাঁহার রাজধানী। ঈশা খাঁ খৃষ্টানদের পরমবন্ধু। তাঁহার অধীনে অনেক জমিদার আছেন। এই সোণারগাঁ পরগণাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখানকার অধিবাসীগণ খড়ের ঘরে বাস করে। দুধ, ভাত, ফল-মূলাদি লোকের প্রধান খাদ্য। সুবর্ণগ্রামে অনেক ধনীলোকের বাস। কিন্তু ধনী, দরিদ্র সকলেই ক্ষুদ্র ধুতি পরিধান করে। চাউল ও কাপড় সোণারগাঁ পরগণা হইতে পেগু ও সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানেও রপ্তানি হয়।" ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ঈশা খাঁ কখনও জঙ্গলবাড়ীতে আসেন নাই, সুবর্ণগ্রামেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

ভ্রমণকারী রলফ্‌ফিচের সহিত ঈশা খাঁর সুবর্ণগ্রামে সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং ভ্রমণকারী কেবল সুবর্ণ গ্রামের বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করায় দ্বিতীয় রাজধানী জঙ্গলবাড়ী সম্বন্ধে লেখকের শেষ মীমাংসায় উপনীত হওয়া এস্থলে সমীচীন হয় নাই। আঃ সঃ

* পূর্ব্বকালে এদেশে এক প্রকার সুবৃহৎ দ্রুতগামী নৌকা হইত, তাহারই নাম কোসা। সময়২ যুদ্ধকালেও এই কোসা-নৌকা ব্যবহৃত হইত।

জলটুঙ্গির উপর চাঁদ রায়ের পরমাসুন্দরী কন্যা সোণামণি সহচরীগণ সহ ধীর পাদবিক্ষেপে জলীয় শীতলবায়ু সেবনের জন্য পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। ঈশা খাঁ সোণামণিকে দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়েন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে এই পরমাসুন্দরী রমণী, চাঁদ রায়ের একমাত্র কুমারী কন্যা। ঈশা খাঁয়ের জ্ঞান-বিলুপ্তি ঘটিল। রাজধানীতে আসিয়াই সোণামণিকে বিবাহ করিবার মানসে তথায় দূত প্রেরণ করিলেন।

দূত ঈশা খাঁয়ের সম্বন্ধ-পত্র প্রদান করিলে, চাঁদ রায় ও তৎপুত্র কেদার রায় এরূপ অপমানজনক উক্তি শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। চাঁদ রায়ের প্রথম আক্রমণেই ঈশা খাঁয়ের কলাগাইছা দুর্গ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অপ্রস্তুত ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের অকস্মাৎ ভীষণ আক্রমণে ভীত হইয়া, ত্রিবেণীর দুর্গে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। চাঁদ রায় ত্রিবেণী অবরোধ করিয়া রাজধানী খিজিরপুরের বহু অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন। ঈশা খাঁ অর্থবলে চাঁদ রায়ের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষকে বশীভূত করেন এবং চৌষট্টি দাঁড়বিশিষ্ট পঞ্চবিংশতি সংখ্যক কোসাতে সহস্রাধিক দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিবার জন্য জলপথে প্রেরণ করেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায় যখন ত্রিবেণী ও খিজিরপুর অবরোধ করিয়া যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় ঈশা খাঁয়ের প্রেরিত সৈন্যগণ চাঁদ রায়ের বাড়ী আক্রমণ করিয়া সম্পত্তি লুণ্ঠন ও সোণামণিকে কোসাযোগে এগারসিন্দুর দুর্গে লইয়া আইসে। সোণামণি হস্তগত হইয়াছে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঈশা খাঁ ভীমবেগে চাঁদ রায়ের বাহিনী আক্রমণ করিয়া সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন, তখন কেদার রায় অনেক সৈন্যসহ খিজিরপুর অবরোধ করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঈশা খাঁ ত্রিবেণী হইতে এগারসিন্দুর দুর্গে আসিয়া সোণামণির পাণিগ্রহণ করেন। সোণামণি "বিবি অলিনেয়ামত" নাম গ্রহণ করেন।

চাঁদ রায় হিন্দুধর্ম্মে বড়ই আস্থাবান্ ছিলেন। যাহার জন্য এত সংগ্রাম, এত নর-শোণিত পাত, সেই প্রাণসমা দুহিতার পরিণাম চিন্তা করিয়া চাঁদ রায়ের হৃদয় বিলোড়িত হইল। তিনি তারা মন্দিরের কপাট রুদ্ধ করিয়া স্বীয় আরাধ্যা দেবীর নিকট "হত্যা" দিলেন। আদেশ হইল "সোণামণির জন্য আর নর-শোণিত পাত করিও না।"

যুদ্ধের অবসান হইল। চাঁদ রায় সংসারের সর্ব্বকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। কেদার রায় রাজ্য শাসন,

প্রজা পালন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এ দিকে সোণামণি "বিবি অলিনেয়ামত" নামে অভিহিতা হইয়া ঈশা খাঁয়ের প্রধান মহিষী হইলেন। দেশে সর্ব্বসাধারণের নিকট ইনি সোণা বিবি বলিয়াই পরিচিত আছেন। ইহারই গর্ভে দেওয়ান আদম খাঁ, বিরাম খাঁ ও আবদুল্লা খাঁয়ের জন্ম হয়।

১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশা খাঁ পরলোক গমন করিলে আদম খাঁ ও বিরাম খাঁ পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে আদম খাঁ মাতামহের রাজ্য বলিয়া বিক্রমপুরের কতকাংশ অধিকার করেন। কেদার রায় পিতৃবিয়োগজনিত শোকে বিহ্বল থাকায় বিশেষ কোনরূপ বাধা দিতে সমর্থ হন নাই। দুই বৎসর পরে একদা আদম খাঁ সিদ্ধি কামনায় "কদম রসুলের দরগায়" গিয়াছিলেন। কেদার রায় তাহা জানিতে পারিয়া বহুতর সৈন্যসহ আদম খাঁকে আক্রমণ করিয়া ধৃত করেন এবং লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যান।

এদিকে বিরাম খাঁ ও সোণাবিবি আদম খাঁয়ের বিপদ-বার্ত্তা শ্রবণে অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সহ কেদার রায়ের রাজধানী আক্রমণ করেন। কেদার রায়ও যথাশক্তি সোণাবিবির গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়া প্রথমে পঞ্চ দিবস প্রবল যুদ্ধের পর সাধের বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরাভিমুখে পলায়ন করত মহারাজ বিজয় মাণিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে সোণাবিবি আদম খাঁকে কারামুক্ত করিয়া নগর লুণ্ঠন করত পুনরায় স্বীয় রাজধানী খিজিরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কেদার রায় ভগ্নী সোণাবিবির সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ত্রিপুরেশ্বর বিজয় মাণিক্য ও আরাকান রাজের শরণাপন্ন হন। ত্রিপুরেশ্বর, মগরাজ এবং কেদার রায় ছাব্বিশ সহস্র উৎকৃষ্ট পদাতি, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী, কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য এবং পাঁচ সহস্র যুদ্ধ-তরী সহ যাত্রা করিয়া ঈশা খাঁয়ের রাজ্য একদিক হইতে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। সোণাবিবি সংবাদ পাইয়া স্বীয় সৈন্য সামন্ত সহ হাজিগঞ্জের দুর্গে ক্রমান্বয়ে আট মাস ত্রিপুরেশ্বর ও মগরাজের সহিত অতি পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করেন; কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে আত্ম বিসর্জ্জন করেন। অদ্যাপিও দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই দুর্গ আজিও "সোণাবিবির কেল্লা" বলিয়া সাধারণের মধ্যে কথিত হইয়া থাকে। মগের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় আজিও সে কথা বিলুপ্ত হয় নাই। সাধারণ কৃষক-সম্প্রদায়ের মুখে আদম খাঁ সম্বন্ধীয় একটী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ সঙ্গীতটী শুনিলেই বিবি অলিনিয়ামত, আদম খাঁ, বিরাম খাঁ, চাঁদ রায়,

কেদার রায় প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনী স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া হৃদয় স্তম্ভিত হয়। এই সমস্ত গ্রাম্য-গীতি হইতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বারান্তরে ঐ গীতের কতকাংশ সংগ্রহ করিয়া "আরতি"র পাঠকগণকে উপহার দিবার বাসনা রহিল। গ্রাম্য-গীতিতে অবগত হওয়া যায় যে এই উভয় যুদ্ধে "মজলিস করিম ঢালী" নামক এক ব্যক্তি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সুবৃহৎ সমাধি কিশোরগঞ্জের অধীন "চৌদ্দ-শ" গ্রামে বর্ত্তমান আছে। বাস্তবিক এই সুবৃহৎ সমাধি দর্শন করিলে মনে হয় যে, মজলিস করিম একজন মহাবলশালী বীর ছিলেন। সমাধির দৈর্ঘ্যও ত্রিশ হাতের কম হইবে না।

সৈয়দ নুরুলহোসেন।

দস্যুর মহত্ত্ব।

৭

উইলিয়ম রটন সাহেব লেজ সাহেবের নিকট হইতে বেগুনবাড়ীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। লেজ অকৃতকার্য্য হইয়া চলিয়া গেলেন। রটনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর দলও ক্রমে বিরল হইয়া পড়িল। ২। ১ বৎসর সন্ন্যাসীর সারা শব্দও পাওয়া গেল না। সন্ন্যাসীর উৎপাত তিরোহিত হইল বটে কিন্তু জমিদারের অত্যাচার নিবৃত্ত হইল না। রটন অতি সাধু ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাই প্রজার দুর্দ্দশার একশেষ হইতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া সন্ন্যাসীর দল আবার আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের উলঙ্গ অত্যাচারে পুনর্ব্বার যমুনার তীর হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্য্যন্ত ভূভাগ শ্মশানে পরিণত হইল। মাঠের সমুদয় পাকা ফসল সন্ন্যাসীরা উঠাইয়া লইয়া গেল। রটন সাহেব বেগতিক দেখিয়া ঢাকা হইতে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লইলেন; জমিদারদিগের নিকট হইতেও প্রচুর সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করিলেন।

এবারের সমবেত শক্তির গতিরোধ করা সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। রটন সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে মধুপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ পথেই সন্ন্যাসীরা তাহাদিগের গতিরোধ করিতে বিস্তর চেষ্টা করিল কিন্তু কোম্পানী-সৈন্যের বন্দুকের সম্মুখে সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। অনেক সন্ন্যাসী হত ও আহত হইল। ক্রমে সন্ন্যাসীর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

রটন সাহেব অন্যদিকে লক্ষ্য না করিয়া ক্রমে সন্ন্যাসীদিগের মঠ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন। মঠের সম্মুখে উভয়পক্ষের আবার শক্তি পরীক্ষা হইল; পরিশেষে কোম্পানীর সৈন্য জয়লাভ করিল। সন্ন্যাসীরা মঠের সম্মুখদ্বার বন্ধ করিয়া অন্যপথে পলাইয়া গেল। কোম্পানীর সৈন্য দ্বার ভাঙ্গিয়া মঠে প্রবেশ করিল। যুদ্ধে যে সকল সন্ন্যাসী ধৃত হইয়াছিল, সেই স্থানেই তাহাদিগের বিচার হইয়া গেল—কোম্পানীর সিপাহীরা যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই সন্ন্যাসী বলিয়া ধরিল, তাহারই দেহ লম্বিত হইল। এইরূপে অপরাধী নিরপরাধ বিচার না করিয়া সিপাহীরা দেশ শাসনে প্রবৃত্ত হইল। বৃক্ষে বৃক্ষে অগণন মৃতদেহ ঝুলিতে লাগিল।

এইরূপে রটন সাহেবের অদ্ভুত পরাক্রমে সন্ন্যাসীর দল ছিন্নভিন্ন হইয়া দেশ হইতে তিরোহিত হইয়া গেল।

৮

আজ কয়েকদিন হইল, যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহা লইয়া দেশময় হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সে প্রসঙ্গে কেবল রটন সাহেব চিন্তা করিতেছেন না। স-কাউন্সেল গবর্ণর জেনারেল সারজন শোর পর্য্যন্ত টলিয়াছেন। গবর্ণর জেনারেল এক বিশেষ চিঠিতে লিখিয়া পাঠাইলেন—"জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া ঢাকায় বিচারার্থ প্রেরণ কর ও উৎপীড়িত লোকদিগকে অভয় প্রদান কর"

গবর্ণর জেনারেলের জরুরি আদেশ অনুসারে মগিনসাহির অত্যাচারী জমিদার যুগলকিশোর রায় ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

যুগল রায়ের অপরাধ ভয়ানক। চিন্তা করিতেও হৃৎকম্প হয়। পার্শ্ববর্ত্তী অন্য জমিদারের এলাকায় প্রবেশ করিয়া তিনি সেই পরগণার এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্নিতে পুড়াইয়া দরিদ্র প্রজাকুলকে ধনে প্রাণে বধ করিয়াছেন। আঠার খানা গ্রাম তাহার এই পৈশাচিক ব্যাপারে ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে। প্রাণীহত্যা যে কত হইয়াছে এখনও তাহার কোনও ইয়ত্তা হয় নাই। কি ভীষণ কাণ্ড!

৯

বেলা অবসান হইয়াছে। রটন সাহেব কাছারীর কার্য্য সমাপন করিয়া চুরটের ধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছেন। কাছারী

গৃহে দেওয়ান রাজচন্দ্র রায় মহাশয় এখনও তাকিয়া ঠেকিয়া বসিয়া আছেন। আসামী যুগলকিশোর রায় পার্শ্বের গৃহে একাকী উপবিষ্ট। বন্দিগৃহের ভিতরের দ্বার উন্মুক্ত।

একটী মণ্ডিত-মস্তক বলবান পুরুষ একখানা চিঠি আনিয়া রাজচন্দ্র রায়ের হস্তে প্রদান করিল। রাজচন্দ্র রায় পত্র গ্রহণ করিয়া খুলিলেন। পত্রে লিখিত ছিল—"পত্রবাহক আমার জানিব বটেহ। জমিদার যুগল রায়ের পক্ষে তদ্বির-কারক। তাহার আরজি শুনিয়া জরুর কার্য্য হউক।" দেওয়ানজী যতক্ষণ পত্র পড়িতেছিলেন ততক্ষণে আগত লোকটী স্বীয় বস্ত্রাস্তরাল হইতে একটী গুরু ওজন বিশিষ্ট তোড়া বাহির করিয়া দেওয়ানজীর সম্মুখে রাখিল। এবং চুপি চুপি বলিল—"অদ্য আপনার দর্শনি আপাততঃ হাজার টাকা দিলাম। মোকদ্দমা প্রতুল হইলে ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার করিব। এখন জমিদার যুগলকিশোরের জামিনতের হুকুম হউক।"

দেওয়ানজী মহাশয় তাচ্ছল্যের সহিত, অথচ শিকার না ছুটে এরূপভাবে বলিলেন—"জা মি ন——অ স ম্ভ ব; অপরাধ বড় ভয়ানক ছাঙ্গন; উপর হইতে এ বিষয়ে বিশেষ তাম্বি আসিতেছে; তারপর কার্য্য হাসল পক্ষে এ মুদ্রাও অতি যৎসামান্য।"

আগন্তুক অধিকতর বিনীতভাবে বলিল—"আরও এক হাজার টাকা দিতেছি; জামিনের হুকুম করাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।"

দেওয়ানজী বলিলেন—"সে কাজ অতি কঠিন, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। তবে কি না অর্থ খরচ করিতে পারিলেই——"

দেওয়ানজী মহাশয়ের স্বর তাল-মান-লয় সহকারে ক্রমে নিম্নে যাইয়া একবারে নির্ব্বাণলাভ করিল। আগন্তুকের তাল-মান-জ্ঞানটুকু বোধ হয় বেশ বিলক্ষণ ছিল; তাই আগন্তুক অতি বিনীতভাবে দেওয়ানজী মহাশয়কে বলিল—"আশীর্ব্বাদ করুন; জমিদার রক্ষা পাইলে আপনাকে খুসী করিয়া দিব।"

দেওয়ানজী মহাশয় যেন বড় অনিচ্ছাস্বত্বে স্বীয় দেহ-গম্বুজটী অতি যত্নে উত্তোলন করিয়া আফিসের একমাত্র পেয়াদা-পাহাড়াওয়ালা-দপ্তরী অভিন্ন কলেবর গরিবুল্লা জমাদারকে ডাকিলেন। গরিবুল্লা হাজির হইলে দেওয়ানজী মহাশয় তাহার হাতে আফিস রক্ষার ভার প্রদান করিয়া সাহেবের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। যাইবার সময় পুনরায় আগন্তুকের উপর কটাক্ষপাত করিয়া

প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া মুখে বলিলেন—"আমিও দেখি, তবে বিষয় বড় সঙ্গিন। কি হয়—?"

দেওয়ানজী চলিয়া গেলে আগন্তুক, গরিবুল্যা জমাদারের হস্তে ১টী টাকা প্রদান করিয়া বলিলেন—"জমাদারজী অনেকক্ষণ ঘুড়িতেছি, মুখটা শুকাইয়া গিয়াছে। হুকা কলিকাটার একটু ব্যবহার হয় না কি? গরিবুল্যা অপরিজ্ঞাত কারণে মুদ্রাটী পাইয়া দীর্ঘ সেলামের পর সেলাম করিয়া কলিকাটী গ্রহণ করিল ও সহর্ষে অগ্নি অন্বেষণে ছুটিল।

সময় বুঝিয়া আগন্তুক পার্শ্বের গৃহেরদিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন—"যুগলকিশোর!"

ডাক যুগলকিশোরের কর্ণে প্রবেশ করিল না।

আগন্তুক পুনরায় ডাকিল—'যুগল'! যুগল রায় উঠিয়া অনেকটা নিকটে আসিলেন। আগন্তুককে চিনিতে না পারিয়া বলিলেন—"আমাকে ডাকিতেছ কি?

আগন্তুক—"হা ভাই, চিনিতে পারিতেছ না কি?"

যুগল রায় ফেল্ ফেল্ করিয়া আগন্তুকের মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মুখ হইতে একটী কথাও সরিল না। আগন্তুককে পূর্ব্বে তিনি কখনও দেখিয়াছেন এরূপ তাঁহার মনে হইল না। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"মনে হইতেছে না—আমি বড় বিপদে—আমার বুদ্ধি সুদ্ধি——।"

আগন্তুক বাধা দিয়া বলিলেন—"কোন ভয় নাই যুগল-দাদা! তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি আসিয়াছি। আজ রাত্রিতেই তোমাকে লইয়া গৃহে যাইব। আমি তোমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি—আজ জীবন দিয়া তোমাকে রক্ষা করিব; সেবক গোলকনাথের জীবন তোমার রক্ষার জন্য রহিয়াছে—ভয় কি ভাই!

যুগল রায় আবেগভরে চীৎকার করিয়া গোলকনাথকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। ক্রমশঃ।



আশার গান।

শুনিব না আর নৈরাশ্যের গান
গেয়ো না বিষাদ-গীতি ;
আজ, নবীন উৎসাহে নবীন আশায়
হৃদয় উঠেছে মাতি।

ভেঙ্গে ফেলে দাও ভীতির বন্ধন
কর চির মুক্তপ্রাণ ;
সংশয়-সন্দেহ তিলেকের তরে
হৃদয়ে দিও না স্থান।

এবার দেবতা হয়েছে প্রসন্ন
চেয়েছে মোদের প্রতি ;
তাঁহারি ইঙ্গিতে জাগিয়াছে দেশ
কে আর রোধিবে গতি !

দেব আশীর্ব্বাদ হয় না নিষ্ফল
ফিরিবে মোদের দিন ;
দেব অনুগ্রহে পূরিবে বাসনা
হয়ো না বিশ্বাস হীন।

দেখ ইতিহাস, থাকে না পতিত
চিরদিন কোন জাতি ;
পড়িয়াছে যারা উঠিবে নিশ্চয়
বিধাতার এই নীতি।

ফিরিয়াছে স্রোত এস ছুটে ভাই
যেখানে যে আছ আজ ;
প্রাণপণে হ'বে করিতে সাধন
প্রিয় জননীর কাজ।

এস করি মিলে   কঠোর সাধনা,
পোহাইবে দুখনিশি ;
আবার পূরবে   উঠিবে তপন
গভীর আঁধার নাশি ।

এবার দেবতা   হয়েছে প্রসন্ন
চেয়েছে মোদের প্রতি ;
তাঁহারি ইঙ্গিতে   জাগিয়াছে দেশ
কে আর রোধিবে গতি ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার ।

আহ্বান ।

উঠ হিন্দু ! উঠ মুসলমান !
হের জননীর কিবা মলিন বয়ান !
এ ঘোর দুর্দ্দিনে ভাই !
রহিও না ঠাঁই ঠাঁই ;
সবে মিলে হও আজি এক-মন-প্রাণ ।
উঠ হিন্দু ! উঠ মুসলমান !

জলদ-গম্ভীর স্বরে
গাও আজি প্রাণভরে
'জয় বঙ্গমাতা জয়'
'জয় বাঙ্গালীর জয়'
গভীর গর্জ্জনে আজি কাঁপাও বিমান ।
জাগ হিন্দু ! জাগ মুসলমান !

হৃদয়ের মাতৃভক্তি,
পরাণে ঢালিবে শক্তি

হইব জীবন্তজাতি লভি নবপ্রাণ।
জাগ হিন্দু! জাগ মুসলমান!

আজি আট কোটি প্রাণে,
বাজিছে গভীর তানে
সে দারুণ মর্ম্মদাহ ঘোর অপমান,
ভুলিও না এই ব্যথা,
হৃদয়ে রাখিও গাথা,
অদূরে নিশ্চয় হবে জাতীয় কল্যাণ।
জাগ হিন্দু! জাগ মুসলমান!

হিংসা-দ্বেষ দূরে ফেলি,
কর সবে কোলাকুলি,
একই বঙ্গের মোরা যুগল-সন্তান!
উভয়ে বাঙ্গালী মোরা
উভয়েই আজি মরা
অত্যাচার অবিচারে আজি জীর্ণপ্রাণ!
জাগ হিন্দু! জাগ মুসলমান!

আমরা দুইটী ভাই!
হই যদি এক ঠাঁই।
অচিরে নিশ্চয় হবে জাতীয় উত্থান।
পাপ তাপ ভস্ম করি
ঐক্যের কৃপাণ ধরি
হইব নূতন জাতি মহা-তেজীয়ান।
জাগ হিন্দু! জাগ মুসলমান!

সৈয়দ সিরাজী।

মরণ।

তপোক্লিষ্ট তনু যবে নিরাশার তাম্র ছবে,
দুঃখ শোক হোমাগ্নিতে শুকাইবে লাবণ্য আমার,
আত্ম বন্ধু সখীদল ভগ্ন-আশা অবিরল
সম দুখী মোর দুখে ফেলিবেক নয়ন আসার,
তুমি কি বর্ণীর বেশে তখন দাঁড়াবে এসে
করে পলাশের দণ্ড শিরে জটা পিঙ্গল বরণ,
আপনার বর বেশ লুকাইয়া হে মহেশ
শেষে কি কম্পিত কর হাস্যমুখে করিয়া ধারণ
দাঁড়াইবে, আসিয়া মরণ?

চেয়ে তব আশা পথ যবে ভগ্ন মনোরথ
বৃন্ত ভাঙা দেহখানি লুটাইবে ধরণীর গায়,
শোভন মালঞ্চ থেকে ঝরে যাবে একে একে
বিমল কুসুম অর্ঘ্য নিরাশার তাপতপ্ত বায়,
এ বন তুলসী নিতে আসিবে কি ব্রজ হতে
মনে কি পড়িবে শ্যাম কুবুজার কুরূপ বদন,
লভি যবে পদধূলি নয়ন আসিবে ঢুলি
এ পাণ্ডু কপোলে দিয়া প্রণয়ের প্রথম চুম্বন
দাঁড়াবে কি আসিয়া মরণ?

কিম্বা মধু পূর্ণিমায় উছলি পড়িবে হায়
বসন্ত লহরী যবে জীবনের বিশুভ্র বেলায়,
রূপ বৃন্তে ঢল ঢল যবে আশা শতদল
আলোকিবে হৃদি সরঃ প্রণয়ের বিচিত্র বিভায়,
স্বপনে লভিয়া বঁধু ত্রিদিব চুম্বন মধু
পুলকে আসিবে মুদি যবে মোর এ দু'টী নয়ন,
সত্য করি স্বপ্ন মম তুমি অনিরুদ্ধ সম
করিয়া পবিত্র কিহে মম ফুল কুসুম শয়ন
বক্ষে মোর রাজিবে মরণ?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গ-স্বাধীনতা কাব্য, শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু প্রণীত; কলিকাতা অন্তঃপুর প্রেসে মুদ্রিত; মূল্য এক টাকা।

বাঙ্গালীর এই জাতীয়জীবন প্রতিষ্ঠার দিনে বাঙ্গালীবীরের পুণ্যকাহিনী আলোচনার বিষয়। গ্রন্থকার অতি উপযুক্ত সময়ে এই গ্রন্থ জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। বীরেন্দ্র প্রতাপাদিত্যের বীরচরিত্র অঙ্কিত করিতে গ্রন্থকার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত এবং ভাবও স্থানে স্থানে উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে।

"প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা আক্রমি সম্মুখে,
নির্ব্বাপিতে পিপীলিকা পারে কি কখন?
কিন্তু যদি তারা সবে অদম্য উৎসাহে,
একতা বন্ধনে মিলি, দীপাধার হতে,
লয় তুলি তৈলরাশি অতি সন্তর্পণে,
অচিরে হইবে ভাণ্ড শুষ্ক-তৈলহীন,
তা'হ'লে দীপের দশা নির্ব্বাণ নিশ্চয়।"

গ্রন্থকার সময়ের অগ্রদূত হইয়া বঙ্গ-স্বাধীনতা রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের অনেক স্থানেই এইরূপ উচ্চ ও সাময়িকভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গভীর ভাবের ভিতর দিয়াও গ্রন্থকারের ভাষা এবং ভাব বাঁধ ভাঙ্গিয়া

"তুঙ্গ-তরঙ্গিত-তরল-তয়োধি তীরে"

পর্য্যন্ত গিয়াছে। এইরূপ গ্রন্থে এতটা অনুপ্রাস মিলাইবার প্রয়াস না করিলেই গ্রন্থকারের পক্ষে ভাল ছিল। যাই হউক আপাততঃ বঙ্গীয় গ্রন্থকার যে কাব্য লিখিতে বসিয়া—যমুনার তীরে উঠিয়াও মাধবীরজনীর বংশীধ্বনি স্মরণ করিয়া মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য—বঙ্গভাষার পক্ষেও কল্যাণের বিষয়। বাঙ্গালীর কল্পনার স্রোত ফিরিয়াছে। মাতৃভূমির পুণ্যনামের সঙ্গে বঙ্গভাষা সঞ্জীবীত হউক—করুণ মর্ম্মস্পর্শী গীতি-কবিতার পরিবর্ত্তে বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র, প্রতাপ চরিতের ন্যায় রাশি রাশি বীরগাথা প্রসব করুন। আমরা সর্ব্বদাই এইরূপ গ্রন্থের অভিনন্দন করিব। গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা ভাল।

২

৪র্থ বর্ষ। ১২শ সংখ্যা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীরমণীমোহন গুহ এম. এ বি এল, শ্রীব্রহ্মানন্দ মহাভারতী,
শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ., শ্রীকেদারনাথ মজুমদার,
শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী
সম্পাদক প্রভৃতি।

ময়মনসিংহ সুহৃদ্ যন্ত্রালয় হইতে
শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত কর্তৃক
প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দেড় টাকা, এই সংখ্যার মূল্য চারি আনা।

সূচী।

—— •:(*):• ——

ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (সারস্বত সংখ্যা) 'আরতি'তে

নিম্নলিখিত সারস্বত প্রবন্ধ সমূহ

প্রকাশিত হইবে—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম্-এ, লিখিত—

রামায়নের সভ্যতা,

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম্-এ, বি-এল, লিখিত—

ভারতে কার্পাস,

শ্রীমন্মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি-এ, লিখিত—

কার্পাস ও প্রদর্শনী সম্বন্ধীয় মন্তব্য,

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ, লিখিত—

(সারস্বতের পুরস্কৃত প্রবন্ধ)

কৃষি,

ও

সম্পাদক লিখিত—

সারস্বত কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী,

এবং

অন্যান্য কবিতা

ও

প্রবন্ধ।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, পৌষ ১৩১২। } দ্বাদশ সংখ্যা।

দ্বাদশ শিব-মন্দির।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কয়েকটী প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতার ৩৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্॥ ১৭
উজ্জয়িন্যাং মহাকাল মোঙ্কার পরমেশ্বরম্।
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্॥ ১৮
বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে।
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাবনে॥ ১৯
সেতুবন্ধেচ রামেশং ঘুশ্মেশঞ্চ শিবালয়ে।
দ্বাদশৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ॥ ২০ ইত্যাদি।

সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন, উজ্জয়িনীতে মহাকাল এবং ওঙ্কার, হিমালয়ে কেদার, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর, গৌতমীতটে ত্র্যম্বক, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ, দারুকাবনে নাগেশ, সেতুবন্ধে রামেশ, এবং শিবালয়ে ঘুশ্মেশ এই দ্বাদশটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ।

এতদ্ব্যতীত ভারতের পূর্ব্ব দিকে চন্দ্রনাথ এবং ভুবনেশ্বরের শিবলিঙ্গদ্বয়ও প্রসিদ্ধ। চন্দ্রনাথের শিবলিঙ্গের কথা লিঙ্গপুরাণেও উল্লেখ আছে।

বর্ত্তমান গুজরাট একসময়ে সৌরাষ্ট্রপ্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। সৌরগণ এই প্রদেশে আবাস স্থাপন করার পরে এই প্রদেশ সৌররাষ্ট্র বা সৌরাষ্ট্র নামপ্রাপ্ত হয়। কালে এই প্রদেশ গুর্জ্জরদেশ বলিয়া কথিত হইত। গুর্জ্জর হইতে গুজরাট নাম হইয়াছে।

সৌরগণ প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সৌরগণ আরবসাগরে এবং পারস্য-উপসাগরে অর্ণবযান প্রেরণ করিতেন। আরবদেশীয় পর্য্যটক আল ইদ্রিসি বলেন—সৌরগণ চীনদেশে অর্ণবতরী প্রেরণ করিতেন। সৌরগণ বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করেন। কোন্ সময়ে সৌরগণ সোমনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন! এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা পারসিক সম্রাট নর্শিবানের রাজত্বের অবসানে এই প্রদেশে আবাস স্থাপন করেন। নর্শিবানের রাজত্বসময়ে আরবদেশে মহাত্মা মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। নর্শিবানকে ইতিবৃত্ত-লেখকগণ 'ন্যায়পরায়ণ' নার্শবান আখ্যা দিয়াছেন।

কালক্রমে জনৈক চালুক্যবংশোৎভব রাজপুত সৌরাষ্ট্রের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে শ্রীপত্তন নগর সৌরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল; শ্রীপত্তন নগর কখন কখন আনহলবারপত্তন নামে কথিত হয়। জনৈক চালুক্য নরপতির রাজত্ব সময়ে গজনীর অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ সুলতান মামুদ সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করেন এবং তত্রত্য ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকগণ মধ্যে কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভীমরায় শ্রীপত্তনের অধিপতি ছিলেন; বাস্তবিক এই সময়ে চামুণ্ড রায় নরপতি ছিলেন, ভীমরায় চামুণ্ড রায়ের পরবর্ত্তী।

প্রাচীন সাময়িক দেবমন্দির মধ্যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করা কঠিন। এই সমস্ত মন্দির ভারতবর্ষীয় স্থপতিগণ নির্ম্মাণ করেন। ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী অন্যান্য দেশীয় হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র।

মুসলমানগণ সোমনাথের মন্দিরের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাঁহারা এই মন্দিরের যে বর্ণনা করিয়াছেন আমরা তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি।

সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে সাগরতটে সোমনাথের মন্দির অবস্থিত ছিল। মন্দিরের স্থান এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপের ন্যায় ছিল। ইহার পূর্ব্ব পশ্চিম এবং দক্ষিণ তিনদিগ সাগর-বেষ্টিত ছিল, উত্তরদিগে এই ক্ষুদ্র উপদ্বীপ সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের সহিত সংলগ্ন ছিল। মন্দিরের চারিদিক প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল। সিংহদ্বারের নিকট এক সঙ্কীর্ণপথের পূর্ব্ব পশ্চিমদিগে প্রাচীর ছিল, এই সঙ্কীর্ণপথের মধ্যদিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যাইত। মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার অন্য কোন পথ ছিল না।

মন্দিরের মধ্যপ্রকোষ্ঠের চারিদিকে বারাণ্ডা ছিল। এই বারাণ্ডার চারিপার্শ্বে

৫৬টী প্রস্তরময় স্তম্ভ বিরাজিত ছিল। এই স্তম্ভগুলিতে তদানীন্তন ভাস্করগণ নানাপ্রকার কারুকার্য্য করেন এবং তাহাতে অসংখ্য মণি সন্নিবেশিত ছিল। মন্দিরের মধ্যপ্রকোষ্ঠে বাহিরের আলোর প্রয়োজন ছিল না। মন্দিরের ভিতরে ছাদ হইতে স্বর্ণময় রজ্জুদ্বারা অসংখ্য হীরক এবং নানাপ্রকার মণি লম্বিত ছিল; এই সমস্ত হীরক এবং মণি হইতে যে জ্যোতি নির্গত হইত তাহাতে মন্দিরের মধ্যভাগ আলোকিত হইত। মন্দিরের মধ্যে দশহস্ত দীর্ঘ শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল; তন্মধ্যে চারিহস্ত মৃত্তিকা-প্রোথিত। মন্দিরের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় স্বর্ণময় শৃঙ্খলদ্বারা স্বর্ণময় ঘণ্টা লম্বিত ছিল। এই শৃঙ্খল এবং ঘণ্টার ওজন ৪০ মণ। মন্দিরের সম্মুখে নাট্যশালা ছিল।

মন্দিরস্থ বিগ্রহের সেবার জন্য দশসহস্র গ্রামের আয় নিয়োজিত ছিল। পাঁচশত নর্ত্তকী এবং সার্দ্ধ তিন শত গায়ক প্রতিদিন নাট্যশালায় নৃত্য এবং গান করিত। প্রতিদিন ভাগীরথীর জল আনয়ন করিয়া বিগ্রহের অভিষেক করা হইত। পর্ব্বোপলক্ষে বহুসংখ্যক যাত্রীগণ উপস্থিত হইত; তদ্দ্বারা বিগ্রহের আয় হইত। গ্রহণ উপলক্ষে কখন কখন তিন চারি লক্ষ লোক উপস্থিত হইত।

শিবলিঙ্গের অভ্যন্তরে নানাপ্রকার হীরক ও মণি ছিল।

পাঠকগণ সোমনাথের মন্দিরের এরূপ আশ্চর্য্য বর্ণনা কি বিশ্বাস করিবেন? ইহা আমাদের কপোল কল্পিত নহে। মুসলমান ইতিবৃত্ত লেখকগণ এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। তৎকালে ভারতবর্ষে সোমনাথের মন্দিরে প্রচুর ধনরত্ন ছিল। এই ধনরত্নের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুলতান মামুদ এই মন্দির লুণ্ঠন করার অভিপ্রায়ে গজনী হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনীদেশ বলিয়া সকলেই বিবেচনা করিত। ভারতের প্রচুর ধনগৌরব ভারতের প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। ইহার প্রচুর ধনের লোভে প্রাচীনকালে মধ্য-এসিয়া হইতে শক, পারদ এবং তুর্কীগণ সময় সময় পঙ্গপালের ন্যায় ভারতে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার উপদ্রব করিয়াছেন। পরিশেষে ইউরোপীয়গণ এ ক্ষেত্রে আগমন করেন। এ দেশের ধন-রত্নের লোভে কলম্বস আমেরিকায় উপনীত হন। এই আশায় ব্রিটেনীয় বণিকগণ ভারতে আগমন করেন; পরে তাঁহাদের বংশধরগণ ভারতের অধিপতি হন।

ইংরেজ-নরপতির সময়ে ভারত দুর্ভিক্ষের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতের ধনরত্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতবাসিগণ এখন অন্নের জন্য হাহাকার

করিতেছে; অন্নাভাবে অসংখ্য ব্যক্তিগণ যমালয়ে গমন করিতেছে। ইংরেজ-রাজত্বের আরম্ভ সময়ে বঙ্গদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহাতে বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইদানীং ভীষণ দুর্ভিক্ষ প্রায় সর্ব্বদাই তাহার করালবদন বিস্তার করিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষে যে পরিমাণ লোকের মৃত্যু হয় তাহার সহিত তুলনা করিলে প্লেগের মৃত্যুসংখ্যা অতি অকিঞ্চিৎকর। রাজপুরুষগণ প্লেগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করেন না। প্লেগ কালে রাজপুরুষগণের দ্বারে উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু দুর্ভিক্ষ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে অক্ষম, এজন্য দুর্ভিক্ষ নিবারণের উচিত বিধান করেন না। যাঁহারা দুর্ভিক্ষের উপদ্রব বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সহৃদয় মহাত্মা ডিগবির গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

৯৪৭ শকাব্দে সুলতান মামুদ সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করিতে উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য আসিয়াছিল। ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করার লোভে তুর্কস্থান হইতে অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। মন্দির রক্ষার্থ অল্প কতিপয় সৈন্য নিযুক্ত ছিল। এই সৈন্যদ্বারা মন্দির রক্ষা করা অসম্ভব। চামুণ্ড রায় এখানে উপস্থিত হইবার পুর্ব্বেই সুলতান মন্দির ভগ্ন করেন।

মুসলমানগণ মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে পাণ্ডাগণ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ নানাপ্রকার দৈব-বিভীষিকা প্রদর্শন আরম্ভ করেন। মুসলমানগণ স্থির-প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের এরূপ বিভীষিকার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ সোমনাথের স্মরণাপন্ন হইলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ সোমনাথও তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মুসলমানগণ মন্দিরেরদিগে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মণগণ মন্দির রক্ষার্থ নিযুক্ত অল্প কতিপয় সৈন্যসহ মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে মন্দির রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। মুসলমানগণ অসংখ্য; হিন্দুসৈন্য অতি অল্প; কিন্তু তাঁহারা মন্দির রক্ষার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ। হিন্দুগণ মন্দিরের সম্মুখস্থ সঙ্কীর্ণপথে সজ্জিত হইলেন; অসংখ্য মুসলমানগণ "আল্লাহু আকবর" রবে মেদিনী কম্পিত করিলেন। কিন্তু সে সঙ্কীর্ণ পথ ব্যতীত অন্য কোন দ্বার দ্বারা মন্দিরে প্রবেশ করার উপায় নাই। হিন্দুসেনার দুই পার্শ্বে উন্নত প্রাচীর, অসংখ্য সেনাদ্বারা মুসলমানগণ কোন

ফললাভ করিতে পারিলেন না। উভয়পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম হইল ; হিন্দুগণ বহু মুসলমান সৈন্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ; মুসলমানগণ কতিপয় হিন্দু সেনাকে নিহত করিলেন। পশ্চাৎকালে হল্‌দিঘাটে যে অভিনয় হইয়াছিল, এখানেও সেরূপ অভিনয় আরম্ভ হইল। সে দিন সুলতান জয় আশা পরিত্যাগ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে পুনঃ মুসলমানগণ "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি করিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন ; হিন্দুসেনা মন্দির রক্ষার্থ সংকীর্ণপথে দণ্ডায়মান হইলেন ; উভয়পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মুসলমানগণ দেখিলেন দুই পার্শ্ব হইতে হিন্দুসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে না পারিলে মন্দিরে প্রবেশ করা অসম্ভব। দলে দলে মুসলমানগণ দুই পার্শ্বস্থ উন্নত প্রাচীরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন ; হিন্দুগণও তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। সে দিনও মুসলমানসেনা জয় আশা পরিত্যাগ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় দিবসে সোমনাথের নিকটবর্ত্তী শ্রীপত্তনেশ্বরের কতিপয় সামন্ত স্ব স্ব সৈন্যসহ মন্দির রক্ষার জন্য উপস্থিত হন। তাঁহারা সুলতানের সহিত সম্মুখসমরে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে চামুণ্ড রায় সৈন্যসহ তথায় উপনীত হন। হিন্দুদিগের পক্ষে মোট দশসহস্র সৈন্য উপস্থিত হইল। এই দশসহস্র সৈন্য লক্ষাধিক মুসলমানসৈন্যসহ সম্মুখসমর আরম্ভ করেন। হিন্দুগণ অসংখ্য মুসলমান নিহত করিলেন কিন্তু সে সৈন্যসাগর অতিক্রম করা অসম্ভব। সুলতান পবিত্র কোরাণের ধর্ম্মনীতি উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিলেন। উভয়পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম হইল। দশসহস্র সৈন্যমধ্যে ছয় সহস্র নিহত হইল। জয়শ্রী মুসলমানগণের পক্ষাবলম্বন করিল। চামুণ্ড রায় অবশিষ্ট চারি সহস্র সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সমুদ্রপথে অর্ণবতরী আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন।

চামুণ্ড রায়ের পক্ষে মাত্র দশসহস্র সৈন্য লইয়া লক্ষাধিক মুসলমান সৈন্য সহ সম্মুখসমরে অগ্রসর হওয়া ভ্রম হইয়াছিল ; তাঁহারা যদি গোপনে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্দির রক্ষার উদ্যোগ করিতেন তবে সে যুদ্ধে সুলতানের মনোরথ সিদ্ধ হওয়া কঠিন হইত।

মন্দির রক্ষক সৈন্যগণ চামুণ্ডরায়ের পরাভববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হতোৎসাহ হইল। তাঁহারা চামুণ্ড রায়ের আগমন আশায় দুই দিবস পর্য্যন্ত মন্দির রক্ষা

করিয়াছিল। বিজয়ী মুসলমান সেনা উল্লাসের সহিত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকগণ বলিয়াছেন যে সুলতান সোমনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার জীবনে ইতঃপূর্ব্বে আর কোনস্থানে এতাদৃশ বহুমূল্য দ্রব্য একত্র সন্নিবেশিত থাকা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি প্রথমেই সোমনাথের শিবলিঙ্গ ভগ্ন করিতে আদেশ করেন। পাণ্ডাগণ তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া শিবলিঙ্গ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সুলতান তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি স্বয়ং প্রথম শিবলিঙ্গের উপরে আঘাত করিলেন; পরে অন্যান্য মুসলমানগণ আঘাত করিলেন। শিবলিঙ্গ ভগ্ন হইবামাত্র তাহা হইতে প্রচুর হীরক, পদ্মরাগ প্রভৃতি নানাপ্রকার মণিমুক্তা বাহির হইল; মুসলমানগণ চমৎকৃত হইলেন। মুসলমানগণ মন্দিরমধ্যস্থ সমস্ত ধনরত্ন অপহরণ করিলেন। তাহা গজনীতে প্রেরিত হইল। শিবলিঙ্গেরও একখণ্ড মক্কায় ও একখণ্ড মদিনায় প্রেরিত হইল এবং দুইখণ্ড গজনীর রাজপথে স্থাপন করা হইল। মন্দিরের দ্বারের শ্বেত-চন্দন-কাষ্ঠ নির্ম্মিত কবাটদ্বয় গজনীতে প্রেরিত হইল। এইরূপে সোমনাথের মন্দির ধ্বংস হইয়া গেল।

সুবিখ্যাত পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ সোমনাথের কবাটদ্বয় লাহোরে আনিয়াছিলেন।

শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন নামক শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। স্রোতস্বতী কৃষ্ণার দক্ষিণে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত শ্রীশৈল নামে খ্যাত।

উজ্জয়িনীতে মহাকাল এবং ওঙ্কারেশ্বর শিবলিঙ্গদ্বয় ছিলেন। উজ্জয়িনী অতি প্রসিদ্ধ স্থান। মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনী-অধিপতি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের প্রধান রত্ন। উজ্জয়িনী হইতে আর্য্য-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দ্রাঘিমা গণনা করিতেন। উজ্জয়িনীর অন্যনাম অবন্তি।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষ দায়িকাঃ॥

মহাকালের অন্য নাম কাল-প্রিয়নাথ।

মহাকবি ভবভূতি কাল-প্রিয়নাথের নাট্যশালাতে অভিনয় হওয়ার জন্য উত্তরচরিত রচনা করেন।

"অদ্য খলু ভগবতঃ কাল-প্রিয়নাথস্য যাত্রায়াম্ আর্য্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি" উত্তরচরিত।

"কাল-প্রিয়নাথস্য উজ্জয়িনীস্থ মহাকালাভিধানস্য শিবলিঙ্গস্য" ইতি প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ।

উত্তরচরিত সংস্কৃতভাষায় একখানা উৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্য।

মহাকালের মন্দিরে প্রচুর ধনরত্ন ছিল। ৮৫২ শকাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। দিল্লীশ্বর আলতামস ১১৫২ শকাব্দে উজ্জয়িনী অধিকার করেন এবং কাল-প্রিয়নাথের মন্দির ধ্বংস করেন।

নর্ম্মদার পূর্ব্বদিকে বিন্ধ্যাচলের উপরে অদ্যাপি ওঙ্কারেশ্বর শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন।

হিমালয় প্রদেশে অদ্যাপি কেদারনাম শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন।

ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত রাজ-মহেন্দ্রীনগরের নিকট দ্রচরম নামক স্থানে এক শিবলিঙ্গ আছেন। এক্ষণ তিনি ভীমেশ্বর শিব বলিয়া কথিত হন। বোধ হয়, এই শিবলিঙ্গ শিবপুরাণোক্ত ভীমশঙ্কর।

বারাণসীর বিশ্বেশ্বর স্বনামপ্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ। কিন্তু শিবপুরাণোক্ত শিবলিঙ্গ বা সেই মন্দির এক্ষণ বর্ত্তমান নাই। সম্রাট আলমগীরের আদেশ অনুসারে সেই শিবমন্দির ধ্বংস হইয়াছে। প্রবাদ প্রচলিত আছে যে সম্রাটের আদেশমতে জ্ঞানবাপি নামক কূপে শিবলিঙ্গ নিক্ষেপ করা হইয়াছে কিন্তু তথা হইতে কেহ তাহা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করেন নাই। মহারাজা রণজিৎ সিংহ বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দির স্বর্ণপাতদ্বারা আবৃত করিয়াছেন।

গৌতমীতীরে ত্র্যম্বক। নাসিকতীর্থ (পঞ্চবটী) হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে ত্রীম্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ পুরাণোক্ত ত্র্যম্বক শিবলিঙ্গ বলিয়া অনুমান হয়।

চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ। কথিত আছে লঙ্কেশ্বর রাবণ এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। বৈদ্যনাথের শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। বৈদ্যনাথের মন্দির আর্য্যস্থাপত্য প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত।

নাগেশ দারুকাবনে। শিবপুরাণে লিখিত আছে যে, দারুক নামে এক রাক্ষস ছিল। দারুকা তাঁহার পত্নী। এই দারুক অধিকৃত বনে নাগেশ শিবলিঙ্গ। দারুকাবনের সম্বন্ধে লিখিত আছে ঃ—

পশ্চিমে সাগরে তস্য বনং সর্ব্ব সমৃদ্ধিমৎ।

৫৬ অধ্যায় ১৭ শিবপুরাণ।

ইহাদ্বারা স্থান নির্ণয় করা যায় না।

সেতুবন্ধে রামেশ্বর শিবলিঙ্গ অতি প্রসিদ্ধ।

শিবালয়ে ঘুশ্মেশ। ইহার স্থান নির্ণয় করা কঠিন। মুহূর্ত্ত-মার্ত্তণ্ড গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে :—

"শ্রীমৎ কৌশিক পাবনো হরিপদ দ্বন্দ্বার্পিতাত্মা
হরিস্তজ্জোঽনন্ত ইলাসুরোচিতগুণো নারায়ণস্তৎসুতঃ।
খ্যাতং দেবগিরেঃ শিবালয় মুদক তস্মাদুদক্
টাপর গ্রামস্তদ্বসতির্মুহূর্ত্ত ভুবনোস্মার্ত্তণ্ড মত্রাকরোৎ॥"

হরিপদদ্বয়ে অর্পিতাত্মা কৌশিক পাবন শ্রীমান্ হরি, তাঁহার পুত্র অনন্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত, তাঁহার পুত্র নারায়ণ; দেবগিরির উত্তরে বিখ্যাত শিবালয়, তাহার উত্তরে টাপর গ্রাম। নারায়ণ টাপরে বাস করিয়া মুহূর্ত্ত-ভুবনোস্মার্ত্তণ্ড রচনা করেন।

টীকাকার বলিয়াছেন :—

"পুরাণ প্রসিদ্ধম্ শিবালয়ম্ ধুশৃণেশ শিবালয়ম্ ইতি
প্রসিদ্ধম্ জ্যোতির্লিঙ্গ স্থানম্ অস্তি।"

ধুশৃণেশ শিবালয় নামক পুরাণ প্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিঙ্গ স্থান ধুশৃণেশ বোধ হয় ঘুশ্মেশ। ঘুশ্মেশস্থলে ধুশ্মেশ পাঠ ধরিলে ধুশৃণেশ এবং ধুশ্মেশ একলিঙ্গ বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহা দেবগিরির উত্তরে অবস্থিত। দেবগিরি মহারাষ্ট্রের প্রাচীন রাজধানী। বর্ত্তমান নাম দৌলতাবাদ।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

ভারতে দুর্ভিক্ষ।

অতি প্রাচীনকালে ভারতের অধিবাসী দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে জানিত না। যে ভারতভূমি মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার ন্যায় আপন অক্ষয়-ভাণ্ডার হইতে প্রায় অর্দ্ধ বসুন্ধরার লোকের আহারের সংস্থান করিতেন তাঁহার সন্তানকে কখনই অনাহারে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে হইত না। দুর্ভিক্ষ কথাটা তখন কেবল অভিধানেই পাওয়া যাইত, কিন্তু বাস্তব জগতে তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ অত্যাচারী অসভ্য এবং অনুদার বলিয়া অজস্র গালি বর্ষণ করিয়াছেন তাঁহাদের রাজত্বকালেও ভারতবর্ষ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদিগের লিখিত

বিবরণ হইতে জানা যায় তখন এদেশবাসী জনসাধারণ অতিশয় সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিত; ধন ধান্যে দেশ ঐশ্বর্য্যশালী ছিল; অনাহারে কাহাকেও প্রাণত্যাগ করিতে হইত না; দু'পয়সা সকলের ঘরেই সঞ্চিত থাকিত। একশত বৎসরের মধ্যে দুই একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কিন্তু তখন দুর্ভিক্ষ এমন সর্ব্বদেশ ব্যাপী হইত না; অল্প কালের জন্য কোন প্রদেশে সীমাবদ্ধ থাকিত। বর্ত্তমানে সভ্যতাভিমানী ইংরেজ রাজপুরুষদের শাসনকালে আমরা একবারে ধ্বংস হইবার পথে আসিয়াছি। এখন দুর্ভিক্ষ আমাদের নিত্য সহচর! এমন বৎসর যায় না যে বৎসর কেবল দুর্ভিক্ষে ভারতবর্ষের লক্ষাধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। ইংরেজ আমলে দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তির তালিকা দেখিলেই আমাদের অবস্থার ভীষণতা সম্যক উপলব্ধি হইবে। কয়েক দিন হইল লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ 'মেডিকেল জার্নেল' Lancet বলিয়াছেন গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষে কেবল দুর্ভিক্ষে ১৯০০০০০০ লোক কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে! তারপর প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি ত আছেই! এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখুন এরূপ ভাবে যদি ভারতের অধিবাসী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা হইলে এ সোণার ভারত শ্মশানে পরিণত হইতে কতদিন লাগিবে। মধ্যপ্রদেশ, বম্বে, মান্দ্রাজ, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে ত দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই রহিয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৃপায় এখনও বঙ্গ অপেক্ষাকৃত নিরাপদে আছে। কিন্তু যে বঙ্গে সায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত সেই বঙ্গে এখন বর্ত্তমান "সায়েস্তা খাঁর" শাসন কালে কেবল আদর্শোপযোগী অত্যাচারই সুলভ হইয়াছে এবং আমরা তাহা নীরবে জীর্ণ করিতেছি; চা'ল যে মণ পাঁচ টাকার কমে পাওয়া যাইতেছে না।

ভারতহিতৈষী চিন্তাশীল মনিষিগণ এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। পাঠক দেখিতে পাইবেন হিন্দু এবং মুসলমান রাজাদিগের শাসনকালে কেন ভারতে দুর্ভিক্ষ হইত না, দেশ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল আর ইংরেজ আমলে ভারত কেন এরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে; অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক বৎসর বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

ক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থার অভাব।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই জলের অভাব। নিদারুণ জলকষ্টে প্রকৃতিপুঞ্জ তৃষিত কণ্ঠে ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। কণ্ঠ শীতল করিবার জন্য অসহায় প্রজাদিগকে

আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিতে হয়। প্রকৃতি দয়া করিয়া বারি দান করিলে তাহাদের আর্ত্তনাদ দূর হয় নতুবা কর্দ্দম পূর্ণ বিষবৎ জল পান করিয়া তাহারা আশু তৃপ্তিলাভ করে বটে কিন্তু পরিণামে উদরাময় ওলাউঠা প্রভৃতি ভীষণ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। যে দেশে তৃষ্ণা নিবারণের ঈদৃশ সুব্যবস্থা সে দেশে কৃষিকার্য্য কিরূপ সুসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। ক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা না থাকিলে কৃষিকার্য্য হইতে পারে না। যে দেশে জলের অভাব সে দেশে শস্যও যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন হয় না।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই রত্ন-প্রসবিনী বলিয়া ভুবন প্রখ্যাত। পূর্ব্বে এ দেশে ক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা ছিল। হিন্দু রাজারা প্রজারঞ্জন করিয়াই আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন। রাজা প্রজার ক্লেশ নিবারণ করাই আপনার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতেন। প্রজাকে সুখী রাখিয়াই রাজা আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। রাজ দরবারে কোন আগন্তুক আসিয়া সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন "মহারাজ আপনার প্রজাকুল ত সুখে স্বচ্ছন্দে আছে?" যদি বৃষ্টির সময় কোন বৎসর বারিপাত না হইত তাহা হইলে রাজা ধর্ম্ম হানির ভয়ে উদ্বিগ্ন ও অধীর হইয়া পড়িতেন। তখন সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করা হইত। জলকষ্ট নিবারণের জন্য বৎসর বৎসর খাল ও তড়াগ খননের ব্যবস্থা ছিল। যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ত কথাই ছিল না! প্রজার জলকষ্ট নিবারণের জন্য রাজা কিরূপ যত্নবান ও আগ্রহান্বিত ছিলেন বহু প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে।

তারপর অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে যখন মুসলমান সম্রাটগণ এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহারাও প্রজাদিগের জলকষ্ট দূর করিবার জন্য দেশে দেশে বহু খাল দীঘী খনন করিয়াছিলেন। রাজ্যের ভিতর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে জলপথে যাতায়াতের জন্য, কৃষিকার্য্য এবং বাণিজ্যের সুবিধার জন্য মুসলমান সম্রাটগণ যে সকল খাল খনন করাইয়াছিলেন তাহার চিহ্ন এখনও কোন কোন স্থানে বিদ্যমান আছে। তখন প্রজাদিগকে আকাশের পানে তাকাইয়া তৃষিত চাতকের ন্যায় বারি যাচ্ঞা করিতে হইত না। রাজ্যের রাজাই জলকষ্ট নিবারণের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। আমাদের দেশের রাজা মহারাজগণ এখন গৌরাঙ্গ সেবায় প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করেন, দিল্লীর দরবারের তামাসায় লক্ষ টাকা চাঁদা দেন, মেমরিয়াল হলের জন্য কর্জ্জ করিয়া অজস্র ধন বর্ষণ করেন।

আজ যাহারা শ্বেতাঙ্গ পুরুষদিগের নিকট বাহবা লইবার জন্য অথবা উপাধি প্রাপ্তির আশায় দীনদুঃখী প্রজার শোণিত শোষণ করিতেছেন তাহাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষেরা গরীব প্রজাদিগের জলকষ্ট নিবারণের জন্য বিশাল দীর্ঘিকা এবং খাল খনন করিয়া অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হইতেন। হায়! সে দিন গিয়াছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিয়া ভারতবর্ষের প্রজাদিগের জলকষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকার বাহাদুর প্রজার জলকষ্ট নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু যে পরিমাণ যত্ন ও অর্থ ব্যয় এ ক্ষেত্রে আবশ্যক তাহার অর্দ্ধেকও হইতেছে না। প্রাচীন জলাশয় খাল বিল প্রভৃতি নূতন সংস্কারের অভাবে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। প্রজার মর্ম্ম বেদনায় যদি রাজপুরুষদিগের হৃদয় বিগলিত হইত তাহা হইলে অনাবশ্যকীয় অথবা অপেক্ষাকৃত স্বল্পাবশ্যকীয় কার্য্যে অজস্র অর্থ ব্যয় না করিয়া তাহারা প্রজার প্রাণ রক্ষার জন্য অধিক ব্যাকুল এবং সচেষ্ট হইতেন। কিন্তু এ ধর্ম্মের কাহিনী এখন আর কে শুনিবে?

যদিও অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে প্রতি বৎসরই ভারতবর্ষের শস্যের গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে তথাপি সমগ্র ভারতবর্ষের শস্য কোন বৎসরই উপর্য্যুক্ত কারণে বিনষ্ট হয় না। এক প্রদেশে নৈসর্গিক কারণে ফসল না জন্মিলেও অন্য প্রদেশে প্রচুর ফসল জন্মিয়া থাকে। প্রতি বৎসর যে ফসল ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় তাহাই ভারতবর্ষের লোকের অভাব মোচনের পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং যাহারা বলেন :—

ভারতবর্ষের অতিশয় লোক বৃদ্ধি (Over population)

দুর্ভিক্ষের কারণ তাহাদের কথাও যথার্থ নহে। দুর্ভিক্ষের কারণানুসন্ধিৎসুগণ বলিয়াছেন—দুর্ভিক্ষের বৎসরও ভারতে খাদ্যের অভাব হয় না এবং মূল্যও অতিশয় বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না। যাহাদের অর্থ আছে তাহারা অল্প মূল্যেই খাদ্য ক্রয় করিতে পারে। সুতরাং ভারতে Over population বা অতিরিক্ত লোক বৃদ্ধি হয় নাই।

তুলনায় দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইয়ুরোপের লোক সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইয়ুরোপের লোক সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, তথায় দুর্ভিক্ষ স্বপ্নের কথা। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ অপেক্ষা লোক সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, জার্ম্মেনীতে ততোধিক। সমগ্র ইয়ুরোপ খণ্ডের সঙ্গে তুলনা করিলে ভারতের জন্ম সংখ্যা গড়পরতা হাজারে পঁচাত্তর জন কম। অতএব অতিরিক্ত

লোক বৃদ্ধি ভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অর্ব্বাচীনের কার্য্য।

এখনও ভারতবর্ষের নানা দেশে বহু স্থান পতিত রহিয়াছে। সেই সকল অনাবাদী ভূমিকে চাষের উপযোগী করিলে এখন আরও বহু লোকের আহারের সংস্থান হইতে পারে। আবার ভারতবর্ষের কৃষকেরা নিতান্ত অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে প্রণালীতে চাষ করিত এখনও তদ্রূপেই করিতেছে। তাহারা কৃষিকার্য্যের কোন উন্নতি করিতে পারে নাই। ইয়ুরোপ এবং আমেরিকায় যেরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে নিত্য নূতন সার আবিষ্কৃত হইতেছে ভারতের কৃষকেরা তাহার কিছুই খবর রাখে না। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে শস্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং ভারতের কৃষিজাত সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় নাই। তবে ভারত-দুর্ভিক্ষের কারণ কি? ভারতবর্ষের প্রকৃতি পুঞ্জের অবস্থা একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা যাইবে। প্রতি বৎসরই ভারতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতেছে তবু দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। যে বৎসর দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে এবং বহু প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে সে বৎসরও এ দেশ হইতে বিদেশে আহার্য্য দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে এবং ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যও যে অত্যন্ত বাড়িয়া থাকে তাহাও নহে। ইহাদ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এ দেশের লোক অতিশয় দরিদ্র। অর্থের অভাবেই তাহারা বাজারে প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। অতএব ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে ভারতবাসীয় লোকের :—

ভীষণ দারিদ্র্যই দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ।

সুভিক্ষের বৎসরও ভারতের অধিবাসিগণ অতি কষ্টে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে মাত্র সমর্থ হয়। দু'পয়সা সঞ্চয় করিতে পারে না। সুতরাং যে বৎসর ফসল মারা যায় সেই বৎসরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র চিতা ভারতের বক্ষে প্রজ্জ্বলিত হয়—রত্ন-প্রসবিনী জননীর সন্তান শৃগাল কুকুরের ন্যায় পথে ঘাটে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। হায়! এরূপ ভীষণ দৃশ্য পৃথিবীতে আর কোথায় দৃষ্টিগোচর হয়? যে দেশে কেবল তামাসার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হয় লার্টদিগের স্মৃতি রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হয় সে দেশের লোক বৎসর বৎসর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে. তাহার কোন প্রতিকার হইতেছে না; ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় কি আছে!

দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সরকার বাহাদুর এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা করেন নাই। ভারতের রাজপুরুষেরা প্রকৃতিপুঞ্জের শোচনীয় দারিদ্র্যের কথা বিলাতের লোকের নিকট গোপন রাখিতেছেন। তাহারা কৌশলে বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া স্বদেশবাসিগণকে বুঝাইতেছেন দিন দিনই ভারতের সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু সেই রাজার যে রাজা সর্ব্বদর্শী ভগবান তাঁহার নিকট কিছুই গোপন করিবার উপায় নাই; তিনি সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দীন বুভুক্ষু প্রজার কাতর আর্ত্তনাদ তাঁহার সমীপে অবশ্যই পৌঁছতেছে। সরকার বাহাদুর দুর্ভিক্ষের বৎসর রিলিফ্ ফাণ্ড স্থাপন করেন; তাহার সাহায্যে বহু লোক কতকদিনের জন্য উদরের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পায় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে সেই উদরান্নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। স্বল্পাহারে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া অতি অল্প লোকই জীবিত থাকে। সুবৃষ্টি হইলে তাহাদিগকে আবার শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিতে হয়। রিক্ত-হস্তে ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহারা পুনরায় কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে আহার্য্য দ্রব্যের অভাব নয় অর্থের অভাবই দুর্ভিক্ষের মুখ্য কারণ। প্রজার দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন করিতে না পারিলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ অসম্ভব।

দারিদ্র্যের কারণ কি ?

এই প্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে অধিক শ্রম কিম্বা গবেষণার প্রয়োজন হইবে না। জন ব্রাইট (John Bright) বলিয়াছেন—"If a country be found possessing a most fertile soil and capable of bearing every variety of production and that not withstanding the people are in a state of extreme destitution and suffering the chances are there is some fundamental error in the government of that country." কোন দেশের ভূমি উর্ব্বর এবং সর্ব্ববিধ শস্যের উপযোগী থাকা সত্ত্বেও যদি সে দেশের অধিবাসী অতিশয় হীন এবং ক্লেশকর অবস্থায় পতিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে দেশের শাসন প্রণালীর মূলেই গুরুতর দোষ রহিয়াছে। বহুদর্শী ব্রাইটের উক্তিতে কঠোর সত্য নিহিত এবং তাহা ইংরেজ অবলম্বিত ভারত শাসন প্রণালীর তীব্র সমালোচনা।

সুবিস্তৃত ভারতে কর্ষণোপযোগী উর্ব্বর ক্ষেত্রের অভাব নাই। ধান্য-মুষ্টি ছড়াইয়া দিলে সুবর্ণ-মুষ্টি পাওয়া যায় কিন্তু তথাপি ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক বৎসর বৎসর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। দিন দিন লোকের অবস্থা

কেবলই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ত এরূপ ছিল না। তখন এ দেশ রত্ন মাণিক্য পূর্ণ ছিল। ইংরেজ-যাদুকরের স্পর্শেই যে ভারতের অতুল বিভব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে সে বিষয় সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল সারজন সোর (Sir John Shore) বলিয়াছেন—"There is reason to conclude that the benefits are more than counterbalanced by evils inseparable from the system of a remote foreign dominion" ইংরেজ শাসনাধীনে আসিয়া ভারতের যে অনিষ্ট হইয়াছে তাহার তুলনায় লব্ধ উপকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বৈদেশিক শাসনে যে বিষময় ফল এ দেশে ফলিতেছে তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই 'সোর' উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তখন যাহা ছিল তাহার তুলনায় এখন অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় প্রজাদিগের দারিদ্র্যের কারণ :—

গুরুতর কর গ্রহণ।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে যে হারে রাজস্ব আদায় করেন এই পৃথিবীর অন্য কোন সুসভ্য জাতিই প্রজার নিকট হইতে এরূপ উচ্চ হারে রাজস্ব আদায় করেন না। সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতি বিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার ভারতীয় অর্থ-নীতির ইতিহাসে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের অসহায় দরিদ্র প্রজাদিগের আয়ের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ এদেশ হইতে চলিয়া যায়। এরূপ অর্থ শোষণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। যদি ভারতের মত ইংলণ্ডকেও তাহার বার্ষিক আয়ের অর্দ্ধেকাংশ জার্ম্মেনী, ফ্রান্স অথবা রুষিয়াদেশে প্রেরণ করিতে হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ডেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।" Rev. J. T. Sunderland আমেরিকার একজন সহৃদয় ধর্ম্মযাজক। তিনি বিদেশী হইলেও ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং এদেশের আভ্যন্তরিক ইতিহাসাভিজ্ঞ। সম্প্রতি তিনি ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—ভারতের দারিদ্র্যের কারণ অনেক কিন্তু বৈদেশিক শাসনই সকলের মূল। ভারতবাসীদিগের স্বায়ত্তশাসন নাই, ব্যবস্থা প্রণয়নে তাহাদের কোন অধিকার নাই, বিজাতীয় শাসনকর্ত্তা দ্বারা তাহারা শাসিত হইতেছে সুতরাং আপন স্বার্থ সংরক্ষণের তাহাদের কোনই ক্ষমতা নাই। শিল্পের উন্নতি দ্বারা ধন বৃদ্ধি করাও তাহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। যে কোন জাতি এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইবে তাহাকেই ভারতের মত নিঃস্ব হইতে হইবে। আত্মরক্ষার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত থাকিলে বৈদেশিক শাসনে ও শোষণে

যে কোন দেশ দেড় কিম্বা দুই শতাব্দীর মধ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িবে। দুর্ব্বল প্রজার উপর বৈদেশিক শাসনে ঈদৃশ ভীষণ ফল অবশ্যম্ভাবী। ব্রিটিশ শাসনের দোষেই ভারত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে; যে কোন বৈদেশিক শক্তির অধীনেই ভারতবর্ষ এইরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইত। বিজেতা বিদেশী এবং বিজাতীয় হইলে যাহা ঘটিয়া থাকে ভারতে তাহাই ঘটিয়াছে। মেকলে (Macaulay) যথার্থ বলিয়াছেন, "The heaviest of all yokes is the yoke of the stranger."

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুরুতর রাজস্ব আদায় দুর্ভিক্ষের একটী কারণ। ভারতে রাজস্বের হার অতিশয় উচ্চ তাহা রাজ পুরুষেরা স্বীকার করিতে চান না। কিন্তু তাহা গোপন করিবার কোনই উপায় নাই। ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের সহিত তুলনা করিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে। ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের অধিবাসীরা গুরুতর করভারে প্রপীড়িত হইতেছে বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাহাদের আন্দোলনে রাজ পুরুষেরা সর্ব্বদা অস্থির থাকেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দীন দুঃখী ভারতের প্রজা তাহাদের আয়ের তুলনায় ইংলণ্ডের তিন গুণ এবং স্কটলণ্ডের চারি গুণ রাজস্ব দান করিতেছে। ভারতের ত আর মা বাপ নাই!

দৃষ্টান্ত স্বরূপ লবণের শুল্কটা ধরা যাউক। লবণ আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য; লবণ ছাড়া এক দিনও চলে না। ইহা ধনী দরিদ্র সকলেরই সমান আবশ্যকীয়। শরীর রক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লবণ সকলকেই আহার করিতে হয় নতুবা কাহারও শরীর টিকিতে পারে না। উপযুক্ত পরিমাণ লবণ আহার না করিলে ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী। এ দিকে প্রকৃতির বিধান যেরূপ কঠোর রাজার আইনও তাদৃশ নির্ম্মম। লবণাম্বু বেষ্টিতা ভারত-মাতার সন্তানগণ অনায়াসে বিনা ব্যয়ে সমুদ্র-জল হইতে লবণ আহরণ করিত কিন্তু রাজ আজ্ঞায় তাহাদিগকে মণ প্রতি দুই টাকা কর দিতে হয়। দরিদ্র প্রজা অন্নের সংস্থান করিতে অসমর্থ তাহারা মহার্ঘ লবণ উপযুক্ত পরিমাণ ক্রয় করিয়া খাইবে কিরূপে। তাহার ফলে বহু লোক পীড়াগ্রস্ত হইতেছে। এই ত গেল লবণের করের কথা। তাহার উপর গুরু আয়কর, চৌকীদারীকর, এক্‌সাইস্ কর, ষ্টাম্পকর, টোলকর, ডাককর, মিউনিসিপাল কর, তুলার কর, পূর্ত্তকর, আর কত বলিব ভারতবর্ষ করের আকর! এই সকল করের উপর দরিদ্র প্রজাদিগের মস্তকে :—

অনাবশ্যকীয় অতিরিক্ত সামরিক ব্যয়ভার।

ভারতবাসী রাজ ভক্ত নিরীহ প্রজা, চিরদিনই তাহারা শান্তি প্রিয়। ভারতে

অভ্যন্তরীণ কোন বিপ্লবের আশঙ্কা নাই। বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়ও গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে দেখা দেয় নাই। বহু বর্ষ যাবৎ ভারতবাসী শান্তিতে বাস করিতেছে তথাপি সামরিক ব্যয় ২০ বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রজার রক্ত শোষণ করিয়াই এই গুরুতর ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। বুয়র যুদ্ধের সময় তের হাজার দুই শত সৈন্য ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু তখনও দেশে কোন উপদ্রব হয় নাই। বক্‌সার-বিদ্রোহের সময় একুশ হাজার তিন শত সৈন্য চীনে প্রেরিত হইয়াছিল তখনও দেশ সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে ২৫।৩০ হাজার সৈন্য ভারতবর্ষ হইতে তুলিয়া লইলেও দেশ নিরাপদে থাকিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। বিশেষ স্বার্থ আছে বলিয়াই গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইতেছে না। তাহার কারণ হতভাগ্য ভারতবাসীর অর্থ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বহু সংখ্যক অতিরিক্ত সৈন্য পোষণ করিতেছেন। তাহারা আবশ্যক মত সাম্রাজ্যের যে কোন স্থানে গিয়া যুদ্ধ বিগ্রহে সাহায্য করিবে আবার কার্য্য সম্পন্ন হইলে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া রাজ-সুখে বিহার করিবে এবং দুর্ব্বল প্রজার "প্লীহা" ফাটাইয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে নিযুক্ত থাকিবে। কেবল তাহাই নহে—ইংরেজের যুদ্ধ হইবে আফ্রিকায় সুদানে, আফগানিস্থানে, বেলুচিস্থানে, তিব্বতে, তাহার ব্যয়ভার বহন করিবে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দীন ভারতের প্রজা। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বাহিরে যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহে ইংরেজ লিপ্ত হইয়াছিলেন কেবল তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থেই ভারতবাসী প্রজা এক শত পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা কর প্রদান করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা অন্যায় বিচার আর কি হইতে পারে? Could anything be more unjust? How much of this kind of thing could any land endure without impoverishment?

Rev. J. T. Sunderland.

গবর্ণমেণ্টের ব্যয়।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অত্যন্ত অধিক। রাজ পুরুষেরা গরীব প্রজার অর্থ জলের ন্যায় অপব্যয় করিয়া থাকেন। ভারতবাসীদিগের আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। যদি ইংলণ্ডের প্রজাদিগের ন্যায় ভারতবাসী প্রজাদিগেরও প্রতিনিধি থাকত এবং তাহাদিগের সরকারী ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার অধিকার থাকিত তাহা হইলে রাজ পুরুষেরা খামখেয়ালী করিয়া দীন প্রজার অর্থ অনাবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিত না। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়

অধিক হইবার আর এক কারণ সরকারী বড় বড় চাকরী সকলই ইংরেজদিগের হস্তে। ইংরেজ কর্ম্মচারীরা এদেশবাসীদিগের ন্যায় অল্প বেতনে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহাদিগের ব্যয় অত্যন্ত অধিক। অধিক মাহিয়ানা না পাইলে তাহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে আসিবে কেন? যে বেতন দিয়া ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয় তাহার অর্দ্ধেক বেতনে যোগ্যতম দেশী লোক পাওয়া যাইত। কিন্তু রাজপুরুষেরা উচ্চ বেতনের পদে স্বজাতিদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। ইংরেজের এই স্বজাতি বাৎসল্যই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ভারতবাসী "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া গর্ব্বিত রাজ পুরুষদের পদলুণ্ঠিত হইতেছি। লর্ড কার্জ্জন তাহার শাসনকালে শিক্ষিত ভারতবাসীর অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরেজ এবং ফিরিঙ্গী দিগকেই কেবল রাজকার্য্যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। তাহার আমলে ৪০৲ টাকার কাজের মধ্যেও শতকরা ৩০টী কাজে ফিরিঙ্গীদিগকে নিযুক্ত করা হইবে স্থির হইয়াছে। অতি উচ্চ বেতনের কয়েকটী অনাবশ্যকীয় পদও তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এখন পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে কিরূপ মুক্তহস্তে রাজপুরুষেরা ভারতের প্রজার অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে।

সুলতান মামুদ, নাদির সা, তাইমুরলেন অহোম্মদ সাহ্ আব্দালী প্রভৃতি লুণ্ঠনকারিগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া অতুল ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিত। তাহাদের লুণ্ঠনে ভারতের যে ক্ষতি না হইয়াছিল ইংরেজের শোষণে তাহা অপেক্ষা শত সহস্রগুণে অনিষ্ট হইতেছে। এ শোষণের বিরাম নাই, দিন নাই রাত্র নাই অবিরাম শোষণ চলিয়াছে। এই শোষণের নামান্তর 'হোমচার্জ্জ' বা 'বার্ষিক লুণ্ঠন'। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী অল্প কয়েক দিন হইল এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন —জার্ম্মেনীর সৈন্য ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছিল, রাজ্য শ্রীহীন করিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু জর্ম্মনসৈন্য দেশে ফিরিয়া যাইতে না যাইতেই ফ্রান্স আবার সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ শক্তি সঞ্চয় করিবার অবসর পাইতেছে না অনবরত তাহার শোণিত শোষণ চলিয়াছে।

ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ড রাজস্ব আদায় হয়। এই রাজস্ব দেশের উন্নতির জন্য প্রজার মঙ্গলের জন্য নানাবিধ উপায়ে ব্যয়িত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ১২৭ কোটি টাকা আয়ের মধ্যে পঁচিশ কোটি টাকাই 'হোমচার্জ্জ' বাবত বিলাত প্রতিবৎসর প্রেরণ করিতে হয়। "The British foreign rule

as a continuous and everlasting invasion is taking away that huge sum every year." Mr. Naoraji.

অত্যাচারী রুষিয়ার 'জারের' প্রজাদিগের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা দুঃখ প্রকাশ করি এবং ন্যায় পরায়ণ বৃটিশ রাজার সাম্রাজ্যে বাস করিতেছি বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিয়া থাকি। কিন্তু দুই দেশের প্রজাদিগের আর্থিক অবস্থার তুলনা করিলে মনে হয় তাহারা কত সুখী। ভারতবাসী লোকের গড়ে প্রত্যেকের বার্ষিক আয় ১৮॥ মাত্র কিন্তু রুষিয়ার প্রতিজনের বার্ষিক আয় প্রায় ১১০ টাকা। রুষিয়ার লোকেরা সর্ব্বদা অত্যাচার সহ্য করিতেছে বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে এ কথা সত্য কিন্তু ভারতেও রাজপুরুষদের অত্যাচারের অভাব নাই। রুষিয়ার শাসনপ্রণালী এখন সম্পূর্ণরূপে এদেশে অবলম্বিত হইতেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির তুলনায় রুষিয়ার অবস্থা খারাপ কিন্তু ভারতের তুলনায় নহে। রুষিয়াতে কি ভারতের ন্যায় কোটি কোটি লোক দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করে?

যতদিন ইংরেজ ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিবে ততদিন পূর্ব্বোল্লিখিত গুরুতর দোষগুলির নিবারণ হইবার কোন আশা নাই এবং দুর্ভিক্ষও দূর হইবে না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রাণেশচন্দ্র।

(১)

কলিকাতার কোন ছাত্রাবাসে একটী যুবক অতি দ্রুত দৌড়িয়া সিঁড়ি বহিয়া তেতলায় উঠিল, আপন কামরায় প্রবেশ করিয়া গায়ের রেপার খানি শয্যার উপর জালের ন্যায় উড়াইয়া ফেলিয়া দিল; কোট খুলিল, গেঞ্জী খুলিল, একখানি পাখা খুঁজিয়া বাহির করিয়া বাতাস দিতে দিতে এদিকে ওদিকে হাটিয়া বলিতে লাগিল—"বড্ড গরম।"

তাহার শয্যার অপর পার্শ্বে আর একখানি শয্যায় আর একটী যুবক লেপের আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। উক্ত যুবকের জুতার শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চাহিয়া দেখিল, সে যখন বাতাস দিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে বলিতেছে—বড্ড গরম।

দ্বিতীয় যুবক। বল কি! মাঘের শীত, কাল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; কলিকাতায় এরূপ ঠাণ্ডা ত দেখি নি। এত শীঘ্র চলে এলে যে?

১ম যুবক। এত শীঘ্রই বটে, চলে এসেছি, কি উড়ে এসেছি, বুঝিতে পারিতেছি না।

২য় যুবক। (লেপে মুখ ঢাকিয়া) কেন, আজ নয় তোমার দীক্ষিত হইবার কথা ছিল। দীক্ষিত হও নাই?

শীতে এবং লেপের কাপড়ে ওঠ লাগিয়া কথাগুলি যেন পাখীর পাখার ন্যায় ফর্ ফর্ শব্দ করিতেছিল; কথাগুলি বুঝা গেল না। ১ম যুবকের কাণ সেখানে ছিল, মন সেখানে ছিল না, সে বলিল "কি বল্‌ছো।"

২য় যুবক মুখ বাহির করিয়া সজোড়ে বলিল—দীক্ষিত।

১ম। তা হই নাই; পাঁচ জনের দীক্ষার কথা ছিল, তিন জনের শেষ হইবার পর আমি ছুটিয়া পলাইয়াছি। গরমে ত ভাই বাঁচি না। ঘড়িতে ক'টা?

২য়। দেখ না, তোমার পকেটেই ত ঘড়ি আছে।

পকেট তখন বিছানায়; ঘড়ি কোথায় খুলিয়া রাখিয়াছে খুঁজিবার অবসর নাই; তাহার বুক ঘড়ির অপেক্ষা জোড়ে দুর্ দুর্ করিতেছিল। সে বলিল—"গোয়ালন্দের গাড়ী ছাড়িয়াছে কি? এখনও সময় আছে কি?"

২য়। আছে মনে হয়, কেন?

১ম। এখানে থাকা হবে না, আজই বাড়ী যাব; ওঠ না ভাই, একটু গুছাইয়া দেও না।

এই বলিতে বলিতে সে তাড়াতাড়ি খাটের তল হইতে ষ্টীল-ট্রাঙ্ক বাহির করিল; তাড়াতাড়ি তালা খুলিয়া তাড়াতাড়ি ডালা উঠাইয়া, কাপড় চোপর প্লেটের গোছা গুজিয়া দিবার মত উহার ভিতর পুরিয়া তালা বন্ধ করিল। তাড়াতাড়িতে বড় ভুল হয়। আবার খুলিয়া কত কি টুক্‌টাক্ যা মনে হইল ট্রাঙ্কে ফেলিয়া পোষাক ছাতা ও লাঠি লইয়া প্রস্তুত হইল—বলিল "তুমি এস, বড় তাড়াতাড়ি, তুলে দিয়ে আসবে এখন।"

বন্ধু দেরি করিলেন না; লেপের আরাম হইতে উঠিয়া মুটে ডাকিলেন, মুটের মাথায় ট্রাঙ্ক তুলিয়া দিয়া দুই জনে অতি দ্রুতপদে শেয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে ছুটিলেন।

(২)

শেয়ালদহ ষ্টেশনের টিকেট-হলের সুদূরশ্রুত সাগর-গর্জ্জন-তুল্য জনকোলাহল তখন থামিয়া গিয়াছে। দুই পাঁচ জন সময়-জ্ঞানশূন্য যাত্রী অতি তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া অতি তাড়াতাড়ি টিকেট দেখাইয়া আপন আপন ক্লাসের অনুসন্ধানে ছুটিয়াছে। আমাদের উল্লিখিত যুবকদ্বয় তাড়াতাড়ি টিকেট-টেবিলে ভাড়ার জন্য টাকা ফেলিয়া দিল। তখন দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িয়াছে। টিকেট বাবু টাকা লইয়া খটাংখট শব্দে টিকেট কাটিলেন। বাকী পয়সা ফিরাইয়া দিতে হয়, কিন্তু পয়সা বড় বজ্জাত—কিছুতেই গুণা হইতে চায় না; গৌণ হইতেছে। সময় যায় গাড়ী ছাড়ে; যুবকদ্বয় পয়সার মায়া ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার পার হইয়া প্লেটফরমে উপস্থিত হইল, তাড়াতাড়ি মধ্যম শ্রেণীর দিকে দৌড়িল; গাড়ী দেখিয়া উঠিতে উদ্যত—কেবলই কণ্ঠে কণ্ঠে গাড়ী হইতে শব্দ হইতেছে "ম'শায় যায়গা নাই, যায়গা নাই ম'শায়, ঐ সামনে আর একখানি গাড়ী আছে।" গাড়ী ছাড়ে। ২য় যুবক অতিশয় বলিষ্ঠ। "আপনাদের সময়েও এইরূপ যায়গা ছিল না" বলিতে বলিতে সে তাড়াতাড়ি কপাট খুলিয়া আপনি উঠিয়া ট্রাঙ্কটী ব্যঙ্কে তুলিয়া দিল, ১ম যুবককে উঠাইয়া লইল। রেলওয়ে কোম্পানীর কৃপায় গাড়ী খানি মালের জন্য কি মানুষের জন্য কে বলিবে! বসিবার স্থানের অভাব। ১ম যুবকটী কোনরূপে বসিতে উদ্যত হইলে অমনি একজন বলিয়া উঠিলেন "ওখানে বস্‌বেন না, দেখ্‌ছেন না, কোন্ সাহেব টুপী ও লাঠি রেখে গেছে।" ২য় যুবক সে কথায় কাণ না দিয়া টুপী একটু সরাইয়া ১ম যুবককে বসাইয়া দিল। শেষ ঘণ্টা পড়িল। "সাহেব ত এলেন না, ষ্টেশনে রেখে যাই, যার টুপী লাঠি খুঁজে নেবে এখন" বলিয়া ২য় যুবক নিমেষে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। শিস্ দিয়া ফস্ ফস্, দম্ দম্ শব্দে তখন গাড়ী চলিয়াছে। যে ব্যক্তি টুপী লাঠির কথা তুলিয়াছিল সে ব্যক্তি তখন জানালা-পথে মুখ বাড়াইয়া যোড় হাতে বলিতে লাগিল "মহাশয় রেখে যান, সাহেব আমার পরিচিত, টুপী লাঠি আমি তাঁকে দিব।" গাড়ী ছাড়িয়াছে। আর প্রবঞ্চনা উদ্ধারের পথ নাই। "পরিচিত—এখনও মিথ্যা—'সাহেবের টুপী লাঠি'—যায়গা রাখিবার ফন্দী ও ঢের দেখেছি,"—২য় যুবক এই কথা বলিতে বলিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে বন্ধুবরকে দেখিতে দেখিতে গাড়ী অদৃশ্য হইল; সে গৃহের দিকে ফিরিল।

সে তাড়াতাড়ি নাই, ধীরে অতি ধীরে। হেরিসন রোডের তাড়িতালোকের কোনটী নিবিতেছে আবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। মাথায় চিন্তার চাপ

—যুবকটী—সে যেন মুটের মত আপন সামর্থ্যের অধিক ওজন লইয়া অতি কষ্টে অতি ধীরে চলিয়াছে, ভাবিতেছে—এতদিনে ওর ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল, ব্রাহ্মদের মধ্যে গতিবিধি সব গেল ; ব্রাহ্ম পরিবারে যাতায়াত শেষ হইল। দীক্ষিত হইলে এক ধনী ব্রাহ্ম তাহাকে বিলাত পাঠাইবেন ঠিক ছিল; আজ বিলাত যাইবার ভরসা ফুরাইল। ওর সাহেব হইবার বড় ইচ্ছা ছিল, তা গেল, কেন এমন হইল ? সব ঠিক, তবে কেন দীক্ষিত হইল না।"

সব তাড়াতাড়ি ; তখন যাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায় সে চলিয়া গিয়াছে। যুবকটী সহজে ঐরূপ ঘটিবার কোনই কারণ স্থির করিতে পারিল না। কাল উহাদের দলের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যাইবে—এইরূপ স্থির করিয়া সে আপন কামরায় প্রবেশ করিল—বড় গরম ; ভাবনা বড় গরম। যে পাখায় বন্ধু বাতাস দিয়াছিল, সেই পাখাটী লইয়া বাতাস দিতে লাগিল। ভাবনার বেগ কমিয়া আসিল, বাতাসে শীত বোধ হইল, যুবক লেপে মাথা ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল।

রেলগাড়ী চাকায় চাকায় শিকলে শিকলে ঝক্ ঝক্ ঝক্, ঝকা ঝক্ একটা তাল তুলিয়া সবেগে ছুটিয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠের আলোকগুলি একে একে অদৃশ্য হইল। গাড়ী কাটাগঙ্গার সেতুগুলি পার হইল। গাড়ীর ভিতর হাসি বিদ্রূপ চলিয়াছে, বিষয়—টুপী ও লাঠি। বিদ্রূপে ব্যথিত হইয়া ব্যর্থ-চতুর যাত্রীটীর ভ্রূকুটী কখন কখনও আমাদের যুবকটীর উপর খরবেগে পড়িতেছে। যুবকের মুখে কথাটী নাই। সঙ্কল্প-ভ্রষ্ট হইলে জীবনে একটা অবজ্ঞার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় ; অবজ্ঞায় সাধারণের উপেক্ষা আনয়ন করে ; উপেক্ষায় অবসাদ ডাকিয়া আনে। সেখানে কেহ তাহাকে উপেক্ষা করিতেছে না, কিন্তু সে আপনার নিকট তস্কর অপেক্ষাও ঘৃণার্হ। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া সে ব্যঙ্কের উপর উঠিল ; সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র বালিশ ছিল। বালিশ নামে ধৈর্য্যশীল কোমল পদার্থের বুকে কত জনের কত শোক দুঃখের অশ্রু মিশিয়াছে, কত আরাম আনন্দের স্থান হইয়াছে—কে বলিবে ? যুবকটী ক্ষুদ্র বালিশের বুকে মাথা রাখিয়া রেপার খানিতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিল।

ইহারই নাম আরব্য উপন্যাসের সচল শয্যা ; লোহার গাড়ীতে শয্যা চলিয়াছে, কল্পনার রথে মন ছুটিয়াছে—হায় হলো না ! ধর্ম্ম হইল না, কর্ম্ম

হইল না; কত ইউরোপ যাত্রীর পত্রে এডেন আলেকজেন্দ্রিয়ার বর্ণনা পড়িয়াছি, হায় তা দেখা হলো না! ইজিপ্টের পিরামিড দেখিব না, মাণ্টার দয়াদেবী দেখিব না, ভারসেলিসের প্রমোদ উদ্যান দেখিব না; বুদ্ধির অগম্য বিস্ময়কর স্নিগ্ধ বীথিকা দেখিব না। দেখিব না ভিনিস, দেখিব না ফ্লোরেন্স; দেখিব না মিলান নগরের ভজনালয়; দেখিব না রেফেল, এঞ্জিলো, সিনোভার অঙ্কিত চিত্র; দেখিব না সুইজরলণ্ডের স্বাধীনতার মূর্ত্তি; দেখিব না টাহো হ্রদের সুনির্ম্মল জল; শুনিব না পেলাজো সিমনেটার বিশ্ববিমোহিনী প্রতিধ্বনি। বিরাট কলিসিয়াম, ভয়াবহ কেপুচিন কন্‌ভেণ্ট—কিছুই দেখা হইল না। আর ইংলণ্ড, স্বাধীনতার জন্মভূমি—যে ভূমি "is holy and consecrated by the genius of universal emancipation" যে ভূমির পুরুষ স্বাধীন, রমণী স্বাধীন, ফুল স্বাধীনতার সৌরভ বহন করে, পাখী স্বাধীনতার গুণ গান করে। জন্মের মত তা আর দেখা হইল না। কোন্ দুর্ম্মতির কুমন্ত্রণায় মুহূর্ত্তে এতদিনের সংকল্পের মূল ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিলাম। কোথায় যাই, কিরূপে বন্ধুসমাজে মুখ দেখাই।—এইরূপ বৃশ্চিক-ভাবনার মধ্যে চির করুণাময়ী নিদ্রাদেবী, ধিক্কারের নির্ম্মম ক্ষতে তাঁহার অমৃতহস্ত বুলাইয়া দিলেন; যুবক অলক্ষ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

তখন অত্যল্প রাত্রি আছে। কৃষকপল্লী ভেদ করিয়া লৌহ-শকট ছুটিয়াছে। শব্দের সাড়া পাইয়া—কি মোহ—পল্লীবধূ পথপার্শ্বে আসিয়া ঐ মাঘের শীতে দাঁড়াইয়াছে —রেলগাড়ী প্রিয়তম অপেক্ষাও প্রিয়। গাড়ী ছুটিয়াছে পূর্ব্ব অভিমুখে—দ্রুত অতি দ্রুত; প্রভাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য যেন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে—পাছে বা আগে প্রভাত হইয়া যায়। প্রভাত না হইতেই রেলগাড়ী গোয়ালন্দ পৌঁছিল। যুবক গৌণ করিল না, ঢাকাযাত্রী জাহাজে উঠিয়া পড়িল। বড় কোয়াসা, কিছু দেখা যায় না, জলস্থল সমান। কত যাত্রী উঠিয়াছে, কত যাত্রী উঠিতেছে। টিকি, টিকি, টিকি, টিকি শব্দে তখন জাহাজের কল কি বলিতেছিল—মালপত্র, জনযাত্রী, সব উঠা শেষ হইল। টং টং, টটাং টং, টং টটাং ঘণ্টা ধ্বনির পর ভৈরব গর্জ্জন করিয়া কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন আকাশে কৃষ্ণ নিশ্বাস মিশাইয়া জাহাজ, জলচর ভীষণ অজগরবৎ পদ্মার তরঙ্গ ভেদ করিয়া চলিল।

ষ্টীমারে উঠিয়া প্রথম লক্ষ্য—পরিচিত কাহাকেও পাওয়া যায় কি না। যুবকের তাহার বিপরীত—কোন পরিচিতের সঙ্গে যেন দেখা না হয়। তাহার সৌভাগ্য সে দিন কোন পরিচিত লোক ছিল না। ডেকের উপর কত স্ত্রীলোক

কত পুরুষ; কত বসিয়া, কত শুইয়া। কাহারো পা অন্যের মাথার নিকট, কাহারো মাথা অপরের পীঠের পাশে। কেহ ঘুমাইতেছে; কেহ তামাক খাইতেছে; কোথাও তাস চলিয়াছে; কোথাও দাবা বসিয়াছে; কেহ খঞ্জনী লইয়া গান ধরিয়াছে। কোথাও কেহ সংবাদপত্র পড়িতেছে আর পাঁচ জনে তর্ক তুলিয়া বিশ্ব বিজয় করিতেছে। মিঠাইওয়ালা চানা মুড়ী ডাল কচুরী বেচিতেছে। কেহ চা খাইতেছে। ওদিকে শীতের আরামে গরমে গরমে সাহেব বিবি বেড়াইতেছেন। কখনও বা বিবি বিচিত্র পতঙ্গবৎ মুক্ত বারেন্দার পথে অতি দ্রুত প্রকোষ্ঠ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ডেকের উপর চক্রে চক্রে কত পথ—ব্যূহ আকারে, কত পথ—সরল ও সহজ। জন-জঙ্গলের মধ্যে এই সকল পথে চলিতে একরূপ আনন্দ আছে। মাঘের শীত—হাটিতে আরাম বোধ হইতেছে।

সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ জাহাজের দ্বিতল ছাইয়া ফেলিয়াছে। দ্বিতলের এক পার্শ্বে ঐ স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোকে একটী বালিকার মুখ ফুটিয়া উঠিল। বালিকা নয়—যুবতী, যুবতী নয়—বালিকা; সিঁথিতে সিন্দুর নাই—অবিবাহিতা। ঐ মুখখানি দেখিবার জন্য নানা উপলক্ষ করিয়া কখনও তামাকের তল্লাসে কখন জলপাত্রের উদ্দেশ্যে বালিকার অভিভাবকের নিকট অনেক লোক উপস্থিত হইতেছে। সিঁড়ির পার্শ্বে ইহাদের বসিবার স্থান। গিরিগুহা হইতে কোন দৈত্য যেমন উঠিয়া আসে, সিঁড়ি বহিয়া এক অদ্ভুত-মূর্ত্তি টিকেট-বাবু উঠিয়া আসিলেন। টিকেট—টিকেট—দেখাও।—যে দেখাইতেছে বাবু তাহার টিকেট দেখিতেছেন না, এখানে এক টিকেট চারিবার চেক করিতেছেন। রূপের মোহ মানুষকে নিমেষে আত্মহারা করিয়া ফেলে। এ বালিকার সেইরূপ—যেরূপ দেখিলে আত্মজীবনে অবজ্ঞার উপহাস পলকে উড়িয়া যায়, এ সেই লাবণ্য—যে দিকে চাহিলে চিত্ত সকল শোক দুঃখ হইতে মুহূর্ত্তে মুক্তি লাভ করে। যুবক বারবার ঐ এক পথে, ঐ বালিকার নিকটবর্ত্তী পথে। কুয়াসায় সূর্য্য ডুবিতেছে, আবার কিরণ ছড়াইয়া উঠিতেছে। বাতাস, অবগুণ্ঠনে বালিকার মুখ কখন ঢাকিতেছে, কখন খুলিয়া দিতেছে।

স্বরূপ দেখিলে কোথা হইতে সঙ্গীত আসিয়া কণ্ঠে ভর করে। যুবক কখনও শিস্ দিয়া কখনও গুন্ গুন্ স্বরে একটী গান গাইতে লাগিল।

মাঘ মাস, পদ্মার চড়া বহু স্থানে ভাসিয়া উঠিয়াছে, বহু স্থানে মগ্ন রহিয়াছে। অনেক স্থানে জল অল্প; জাহাজ সতর্কতার সহিত চালাইতে হয়। খালাসী জল মাপিতেছে—"পাণি এক বাম"। সারং ডাকিতেছে Easy ahead—যুবকের

সে ডাক ভাল লাগিতেছে না। "বাম মিলে না, Full ahead"—যুবক পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। বালিকা যুবকটীর দিকে সলজ্জ চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল। যুবকও চক্ষু বালিকার প্রতি রাখিতে পারিল না।

বালিকার পিতা, কেন কি কারণে বলিতে পারি না, উঠিয়া যুবকটীকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার নাম—

শ্রীপ্রাণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কোথায় যাইবেন?

মামা বাড়ী।

মামা বাড়ী কোথায়?

শ্রীপুর।

তবে ত আমাদের বাড়ী হইতে অধিক দূর নয়। এক ঘণ্টার পথ। শ্রীপুরে আমাদের অনেক আত্মীয় আছেন।

আপনাদের বাড়ী কোথায়?

আড়িঙ্গনা।

যুবক তাঁহার নাম জিজ্ঞাসায় সম্ভ্রম প্রকাশের ত্রুটি হইবে মনে করিতেছিল।

বালিকার পিতা বলিলেন "আমার নাম শশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা রাসের সময় শান্তিপুর গিয়াছিলাম, এখন দেশে ফিরিতেছি—সে দিন পথে হাটিতে মেয়েটীর পায় একটা কাঁটা ফুটিয়াছে—বড় কষ্ট পাইতেছে—যাক্ আজই বাড়ী পৌঁছিব।

পায় কাঁটা—দারুণ ব্যথা! কিন্তু সেই লাবণ্যময়ী বালিকার সেই লজ্জিত মুখের ত্রিসীমায় উঠিতে দারুণ ব্যথার সাহসে কুলাইতেছে না। কি প্রসন্ন শ্রী। প্রাণেশচন্দ্রের মুখশ্রীতে একটা আকর্ষণ আছে। বালিকার পিতা তাহাকে তাহাদের সকলের মধ্যে লইয়া গেলেন। তখন বালিকাটী সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকিয়া এক কোণে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া শুইয়া আছে।

শশীধর। আমরা তবে একই ষ্টেশনে নামিব—ভাগ্যকুল।

প্রাণেশ। হাঁ, ভাগ্যকুল।

১২টার সময় ষ্টীমার ভাগ্যকুল দাঁড়াইল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ীতে নৌকার জন্য লিখিয়াছিলেন। তিনি তীরে নামিয়া নৌকার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নৌকা তখনও পৌঁছে নাই। তাঁহাদিগকে এক পরিচিত গৃহে অপেক্ষা করিতে হইল।

বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বেই জানাইয়াছেন, প্রাণেশচন্দ্র তাঁহার নৌকায় যাইলে তিনি সুখী হইবেন। তিনি পুনরায় সেই অনুরোধ করিলেন।

প্রাণেশচন্দ্র ভাবিতে লাগিল—কলিকাতা হইতে পলাইয়াছি, ইহাদের সঙ্গে যাইব কি? ক্রমশঃ।

তক্ষশীল

গ্রীক, রোমক ও ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক লিখিত ভারতীয় ইতিহাসে তক্ষশীলের নাম দেখা যায়। মহাভারত এবং পুরাণেও তক্ষশীলের উল্লেখ আছে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে ও বৌদ্ধসাহিত্যে তক্ষশীলের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চনদপ্রধৌত পঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত তক্ষশীল নগর একটী প্রধান ঐতিহাসিক লীলাক্ষেত্র। বুদ্ধদেবের জীবনের এবং বৌদ্ধ নীতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় এই প্রাচীন নগর, বৌদ্ধশাস্ত্র মতে "ধর্ম্মক্ষেত্র" ও "পবিত্র" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা এই স্থানকে তীর্থ বলিয়া মান্য করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই তক্ষশীল সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

জগদ্বিখ্যাত গ্রীক বীর আলেক্জন্দর (সেকেন্দর) যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন, তক্ষশীল নামে এক হিন্দু রাজা সিন্ধুনদ তটে তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিলেন। আলেক্জন্দরের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী গ্রীক লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে তক্ষশীলের রাজত্বের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রীকেরা তক্ষশীলের কথা তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ না করিলে, প্রাচীন তক্ষশীল রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াও সুকঠিন হইত; কারণ বৌদ্ধগ্রন্থে তক্ষশীলের যে বিবরণ আছে তাহাতে সত্যের ভাগ অতি সামান্য এবং অসার ও অবিশ্বাস্য গল্পের ভাগই অধিক। বীরবর আলেক্জন্দর কাবুল ও কান্দাহারনিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া, ত্রিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর ৩৩১ বর্ষ পূর্ব্বে এক লক্ষ ষড়্‌বিংশ সহস্র গ্রীক সেনা লইয়া সিন্ধুনদাতিক্রমপূর্ব্বক তৎ সাময়িক হিন্দু রাজাদিগের রাজ্যে প্রবেশ করেন। তক্ষশীল ইঁহাদের অন্যতম। তক্ষশীল "নাগ" বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রবাদ আছে। ইনি যে প্রসস্ত নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নামও তক্ষশীল। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন,

সেকেন্দরের আক্রমণকালে একশত অষ্টাদশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ও হিন্দুরাজ্য পঞ্জাবপ্রান্তে বর্ত্তমান ছিল। ইহার মধ্যে অভিসার, পুরু, মল্ল, তক্ষশীল প্রভৃতি কয়েক জন ধনে, মানে, বিক্রমে, যশে, প্রভুত্বে এবং সাহসে অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিলেন। তক্ষশীল রাজার রাজত্ব, সিন্ধুনদ-তট হইতে জেগমনদ-তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তক্ষশীল নরপতির সহিত, সেকেন্দর বাদসাহের ভারতাক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায়, বৈরীতা সংঘটন হইয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই উভয়ের মধ্যে এতাদৃশ সখ্যতা সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, পরস্পরে পরস্পরকে "অভিন্নহৃদয়" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তক্ষশীলের নিকটে আলেক্জন্দর এবং তাঁহার লোকেরা যেরূপ নানা বিষয়ে এবং নানাপ্রকারে প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তক্ষশীলও তেমতি গ্রীকসম্রাট এবং তাঁহার সৈনিকপুরুষবর্গের-দ্বারাও বহু প্রকারে উপকৃত ও বাধিত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন তক্ষশীল নগরের ভগ্নরাশি পঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি জেলায় অদ্যাপি দেখিতে পাওয়াযায়। এই স্থানের সংস্কৃত নাম তক্ষশীলা, তিব্বতীয় নাম দোযোগ, গ্রীক নাম টাক্শাইলস্, দরায়ুসের গ্রন্থে ইহার নাম তক্শীহিল, পালি ভাষায় এলাপত্র এবং সেকালের পাঠান সুবাদারদিগের খাতায় ইহার নাম "সাহাদারি পরগণা" বলিয়া উক্ত আছে। তক্ষশীল নগর, রাওলপিণ্ডি নগরী হইতে চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত; সরাইকালা নামক ষ্টেশন হইতে ইহা কেবল দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। সর্কপ ও কচাকৎ নামক গ্রাম অতিক্রম করিয়া তক্ষশীলে পৌঁছিতে হয়। সর্কপ গ্রামে একদা বুদ্ধদেব "জিন্পাফারোল্তু" নামক মহাআশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত তিব্বতীয় শব্দের অর্থ "বদান্যতার পরাকাষ্ঠা।" প্রবাদ আছে, এক ক্ষুধিত শার্দ্দূলের এবং তাহার সপ্ত শিশুর ক্ষুধা নিবারণার্থ বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে এই স্থানে তাঁহার স্বীয় মস্তক খণ্ডন করিয়া পশুদিগকে দেহ বিতরণ করিয়াছিলেন। এক ক্রোশ দক্ষিণে যে বন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, প্রবাদ-বাক্যে শুনা যায়, এক সময়ে উহা মহারণ্য ছিল এবং ঐ মহারণ্য হইতে ব্যাঘ্রের দল আসিয়াছিল। সার্কপ গ্রামের এক ক্রোশ পূর্ব্বে "চম্ভিন" অর্থাৎ একটা স্তূপের ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়; এই স্থানে অশোকরাজার কুনলা নামধেয় সন্তানের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত হইয়াছিল। কুনলার বিমাতা এই ঘোরতর অত্যাচারের কারণ। উত্তর পশ্চিম দিকে "ভাবুরা নালা" নামক যে জলাশয় আছে, তাহা এক সময়ে নাগবংশীয় রাজাগণ

কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ ইহা তক্ষশীলের দ্বারা খোদিত। সিরকপ গ্রামের দুই ক্রোশ দূরে এক বিশাল চতুষ্কোণ প্রান্তর আছে, ইহাতে বহু সংখ্যক ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার স্থানে স্থানে গুহা দেখা যায়; বোধ হয় এক সময়ে ইহা বৌদ্ধশ্রাবকদিগের আশ্রমরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনকালে এই বিশাল প্রান্তরে যে সুবৃহৎ ও মনোহর প্রাসাদ ছিল, তাহাতে মহারাজ তক্ষশীল একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টাদশ প্রকার জ্ঞানকরী বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত বলিয়া বৌদ্ধসাহিত্যে লিখিত আছে। প্রবাদ-বাক্যে শ্রুত হওয়া যায়, বুদ্ধদেব তাঁহার পূর্ব্ব জন্মে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পালি ও তিব্বতীয় গ্রন্থের এই উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আলেকজন্দরের সমসাময়িক তক্ষশীলের পূর্ব্বেও আর এক তক্ষশীল নরপতি ছিলেন এবং তাঁহার নামে এই নগর বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, কারণ আলেকজন্দরের সমসাময়িক তক্ষশীল বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী কালের লোক; কিন্তু আমরা বৌদ্ধ গ্রন্থের ও তিব্বতীয় পুস্তকের উক্তিকে গল্প বলিয়া জ্ঞান করি। বুদ্ধদেবের "জীবক" নামধেয় চিকিৎসক তক্ষশীলনগরে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে যে বর্ণনা আছে তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। বর্ত্তমান তক্ষশীলের অনেক স্থানে অনেক প্রকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এখনও স্তম্ভ, গুহা, দীর্ঘিকা, প্রস্তর নির্ম্মিত চত্বর, চৈৎ, সমাধি, লৌহ নির্ম্মিত মুদ্গরখণ্ড প্রভৃতি পরিব্রাজকদিগের নয়ন পথে পতিত হইয়া থাকে। অতি অল্পদিন হইল তিব্বতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক সুপ্রসিদ্ধ তাসাই লামা বাহাদুর এই স্থান পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিব্বত দেশে ইনি "বুদ্ধের অবতার" বলিয়া প্রখ্যাত। ইনি প্রায় ছয় সহস্র তিব্বতীয় সন্ন্যাসীর গুরু এবং পৃথিবীর সমুদয় বৌদ্ধ-মঠের প্রধান অধ্যক্ষ। সিংহল, শ্যাম, আনাম, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, জাপান, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি সমুদয় বৌদ্ধ রাজ্যের নরপতিগণই তাসাই লামাকে অতিশয় শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি করেন।

মহারাজ তক্ষশীল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেকালের অপূর্ব্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে কি প্রকার শিক্ষা প্রদত্ত হইত তাহা বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্যের সাহায্যে সংক্ষিপ্তভাবে জানিতে পারা যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমরা কখনও দেখি নাই সুতরাং আমাদের হতভাগ্য জাতি এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রাখেন না। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে যে প্রকার শিক্ষা প্রণালী উক্ত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে

নিশ্চয় বোধ হয়, তাঁহারা জগৎপূজ্য ভারতীয় হিন্দু জাতির নিকট হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রথা ও নিয়মাদি শিখিয়া লইয়াছিলেন। জ্যোতিষ, গণিত, বৈদিকব্যাকরণ, বৈদিকসঙ্গীত, ব্রহ্মজ্ঞান, রাজনীতি, সমরনীতি, ব্যায়াম, রথ চালনা, অস্ত্র নির্ম্মাণ কোশল, চিকিৎসা, হোম, যজ্ঞ, বৈধ ও অবৈধ কর্ম্মের বিচার জ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষায় তৎকালীয় বিদ্যার্থীবৃন্দ পারদর্শীতা লাভ করিতেন। প্রতি দিবস চারি ঘণ্টার অধিক কাল ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে অবস্থান করিতেন না। মাসের প্রথম দিনে, সংক্রান্তি তিথিতে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়, ঝড় ও বৃষ্টির দিনে, বন্যা হইলে, গ্রহণের দিবসে, ভূমিকম্প হইলে অথবা উৎসবের দিনে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকিত। একটী বিদ্যালয়ে এক শতের অধিক সংখ্যক ছাত্র থাকিতে পাইত না। ছাত্র সংখ্যা অধিক হইলে অন্য বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা প্রেরিত হইতেন। বিদ্যালয় সমূহ যে "সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয়ের" অধীন থাকিত তাহারই নাম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, রাজকীয় সভাপণ্ডিতদিগের অধীনে থাকিত। দ্বাবিংশ বর্ষ অতীত হইলে কোনও ব্যক্তি, বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইত না। স্ত্রী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকিত।

আমি তক্ষশীল দেখিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, দিবার পরে রাত্রি এবং রাত্রির পরে দিবা হয়; সুখের পরে দুঃখ এবং দুঃখের পরে সুখ হয়। অত্যন্ত শীতের কাতরতার অব্যবহিত পরে সুখময় বসন্ত ঋতুর উদয় হয়, এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে ফুল ফুটে, মলয়পবন ছুটে. কোকিল ডাকে, তরু-লতায় অপূর্ব্ব শোভা ও সমৃদ্ধির সৃষ্টি হয় এবং সমুদয় প্রকৃতি যেন এক মনোহারিণী ভূষায় অলঙ্কৃতা হইয়া জীবমাত্রকেই প্রীতি প্রদান করে। এই হতভাগ্য ও অধঃপতিত ভারতের অন্ধকারময়ী রজনীর পরে আর কি শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমার চাঁদ উঠিবে না? আবার কি ভারতের সুখ-সরোবরে সমৃদ্ধির সরোজ প্রস্ফুটিত হইয়া যশোরূপ অলিকুলকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইবে না? নৌকার উপর গাড়ী এবং গাড়ীর উপরে নৌকা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারতেও আবার ভাগ্যলক্ষ্মী আসিতে পারেন, ইহা ত অসম্ভব কথা নয়।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

দস্যুর মহত্ত্ব।

৯

দেওয়ানজী মহাশয়ের অনুগ্রহে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গোলোকনাথ যুগলকিশোরকে জামিনে মুক্ত করিয়া লইয়া আসিয়াছেন।

তিন দিবস পরে যুগলকিশোরের বিচার হইবে। বিচার জেলা-কাছারীতেই হইবে। মেঃ ওয়াণ্টার মেগুয়ার ঢাকা হইতে এই মোকদ্দমার বিশেষ বিচারক নিযুক্ত হইয়া এখানে আসিতেছেন। আর সময় নাই সুতরাং যুগল রায়কে লইয়া গোলোকনাথ রাতারাতি বাড়ী আসিয়া পঁহুছিলেন।

যুগল রায় রাত্রিতে পঁহুছিয়া গোলোকনাথকে বাড়ী দেখাইলেন বলিলেন "দাদা, তুমি বোধ হয় আর আমাদের এ বাড়ী দেখ নাই।"

গোলোকনাথ বলিল, "নালঙ্কা হইতে বোকাইনগর আসিবার অল্প পরেই আমার মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং দেখি নাই।"

যুগল—এ অজ্ঞাতবাসে কোথায় কাটাইলে?

গোলোকনাথ—"অযোধ্যার নবাব সরকারে চাকুরী লইয়াছিলাম। সে চাকুরী এখনও উঠিয়া যায় নাই।"

যুগল। "তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে কেন?"

গোলোকনাথ। "তোমরা আমাকে তাড়াইলে বলিয়া।"

যুগল। কিসে বুঝিলে?

গোলোকনাথ। "আমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের সম্পত্তির ভাবি ওয়ারীশ হইয়া তোমাদের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটাইব এই ভয়ে, যা'ক্ সে সব। আমি মরি নাই। কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভাবি ওয়ারীশদিগের স্বার্থেও ব্যাঘাত করি নাই। সম্প্রতি তদীয় ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছি—তাহাই করিব।"

যুগলরায় লজ্জিত হইলেন, বলিলেন যদি তাহা প্রতিগ্রহণ না করি?

গোলোকনাথ। "কোম্পানির বিচারে ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন যাইবে।"

যুগলকিশোর কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "শত সহস্র নর-নারীর অভিসম্পাত ফলিবে,—পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইবে।"

গোলোকনাথ। তবে এরূপ পাপ করিলে কেন?

যুগলকিশোর কাতর কণ্ঠে বলিলেন এরূপ ভয়াবহ কার্য্য হইবে ভাবিলে কখনই এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। আমি শাসনেরই অনুমতি

দিয়াছিলাম মাত্র, তাহার পরিণাম এরূপ ভীষণ লঙ্কাকাণ্ডে পরিণত হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। আমি নিজে সে দৃশ্য দেখি নাই। কিন্তু যাহা শুনিয়াছি তাহাও যে ভগবান—বলিয়া যুগলকিশোর কাঁদিয়া ফেলিলেন।

গোলোকনাথ বলিলেন, "ধর্ম্ম ইহার বিচার করিবেন।" কিন্তু আপাততঃ তোমাকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ যোগাড় প্রয়োজন। সে জন্য বিশেষ অর্থেরও প্রয়োজন।

যুগলকিশোর—আমি কপর্দ্দক শূন্য হইয়া পড়িয়াছি। তিন বৎসর যাবৎ সরকারী রাজস্বই সম্পূর্ণ আদায় হইয়া আসিতেছে না। সন্ন্যাসীদিগের ঘন ঘন উপদ্রবের ও দুর্ভিক্ষের দোহাই দিয়া সরকারী রাজস্ব আদায়ের শৈথল্য হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়া আসিতেছি।

গোলোকনাথ কথায় বাধা দিয়া বলিল "আপাততঃ টাকার জন্য তোমার কোন চিন্তার প্রয়োজন নাই। তুমি কিম্বা তোমার লোকজন এই কার্য্য করে নাই, ইহাই তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে। সাক্ষী সংগ্রহের জন্য অদ্যই আমাকে অকুস্থলে যাইতে হইবে।

১০

ঢাকা হইতে মেঃ ওয়াল্টার মেওয়ার যুগলকিশোরের মোকদ্দমায় বিশেষ বিচারক হইয়া আসিয়াছেন। কয়েক দিন যাবত সমানে মোকদ্দমার বিচার চলিয়াছে। বহু গ্রামিকানের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। কাহারও দ্বারা যুগলকিশোরের দোষ সপ্রমাণিত হয় নাই। ঢাকা হইতে আগত বাকরন্দের উকীল গৌরীকান্ত মুন্সীও সরকারী পক্ষে বক্তৃতা করিতে যাইয়া যুগলকিশোরের সাপক্ষে প্রচুর ওকালতী করিলেন। রূপচান্দের কি মোহিনী শক্তি! বাক্ রন্দের উকীল আসন গ্রহণ করিলে, কৃপারাম ও নরসিং রায় আসামীর পক্ষে ক্রমাগত উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। সকলের বক্তৃতা শেষ হইলে, বিচারক মেওয়ার সাহেব পরিষ্কার বাঙ্গলা ভাষায় নিজ মন্তব্য বিবৃত করিলেন।

"গৃহীত সাক্ষ্যদ্বারা যুগলকিশোরের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণিত হইয়াছে বটে। কিন্তু ঘটনার কোন কিনারা হয় নাই। মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর আমাকে এখানে আসামী খালাস দিতে পাঠান নাই, নির্দ্দোষকে শাস্তি দিতেও অবশ্যই পাঠান নাই, বিচার করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে ও দোষীর যথাবিহিত দণ্ড দিতেই পাঠাইয়াছেন। এতদ্দেশে জমিদারের অত্যাচার-কাহিনী আমারও অবিদিত নহে। জমিদার অত্যাচার করিয়া অর্থ-মাহাত্ম্যে নিষ্কৃতি পাইবে

থাকিয়া নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইবে, ইহা ন্যায় বিচারের অনুমোদিত নহে।

"বর্ত্তমান মাজরায় প্রজাগণের উপর যে ভীষণ অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহা জমিদার যুগল রায় না করিয়া থাকিলেও কেহ অবশ্যই করিয়াছে। অতএব আদেশ হইল যে— যে পর্য্যন্ত ইহার প্রকৃত অপরাধী বাহির না হইবে, সে পর্য্যন্ত যুগল রায় অব্যাহতি পাইবে না।"

বিচারকের রায় সমাপ্ত হইল। আদালত গৃহ নিস্তব্ধ। সকলেরই মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কাহারও মুখে কথাটী মাত্র নাই। সেই নিস্তব্ধ আদালত গৃহের শান্তিভঙ্গ করিয়া উচ্চকণ্ঠে একজন বলিয়া উঠিল, "প্রকৃত আসামী হাজির নির্দ্দোষকে ছাড়িয়া দাও।" আদালতস্থ সকলে সবিস্ময়ে দেখিল গোলোকনাথ সবেগে যাইয়া যুগলকিশোরকে ঠেলিয়া দিয়া সে স্থান অধিকার করিয়া লইল। যুগলকিশোর হতবুদ্ধি হইল। সকলেই বিস্মিত। একি এ—? বিচারক ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

উঃ। "আমি এই মাজরার প্রকৃত আসামী।"

প্রঃ। প্রজাদিগের প্রতি তুমি অত্যাচার করিয়াছ?

উঃ। হাঁ আমি সদলবলে প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছি।

প্রঃ। দোষীর কি দণ্ড হইবে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ কি?

উঃ। খুব বুঝিতেছি—প্রাণদণ্ড।

প্রঃ। জমিদারের অর্থ-প্রলোভনে বশীভূত হইয়াছ কি?

উঃ। কখনও নহে। নির্দ্দোষের দণ্ড হইতেছে দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলাম। পারিলাম না তাই নিজেই ধরা দিতেছি—সাহেব সুযোগ ছাড়িও না।

বিচারক "আচ্ছা তাহাই হউক" বলিয়া কাগজ টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম?"

উঃ। সাহামজরদ—জয়সিংগীর সন্ন্যাসী।

ভয়ে বিচারকের বক্ষঃ স্পন্দিত হইল। ক্ষণকালের জন্য বিচারালয়স্থিত সকলেই যেন জড়সড় হইয়া রহিল।

বিচারকের আদেশে সন্ন্যাসীদলপতি জয়সিংহের হস্ত লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল।*

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

---

* মল্লিখিত "ময়মনসিংহের ইতিহাসের" ৮ম ও ১০ম অধ্যায় হইতে গৃহীত।

মা।

কে মোরে শুনাল আজি সুধার "মা" নাম
কি অমিয়া স্পর্শে আজি ভরে গেল প্রাণ।
শুষ্ক এ হৃদয় সারা, মৃতসঞ্জীবনী পারা
কে আসিল, কে ঢালিল সুধা অবিরাম,
দুঃখিনীরে কে শুনাল সুধার "মা" নাম।

একি সুধা ধারা নব, একি নব সুখ,
যার স্পর্শে ভরে যায় তাপ দগ্ধ বুক.
সারা এ জগতে আজি, বিশ্ব-বীণা উঠে বাজি'
একি মন্ত্র প্রাণ-মন্ত্রে উঠিল উথলি,
শিশু হারা দুঃখিনীরে কে ডাকে মা বলি।

এ বিশ্ব যে পরিপূর্ণ সেই সুধা নামে,
সে সুধা ছড়ায়ে পূর্ণ কে করে এ প্রাণে।
আমি শুনি আত্মহারা, সারা এ জগৎ সারা
ভরিয়া উঠিছে যেন সেই এক তানে,
কে মোরে ডাকিল আজি সুধার "মা" নামে

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

তুলসী।

চিনেছি তোমায় তুমি সত্যে-সত্যবতী
ত্রেতায় সাজিলে ভাল মানবী রূপসী,
দ্বাপরে রসিকা বৃন্দা ছিলে প্রেম-দূতী,
কলিযুগে জগদ্ধাত্রী, তুমরে তুলসা;
যুগে যুগে নবলীলা নব অবতার
নানারূপে বিশ্বে তব নিয়ত বসতি,
মর্ত্তের মঙ্গল কিসে চিন্ত অনিবার
অমরার সুখভোগে নাহি তব মতি;
বরদা কেশবপ্রিয়া পতিতপাবনি!
ভ্রান্ত ভক্ত তব দাঁড়ায়ে নিকটে
প্রাণের অনল তার কোথাও নিভেনি
নাহি ত্রাণ যায় প্রাণ বিষম সঙ্কটে;
শরণ লয়েছি চিনে চরণে এবার
পরশনে মুক্ত কর—ভক্তেরে তোমার—